প্রকাশনায় ঃ শ্রীমতী ঊষা মাহাত
প্রতিম প্রকাশন
'কিরণস্মৃতি', রঘুনাথপুর
ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

প্রথম প্রকাশ ঃ পৌষ সংক্রান্তি, ১৩৬৭

মুদ্রণে ঃ শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র সাহা
অমি প্রেস, ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

উচ্চসংস্কৃতির তীব্র আকর্ষণে দিশেহারা পুত্রকে যিনি নিজস্ব ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির প্রতি আত্মসমর্পণে শ্রদ্ধাবান করে তুলেছেন, ঝাড়খণ্ডের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহে ও বিচার-বিশ্লেষণে যিনি নিরলস সস্নেহ সাহায্য করেছেন, এ গ্রন্থের প্রতি ছত্রে যাঁর উপস্থিতি বর্তমান, সেই স্বর্গাদুচ্চতর পিতা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাহাত

শ্রীচরণকমলেষু

তাঁর সামান্যতম পরিতৃপ্তি এবং সান্ত্বনার আশায় পুষ্পস্তবকপ্রতিম এই গ্রন্থ পরম শ্রদ্ধায় সমর্পিত হল।

ভূমিকা

ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে ঝাড়খণ্ড নামটিই আলোচ্য অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং দীর্ঘস্থায়ী নাম। জঙ্গলমহল, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সী এবং ছোটনাগপুর নামগুলো অত্যন্ত অধুনা কালে বৃটিশ সরকারের প্রশাসনিক নামকরণ মাত্র। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঝাড়খণ্ডকে যেভাবে ভাঙা-চোরা করা হয়েছে (সম্ভবত ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলের ক্ষেত্রে বারবার এমন ভাবে অঙ্গহানি ঘটিয়ে ভাগবাঁটোয়ারা করা হয়নি), তা অত্যন্ত অমানবিক এবং বেদনাময়। আদিবাসী মানসিকতা, ভাষা-সংস্কৃতি কিংবা জীবনচর্যার প্রতি কোনরকম দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি শাসকগোষ্ঠী। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা দেখা দিল; আদিবাসী সংস্কৃতির ওপর উচ্চসংস্কৃতির চাপ সৃষ্টি করা হল। ফলে, ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির সংহতি বিনষ্ট হল; সরকারি শাসন এবং প্রচার-যন্ত্রের তাড়নায় কোথাও বঙ্গসংস্কৃতি, কোথাও বিহার-সংস্কৃতি, কোথাও উড়িষ্যা-সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করল। সুযোগ বুঝে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার বুদ্ধিজীবীরা তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন, আদিবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটতে শুরু করেছে; কিন্তু আসলে যা হল তা সমন্বয়ের নামে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ বৃটিশ যুগের মতোই অব্যাহত থাকল, তবে এবারে তীব্রতা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। শুধু তাই নয়, শুরু হল আদিবাসীদের মগজধোলাই এবং তাদের ভাষা-সংস্কৃতি বিনষ্টির পালা। বিভিন্ন রাজ্যে ঝাড়খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে মিশে যাবার ফলে আদিবাসীদের পরিবার ও সমাজ-জীবন ভেঙে পড়তে লাগল। তাঁরা নিজেদের আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাষা-সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে ক্রমশই পরস্পরের অপরিচিত হয়ে পড়তে লাগলেন। আদিবাসীদের জীবনচর্যা এবং সংস্কৃতি-সংকট সম্পর্কে এতো গভীরে ভেবে দেখবার কথা আমাদের সমদৃষ্টিসম্পন্ন সরকার সম্ভবত বাহুল্য মনে করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বুদ্ধিজীবিগোষ্ঠীও

ঝাড়খণ্ডী জনতার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং জীবনচর্যা সম্পর্কে দায়সারা গতানুগতিক ধারণা পোষণ করেন ; ঝাড়খণ্ডীদের যন্ত্রণা, হতাশা, অনিশ্চয়তা-বোধ এবং অসহায়তা সম্পর্কে কোনরকম সহানুভূতি দেখিয়ে গভীর চিন্তা করবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

এই কারণেই আমি এই গ্রন্থে ঝাড়খণ্ডের একটি সামগ্রিক রূপরেখা অঙ্কন করতে প্রয়াসী হয়েছি। তবে এখানে আমি ঝাড়খণ্ডী বাঙলা উপভাষাভাষী পূর্ব ঝাড়খণ্ড বা জঙ্গলমহল অঞ্চলটিকেই বেছে নিয়েছি এবং 'প্রারম্ভিকা-তে এই অঞ্চলটির পরিচয় দেবার জন্য ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিম বাংলা নাম ব্যবহার করেছি। বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ লভ্য প্রবচনটি মেনে নিলেও স্বল্পপরিসরে অস্ট্রিকভাষাভাষী আদিবাসীদের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে তাঁদের প্রতি অবিচারের আশঙ্কায় আমি সে প্রয়াসে বিরত থেকেছি। এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবল অর্থসংকট দেখা দেওয়ায় গ্রন্থের কলেবর সংকোচন করতে বাধ্য হয়েছি ; ফলে লোকগীতি এবং প্রবাদগুলো বহু ক্ষেত্রে একটানা গদ্যের মতো সাজাতে হয়েছে—পাঠকের সুবিধার্থে প্রতিটি উপকরণের শেষে দু'টি দাঁড়ি দিয়ে সমাপ্তি বোঝানো হয়েছে। এর ফলে ব্যয়সংকোচ এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রচুর উপকরণের স্থান সংকুলান সম্ভব হলেও গানগুলো কবিতার অবয়ব হারিয়েছে। এ ত্রুটি বিনীত-ভাবেই স্বীকার করি। গ্রন্থমধ্যে আলোচনার সময় প্রচুর পরিমাণে লোকগীতি উদ্ধৃত এবং সংকলিত হয়েছে বলে আলাদাভাবে কোন সংকলন দেওয়া হল না। পরিবর্তে কিছু নির্বাচিত শব্দের অর্থসহ একটি সূচী সংযোজিত করা হল।

আলোচ্য অঞ্চলের ওপর কিছু গতানুগতিক এবং পল্লবগ্রাহী আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে : ড. সুধীরকুমার করণ এবং ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহার গ্রন্থ দু'টি কিছুটা ব্যতিক্রম। গ্রন্থগুলি অল্পবিস্তর প্রয়োজন মেটালেও কোনটিই এখানকার লোকজীবন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তেমন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় নি। পূর্বসূরী গ্রন্থকারগণ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে ঝাড়খণ্ডের জনজীবন এবং সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেন নি। যে-কোন জনজীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেই বিশেষ জন-গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে দীর্ঘকাল বাস করবার একান্ত প্রয়োজন। শহরে আরামশয্যায় শুয়ে থাকলে কিংবা উঁচু সংস্কৃতির অহমিকায় নিজেকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব

নয়। আমি নিজে ঝাড়খণ্ডের একটি আদিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এ-অঞ্চলের লোকজীবন, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং আচার-সংস্কারের ঘনিষ্ঠ পরিবেশে পরিপালিত হয়েছি; তা সত্ত্বেও এখানকার লোকজীবন ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস যে সর্বাংশে সফল হয়েছে এমন দাবি আমি করি না। ত্রুটি মানুষের নিত্য সহচর, আমি তার ব্যতিক্রম নই। তবু আমার বিশ্বাস করবার সংগত কারণ আছে যে, কারো কারো কাছে এ গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় অধিকতর সম্পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য মনে হতে পারে।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠকালে জামশেদপুরের সাপ্তাহিক 'নবজাগরণ' সংবাদ-সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয়তে একটি লোকসংস্কৃতিমূলক ক্ষুদ্র রচনা প্রকাশ এবং ১৯৫৭তে কলকাতার 'গাঙ্গেয়' পত্রিকায় একটি লোক-সাহিত্যসম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে আমার লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত। তারপর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমার বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, যা আজো গ্রন্থবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। এসব কথা বলবার একটিই কারণ যে, নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করলেও রাতারাতি এ গ্রন্থ রচিত হয় নি, বরং এর পেছনে রয়েছে প্রায় ২০/২৫ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন চর্চার অভিজ্ঞতা এবং প্রস্তুতি। এই ২০/২৫ বছর ধরে আমি নিরলসভাবে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন জনের সহৃদয় সাহায্যের ফলেও আমার পক্ষে বিপুল উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যত্র পৃথকভাবে আমি এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি।

গ্রন্থখানি মৌলিক কি না তার বিচারভার পণ্ডিতবর্গ এবং রসিক বিদ্বজ্জনের হাতে অর্পণ করা হল। তবে গ্রন্থখানি যে মৌলিক উপকরণের সাহায্যে যথাসম্ভব মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে রচনার চেষ্টা করা হয়েছে—একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই। গবেষণা-নিবন্ধ প্রায় ক্ষেত্রেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য হয়ে থাকে; আবার কোন কোন গ্রন্থ লেখকের ভাষার মনোহারিত্বে বিষয়বস্তুর অন্তঃসারশূন্যতাকে আড়াল করে রাখে: এই গ্রন্থে এই দু'টি দিকই সযত্নে পরিহার করা হয়েছে।

গ্রন্থটির মুদ্রণকালে আমি রাঁচি কলেজে অধ্যাপনা করতাম। কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকায় ডাকযোগে একমাত্র মেক-আপ প্রুফ দেখবার

সুযোগ পেতাম। তাই মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে বহুল পরিমাণে ; সব ভুল সংশোধন করবার অবকাশ নেই—তবু নির্বাচিত কিছু ত্রুটির শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত করা হল। 'কুলকেতু' শব্দটি নিতান্ত অনবধানতাবশত দু'এক জায়গায় 'কুলতিলক' ছাপা হয়েছে। কয়েকটি শব্দের বানানে প্রচলিত দু'টি রূপই ছাপা হয়েছে। আহীরা গানের ৩৮-সংখ্যক গানের তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ১৪৩ পৃষ্ঠার প্রথম পঙ্‌ক্তি—'ছাগলে ত খুজে ভালা চৈত বৈশাখ গ কাড়ায় ত খুজে আষাড় মাস'—বাদ পড়ে গেছে। পটমদা (বরাভূম) ভুলবশত সেরাইকেলা মহকুমার অন্তর্গত বলে ছাপা হয়েছে, হবে ধলভূম মহকুমার অন্তর্গত। এই সমস্ত ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আপাতত আর কিছু করবার নেই।

অগণিত খ্যাত-অখ্যাত, জ্ঞাত-অজ্ঞাত, জীবিত এবং পরলোকগত লোককবিদের প্রতি—যাঁদের রচিত গানে এ-গ্রন্থ শুধু অবয়বই লাভ করেনি বরং অর্থময় হয়ে উঠেছে—আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তাঁরাই ঝাড়খণ্ডের মনোলোক রচনায় সার্থক রূপকার ও পথিকৃৎ।

শ্রদ্ধেয় ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেন আমাদের মুখের ভাষাকে ঝাড়খণ্ডী উপভাষা অভিধায় ভূষিত করে এবং স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যাঁরা আমাকে বিশেষ স্নেহভরে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেব (সম্পাদক, নবজাগরণ),প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট লোকতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার রায় (চতুষ্কোণ,কলকাতা)-এর প্রতি আমি বিশেষ ঋণী। এঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য গবেষণায় অপরিসীম উৎসাহ দিয়ে আসছেন। রবীন্দ্র অধ্যাপক ড. হরপ্রসাদ মিত্র ঝাড়খণ্ডের জনজীবন ও সাহিত্যসংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণায় নিরন্তর অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এঁদের দু'জনকেই শ্রদ্ধা জানাই।

আমার এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অগণিত জন অত্যন্ত আগ্রহান্বিত—তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যাঁদের অনুপ্রেরণা ছাড়া এ গ্রন্থের মুদ্রণ তো দূরের কথা, পাণ্ডুলিপি রচনাই বিলম্বিত হয়ে পড়ত, সেই অধ্যাপক-দম্পতি অগ্রজপ্রতিম ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা এম. এ. ; পি-এইচ. ডি ; ডি. লিট.

(স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, রঁাচি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং শ্রীমতী শ্রেয়কণা সাহা এম. এ. (রঁাচি উইমেনস্ কলেজ)-কে আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

অমি প্রেসের স্বত্বাধিকারী বন্ধুপ্রতিম শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র সাহা অসীমধৈর্য্যের সঙ্গে তাঁর অপরিচিত উপভাষার এই গ্রন্থটিকে মুদ্রণের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত পার্থ বন্দোপাধ্যায় শুধু প্রুফ দেখার গুরুদায়িত্বই পালন করেন নি, এ গ্রন্থের সাফল্য সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত আশার বাণী উচ্চারণ করে আমাকে উৎসাহিতও করেছেন। এঁদের দু'জনকেই আমার আন্তরিক প্রীতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

সবশেষে বলা হলেও যাদের অবদান এই গ্রন্থ রচনার পেছনে নিতান্ত নগণ্য নয়, তারা হল আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী ঊষা মাহাত এবং শিশুপুত্র শ্রীমান প্রতিমসূর্য। পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিমান মাহাতর কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এদের সবাইকে আমার প্রীতি জানাই।

বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ সংগ্রহের ব্যাপারে আমি নিম্নলিখিতদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এঁরা ছাড়াও আরো অনেক নাম-না-জানা গাইয়ের অবদান এ গ্রন্থ প্রণয়নে বড়ো একটা কম নয়। বলতে গেলে, আলোচ্য অঞ্চলের সমগ্র জনসমাজই যেন এই গ্রন্থের প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে সশরীরে বর্তমান; সবার আনন্দ-বেদনার কথাই এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সুর। তাই সবার কাছেই আমি আমার ঋণ স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ধলভূম: চাকুলিয়া: পাথরাঘাটি—বাবা ও মা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাহাত ও শ্রীযুক্তা কৌশল্যা মাহাত, বোন কুমারী মিনতি মাহাত, ৺কামিনী পিসি, ৺খুনিয়া, শ্রীকেদারনাথ মাহাত, শ্রীঠাকুরদাস মাহাত, শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাত্র। মাটিয়াবাঁধি—শ্রীরজনীকান্ত মাহাত, শ্রীনিরঞ্জন মাহাত, শ্রীভুবন মাহাত। মালকুঁড়ি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মাহাত, গুঁড়ুর প্যাতর। পিঁড়বাশোল—দিদিমা, ছোট মামীমা, শ্রীজগন্নাথ মাহাত। চাকুলিয়া—শ্রীজহরলাল মাহাত। নরসিংগড়: থুকড়াথুঁপি—শ্রীবৈষ্ণবচরণ মাহাত, ভুয়া। ঘাটশিলা: সিংপুরা—গুরুপ্রসাদ মাহাত, শ্রীমতী শশিকলা মাহাত, শ্রীমতী যশোদা মাহাত। বাঁকি—সৈরভীবালা মাহাত। আমাডুবি-‍-শ্রীকিরীটিভূষণ চিত্রকর। মহুলিয়া: পায়রাগুড়ি—শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংসর্দার। **বরাভূম:** পটমদা: কুইয়ানি—শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র মাহাত। লাওয়া—শ্রীদুলালচন্দ্র মল্লিক। দীঘি—শ্রীঅরুণচন্দ্র মাহাত। **পুরুলিয়া:** পুরুলিয়া—শ্রীযুক্ত সুবোধ বসুরায় (সম্পাদক, ছত্রাক)। ডাবর—শ্রীপশুপতিপ্রসাদ মাহাত। রাজনুয়াগড়—শ্রীঅশ্বিনী লুহার। ঝালদা: তুড়দাগ—শ্রীঅধীরচন্দ্র মাহাত। **ধানবাদ:** শিখরভূম: ডুমুরজোড়—শ্রীচণ্ডী-চরণ মাহাত। **ঝাড়গ্রাম:** সাঁকরাইল: পাথরা—শ্রীবিধানচন্দ্র মাহাত। পড়িহাটি: রাজপাড়া—'কোকিলা মামু'। জামবনী—শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

পাঠসঙ্কেত

বিপর্যস্ত ই এবং উ ধ্বনি দু'টিকে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিপর্যস্ত ই=একটি ঊর্ধ্ব কমা। যেমন আইজ>আ'জ, কাইল>কা'ল।

বিপর্যস্ত উ=দুটি ঊর্ধ্ব কমা। যেমন চাউল>চা"ল, বেউল>বে"ল।

এছাড়া ক,=কথান্তর, পা. টী.=পাদটীকা, সাঁ=সাঁওতালী ইত্যাদি সঙ্কেতও ব্যবহৃত হয়েছে।

সূচীপত্র

প্রারম্ভিকা

॥ এক ॥

ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিম বাংলার পরিচয়

লোকসাহিত্য পরিক্রমায় আমরা যে অঞ্চলটিকে নির্বাচিত করেছি, সেই অঞ্চলটিকে আধুনিক রাজনৈতিক মানচিত্রের পটভূমিতে সর্বজনবোধ্য করে তোলবার জন্য 'ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিম বাংলা' নামে চিহ্নিত করা যায়। এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বিহারের ধানবাদ জেলা, সিংভূমের ধলভূম ও সেরাইকেলা মহকুমাদ্বয়, রাঁচির বুণ্ডু-সিল্লি তামাড় সোনাহাতু আদি পাঁচ পরগণা এবং অন্যদিকে পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া জেলা, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা এবং বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে থাকে, তা বাঙলা ভাষারই একটি উপভাষা। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন এই উপভাষাকে ঝাড়খণ্ডী বাঙলা অভিধায় ভূষিত করেছেন। প্রস্তাবিত লোকসাহিত্য-আলোচনার পরিক্রমণ ক্ষেত্র হিসেবে এই উপ-ভাষাঞ্চলটিকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাজ্যপুনর্গঠনের টানাপোড়েনে এই ভাষাঞ্চলের কিছু অংশ চলে গেছে পশ্চিম বাংলায়, কিছু অংশ থেকে গেছে বিহারে যা ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত। পাহাড় অরণ্যময় টাঁইড়-টিকর ভরা এই অজলা অফলা ঊষর ধূসর জনপদকে ঘিরে ভাঙনের সূত্রপাত যে এই প্রথম, তা নয়। ইংরাজ আমলে এ-অঞ্চলের স্বাধীনতাপ্রিয় আদিম অধিবাসী-দের দৃপ্ত বিদ্রোহে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কতো বার কতো ভাবে একে খণ্ডিত করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

আলোচ্য অঞ্চলটি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভূখণ্ড রাঁচি-গণ্ডোয়ানা মালভূমির অন্তর্গত। গণ্ডোয়ানা মালভূমির সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকে একই ভাগ্য-সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে ছোটনাগপুর বা রাঁচি মালভূমি যা ক্রমশঃ অবনমিত হয়ে তার অজলা অফলা ঊষর ধূসর শরীরচিত্রে রাঙামাটি আর কাঁকর পাথরের প্রলেপ নিতে নিতে খড়্গপুরের প্রান্তভূমি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। গণ্ডোয়ানার বিন্ধ্য পর্বতমালা পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে চাণ্ডিল-জামশেদপুরের দলমা

পাহাড় স্পর্শ করে ঘাগরা গোটাশিলা পাহাড হয়ে চাকুলিয়া—বেলপাহাড়ীর মধ্যস্থলে কানায়েশ্বর পাহাড়ের প্রান্তসীমানায় অবসিত হয়েছে, উত্তরে বাঘমুণ্ডি অযোধ্যার পাহাড় ছাড়িয়ে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্যন্ত তা প্রসারিত। বলাবাহুল্য, ভারতের এই আদিম ভূমিখণ্ডে সেই গণ্ডোয়ানা থেকে খড়্গপুর পর্যন্ত আদিম অধিবাসীদের বাসভূমি প্রসারিত, যাদের মধ্যে রয়েছে দ্রাবিড়, আদি-অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা। কোন কোন গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা এখনো নির্বিকার ব্যবহার অব্যাহত রেখে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। কোন কোন গোষ্ঠী নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে আর্যভাষা গ্রহণ করে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করছে। পরবর্তী গোষ্ঠী-গুলোর ভেতর ভূমিজ, মাল, খারিয়া, কুর্মিমাহাত গোষ্ঠীগুলোই প্রধান।

অতঃপর এই অঞ্চলের নামের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে। মহাভারতে নিম্নোদ্ধৃত দু'টি শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়ঃ

অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাশ্চ শুণ্ডিকান্ মিথিলানথ।
মাগধান্ কর্কখণ্ডাংশ্চ নিবেশ্য বিষয়েঽত্মনঃ ॥
আবশীরাংশ্চ যোধ্যাংশ্চ অহিক্ষত্রং চ নির্জয়ৎ।
পূর্বাং দিশং বিনির্জত্য বৎসভূমিং তথাগতম্ ॥[১]

এখানে আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটিকে মহাভারতকার ব্যাসদেব কর্কখণ্ড নামে অভিহিত করেছেন। বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা'য় (৬ষ্ঠ শতক, ১৪শ অধ্যায় ৫ম—৭ম শ্লোক) 'কর্বট', মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৬ষ্ঠ শতকের পরে) 'কর্বটাশন' এবং পরাশরের ভূগোলে 'কর্বট' নামে প্রাচ্য অঞ্চলে একটি পর্বত রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। নানা দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয়, তাঁরা অই নামের সাহায্যে আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। ছোটনাগপুর পরবর্তী কালে কোকরা নামে-ও পরিচিতি লাভ করেছিল। "কথাসরিৎসাগর'-সম্পাদনায় Tawney বলেন বা মনে করেন যে কাহিনীর কর্কোট নাগের নিবাস ব্রহ্মের আরাকানে ছিল। এই স্থান পর্বতময় হওয়ায় 'কর্কোট' সহ কর্বটের যোগ অসম্ভব নয়।"[২] আমাদের বিশ্বাস, কর্কোট নাগের দেশ ছোটনাগপুরই ছিল, এই অঞ্চলটি পর্বতময় হওয়ায় কর্কোট সহ

১. মহাভারত, দ্বিতীয়খণ্ড (সংবৎ ২০২৩ গোরখপুর) পৃ. ১৬৬৫ ; ২ রামপ্রসাদ মজুমদার : চতুষ্কোণ আষাঢ় ১৩৭৮ পৃ. ১৬৮

কর্কটের যোগ খুবই স্বাভাবিক এবং সম্ভাব্য ব্যাপার। টলেমির ভূগোল (২য় শতক)-এর কথা উল্লেখ করে মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ৪৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—Ptolemy's geography throws little more light on the subject beyond that he groups with Mandalai and Sutrarai (the Monedas and Sauri of Plyni), Kokhenagai, a name which is perhaps traceable to Karkhotanaga, the country of Na bangsis and surviving still in the name Nagpur.

বলাবাহুল্য, এই নাগপুর বলতে চুটিয়া-নাগপুরকেই বোঝানো হয়েছে। নাগপুরের রাজাদের রাজত্ব সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে—Raja Phani Mukut Rai reigned over Bantha, Hazen Kharsawan to Badin, Ramgarh, Changuriah, Gola, Palami, Tori to Mankeri, Burway.[৩]

কর্কখণ্ডই যে কালপ্রবাহে 'কখেনাগাই' এবং 'কর্কোটনাগ'তে পরিবর্তিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বি সি মজুমদার তাঁর Aboriginals of Central India গ্রন্থটিতে বলেছেন In all probability at a time not later than 6th century B. C. when the Anga country (for the south-eastern Bihar) and the province of Bengal lay outside the holyland of the people of Vedic traditions, the forest areas of Kalkavana formed the eastern boundary of Aryavarta. This Kalkavana obtained subsequently the designation of Jharkhand and this Jharkhand of indefinite extension lay to the south of Gaya, to the east of Shahabad, to the south of Bhagalpur and to the west of the districts of Bankura and Midnapur.. ...The Santhal Parganas, Chutia Nagpur, the districts of Sambalpur and the native states adjoining Chutia Nagpur and Sambalpur fall within Jharkhand.[৪]

দেখা যাচ্ছে, ঝাড়খণ্ড নামে পৌঁছুবার আগে এই অঞ্চলটি বৈদিক যুগে কালকাবন নামে-ও পরিচিত ছিল।

হিউ-এন-সাঙ যখন ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন, তখন তিনি আলোচ্য অঞ্চলটি-ও পরিক্রমণ করেন। তিনি এ-অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যেমন

৩. P. B. Chakraborty B.Sc. BL : Chhotanagpur Raj, Pp. 2
৪. B. C. Majumdar : Aboriginals of Central India. Ch. V Pp. 217

লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তেমনি স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে-ও কিছু কথা বলে গেছেন। মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারতে এ-প্রসংগে বলা হয়েছে—

These (Huen Tsang's Accounts) as interpreted by Cunningham, show that between Orissa on the south, Magadh or Bihar (Buddhist manasteries are called Biharas) on the north, Champa (query Bhagalpur and Burdwan) on the east and Maheswara (i e. Central India) on the west lay the Kingdom of Kie-lo-na su-fa-lana or the Kingdom of Kiranasuvarna, ordinarily identified with the Suvarna Rekha river. This, General Cunningham writes, must have comprised all the petty hill states lying between Midnapore and Surguja on the east and west and between the sources of Damodar and Vaitarani on the north and south.[৫]

অর্থাৎ হিউ-এন-সাঙের সময়ে দক্ষিণে উড়িষ্যা, উত্তরে মগধ, পূর্বে চম্পা (ভাগলপুর ও বর্ধমানভুক্তি) এবং পশ্চিমে মহেশ্বর (মধ্যভারত) এর মধ্যবর্তীস্থলে কিরণসুবর্ণ নামক একটি বিশাল রাজ্য ছিল, যাকে বর্তমানে সাধারণভাবে সুবর্ণরেখা নদীর নামের সঙ্গে একীকরণ করে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেনারেল কানিংহামের মতে, পূর্বে মেদিনীপুর পশ্চিমে সুরগুজা রাজ্য (বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত), উত্তরে দামোদর এবং দক্ষিণে উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর উৎপত্তিস্থলের মধ্যবর্তী সমস্ত ছোটবড়ো অরণ্য পর্বতময় রাজ্যগুলো নিয়ে নিঃসন্দেহে এই কিরণ সুবর্ণ রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল। আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটি এই কিরণসুবর্ণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছোটবড়ো অরণ্যপর্বতময় রাজ্যগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ এসেছিলেন খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বৌদ্ধযুগে এবং তখন এই কিরণ সুবর্ণের রাজা ছিলেন বৌদ্ধদের পরম শত্রু দুর্দান্ত শশাঙ্ক। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটলেও কিরণ সুবর্ণের ওপর তার কোন প্রভাব পড়ে নি। আরো পরবর্তীকালে পাঠানরা যখন ভারতবর্ষে তাদের রাজত্ব বিস্তার করে, তখনো এই পার্ব্বত্য অঞ্চল, বর্তমানের ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত অঞ্চল, পাঠানদের আগমন এবং প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল।[৬] To

৫ Manbhum District Gazetteer : P. 46

৬. Chakraborty : Chhotanagpur Raj, P 4

the Mohammedan historians, the whole of Chhotanagpur and the adjoining hill states was known by the name 'Jharkhand.'[৭]

সমস্ত মুঘল যুগ ধরে এই অঞ্চলটি ঝাড়খণ্ড নামেই পরিচিত ছিল। আইন-ই-আকবরী, জাহাঙ্গীর নামা, তুজক-ই-জহাঁগীরী আদি গ্রন্থে ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ আছে। যেহেতু বর্বর অসভ্য, দস্যু অভিধাভূষিত আদিবাসীদের রাজ্য এই ঝাড়খণ্ড কোনদিনই মুঘল সম্রাটদের কুক্ষিগত হয়নি, তাই এ-অঞ্চলকে মুঘল যুগে ভাঙা গড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন কোন রাজ্য, কখনো কোকরা (চুটিয়া নাগপুর), কখনো রামগড়, কখনো-বা পাঞ্চেতের ওপর মুঘলদের আক্রমণ ঘটেছে এবং কখনো কখনো এক-আধ বছরের জন্য এই সব রাজ্য মুঘলসম্রাটদের রাজস্ব দিলেও মোটামুটিভাবে তারা স্বাধীন রাজ্য হিসেবেই থেকে গেছে। যেহেতু এই অঞ্চলটি সামগ্রিকভাবে ঝাড়খণ্ড নামেই চিরকাল পরিচিতি লাভ করেছে, তাই প্রাচীন গ্রন্থ থেকে শুরু করে আধুনিক ইতিহাসকারকে-ও এই অঞ্চলের সমগ্রতাকে বোঝাবার জন্য ঝাড়খণ্ড নামটিই ব্যবহার করতে হয়েছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মল্ল এবং ব্যাঘ্র মুখ নামে দুটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। মল্ল রাজ্য বলতে মানভূমকে বোঝানো হয়েছে বলে মনে হয় (মল্ল>মাল> মান); অবশ্য রাজ্যগুলো 'ভূম' রাজ্য হিসেবে-ও পরিচিত। ব্যাঘ্রমুখ পার্বত্য রাজ্য, তাই এটি বাঘমুণ্ডি-সংশ্লিষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ১৫শ—১৬শ শতকে রচিত ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে বরাভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বরাভূমির (অতীতে মানভূম জেলার দক্ষিণ সীমান্ত, বর্তমানে পুরুলিয়ার) একদিকে ছিল তুঙ্গভূম রাজ্য (বর্তমানে বাঁকুড়ার রাইপুর) অন্যদিকে শেখর পর্বতমালা (পাঞ্চেত বা পঞ্চকোটের পাহাড়)। সেই অতীতকালে এই বরাভূমি একটি বিশাল রাজ্য ছিল যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বরাভূম, সামন্তভূম এবং মানভূম (অতীতের মানভূম জেলার সদর মহকুমা) মহলগুলো। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত রাজ্য ঝাড়খণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলা সাহিত্যে ঝাড়খণ্ডের প্রথম উল্লেখ সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেই করা হয়েছে। এই গ্রন্থের বহু-উচ্চারিত সেই পংক্তিগুলো হল—

ঝারিখণ্ড স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।...

৭. M. D. G.; P.52

মথুরা যাইবার কালে আসেন ঝারিখণ্ড।
ভিন্ন প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥

অষ্টাদশ শতকে রচিত কবি রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গলে ঝাড়খণ্ডী বাজনার উল্লেখ দেখা যায়। একটি প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকে ঝাড়খণ্ড অঞ্চল সম্পর্কে বলা হয়েছে—

অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানম্ শালপত্রে চ ভোজনম।
শয়ণম খর্জুরীপত্রে ঝাডখণ্ডো বিধীয়তে॥

অর্থাৎ যেখানে লোক লৌহপাত্রে জলপান করে, শালপত্রে ভোজন করে। খর্জুরপত্রে (চাটাই) শয়ন করে, সেই দেশটিই হল ঝাড়খণ্ড। বর্তমান কালে জলপানের জন্য লৌহপাত্রের পরিবর্তে পিতল এবং কাঁসার পাত্র এলেও এ-অঞ্চলের লোকেরা এখনো শাল পাতায় ভোজন এবং খেজুর পাতার 'চাটাই'তে শয়ন করে থাকে।

প্রায় সমস্ত ইতিহাসকারই আলোচ্য অঞ্চলটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একে ঝাডখণ্ড নামেই চিহ্নিত করেছেন। (দ্রষ্টব্য : Delhi Sultanate (vol. vi) ; History and Culture of the Indian People—Cambridge History of India ; History of Bengal and Bihar through Ages—Dr. Qanungo ; Mundas and their Country—S. C. Roy ; The Bhumij Revolt—J. C. Jha : প্রাঙমৌর্য বিহার—ডঃ দেবসহায় ত্রিবেদী, মুঘল সম্রাট হুমায়ুঁ—ডঃ হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব ইত্যাদি)।

এমন কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীর শুরুতে শাসক এবং মিশনারী সাহেবেরা একে ঝাডখণ্ড নামেই চিনতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ পাবার আগে পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ছিল। তাই ভৌগোলিক কিংবা রাজনৈতিক ডামাডোল অথবা অঙ্গচ্ছেদের কোন প্রশ্নই সেদিন ছিল না। ঝাড়খণ্ডের অঙ্গচ্ছেদ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নামকরণ-এর সূত্রপাত হয় ইংরাজদের হাতে অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশকে।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাব মীরকাশিমের কাছ থেকে, পরবর্তীকালে যে-সকল অঞ্চল জঙ্গলমহল এবং ধলভূম (যা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল) নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, সেই সব অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের সনদ পেয়েছিল। তসর রেশম, লাক্ষা এবং অন্যান্য

অরণ্যজাত দ্রব্যের লোভ থাকলেও কোম্পানী দুর্দান্ত পার্বত্য আদিবাসীর পরাক্রমে এ-সব অঞ্চলে ঘাঁটি পত্তনের ভরসা পায় নি। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট বাংলা-বিহার- উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর মীরকাশিম প্রদত্ত অঞ্চলগুলোর ওপরও কোম্পানী তার পূর্ণ অধিকার অর্জন করে। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী এই সব দুর্গম অরণ্যরাজ্য গুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য অভিযান চালায়। ঝাড়গ্রামের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রামগড়, শাঁখাকুলি (লালগড), জাম্বনী, ঝাঁটিবনী (শিলদা) আত্মসমর্পণ করে। ক্রমে আমাইনগর (অম্বিকা নগর), সুপুর, মানভূম, ছাতনা, বরাভূম, সামন্তভূম, রাইপুর (তুঙ্গভূম), শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করে। ধলভূম দীর্ঘকাল প্রতিরোধ রচনা করলেও শেষ পর্যন্ত তারও পতন ঘটে। কোম্পানী পশ্চিমে পাতকুম, তোড়াং, বুণ্ডু, সিলি, তামাড় এবং উত্তরে ঝালদা, কাতরাস, ঝরিয়া, নওয়াগড়, পাঞ্চেত (শিখরভূম) কাশীপুর আদি রাজ্যও দখল করে। ধলভূমকে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত অরণ্যরাজ্যগুলোর সামূহিক নাম দেওয়া হয় জঙ্গল মহল। ঝাড়খণ্ড এই প্রথম তার কয়েক শো বছরের পুরাতন নাম হারিয়ে রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক দলিলে জঙ্গলমহল নামে চিহ্নিত হল। অরণ্যময় স্বাধীন ঝাড়খণ্ড এবার দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরতে বাধ্য হল। পরস্পর আত্মীয়তা সম্পর্কে আবদ্ধ ঝাড়খণ্ডের অরণ্যরাজ্যগুলোর অঙ্গচ্ছেদ যেমন ঘটতে লাগল, তেমনি একবার এ জেলা একবার ও জেলার লেজুড় হিসেবে এদের জুড়ে দেওয়া শুরু হল। আলোচ্য ঝাড়খণ্ডী বাঙলা উপভাষাঞ্চল, কোম্পানী যার নাম দিল জঙ্গলমহল এবং ধলভূম, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মেদিনী-পুর শাসকের অধীনে থাকল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে শাসনের দায়িত্ব হস্তান্তরিত হল বর্ধমানের প্রাদেশিক কাউন্সিলের কাছে। আবার ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে যখন বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন করা হল, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পুনর্বার মেদিনীপুরের শাসকের হাতে ফিরে এল। ছোটখাটো পরিবর্তনও করা হল কিছু। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রাইপুর এবং ফুলকুসমাকে বর্ধমানের এক্তিয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবারে শ্যামসুন্দরপুরকেও বর্ধমানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। অবশ্য ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী নাগাদ রাইপুর এবং শ্যামসুন্দরপুরকে মেদিনীপুরের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ছাতনাকে বীরভূমের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত

আঞ্চলিক শান্তি সংহত রাখার জন্য জুলাই নাগাদ ছাতনাকে মেদিনীপুরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

এই দুর্দান্ত জঙ্গল মহলগুলোকে একই সূত্রে গ্রথিত করে শান্তি সংরক্ষণ এবং সুশাসনের জন্য কোম্পানী জঙ্গল মহল নামে একটি পৃথক জেলা সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। In 1805 the Government realized that for 'the maintenance of the peace and the support of the General police of that part of the country', it was essential to station an officer in the heart of the Jungle Mahals. They therefore passed Regulation XVIII of 1805.[৮]

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের এই অষ্টাদশ সংখ্যক ধারাকে আরো ব্যাপক অঞ্চলে কার্যকরী করা হল। ফলে আরো কয়েকটি মহল এই নতুন শাসনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে এল। বীরভূম জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল পাঞ্চেত, বাঘমুণ্ডি, বাগনকুন্দর, তরফ বালিয়াপার, কাতরাস, হেসলা (ঝালদা), ঝরিয়া, জয়পুর, মুকুন্দপুর, কিসমৎ নওয়াগড়, কিসমৎ চুটি, তোডাং, টুণ্ডি, নাগবকিয়ারী এবং পাতকুম। বর্ধমান জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হল শনপাহাড়ী, ভঞ্জভূম, শেরগড এবং বিষ্ণুপুর; মেদিনীপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হল ছাতনা, বরাভূম, সুপুর, অম্বিকানগর, শিমলাপাল এবং ভেলাইডিহা। পুরাতন জঙ্গল মহলগুলোর সঙ্গে এই নূতন মহলগুলো জুড়ে দিয়ে এক বিস্তীর্ণ এলাকাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠল নতুন জেলা জঙ্গল মহল। ধলভূম অরণ্যরাজ্য হলেও তাকে এবং বর্তমান ঝাডগ্রাম মহকুমার কিছু অরণ্যরাজ্যকে জঙ্গল মহলের সঙ্গে না জুডে আগের মতোই মেদিনীপুর শাসকের নিয়ন্ত্রণেই রাখা হল।

১৮৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিজ বিদ্রোহ বা গঙ্গানারায়নী হাঙ্গামার পর কোম্পানী সরকারকে এই সব মহলকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় এই সব মহলগুলোকে নিয়ে একটি Non-Regulation Area গড়ে তোলার, যার শাসন দায়িত্ব থাকবে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক এজেন্টের হাতে,—যিনি এর কমিশনার হিসেবে কাজ করবেন। ২২শে ডিসেম্বর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল, নতুন জঙ্গলমহল জিলা থেকে শনপাহাড়ী, শেরগড়, বিষ্ণুপুর এবং ধলভূম (মেদিনীপুর জেলা)-কে বাদ দেওয়া হল। বাঁকুডা শহর অংশতঃ

৮. J. C. Jha. : The Bhumij Revolt, Pp. 29

বিষ্ণুপুর (বর্ধমান জেলা) এবং ছাতনা (এজেন্সীভুক্ত রাজ্য) থাকায় শেষ পর্যন্ত সংলগ্ন তিনটি গ্রাম সহ বাঁকুড়াকে এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই নতুন এজেন্সীকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের শুরুতেই তিনটী বিভাগে ভাগ করা হল: মানভূম বিভাগের (যার সদর দপ্তর ছিল মানবাজার) অন্তর্ভুক্ত করা হল নন্-রেগুলেটেড জঙ্গলমহলগুলো সহ ধলভূমকে; লোহারদাগা বিভাগে রাখা হল বুণ্ডুসিলি তামাড় আদি পাঁচপরগণাসহ চুটিয়ানাগপুর এবং পালামৌ; হাজারিবাগ বিভাগের অন্তর্গত করা হল রামগড়, খড়কডিহা এবং পুরাতন রামগড় জেলার রেগুলেশান বহির্ভূত রাজ্যগুলোকে। আমাদের পরিক্রমণ ক্ষেত্র মূলতঃ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সীর মানভূম বিভাগ হলেও অল্পবিস্তর ঝাড়খণ্ডী বাঙলাভাষী পাঁচপরগণাও আমাদের পরিক্রমণের দাবী করে। এজেন্সী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ পর্যন্ত এই অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মানভূমের সদর দপ্তর 'অরণ্যভূমির কেন্দ্রবিন্দু' পুরুলিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংভূম জেলার সৃষ্টি হলে ধলভূমকে সিংভূমের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের এজেণ্ট ছোটনাগপুরের কমিশনার এবং এজেণ্টের পুরুলিয়াস্থ মুখ্য সহকারী ডেপুটি কমিশনার পদে উন্নীত হন। জঙ্গল মহলের এতোদিনের কায়েমী নাম, ঝাড়খণ্ড নামের মতোই, এজেন্সীর অন্তরালে হারিয়ে গেল। এবার ধীরে ধীরে রাজনৈতিক মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল ছোটনাগপুর।

ঝাড়খণ্ডই বলা হোক কি জঙ্গলমহল কি ছোটনাগপুর, বাঙলাভাষী মহল এবং রাজ্যগুলোর ভাগ্যচক্রের আবর্তন থামে নি। ধলভূমকে সিংভূমের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ধলভূমের পূর্ব প্রান্ত (বর্তমান পশ্চিমবাংলার গিধনি-পড়িহাটির পশ্চিম প্রান্ত থেকে বিহারসীমান্তঅবধি) মেদিনীপুর জেলায় খণ্ডিত অবস্থায় থেকে গেল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশের ভারতবর্ষ ত্যাগের সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলের ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় ঘটে গেছে, দেখা যায়। বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা পৃথক পৃথক প্রদেশ হয়ে গেছে এবং বাঙলাভাষী জঙ্গলমহলগুলো বাংলা বিহারের বিভিন্ন জেলার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ধলভূম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বৃহত্তর অংশ বিহারের সিংভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ক্ষুদ্রতর অংশটা বাংলার মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে মিশে গেছে।

পাঁচ পরগণা—বুণ্ডু, সিলি, তামাড়, সোনাহাতু ইত্যাদি—রাঁচি জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জঙ্গলমহলগুলোর অধিকাংশ মহলের সমন্বয়ে বিহারের ধানভূম জেলা গড়ে উঠেছে। ঝাড়গ্রাম, নয়াবসান, কল্যাণপুর, জামবনী লালগড, রামগড, ঝাঁটিবনী আদি নিয়ে গড়ে উঠেছে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা। রাইপুর, সুপুর, সামন্তভূম, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ফুলকুসমা, ভঞ্জভূম, ভেলাইডিহা, কুইলাপাল, ছাতনা আদি মহল নিয়ে গড়ে উঠেছে বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমাঞ্চল।

ঝাড়খণ্ড গিয়েছিল, জঙ্গলমহলও পুরনো দলিলে আশ্রয় নিয়েছিল, তবু অধিকাংশ জঙ্গল মহল ছোটনাগপুর নামের আড়ালে আশ্রয় পেয়েছিল। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে আবার অন্তিম এবং চরম ভাঙাগড়ার কাজ শেষ হল। মানভূম ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেল: বাঙলাভাষী অঞ্চল হওয়া সত্ত্বে-ও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে টানাপোড়েনে উত্তরের শিল্পাঞ্চল ধানবাদকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিহারের একটি নতুন জেলার সৃষ্টি করা হল,—কাতরাস, ঝরিয়া আদি মহল থেকে গেল এই নতুন জেলার ভেতর; জামশেদপুর শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখার জন্য দক্ষিণ পশ্চিমাংশ জুড়ে দেওয়া হল সিংভূম জেলার নতুন মহকুমা সেরাইকেলার সঙ্গে, যার ভেতর থেকে গেল তোড়াং পাতকুম আদি মহল এবং চাণ্ডিল পটমদা অঞ্চল; মধ্যাংশ এবং বৃহত্তর অংশ পুরুলিয়া নাম ধারণ করে পশ্চিমবাংলার একটি নতুন জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, যার মধ্যে রইল বরাভূম, পাঞ্চেত, ঝালদা, বাঘমুণ্ডি, বাগনকোদর, জয়পুর, মুকুন্দপুর, নয়াগড়, কাশীপুর, মানভূম আদি মহলগুলো। ঝাড়খণ্ড এবং জঙ্গলমহল মানচিত্র থেকে আগেই মুছে গিয়েছিল, এবারে মানভূম ও মুছে গেল। এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধলভূম-মানভূমের বাঙলাভাষী ধলভূম তার বিরাট শিল্পাঞ্চল নিয়ে আগের মতোই সিংভূম জেলার অন্যতম মহকুমা হিসেবে থেকে গেল; ধলভূম-মানভূমের অবিচ্ছেদ্য রক্ত সম্পর্কের অস্তিত্বের ওপর রাজনৈতিক শবব্যবচ্ছেদ কার্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করা হল। পাঁচ পরগণার ভবিতব্য বহুকাল আগেই রাঁচির ভাগ্যচক্রের সঙ্গে আবর্তিত হচ্ছিল, তার কোন পরিবর্তন হল না।

বাঙলাভাষী ঝাড়খণ্ড বলেই ডাকা হোক, কি জঙ্গল মহল অথবা ছোট-নাগপুর, সেই হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুঘল যুগের দুর্দান্ত স্বাধীন আদিবাসী অঞ্চলের

সংহৃতির বিনষ্টি ইংরাজ রাজত্বে সূত্রপাত হলেও স্বাধীন ভারতবর্ষে তা চরম ভাবে সংঘটিত হয়েছে।

বাংলা-বিহারে দ্বিধা বিভক্ত সেই সব বাঙলাভাষী আদিবাসী 'ভূমি' বা 'ভূম' রাজ্যগুলো আজ যেন আমাদের স্মৃতি থেকেও লুপ্ত হতে চলেছে। এই সব অঞ্চলের লুপ্ত গৌরবকে অন্ততঃ স্মৃতিতে সঞ্জীবিত করে তোলা যায়, যদি আমরা একে চিরপুরাতন চিরনূতন ঝাড়খণ্ড নামে অভিহিত করি। রাজনৈতিক ভূচিত্রে দ্বিধাবিভক্ত এই সব মহল একমাত্র তাহলেই তাদের পুরনো সংহৃতি ফিরে পেতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে মনচিত্রে এইসব বিচ্ছিন্ন মহল-গুলোকে একটি সাধারণ নামের আশ্রয়ে সংহৃত করতে না পারলে আঞ্চলিক লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে সংহৃতি আশা যেমন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তেমনি রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে অবলম্বন করে আঞ্চলিক সংস্কৃতি-গত জীবনের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে অগ্রগতিও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আমরা আমাদের প্রস্তাবিত অঞ্চলটিকে 'ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিমবাংলা' নামে অভিহিত করতে গিয়ে দ্বিধান্বিত না হয়ে পারি না। এক তো এর সাহায্যে আদিবাসী জনজীবনের ব্যাখ্যা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ এই নাম এক এবং অভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বিচরণ করার পক্ষে শুধু অস্পষ্টতাই সৃষ্টি করে না, বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করে। তাই আমরা এর পরিবর্তে অবিচ্ছিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক নাম 'ঝাড়খণ্ড' গ্রহণ করবার পক্ষপাতী; এর ফলে অতীতের স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্দান্ত আদিবাসী বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং লুপ্ত গৌরবকে জীইয়ে রাখা দুটো কাজই সহজে সম্ভব হবে।

বাঙলাভাষী ঝাড়খণ্ডের যে-সব রাজ্য এবং মহলের লোকসাহিত্য সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করব, তাদের মোটামুটি নাম-গুলো হল: বিহারের রাঁচি জেলার বুণ্ডু, সিলি, তামাড়, সোনাহাতু আদি পাঁচ পরগণা; পুরাতন মানভূম জেলার (বর্তমানে বিহারের ধানবাদ জেলা, সিংভূমের সেরাইকেলা মহকুমা ও পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া জেলা) অন্তর্গত সমস্ত জঙ্গলমহল—পাঞ্চেত, কাশীপুর, বাঘমুণ্ডি, বাগনকুদর, তরফ বালিয়াপার, কাতরাস হেসলা (ইলু) ঝালদা, ঝরিয়া, জয়পুর, মুকুন্দপুর, নয়াগড়, চুটি, তোড়াং, টুণ্ডি, নাগরকিয়ারী, পাতকুম, মানভূম, বরাভূম ইত্যাদি; সিংভূম জেলার সেরাইকেলা এবং ধলভূম মহকুমা; পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার

ছাতনা, ভঞ্জভূম, সুপুর, সামন্তভূম, অম্বিকানগর, কুইলাপাল, শিমলাপাল, ভেলাইডিহা, রাইপুর (তুঙ্গভূম), শ্যামসুন্দরপুর ফুলকুসমা আদি সীমান্তবর্তী জঙ্গলমহল সমূহ এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম, নয়াবসান, কল্যাণপুর (দহিজুড়ি), লালগড (শাঁকাকুলি), বামগড়, ঝাঁটিবনী (শিলদা), জামবনী আদি জঙ্গলমহল সমূহ। বলাবাহুল্য, এই সব জঙ্গল মহলকে তৎকালীন জয়েন্ট কমিশনার মিঃ ডেন্ট বাংলাভাষী অরণ্যরাজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। ভূমিজ বিদ্রোহের (১৮৩২-৩৩) পর জঙ্গল মহল ভেঙে বিভিন্ন জেলা পুনর্গঠনের সময় তিনি এই অঞ্চলে সমস্ত সরকারি কাজে ফারসী ভাষার পরিবর্তে বাঙলা ভাষার ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেন। He urged that Bengali, the colloquial language of the hill areas, should be substituted for Persian in all public offices and he requested the Government to open a good school for the children of the Jungle Zamindars [৯]

মামলা মোকর্দমার ক্ষেত্রে আমলার যাতে অন্যায় সুযোগ নিতে না পারে অথবা অযথা দেরী না হয় তার জন্য অন্যতম জয়েন্ট কমিশনার ক্যাপ্টেন উইলকিনসন তাঁর নির্দেশনামায় বলেন—The assistant was to maintain an English and a Bengali register of suits.[১০]

এসব থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জঙ্গল মহলে সমতল বাংলার বাঙালীর অনুপ্রবেশের পূর্বে থেকেই বাঙলা ভাষা এখানকার আঞ্চলিক ভাষা ছিল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই ভাষাতেই এখানকার লোকসাহিত্য রচিত, কথিত এবং গীত হয়েছে।

৯ The Bhumij Revolt · J. C Jha, Pp 168
১০ Ibid

॥ দুই ॥

ভাষা-সংস্কৃতি-অধিবাসী

ঝাড়খণ্ড সর্বাংশে আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানে আদি-অষ্ট্রেলীয় এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বহু সম্প্রদায় পরম আত্মীয়ের মতো ইতিহাসের ধূসর যুগ থেকে পাশাপাশি বাস করে আসছে। আদি-অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর সাঁওতাল, কোল, হো, কোড়া, মাহলী আদি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, খাড়িয়া, বীরহোড়, কুর্মি আদি সম্প্রদায়গুলো একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উদ্ভব এবং বিকাশে সমান অবদান জুগিয়েছে। আদি-অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর সম্প্রদায়গুলো এখনো তাদের নিজস্ব অস্ট্রীক ভাষাকে বর্জন করে নি; কিন্তু দ্রাবিড গোষ্ঠীর লোকেরা নিজস্ব ভাষা বর্জন করে ভারতীয়-আর্যভাষার কোন না কোন উপভাষাকে আশ্রয় করেছে এবং পৃথক পৃথক গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের উপযোগী এক একটা ভাষা-সংস্কার গড়ে তুলেছে। আমাদের আলোচ্য অঞ্চলে প্রধানতঃ ভূমিজ, খাড়িয়া, কুর্মি, বাগাল, কামার কুমোর ভুঞা আদি ভারতীয় আর্য উপভাষা ভাষীদের যেমন বাস আছে, তেমনি অস্ট্রীক ভাষী সাঁওতাল, কোড়া মাহলী আদির বাসও আছে। কুর্মি-মাহাত, ভূমিজ খাড়িয়া কামার কুমোর বাগাল আদি সম্প্রদায়গুলো ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষাভাষী। এদের মধ্যে প্রচলিত লোকসাহিত্যের উপকরণগুলোই বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

প্রধানতঃ কুর্মি-মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত লোকসাহিত্যের উপকরণ নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই দুটি সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। ঝাড়খণ্ডের আলোচ্য অঞ্চলে কুর্মি-মাহাত সম্প্রদায়ের লোকেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। ধানবাদ-রাঁচির পাঁচ পরগণা, সেরাইকেলা ধলভূম পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম-দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাঁকুড়ায় কুর্মিরা অত্যন্ত ঘনভাবে বসবাস করে আসছে। কুর্মিদের আদি বাসভূমি শিখরভূম, সেখান থেকেই তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের নিজস্ব ভাষা কুর্মালি এখনো পাঁচ পরগণা-ঝালদা-ধানবাদ আদি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যত্র কুর্মি মাহাতরা ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষায় কথা বলে, গান গায়, মৌখিক সাহিত্য রচনা করে। মাহাঁতদের ভাষা-সংস্কৃতিই আলোচ্য অঞ্চলের ভাষাসংস্কৃতির প্রধানতম উপাদান। ডঃ সুধীর

কুমার করণ যথার্থই বলেছেন, 'এদের বাদ দিলে সীমান্ত বাঙলাও থাকে না, সীমান্ত-সংস্কৃতিও থাকে না।'[১] এদের সর্বগ্রাসী ভাষা-সংস্কৃতি ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী সমস্ত ঝাড়খণ্ডী উপভাষীদের প্রভাবিত করেছে। কোথাও কোথাও বহিরাগত হিন্দু বা বর্ণহিন্দুরা এদের ভাষার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখবার জন্য ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মধ্যে একটা ভেদ রেখা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। মাহাতদের সানুনাসিক বাকভঙ্গির নাসিক্যধ্বনিটিকে বাদ দিয়ে এঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র রাখতে যৎসামান্য সফল হয়েছেন। নাসিক্যধ্বনি-প্রধান ঝাড়খণ্ডী উপভাষা বহিরাগত বঙ্গজনের কাছে 'কুড়মী ভাষা' বা 'মাহাত ভাষা' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

কুর্মি সম্প্রদায়টি কুর্মিক্ষত্রিয় নামে খুবই সম্প্রতিকালে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু এই পরিচয়টা শুধু এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত এবং সম্পন্ন পরিবারগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সাধারণ কুর্মিরা নিজেদের 'কুড়মি' বলেই পরিচয় দেয়। প্রতিবেশী সম্প্রদায়গুলো এদের 'কুড়মি' বলেই জানে। আসলে এদের আত্মিক সম্পর্ক ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের সঙ্গেই। কুর্মিরা যে দ্রাবিড় শাখারই একটি সম্প্রদায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুর্মিরা পেশায় কৃষিজীবী, এদের মতো কৃষি-কর্মে দক্ষ সম্প্রদায় শুধু ঝাড়খণ্ডে কেন, ভারতের অন্যত্রও খুব বেশি নেই। কুর্মি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই 'মাহাত' বা 'মাহাতো' পদবী ব্যবহার করে থাকে। তাই ধলভূম-ঝাড়গ্রাম আদি অঞ্চলে এরা কুর্মি নামের পরিবর্তে মাহাত নামেই সুপরিচিত। কুর্মিক্ষত্রিয় নামটি না এদের মধ্যে বহুল পরিচিত, না প্রতিবেশীদের কাছে।

কুর্মি-মাহাতরা ব্রাহ্মণ্য-সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত কোনদিনই ছিল না। আচারে-আচরণে, জীবনচর্যায়-সংস্কৃতিতে এদের মধ্যে আদিম জাতিত্বের চিহ্নগুলো যতো বেশি সুপ্রকট, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবজাত হিন্দুত্বের চিহ্ন তার সিকি অংশও লক্ষ্যগোচর হয় না। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বন এই সম্প্রদায়ের ওপর কোনই প্রভাব ফেলতে পারে নি। অধুনা এদের মধ্যে বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং কিছু কিছু পূজানুষ্ঠানে কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হচ্ছে। 'কান ফুঁকা' বা কানে-কানে হরে কৃষ্ণ হরে রাম বৈষ্ণব মন্ত্রদানের অনুষ্ঠানও আছে। কিন্তু অই পর্যন্তই। হিন্দু সমাজব্যবস্থায় অংশ লাভের প্রলোভন দেখিয়ে ব্রাহ্মণেরা ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী রাজা-জমিদার-

১ সীমান্ত বাঙলায় লোকয়ান পৃঃ ৩৩

সামন্তদের ক্ষত্রিয়ত্ব দান করেছিলেন। আদিবাসী সামন্তদের নির্দেশেই কুর্মি, ভূমিজ আদি উপজাতিদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়োগের সূত্রপাত হয়ে-থাকা খুবই স্বাভাবিক। ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি রাজবংশই যে আদিবাসী রাজবংশ, তা সে মুণ্ডা হোক, কুর্মি হোক কি ভূমিজ হোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পঞ্চকোট, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম, বরাভূম, পাতকুম যে-কোন রাজবংশের উদ্ভব কাহিনী একই ছাঁচে গড়া। সর্বত্রই উপকথা: আর্যাবর্তের কোন না কোন রাজ্যের রাজদম্পতি পুরীধামে যাবার পথে সদ্যোজাত শিশুকে প্রসব-স্থলেই ফেলে চলে গেছেন; এই শিশুই আদিবাসীদের হাতে লালিত হয়ে সেই রাজ্যের রাজা হয়ে ক্ষত্রিয় রাজবংশের সূত্রপাত করেছে। কোথাও বা বন-থেকে কুড়িয়ে-আনা অজ্ঞাতকুলশীল শিশুই রাজা হবার পর ক্ষত্রিয় রাজবংশ প্রবর্তন করেছে। যেমন পঞ্চকোট রাজবংশ। আসলে আদি-বাসীদের যজন-যাজনের প্রলোভন ত্যাগ করতে না পেরে এবং নিজেদের সমাজে যাতে ব্রাত্য না হতে হয় এই কারণেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা এই ধরনের উপকথার সৃষ্টি করে আদিবাসীত্ব ঘুচিয়ে রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্ব দান করেছিলেন। তাঁদের আসল লক্ষ্য ছিল শোষণ, এ ব্যাপারে তাঁরা ষোল আনাই সফল হয়েছিলেন। এই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবের ফলেই কুর্মি-সামন্তদের নির্দেশে, যাঁদের মধ্যে শিখরভূমের রাজা বিশিষ্টতম, কুর্মিক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন ওঠে; আদিবাসীসুলভ কিছু খাদ্য-অভ্যাস এবং কুসংস্কার বর্জিত হয়। বহু লোক যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। কিন্তু এই ঘটনাটি খুবই সাম্প্রতিক। সংস্কৃতি সমন্বয়ের কথা বারবার বলা হয়েছে। যাঁরা গভীরে প্রবেশ করে ঝাড়খণ্ডী আদিবাসীদের, বিশেষ করে কুর্মিদের, আচার-সংস্কৃতি খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কথাটা নিতান্তই কাল্পনিক, কখনো-কখনো বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচার-ধ্বনি (স্লোগান) মাত্র। কুর্মিরা কিংবা ভূমিজরা যেমন ক্ষত্রিয় নয়, তেমনি আর্য-অনার্য সংস্কৃতি-সমন্বয় কথাটিও সর্বাংশে সত্য নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ কিংবা বৈষ্ণব জীবনচর্যা এদের জীবন-ধারায় কোথাও কোথাও একটা ভাসা-ভাসা রূপ পেয়েছে মাত্র; যতক্ষণ না কোন সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করা হয় ততক্ষণ সমন্বয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্রাহ্মণ্যবাদ কিংবা বৈষ্ণব জীবনচর্যা কোনদিনই ঝাড়খণ্ডের হিন্দুকৃত আদিবাসী কুর্মিদের মর্মমূলে পৌঁছাতে পারেনি। অন্যের ধর্ম কিংবা জীবনচর্যা গ্রহণের প্রতি কুর্মিদের চিরকালই তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। তাই এরা বৈদিক

ধর্ম, জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছিল ; মুসলমান ধর্মের চাপে পড়ে এরা একদা উত্তর ভারত থেকে ঝাড়খণ্ডে পালিয়ে এসেছিল, সে-কথা এদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে জানা যায় ; খ্রীষ্টান ধর্মের বর্ণময় প্রলোভনে পড়ে যখন অন্যান্য আদিবাসীরা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে তখনো এরা তীব্র প্রতি-রোধ রচনা করে খ্রীষ্টান পাদরীদের সমস্ত প্রলোভনকে নির্বিকার প্রত্যাখ্যান করে। শুধু চৈতন্যদেবের শ্রেণীহীন জাতিহীন ধর্মব্যবস্থায় এরা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। এর কারণটাও এদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত আছে। কুর্মিদের সমাজ-ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে আদিম কৌম ব্যবস্থার সাম্যবাদী চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ভেদাভেদে অবিশ্বাসী সাম্যবাদী জীবন-চর্যায় বিশ্বাসী কুর্মিরা তাই একই পদবী 'মাহাত' ব্যবহার করে থাকে। আলোচ্য গ্রন্থে কুর্মিদের লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি পালপার্বন জীবনচর্যার কথাই মূলতঃ বলা হয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, কুর্মিদের সংস্কৃতি পালপার্বন সমস্তই আদিবাসীত্বের বৈশিষ্ট্যগুলোকেই সুপরিস্ফুট করে তুলেছে।

এখানে কুর্মিদের সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ণের অবকাশ নেই। অল্পকথায় তাদের সম্পর্কে অনধীত দিকটিতে আলোকপাত করাই আমাদের লক্ষ্য। এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে মুণ্ডা এবং কুর্মিরা সমসাময়িক কালেই ঝাড়খণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। প্রাচীন কালে মগধে চেরপাদ নামক উপজাতি বাস করত (ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ সত্যায়মাংস্তানী মানী বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ। ঐতরেয় আরণ্যক। ২।১।১।৫)। তারাই পরবর্ত্তীকালে ঝাড়খণ্ডে এসে মুণ্ডা এবং কুর্মি নামে দু'টি উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে থাকা স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় এদের ভাষা সংস্কৃতি জীবনচর্যাতেও পার্থক্য ঘটতে থাকে কিন্তু মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোতে কোন পরিবর্তন ঘটেনা। মুণ্ডারা প্রধানতঃ ছোট নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বাসভূমি স্থাপন করে কিন্তু কুর্মিবা মগধ থেকে সাঁওতাল পরগণা হাজারিবাগ হয়ে মানভূমের মূল ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। কুর্মিরা দামোদর কংসাবতী এবং সুবর্ণ রেখার তীরবর্তী উর্বর অঞ্চলগুলোতে বাস করতে শুরু করে। একে তো কুর্মিরা কৃষিকর্মে সুদক্ষ, তার ওপর উর্বরা ভূমি তাদের অধিগত, তাই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মুণ্ডাদের থেকে অনেক বেশি স্বচ্ছল ছিল। স্বভাবতঃই কুর্মিরা মুণ্ডাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরবর্তী-কালে মুণ্ডাদের একটি শাখা কুর্মি-অধ্যুষিত অঞ্চলে এসে জমির মালিক হওয়ায়

তারা ভূমিজ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কুর্মিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আচারে-আচরণে ভাষায়-সংস্কৃতিতে তারা কুর্মিদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় ; এদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কুর্মি শব্দটি কুর্ম (কচ্ছপ) টোটেম (কুলতিলক) বাচক শব্দ হতে পারে। শব্দটি অত্যন্ত প্রাচীন, বেদে ক্ষত্রিয়রাজ ইন্দ্রের প্রসংগে এই শব্দের ব্যবহার আছে। কুর্মি শব্দটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধ পরিবার-জীবনের সমার্থক 'কুটুম্ব' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে পণ্ডিতদের মত। ব্যাখ্যাটি বিশ্বাসযোগ্য এই কারণে যে এদের মধ্যে আদিম সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার জাতি-কুটুম্ব চরিত্র গুণটি এখনো অত্যন্ত সুপ্রকটভাবে দেখা যায়। 'মাহাত' বলে পরিচয় দিলে যে কোন কুর্মি পবিবারে কুটুম্বের মতোই আদরযত্ন লাভ করা যায় ; আহার এবং আশ্রয়ের কোন অসুবিধা হয় না—এতো বেশি কুটুম্বপ্রিয় সম্প্রদায় খুব কমই দেখা যাবে। সংস্কৃত 'কুটুম্ব' শব্দটি দ্রাবিড় শব্দ হওয়াই সম্ভব। প্রাচীন-কালেও যে এরা ভাবতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করত তার উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে মেলে। কুটুম্বিন, কুনবী, কুড়ুম্বি কুববী এবং সব শেষে কুর্মি একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নাম বিশেষ। সর্বত্রই এরা কৃষিনির্ভর উপজাতি হিসেবেই পরিচিত।

অধ্যাপক গুরের মতে, ঝাড়খণ্ডের কুর্মিরা ছত্তিশগড়ের গণ্ড এবং কামারদের চাপে পড়ে পূর্ব দিকে সরে এসে বাস করতে শুরু করে। ঝাড়খণ্ডের কুর্মিদের কৃষিকর্মের রীতিরেওয়াজ, উপকরণ, লাঙল-ফালের ধরন-ধারণ, ভাষা, গোত্র এবং সমাজ-ব্যবস্থার ওপর গবেষণা করে তিনি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন যে এদের সঙ্গে মধ্যভারতীয় উপজাতিদের মিলই সর্বাধিক। ডাল্টন সাহেবও কুর্মিদের ঝাড়খণ্ডের প্রাচীনতম উপজাতিদের অন্যতম বলে স্বীকার করেছেন।

কুর্মিদের গোত্রনামগুলো কখনো পেশাগত কখনো টোটেম বা কুলতিলক-গত হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন এদের মধ্যে মাত্র বারোটি গোত্র বিদ্যমান। কথাটি ঠিক নয় বলেই মনে হয়। আমাদের পরিচিত কয়েকটি গোত্রের নাম দেওয়া হল: কাড়ওয়ার (মহিষ), কেশরিয়ার (কেশর ঘাস), কুরুম (কচ্ছপ), বাঘবানয়ার (বাঘ), ছঁচ মুত্‌রা (মাকড়সা), ডুমুরিয়ার (ডুমুর গাছ), হাঁসতোয়ার (হাঁস), টুডু, হিন্দোয়ার আদি টোটেমজাত গোত্র এবং

পেশাগত গোত্র হল ডোমিয়ার, কাটিয়ার, তিরুয়ার, জালবুনার, বাঁশিয়ার, শাঁখোয়ার ইত্যাদি। গোত্রবিভাজন এবং নামকরণ রীতিটি সম্পূর্ণতঃ আদিম উপজাতির প্রথাসিদ্ধ রীতি। এদিক দিয়ে সাঁওতাল-মুণ্ডাদের সঙ্গে এদের সম্পূর্ণতঃ মিল আছে।

কুর্মিদের সঙ্গে সাঁওতালদেরও অনেক বিষয়ে মিল আছে। সাঁওতালরা কুর্মিদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে থাকে। সাঁওতালরা অন্য উপজাতির রান্না-করা খাবার গ্রহণ করে না, কিন্তু মাহাতদের রান্না অন্ন গ্রহণ করে। মাহাতদের বিয়ের 'শিরি বারি ডালা' একদা সাঁওতালে বহন করত অনিবার্যভাবে। সাঁওতালদের মতোই কুর্মিরা ব্রাহ্মণদের অন্নও একদা গ্রহণ করত না। এখনো অনেকেই গ্রহণ করে না, নারীসমাজ তো কোনদিনই ব্রাহ্মণের রান্না খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে নি। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের প্রাণঘাতী দুর্ভিক্ষের সময়েও বাঙালি ব্রাহ্মণদের রান্না-করা লঙ্গরখানার খাবার কুর্মি এবং সাঁওতালরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কুর্মিদের এই খাদ্য-অভ্যাসও তাদের ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থা-বহির্ভূত আদিম উপজাতিত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

বৃটিশ শাসন কালে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুর্মিরা আদিম উপজাতি হিসাবেই পরিচিত ছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে এই সম্প্রদায় কুর্মিক্ষত্রিয় নামে চিহ্নিত হয় এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। এ-প্রসংগে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আদম সুমারীর প্রাক্কালে কুর্মি মহাসভা যে প্রচারপত্র বিলি করেছিল তা স্মরণ করা যেতে পারে। কুর্মি মহাসভার আবেদনক্রমে তৎকালীন ইংরাজ সরকার কুর্মিদের লোকগণনায় কুর্মিক্ষত্রিয় নাম ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রচারপত্রে সরকারী দুটি পত্রের বাংলা অনুবাদও ছিল। আমরা সেগুলো এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

নং এফ ৩৩৩। ১৯৩০ পাবলিক
গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হোম ডিপার্টমেণ্ট।
প্রেরক : এ হুইটেকার এস্কোয়ার আই. সি. এস।
আণ্ডার সেক্রেটারী গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া।
নয়াদিল্লী ১৮ই নভেম্বর

মহাশয়,

আপনার ৬।১১।৩০ তাং ১৯৪৫ নং পত্রের উত্তর দিবার জন্ত আমাকে

এই আদেশ করিয়াছেন যে আগামী সন ১৯৩১ সালের মনুষ্যগণনায় আপনাদের স্বজাতি ভ্রাতৃবর্গকে কুর্মিক্ষত্রিয় জাতি লিখাইবার আদেশ দিয়াছেন। তাহাতে ভারত গভর্ণমেণ্টের কোন আপত্য নাই।

ভবদীয়

(হস্তাক্ষর) এ. হুইটেকার

আণ্ডার সেক্রেটারী ভারত গভর্ণমেণ্ট

দ্বিতীয় পত্রটিও অখিল ভারতীয় কুর্মিমহাসভার প্রধান সম্পাদককে ভারতের জন-গণনা কমিশনার মিঃ জে. এইচ. হটন লিখেছিলেন। তাঁর চিঠির সংখ্যা ছিল নং ৫ ই. এন. এম. এন. তারিখ দিল্লী ২৫শে নভেম্বর ১৯৩০। তিনি লিখেছিলেন, 'মহাশয়, আপনার ৬।১১।৩০ তারিখের ১৯৪৪ নং পত্রের উত্তর দিয়া অবগত করিতেছি যে সেনসাসের জেনারেল সিডিউলে অর্থাৎ রেকর্ডে কুর্মি জাতিকে কুর্মি ক্ষত্রিয় লিখাইবার আমার আপত্য নাই, কুর্মিক্ষত্রিয় শব্দের অতিরিক্ত অর্থাৎ স্থানীয় জাতির নাম বা উপজাতির নাম দিয়া যথা রাজবংশীয়, কুনবি বা রেড্ডি ইত্যাদি। কেননা (তাহা না হইলে) পূর্ব মনুষ্যগণনার আপনাদের জাতিসংখ্যার সহিত আগামী মনুষ্যগণনার জাতিসংখ্যা মিলান সম্ভব হইবে না। সেনসাসের সমূহ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অবগত করান হইয়াছে।'

চিঠি দুটির প্রতিলিপি উদ্ধৃত করা হল এই কারণে যে এর ফলে কুর্মিদের সম্পর্কে বর্তমানে দ্বিধাগ্রস্ত অনেকেই কুর্মিদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন। কুর্মিরা যে ক্ষত্রিয় নয়, চিঠিগুলো তা প্রমাণ করে; তাছাড়া কুর্মি, কুনবি বা রেড্ডীরা যে একই সম্প্রদায়ভুক্ত, তা'ও প্রমাণিত হয়। কুর্মিরা অনুন্নত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় উপজাতির প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে উপজাতিদের থেকেও পশ্চাৎপদ থেকে গেছে। বর্তমানে শিক্ষিত কুর্মি তরুণসম্প্রদায় বহিরাগত উন্নত সম্প্রদায়ের লোকেদের মুখোমুখি হতে গিয়ে রীতিমতো হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করেছে।

ডঃ সুধীর কুমার করণ বলেছেন, "সীমান্ত বাঙলার সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হয়েও এরা কোনদিন রাজ্যস্থাপন করেনি। এদের উপকথায়, লোকগাথায় —কোন রাজবংশের কীর্তিকাহিনী নেই। মাহাতো রাজার কোন অস্তিত্বই জানে না ইতিহাস। পঞ্চকোটের রাজাই এদের একমাত্র রাজা…। বলা বাহুল্য, নির্বিরোধ এদের ইতিহাস; জন বিপ্লবের ভূমিকায় সীমান্ত বাঙলার বাগদী-বাউরী, মাল, ভূমিজদের যে অবদান, সে অবদান এদের নেই।"

কুর্মিরা যে অন্যান্যদের তুলনায় প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে, সব রকম সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং সব রকম রাজনৈতিক আন্দোলনের গৌরব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুর্মিদের ইতিহাস সত্যিই রহস্যে ঢাকা পড়ে আছে; রাজনৈতিক কারণে হোক বা যে-কোন কারণে হোক কুর্মিদের সম্বন্ধে কেউই উচ্চবাচ্য করেন নি। ডঃ করণের মতে এরা কোন সহিংস আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি, ঝাড়খণ্ডের অতীতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে এরা অংশগ্রহণ করে নি। তিনি স্বীকার করেছেন এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়; বলা বাহুল্য অবস্থাপন্ন জমিদার শ্রেণীর লোক বলতেও ঝাড়খণ্ডীদের মধ্যে এরাই অগ্রগণ্য। প্রাচীনতম উপজাতিদের অন্যতম এই কুর্মি সম্প্রদায়। অথচ তারা কোন রাজত্ব স্থাপন করেনি, সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে নি এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, অবাস্তব বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। আসলে ঝাড়খণ্ডের ইতিহাস অবাস্তব ইতিহাস, অন্ততঃ কুর্মিদের সম্পর্কে এখনো কেউ সত্যি কথা উচ্চারণ করেননি। কুর্মিরা এখনো আদিম সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় অভ্যস্ত। দলনায়কের প্রতি তাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা। ঝাড়খণ্ডের রাজা বা সামন্তরা যদি তাদের দলনায়ক না হয়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কুর্মিরা কখনো তাদের দাসত্ব করতে পারত না। কুর্মিদের জাতীয় চরিত্র যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন কুর্মিরা অন্য সম্প্রদায়ের লোকের কাছে জোড়হস্ত কিংবা নতজানু হয় না। তাহলে তাদের কোন রাজা ছিল না, এমন কথা কি খুব একটা সত্য-সম্ভূত মনে হয়?

এবারে ডঃ জগদীশ চন্দ্র ঝা-র দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটাকে দেখা যেতে পারে। মূল দলিল দস্তাবেজ, তৎকালীন সংবাদপত্র, ব্যক্তিগত সংগ্রহের কাগজপত্রের ভিত্তিতে রচিত তাঁর গ্রন্থ The Bhumij Revolt (1832-33) থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে। Barabhum was inhabited predominantly by the Bhumijes with some Kurmis, Santhals and others·· (P32) It (Dhalbhum) was inhabited by Bhumijes (P38). The population of the pargana (Pachet) was almost entirely Bhumij (P44). This (Kasipur) was a Bhumij Pargana (53). The population (of Patkum) was again mainly Bhumij (P53). The population (of Bagmundi) was chiefly Bhumij (P59) The inhabitants (of Koilapal) were all Bhumijes (P61). The people (of Raipur) were Bhumijes (P63). দেখা যাচ্ছে

১৮৩২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সারা ঝাড়খণ্ডের অধিবাসীরা ভূমিজ; নামমাত্র কুর্মি এবং সাঁওতালের বাস। এবার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মানভূমের সেন্সাস রিপোর্টে নজর দেওয়া যেতে পারে: মোট জনসংখ্যা ১৮,১০,৮৯০; এর মধ্যে কুর্মি ৩,২৩,০৬৮, সাঁওতাল ২,৮২,৩১৫ এবং ভূমিজ ১,০৩,৯০১। সারা ঝাড়খণ্ডে যদি ভূমিজদেরই বাস ছিল, তারা গেল কোথায়? যদি ধরা যায় রাজপুতেরা ভূমিজদেব হিন্দুকৃত তথাকথিত ক্ষত্রিয় শাখা, তাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ রাজপুতের সংখ্যা ছিল ৩০৭৭৬। সমস্যাটি যে খুব সাধারণ সমস্যা নয়, তা যে কেউ বুঝতে পারবেন। আসলে অতীতে কুর্মিদেরই বার-বার ভূমিজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দৈহিক গঠন, আচার অনুষ্ঠান সব দিক দিয়েই প্রচুর ঐক্য বিদ্যমান। তাই কুর্মিদের ভূমিজ মনে করে বিভ্রান্ত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়; আর তা যদি না হয়, যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভূমিজরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে ভূমিজেরা কুর্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ উপজাতি সম্প্রদায়গুলোর সীমাবেখা যথেষ্ট কড়া-কড়ি ছিল। কুর্মিদের নিজস্ব ভাষা কুর্মালী ছিল, নিজস্ব সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা ছিল। সাঁওতালদের এবং মুণ্ডাদের পরগণাব মতো কুর্মিদেরও ২২টি পরগণা ছিল; এমতাবস্থায় কুর্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে ভূমিজদের স্থানলাভ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে কুর্মি এবং মুণ্ডা-সম্প্রদায়-উদ্ভূত ভূমিজদেব মধ্যে অতীতে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকাও অসম্ভব নয়। দুটিই ঝাড়খণ্ডের তিনটি বৃহত্তম সম্প্রদায়েব অন্যতম, দুটি সম্প্রদায়ই ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কথা বলে থাকে; দুটি সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে ঝাড়খণ্ডে সর্বপ্রথম গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিয়োগ করে, ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করে এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। এদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে ভূমিজ এবং কুর্মি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই ঝাড়খণ্ডের সামন্ত রাজারা যে শুধু ভূমিজ ছিলেন না, অনেকেই কুর্মি ছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। চুয়াড় বিদ্রোহ ভূমিজ বিদ্রোহে কুর্মিদেরও যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে ভাবেই হোক কুর্মিদের অতীত ইতিহাসকে সংগোপন রাখা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের সব সম্প্রদায় সম্পর্কেই পণ্ডিতেরা আগ্রহ দেখিয়েছেন অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি সম্পর্কেই আশ্চর্য নীরব। সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত রহস্যে ঢাকা।

ঝাড়খণ্ডের অন্যতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভূমিজ সম্প্রদায়ের কিছু কথা কুর্মি-সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। ভূমিজ সম্প্রদায় আসলে মুণ্ডা গোষ্ঠীরই একটি শাখা। ছোট নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে এরা পূর্বদিকে সুবর্ণরেখার তীরভূমিতে বসবাস করতে শুরু করে। যারা জমির মালিক হল তারাই ভূমিজ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কৃষিকে পেশা হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছুটা স্বনির্ভর হয়ে, ওঠে। মুণ্ডাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরাই পরবর্তীকালে হিন্দুত্ব গ্রহণ করে, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত হিসাবে নিজেদের অভিহিত করে এবং উপবীত ধারণ করে। কেউ কেউ জৈনদের আচারাঙ্গ সূত্রে বর্ণিত বজ্রভূমির 'রূঢ়' এবং বর্বর মানুষদের সঙ্গে ভূমিজদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন। আমরা রাঢ়ভূমির সঙ্গে ঝাড়খণ্ডকে একাকার করে দেখবার পক্ষপাতী নই বলে এই মতকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না।

ভূমিজ সম্প্রদায় হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করলেও আদিম সমাজজীবনের রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক উপকরণই এদের এখনো অবলম্বন হয়ে আছে। এদের গোত্রবিভাজন রীতিতে টোটেম বা কুলতিলকের অনুসরণ করা হয়েছে। এদের কয়েকটি গোত্রনাম হল নাগ, হেমরম, সাণ্ডিল্য, হাঁসদা, সালরিষি ইত্যাদি।

কুর্মি-ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোক ছাড়াও সাঁওতাল-খাড়িয়া-মুড়া কামার-কুমোর বাগাল-ভুঞা আদি নানান শ্রেণীর উপজাতি ঝাডখণ্ডে বাস করে। আলোচিতব্য লোকসাহিত্যের উপকরণ এই সব সম্প্রদায় থেকেও সংগৃহীত হয়েছে। সাঁওতালরা অষ্ট্রীকভাষী বলে তাদের কোন উপকরণই আলোচ্য গ্রন্থে স্থান লাভ করে নি।

এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য সহজেই নজরে পড়ে। পেশার বিভিন্নতা থাকলেও প্রায় সব সম্প্রদায়ই কমবেশি কৃষি-নির্ভর। তাই এদের সংস্কৃতিও কৃষিনির্ভর। ঋতুপর্যায়ে রোহিন, গমা, চিত, করম, বিঁধা বাঁধনা, টুসু, সারহুল, ভগ্‌তা পরব (চড়ক) যেমন আছে, তেমনি আছে দাঁড়শাল্যা বা পাঁতা নাচ, জাওয়া নাচ, কাঁঠি নাচ, ছো নাচ আদি নৃত্য ; এরই সঙ্গে রয়েছে পাঁতা নাচের গান, জাঁত গান, আহীরা গান, টুসু গান, ছো-নাচের গান ; আছে মন্ত্র, রুমুজ, সাখী গান ; আছে ঢুয়া, ঝুমুর, উদয়া গান। বিপুল সংখ্যক বিবাহের গান এই অঞ্চলের অন্যতম সম্পদ। তাছাড়া ছেলে-

ভুলানো গান, ধাঁধা, রূপকথা, প্রবাদ, পুরাকথার প্রাচুর্য ঝাড়খণ্ডী জনতার চিত্তকে সব সময় রস-সম্পৃক্ত করে রাখে।

আদিম জীবন-চর্যার ধারা এখানে এখনো অব্যাহত আছে। আদিম আচার-অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস-কুসংস্কার, আদিমতম ধর্ম-ভাবনা এখানকার সংস্কৃতির অঙ্গ। বৃক্ষপূজা, বুরু-পাহাড় পূজা, পশু-পাখির পূজাও এ-অঞ্চলে প্রচলিত। ঝাড়খণ্ডের ধর্ম বলতে আদিম ধর্মকেই বোঝায়। গাছপালা পশু-পাখি ধুলো পাথর নদী-নালা সব কিছুর মধ্যেই দেবতার অস্তিত্বের কথায় একদা আদিম মানুষ যেমন বিশ্বাস করত, আজো একই ভাবে ঝাড়খণ্ডী মানুষ তা বিশ্বাস করে। দেবতা বলতে এখানে মনুনির্দেশিত কোন দেবতার দর্শন মেলে না। ঝাড়খণ্ডে 'ভূত পূজা'র সর্বাত্মক প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয়। মাঠে-প্রান্তরে নদী-নালায়, বনেপাহাড়ে, গৃহকোণে, বাসস্থানে-জনপদে সর্বত্রই এই ভূতের পূজা করা হয়। 'গরাম দেবতা' সবার ওপরে অধিষ্ঠিত। গ্রামদেবতাদের মধ্যে গরাম, ধরম, করম, বড়াম, ক্ষেত্রপাল, শীতলা, মনসা, বড় পাহাড়, মারাং বুরু আদি বিশিষ্ট। তাছাড়া কুদরা, বাঘুৎ, গরয়া, দুয়ারসিনি, সাত বহনী আদি ভূত বা দেবদেবীর সংখ্যাও অনেক।

এই সব নৃত্যগীত আচার-অনুষ্ঠান ভূতপ্রেতের পূজা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের কুর্মি এবং ভূমিজদের সাংস্কৃতিক উপকরণগুলোকে ঝাড়খণ্ডের সাংস্কৃতিক উপকরণ হিসেবে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যেতে পারে। সমগ্র ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব প্রান্তের প্রধানতম শরিক কুর্মি সম্প্রদায়; পশ্চিম প্রান্তের মুণ্ডা শাখার প্রতিনিধি ভূমিজ সম্প্রদায়। তাই আমরা ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানতঃ এদের ভাষাসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্যের উপকরণই গ্রহণ করেছি। সাঁওতালদের ভাষা ঝাড়খণ্ডী নয়, তারা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর সাঁওতালী ভাষায় কথা বলে থাকে; তাই তাদের লোকসাহিত্য নিয়ে আমরা এখানে কোন আলোচনা করি নি। তবে ভাষা-লোকসাহিত্য বাদ দিলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতিগত একটি অখণ্ড যোগসূত্র আছে, যদিও সব সম্প্রদায়েরই কিছু কিছু সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে—যা ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতিতে বর্ণময় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

॥ তিন ॥

ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যঃ শ্রেণীবিভাগ ও বিষয়বস্তু

পাহাড়-পর্বত-বন-ডুংরি-টাঁড়ের দেশ ঝাড়খণ্ড নৃত্যগীতময়তায় সর্বদা-চঞ্চল। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যেবেলা তাদের সাহিত্য-শিল্পের মুখর আয়োজনে আসর প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে। কোথাও সংগীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে; কোথাও বা রূপকথা, ছড়া, ধাঁধার আসব বসে। কোথাও গল্প-কথায়, প্রবাদে-প্রবচনে অরণ্য-জনতা সান্ধ্য-অবসর টুকুকে উপভোগ্য কবে তোলে।

ঝাড়খণ্ড খাদ্যান্ন সংগ্রহে বিব্রত হলেও মানসিক উপচার সংগীত-সাহিত্য নিতান্ত সহজ সাবলীলতায় সৃষ্ট এবং সঞ্চিত হয়ে ঝাডখণ্ডের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আবহমান কাল থেকে পরিপুষ্ট করে বেখেছে। ঝাডখণ্ডী বাংলার অরণ্যভূমি তাই লোকসাহিত্যের বিপুল সম্পদের অধিকারী।

লোকসাহিত্য এখনো অরণ্যভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাব প্রসার এ-অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পডলেও অরণ্যসন্তানেরা এখনো লোকসাহিত্যে তাদের আত্মার শান্তি, ক্ষুধার নিবৃত্তি, মানসিক যন্ত্রণার অমৃত প্রলেপ খুঁজে পায়। লোকসাহিত্য তাদের জীবনের একান্ত সহচর, এমন-কি প্রাণবায়ু বললে-ও অত্যুক্তি করা হয় না।

লোকসাহিত্য বলতে আমরা কি বোঝাতে চাইছি এবার তার আলোচনা প্রয়োজন।

লোকসাহিত্য শব্দটি দু'টি বিচ্ছিন্ন শব্দ 'লোক' এবং 'সাহিত্য'-এর যোগা-যোগে গড়ে উঠেছে। 'লোক' বলতে সাধারণতঃ অশিক্ষিত অরণ্যপর্বতবাসী কিংবা গ্রাম্যজনতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। উচ্চমানের সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব রুচি, ভাবনা এবং পরিবেশ মতো সমাজের সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকে, তা-ই আসলে লোকসাহিত্য রূপে গড়ে ওঠে। এ সাহিত্য শিক্ষিত মানস-জাত শিল্প-সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই লোকসাহিত্যকে কেউ কেউ গ্রাম্যসাহিত্য কিংবা পল্লীসাহিত্য বলার পক্ষপাতী। আমাদের মনে হয় গ্রাম্য-, পল্লী-, বা লোক- সাহিত্য যে-নামেই এই সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হোক না কেন চরিত্রগত তারতম্য, বড়ো

একটা ঘটে না। আরণ্য, গ্রাম্য বা পল্লীর সাধারণ মানুষ এই সাহিত্য সমাজের সর্বসাধারণের আনন্দবিধানের জন্যই রচনা করে থাকে।

আদিবাসীদের সংজ্ঞা প্রসংগে বলা হয়েছে যে কয়েকটি পরিবার বা গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত যে জনসমাজ একটি সাধারণ নামে পরিচিতি লাভ করে, যারা একটি বিশেষ অঞ্চলে বাস করে, একই ভাষায় বা উপভাষায় বার্তালাপ করে, বংশপরম্পরাগত দল-নেতাকে মান্য করে, বিবাহে এবং ধর্মচর্চায় কতকগুলো ঐতিহ্যানুসারী রীতিরেওয়াজ পালন করে, তারাই আদিবাসী। আমরা 'লোক' বলতে প্রায় এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করতে চাই। আদিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর লোকজন ভূমিজ-মাহলী-কুর্মি, মাল-মুণ্ডা-খাড়িয়া, কামার-কুমোর-ভুঞা আদিদের একটি সাধারণ নাম 'ঝাড়খণ্ডী' অভিধায় চিহ্নিত করতে চাই যারা ঝাডখণ্ড বা জঙগল মহল-ধলভূমে বাস করে এবং ঝাডখণ্ডী উপভাষায় কথা বলে থাকে। এই অরণ্য-জনতার সমাজব্যবস্থা, বিবাহে এবং ধর্মচর্চায় ঐতিহ্যানুসারী রীতিরেওয়াজে অল্পবিস্তর প্রভেদ ছাড়া সর্বক্ষেত্রেই এক। অন্যকথায় আমরা বলতে পাবি, ঝাড়খণ্ডী জনতা একটি বিশিষ্ট সংহত সমাজের সৃষ্টি করেছে এই অরণ্যভূমিতে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'সংহত সমাজ' প্রসংগে বলেছেন, 'যে সমাজ ইহাব অন্তর্ভুক্ত মানব গোষ্ঠীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিতর দিয়া চিরাচরিত প্রথায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়া চলে, তাহাই মনে করা হইয়াছে।'[১] ঝাডখণ্ডী জনতাব যে সমাজ, তার চেয়ে নিখুঁত আদর্শ 'সংহত সমাজ' আর কোথায় পাওয়া যাবে? এখানের বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসী-অর্ধআদিবাসী সম্মিলিতভাবে একই সাংস্কৃতিক পটভূমি গড়ে তুলেছে। একই ধরনের নৃত্যগীত-গল্পকথা-ভাষায় তারা এমনি একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে সবাই সমানভাবে আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে থাকে।

সংহত সমাজে যেমন ব্যক্তিসত্তার কোন অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় না, পরিবর্তে সমাজ-সত্তাই স্বীকৃতি লাভ করে, তেমনি ঝাড়খণ্ডী অঞ্চলেও সমাজই ব্যক্তিসত্তার উর্ধ্বে স্থান লাভ করে থাকে। প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অবশেষ এখনো এইসব অঞ্চলে উপলব্ধি করা যায়। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-

বোধ নির্ভরশীলতা এখনো ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী সমাজে লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রদায়গত বা সমাজগত জীবনই তাই সমস্ত মনোরঞ্জনের আসল লক্ষ্য। লোকসাহিত্য সৃষ্টি প্রসংগে তাই বলা হয়েছে, 'ইহা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নহে।'[২]

কিন্তু লোকসাহিত্য-রচনায় ব্যক্তিসত্তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। কোন রূপকথা কিংবা গান তার প্রথম স্তরে সমাজের দশজনের সাহায্যে রচিত হয় নাই বলেই মনে হয়। সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টা একজনই থাকে। তারপর স্রষ্টার মুখ থেকে যখন তা সমাজেব আর দশজনেব কর্ণে এবং মুখে সম্প্রচারিত হয় তখন তা নানা ভাঙাগড়া পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের সৃষ্টিতে পরিণত হয়। তাই সমাজে প্রচলিত লোকসাহিত্যকে সামাজিক সৃষ্টি বলে স্বীকার করে নিতে আমাদের আপত্তি নেই; অন্যদিকে সৃষ্টির আদিতে যে ব্যক্তিসত্তা ছিল, তার অস্তিত্বকেও আমরা অস্বীকার করতে পারিনা।

জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে লোকবৃত্তের সব বিষয়ই ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি, কিন্তু সমাজের দশজনের হাতে পড়বার পর ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত সামূহিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়। আমাদের মনে হয় এখানে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে কালে কালে বহুল পরিবর্তিত যে লোকসাহিত্য আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি তার আদিরূপ কি ছিল তা অনুমান করা একান্তই কঠিন। কিন্তু জন্মলগ্নে এক জন আদিস্রষ্টা যেমন ছিল, তেমনি তার আদিরূপ-ও ছিল।

ব্যক্তি-ভাবনার ফসল যে সব সময় অসম্পূর্ণই হয় কিংবা সমূহ-ভাবনার রূপায়ণ যে সব সময় ব্যক্তি-সৃষ্টিকে মহত্তর পর্যায়ে পৌঁছে দেয়, এমন কথা ভাববার কোন কারণ নেই। টি. এস. এলিয়টের সেই মহৎ উক্তি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য : সৎকবির হাতে অকবির উপকরণ-ও শাশ্বত কবিতার রূপ লাভ করে, আবার অকবির হাতে সৎকবির উপকরণ নিকৃষ্ট কবিতার জন্ম দিতে পারে (Bad poets deface what they take, and good poets make it into something better, or at least something better)।[৩] কাজেই ব্যক্তির সৃষ্টি সমষ্টির হাতে পড়ে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দুই-ই হতে পারে। আর

২. প্রাগুক্ত
৩. The Sacred Wood, PP 125

নিকৃষ্ট হলেই যে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এমন কথা ভাবা-ও সংগত বলে মনে করি না। কেন না শুধু কথাবস্তুর জোরে লোকসাহিত্য টিঁকে থাকে না। বলার ভঙ্গির ওপর, সুরের ওপর, স্থান কালপাত্রের ওপর এর নির্ভরশীলতা অনস্বীকার্য।

যে-কোন সমাজের লোকসাহিত্যে সেই সমাজ তার সামগ্রিক রূপ নিয়েই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সেই সমাজের আচারব্যবহার, রীতি-রেওয়াজ, উৎসব অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-ভালোবাসা যৌনতা, খাদ্য-পানীয়, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি সব কিছুই সগৌরবে স্থান লাভ করে থাকে। শুধু সমাজ-ঘটিত প্রসংগগুলোই বা বলি কেন, পারিপার্শ্বিক অরণ্য-প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তু, পাখি-পাখালি, গ্রাম নাম সব কিছুই লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। বলাবাহুল্য, যে-কোন লোকসাহিত্যের আঞ্চলিক চারিত্রধর্ম এগুলোর মাধ্যমেই রক্ষিত হয়ে থাকে। কোন গাছপালা কি পাখি-পাখালির নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে সেই অঞ্চলটির কথা উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

সমাজের অগ্রগতির মানদণ্ডের ওপর ও লোকসাহিত্যের গুণাগুণ নির্ভর করতে পারে। যে সমাজ শিক্ষায় দীক্ষায় যথেষ্ট উন্নত এবং প্রাগ্রসর তাদের লোকসাহিত্য যতোখানি শিল্পসম্মত হবে, ততোখানি শিল্পসম্মত লোকসাহিত্য অশিক্ষিত এবং অনগ্রসর সমাজের কাছ থেকে আশা করা উচিত নয়। প্রকাশ-ভঙ্গি, ভাষার লালিত্য, ভাবের গভীরতা, ভাষার কলাকৌশল, সুরের মাধুর্য দু'টি ক্ষেত্রে এক হবার কথা নয়। কিন্তু লোকজীবনের চিরন্তন সম্পদের পর্যাপ্তসত্তার উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। মানুষের সৎ গুণগুলো যেমন লোক সাহিত্যের উপজীব্য, তেমনি তার অসৎ গুণগুলোও। মৃত্যুঞ্জয়ী ভাবনাই লোকসাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুকে এতো আকর্ষণীয় করে রাখে। উন্নত অনুন্নত সব লোকসাহিত্যেই অমৃতময় মানুষের জয়গান করা হয়ে থাকে। সমাজের পক্ষে যা কল্যাণকর, লোকসাহিত্যে তারই উজ্জ্বল প্রকাশ। পাপপুণ্য, ধর্মাধর্মের হিসেবনিকেশ তাই লোকসাহিত্যেও মেলে।

তবে এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আদিম জনসমাজের লোক-সাহিত্যেও স্রষ্টার প্রতিভা, কবিত্ব, স্বল্প পরিসরে বিপুলের আয়োজন, রূপক বা সংকেতের গভীর তাৎপর্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বলা ভালো, লোকসাহিত্যের বিশেষ ধর্ম আদিমতা, অকৃত্রিমতা, সরলতা, প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা আদি

গুণাবলী অনুন্নত সমাজের লোকসাহিত্যে যতো বেশি দৃষ্টিগোচর হয় ততোখানি উন্নত সমাজের লোকসাহিত্যে পাওয়া যায় না। চিরন্তনতা বা শাশ্বত ধর্মের ওপরই লোকসাহিত্যের প্রাণস্পন্দন নির্ভর করে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, লোকসাহিত্য কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্য। অর্থাৎ লোকসাহিত্য কোনদিনই কাগজে-কলমে লিখিত হয় নি, মুখে-মুখেই এর প্রচার এবং প্রসার। অন্য কথায়, লোকসাহিত্য যেমন অলিখিত সাহিত্য, তেমনি মৌখিক সাহিত্যও বটে। কিন্তু লিখিত হলেই লোকসাহিত্য তার লোকবৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে একথা স্বীকার করে নেওয়া যায় না। কাগজে-কলমে রচিত হলেই কি তা লোকসাহিত্য হবে না? আমরা তো জানি, ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রীতিমতো শিক্ষিত ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোক। তিনি জনমানসে বিপ্লব সৃষ্টিকারী তাঁর ঝুমুর গানগুলো শুধু লিখিত ভাবেই রচনা করেন নি, পুস্তকাকারে মুদ্রিতও করেছেন। আমাদের প্রশ্ন, ওগুলো কি লোকসাহিত্য নয়? ওগুলো যদি লোকসাহিত্য না হয়ে থাকে তবে লোকসাহিত্য কি? আসলে আমরা লোকসাহিত্য সম্পর্কে একদেশদর্শী মনোভাব পোষণ করে থাকি। যে কোন স্রষ্টাই তার সৃষ্টিকে নিখুঁতভাবে সাধারণ্যে প্রচার করতে চায়। সাক্ষর লোককবি যে খুব স্বাভাবিকভাবেই তার উদ্ভাসিত ভাবনার বাঙ্‌ময় রূপকে লেখার বাঁধনে বেঁধে পরিমার্জিত রূপ দেবার চেষ্টা করবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

কারো কারো মতে লোকসাহিত্য লিখিত হতে বাধা নেই কিন্তু তা 'অভিজ্ঞ বা বিশেষভাবে শিক্ষিত গবেষক কর্তৃক লিখিত হওয়া চাই।' এখানে যে-বক্তব্য তা, বলাবাহুল্য, লোকমুখ থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রসংগে বলা হয়েছে। কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান কোথায়? কোন লোককবির লিখিত সাহিত্য কি লোকসাহিত্য নয়? আমরা বিশ্বাস করি, তা'ও লোকসাহিত্য। ঝাড়খণ্ডী জনতা অর্ধশিক্ষিত ঝুমুরকারদের এবং টুসু কবিদের গান সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করে থাকে, সমাজ-মানসে তা আনন্দরসের সঞ্চার করে; কারণ সেই সব গানের মধ্যে সমাজমানসের চিন্তাভাবনা, রীতি-রেওয়াজ, সব কিছুই সঞ্চিত থাকে। লিখিত হলেই যে তা লোকসাহিত্যের দু'টি অনিবার্য গুণ 'প্রত্যক্ষতা' এবং 'স্বাভাবিকতা' থেকে বঞ্চিত হবে, তা ভাবা ঠিক নয়। প্রত্যক্ষতা এবং স্বাভাবিকতা না থাকলে লিখিত কি অলিখিত সব লোকসাহিত্যই জনতা নিঃসংকোচে বর্জন করে থাকে। লোকমুখে শ্রুত

এবং সংগৃহীত লোকসাহিত্যের একই বিষয়ের বিভিন্ন পাঠান্তর অথবা রূপান্তর দেখা যায় বিভিন্ন গবেষক সংগ্রাহকের সংগ্রহ থেকে এবং এটাই যে সম্ভব এবং স্বাভাবিক তা আমরা স্বীকার করি। কেননা একই গান লোকমুখে পরিমার্জিত পরিবর্ধিত হতে হতে তার বিভিন্ন পাঠ অথবা রূপ যে দেখা যাবে তাতে আর সন্দেহ কি। এই গানগুলো যদি রচনাকালেই লিখিত হয়ে থাকত, তাহলে তার আসল রূপ এবং পাঠ খুঁজে নিতে আমাদের অসুবিধে হত না। সেখানে লিখিত হয়েও তা লোকসাহিত্যই থাকত এবং একটা আদর্শ রূপ আমাদের সম্মুখে সব সময় উপস্থিত থাকত। লিখিত অলিখিত সমস্ত লোকসাহিত্যই মুখে মুখে উচ্চারিত হয়, তাই মৌখিক ধারার লোকসাহিত্য আমাদের হৃদয়ের অন্দরমহলে বড়ো সহজে প্রবেশ করে থাকে।

লোকসাহিত্যের বড় ধর্মই হল সজীবতা, সচলতা। প্রচণ্ড প্রাণবেগে তা বিভিন্ন মানুষের স্মৃতিপথ বেয়ে লোকমুখে দেশকাল পাত্র ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। আপন অন্তরের গতিবেগেই তা পরিবর্তিত হতে থাকে, লিখিত আদর্শরূপ থাকলেও সাধারণ মানুষ তা মিলিয়ে দেখে সংশোধন করে না, বলা চলে তার প্রয়োজনই বোধ করে না। তবে লিখিত বা অলিখিত যে কোন লোকসাহিত্যই হোক না কেন তার একটা গীত ও কথ্য রূপ আছে। তার জন্য শ্রোতা যেমন দরকার, তেমনি তার আসল পরিবেশ, সুর, বাচনভঙ্গি ইত্যাদিরও প্রয়োজন। এর অভাব ঘটলেই লোকসাহিত্যের আসল রস থেকে আমরা বঞ্চিত হই। নাচনী নাচের ঝুমুরের রস এবং আবেদন হৃদয়ঙ্গম করতে হলে রাতের আবছা আলোর পরিবেশ, বাজনা, নাচনীর সুকণ্ঠে ঝুমুরের বিশিষ্ট সুরঝংকার, নাচনীর শারীরিক আন্দোলন এবং নয়নভঙ্গি এবং রসাপ্লুত জনতার আনন্দোল্লাস থাকা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা শুষ্ক কাগজের পাতায় যতোই মধুর ঝুমুরের পদাবলী লিপিবদ্ধ থাক না কেন, তা আমাদের তিলমাত্রও আনন্দরস পরিবেষণ করতে পারে না।

আগামী দিনে প্রাচীনকালের অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে যাবে। লোক-সাহিত্যও যথাসময়ে সংগৃহীত না হলে প্রাচীন ঐতিহ্যের বহু সম্পদ লুপ্ত হবার সম্ভাবনা। তবে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হবার কোন উপায় আছে কি? সংগ্রাহক যা আমাদের উপহার দেন, তা কি সব সময় বিশ্বাসযোগ্য অথবা অর্থবহ হয়ে থাকে? এ-ব্যাপারে সংগ্রাহকের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার যোগ্যতার মাপকাঠি কি হবে? আমরা আগেই দেখেছি,

গবেষকের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষভাবে শিক্ষা তার যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। কেননা অনভিজ্ঞ বা অসতর্ক লেখকের হাতে লোকমুখে প্রচলিত গান লিখিত হবার সময় বিকৃত হবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞ বা শিক্ষিত সংগ্রাহকের সংগ্রহ কি অবিকৃত এবং ত্রুটিমুক্ত হয়ে থাকে ?

বিশিষ্ট লোকশ্রুতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'বহিরাগত কোন গবেষক যদি স্বতন্ত্র কোন জাতির লোকসাহিত্য সংগ্রহ করিতে চাহেন, তবে তাহা সংগ্রহ করিবার যে বিশেষ শিক্ষা তাঁহার প্রয়োজন, কেহ যদি নিজস্ব লোকসাহিত্য সংগ্রহক রিতে চাহেন, তবে তাঁহার সেই বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন না-ও হইতে পারে। কারণ, ইহার খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাঁহার যে স্বাভাবিক জ্ঞান থাকিবে, তাহা হইতেই তাহা নিখুঁতভাবে লিখিত হইতে পারে। তবে তাঁহার পক্ষেও লিখিবার সময় তাঁহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রসবোধ, বিচারবুদ্ধি ও সকল প্রকার সৃজনী প্রেরণা সংযত রাখা আবশ্যক। একথা সত্য, তিনি যাহা লিখিয়া লইবেন, তাহা প্রচলিত লোকসাহিত্যের বিশেষ আর একটি রূপ হইবে। কিন্তু তথাপি যেহেতু তিনি সেই সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত এবং সেই সমাজের বিশিষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত, সেই জন্য তাঁহার লিখিত রূপ প্রচলিত রূপের বিশেষ ব্যতিক্রম হইবে না—যতটুকু একজনের মুখ হইতে আর একজনের মুখে প্রচারিত হইতে গেলেও হইয়া থাকে, ততটুকুই হইতে পারে মাত্র; অতএব তাহা একেবারে অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।'[৪]

ডঃ ভট্টাচার্য এখানে দু'শ্রেণীর গবেষক-সংগ্রাহকের কথা বলেছেন। প্রথম শ্রেণী বহিরাগত ভিন্ন জাতি বা সমাজভুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণী একই জাতি বা সমাজভুক্ত গবেষক-সংগ্রাহক। প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতার মাপকাঠি হল অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্তি। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য অভিজ্ঞতার দরকার পড়তে পারে, কিন্তু বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত না হলেও চলে। কেননা তার স্বজাতির ভাষা, বাগভঙ্গি, রীতি রেওয়াজ সব কিছুই নিখুঁতভাবে জানা থাকে। তবে তার ক্ষেত্রেও নিজস্ব রসবোধ, বিচার বুদ্ধি এবং সৃজনী ক্ষমতাকে সংযত রাখা প্রয়োজন; অবশ্যি ডঃ ভট্টাচার্যের মতে সব কিছু নিখুঁত ভাবে সংগ্রহ করা হলেও মৌখিক এবং লিখিত রূপে পার্থক্য থেকেই যাবে।

৪. বাংলার লোকসাহিত্য ১ম, পৃ ১৬

আমি নিজে দ্বিতীয় শ্রেণীর গবেষক-সংগ্রাহক। কুর্মি (মাহাতো)-রা এই অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ডের অন্যতম আদিম অধিবাসী। ডাল্টনের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রায় ৫৬ পুরুষ (প্রতি ২৫ বছরে এক পুরুষ) ধরে কুর্মিরা এখানে বাস করে আসছেন।[৫] আমি নিজে এই কুর্মি (মাহাতো) গোষ্ঠীভুক্ত। আমাদের সংগৃহীত লোকসাহিত্য মূলতঃ এই কুর্মিদের এবং তাঁদের প্রতিবেশী ভূমিজ, খাড়িয়া, কামার কুমোর বাগালদের লোকসাহিত্য। নিখুঁতভাবে সংগ্রহ কার্য সম্পন্ন করলেও সাফল্যের বিচারের ভার সুধীবৃন্দের হাতেই অর্পণ করা হল। এর আগে ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহার 'ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান' প্রকাশিত হয়েছে, যা এ অঞ্চলের সংগৃহীত ও মুদ্রিত লোকসংগীতের একমাত্র নিখুঁত সংকলন গ্রন্থের মর্যাদা পেতে পারে। ডঃ ভট্টাচার্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের, যারা নিজস্ব লোকসাহিত্য সংগ্রহ-গবেষণায় রত, শ্রেয়টুকু স্বীকার করেছেন। 'যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাই যথাযথ লিখিতে হইবে, যাহা বুঝিলাম তাহা নহে।'[৬] একই গোষ্ঠীভুক্ত লোকের মধ্যে বোধ হয় শোনা এবং বোঝার মধ্যে একটা নিবিড় সামঞ্জস্য সব সময়েই থাকে। একই অঞ্চলের লোকের মুখের কথা উচ্চারিত হতে না হতেই সেই অঞ্চলের লোকের পক্ষে তা শ্রবণ এবং অর্থ উপলব্ধি ক্রিয়া দু'টি যুগপৎ ঘটে থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস। কোন নিষ্ঠাবান গবেষকই শঠতার আশ্রয় নিতে পারেন না। তাই গবেষণার ক্ষেত্র স্বজাতি, স্বসমাজ বা স্ব-অঞ্চল হলেও উৎসর্গ-প্রাণ গবেষক কখনো চাতুরির আশ্রয় নিতে পারেন না; বরং যা তাঁদের ঐতিহ্য এবং জাতীয় সম্পদ তাকে নিখাদ নির্ভেজাল রূপে প্রকাশ করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেই বিশেষ গৌরববোধ করে থাকেন।

প্রথম শ্রেণীর গবেষক-সংগ্রাহকদের হাতে পড়ে অন্য অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের কি দুর্দশা হতে পারে ডঃ ভট্টাচার্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ (?) হিসেবে স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র সংকলন ও সম্পাদনার প্রসংগ উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, সেন মহাশয় বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত গবেষক না হওয়ায় নিজের ইচ্ছেমতো ভদ্ররূপ দিয়ে গীতিকা-গুলোর মধ্যে কৃত্রিমতা সৃষ্টি করেছেন। কারণ সেন মহাশয় স্বতন্ত্র অঞ্চলের

৫. Descriptive Ethnology of Bengal

৬. বাংলার লোকসাহিত্য ১ম, পৃ ১৮

অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র রূপ ও প্রকৃতি এবং ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন।

এবার আমরাও ডঃ ভট্টাচার্যের কাছে একটি অভিযোগ বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই। তাঁর বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে তিনি নিজেকে 'অভিজ্ঞ এবং বিশেষভাবে শিক্ষা'র অধিকারী বলে মনে করেন এবং তাঁর সংগৃহীত সমস্ত লোকসাহিত্যকে অকৃত্রিম বলেও মনে করেন, তা না হলে গ্রন্থের কোথাও তিনি এ-ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করতেন। এখানে আমরা তাঁর আর একটি উক্তি উদ্ধার করতে পারি। গ্রামাঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে লোকসাহিত্য সংগ্রহ কার্য প্রসংগে তিনি বলেছেন: 'আমার এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার কতকগুলি যে দুর্লভ সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাই এই কার্যে প্রযোগ করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। একথা হয়তো অনেকেই জানেন, যে আমি আট বৎসরেরও অধিক কাল ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগে লোক-সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ডক্টর ভেরিয়র এলউইনের গবেষণা সহযোগীরূপে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জসহ সারা ভারতবর্ষের আদিবাসী গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া এই বিষয়ে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম।... সুতরাং এই অভিজ্ঞতা সকলের থাকিবার কথা নহে এবং স্বভাবতঃই এই সাফল্য সাধারণভাবেও লাভ করা যাইতে পারে না।'[৭] নিষ্ঠাবান, নির্ভুল, ত্রুটিহীন গবেষক হিসেবে নিজেকে প্রচার করার জন্য তিনি যে এখানে সাহংকার আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা কারো দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। তাঁর সাফল্যকে তিনি আশাতীত এবং অসাধারণ বলে ঘোষণা করেছেন। এইখানে আমরা আমাদের একটি বিনীত অভিযোগ পেশ করি। ডঃ ভট্টাচার্য কি মনে করেন ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে (যে-অঞ্চলকে তাঁরা পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ, রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চল ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেছেন) নির্ভুল সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন? এ-অঞ্চলের ইতিহাস প্রসংগে তিনি 'পরিচায়িকা'র বারো এবং পনেরো পৃষ্ঠায় এলোমেলো ভুল তথ্য পরিবেষণ করেছেন। একজন নিষ্ঠাবান গবেষক হিসেবে তাঁর এ-ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি। তথাকথিত পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য তিনি যে বিপুল পরিমাণে

পরিচায়িকা, পশ্চিমসীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ।

সংগ্রহ করেছেন, তা তাঁর বিপুলাকার গ্রন্থগুলোর পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়। কিন্তু যতো বিপুল তাঁর সংগ্রহ হোক না কেন, এলোমেলোভাবে যে-কোন ঝাড়খণ্ডী লোকগীতি কিংবা ধাঁধা তুলে নিলেই বোঝা যাবে তা কি-অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক রকমের বিকৃত। বহুক্ষেত্রেই হাস্যকর ত্রুটির সমাবেশ ঘটেছে, এবং এগুলো কোন ক্রমেই তাঁর দুর্লভ অভিজ্ঞতা, বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্তির পরিচায়ক নয়। কিন্তু এখানে তাঁর সাফল্য আশাতীত কিংবা অসাধারণ তো নয়ই বরং তা তাঁর ঝাড়খণ্ডী উপভাষা সম্পর্কে পরিচয়হীনতা, প্রায় অজ্ঞতা, প্রমাণ করে। দু' একটি উদাহরণই যথেষ্ট বলে মনে করি :

১. মোহনপুরে ঠেকাঠেকি কি করে গুড়াব একা
টিকটিকি ননদ পালাল
খোঁচার মোহন খোঁচে শুকাল।
(বাংলার লোকসাহিত্য ৩য়,পৃ ২০৬)

২ শালগাছে শাল পংড়া কদমগাছে কলি রে
মাদার গাছে লাল গামছা চটক দেখে মরি রে। (ঐ, পৃ ২০৯)

৩ আমাদের গাঁয়ে কুলিমুড়ায় সরুমোটা বাল
বুট বহাইল কুড়ায়ে খাইলি ছাগলের দাড়ি।

৪ দে না ছোটকি, চাল গিল সেরাইঙ্গে
বড়কাবা আমাদের আসিছে সিনাইঙ্গে
একে আমার জুঠা হাত বাটাইং দেঙ্গে বাসি পাত
ঝুড়ি কাঠটা দে ন সলগায়েঙ্গে।
(লোকসংগীত রত্নাকর ৩য়,পৃ ১১৩৩)

প্রথম গানটির রূপ আমাদের সংগ্রহে এই রকম :

মহুল পড়ে ঠেক্যাঠেকা কি করে কুঢ়াব একা
টিকটিকি দেখ্যেই ননদ পালাল্য,
টাঁইড়ের মহুল টাঁইড়েই শুকাল্য।

মহুল পড়ে অর্থাৎ মহুয়া পড়ে এর স্থানে যদি লেখা হয় 'মোহনপুর', তাহলে কৌতুকরস ঘন হয় না কি? শেষাংশ ঠিক আছে ধরে নিলে-ও টিকটিকির পরে 'দেখ্যে' এবং 'খোঁচের মোহন' যে খোঁচের মহুল হবে তা বলে না দিলেও চলে। দ্বিতীয় গানটি তো ঝাড়খণ্ডী লোকগীতির তথাকথিত প্রখ্যাত শিল্পী অংশুমান রায়ের কল্যাণে গ্রামোফোন রেকর্ডে-ও শোনা যায়।

'মান্নার গাছে লাল গামছা' ব্যাপারটা হাস্যকর নয় কি, আসলে এটা হবে 'ভঁদার (বঁধার) গায়ে লাল গামছা' মানে বঁধুর গায়ে লাল গামছা। তৃতীয় গানের শেষ পংক্তিটি হবে, 'বুট বল্যে কুড়ায়েঁ থালি ছাগল্ল লেদাড়ি।' বুটের (ছোলা) সঙ্গে ছাগলের নাদের (লেদাড়ি) মিল আছে, তাই রসিকতা করে বলা হয়েছে যে তুই ছোলা ভেবে ছাগলের নাদ কুড়িয়ে খেলি; সেখানে কেউ যদি বলেন, ছোলা ভেবে তুই ছাগলের দাড়ি খেলি, তবে তা সশব্দ হাসির উদ্রেক ছাড়া আর কি করতে পারে? চতুর্থ গানটি আমাদের সংগ্রহে এই রকম:

দে ন ছটকী, চা''ল গিলা মের‍্যাই গে।
বড়কারা আমদের (হামদের) আ'সছে সিনাই গে
একে আমার জুঁঠা হাত বাঢ়াই দে গে বাসিভাত
ঝুড়ি কাঠটা দে ন সলগাঁই গে।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে ডঃ ভট্টাচার্য এ-অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এখানকার উচ্চারণভঙ্গি অনুধাবন করতে না পেরে তিনি যেমন বিভ্রান্ত হয়েছেন, তেমনি তা লিখতে গিয়ে হিন্দীর 'করেঙ্গে, মারেঙ্গে'র ঢঙে লিখে ফেলেছেন। সম্ভবতঃ তিনি জানেন না যে ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষাতে বোনেদের ভেতরে এবং জা-দের ভেতরে 'গে' সম্বোধনটাই শিষ্ট রূপ। ভাই-ও বোনকে 'গে' সম্বোধন করে থাকে। এই গানটি প্রসঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্যের মন্তব্য: 'বাংলা শব্দের মধ্যে মধ্যে নির্বিচারে হিন্দী বা কুর্মালি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরুলিয়ার লোকসংগীতের ইহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের নানা আদিম জাতির ভাষা কি ভাবে ব্যংলাভাষা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ক্রমে **বাংলা ভাষার কুক্ষিগত** হইয়াছে ইহা তাহার প্রমাণ। রাজনৈতিক প্রতিপত্তির দ্বারা ভাষার প্রভাব বিস্তার লাভ করে না, এই বিষয়ে যে ভাষার বিশেষ শক্তি আছে, সেই ভাষাই নিজের শক্তিতে প্রচার লাভ করে।'[৮] আশ্চর্য, ডঃ ভট্টাচার্য হিন্দী বা কুর্মালি শব্দের ব্যবহারের কথা বললেন অথচ বললেন না যে এই রূপটাই আসলে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার রূপ? মাগধী প্রাকৃত যে ভোজপুরী, মগহী, নাগপুরিয়া-কুর্মালির স্তর পার হয়ে ঝাড়খণ্ডী বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে, এ-কথা এখনো কেউ বললেন না।

৮. লোকসংগীত রত্নাকর ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩৩

বৃটিশদের অরণ্যভূমিতে পদার্পণের আগে যে এ-অঞ্চলে রাঢ় বা সমতল বাংলার হিন্দু বাঙালীর বাস ছিল না তাতো বৃটিশ ইতিহাসকারেরাই বলে গেছেন। দু'শো বছরেরও কম সময়ে যদি মুষ্টিমেয় বাঙালী একটি অঞ্চলকে ভাষান্তরিত করে থাকতে পারেন, তাহলে বৃটিশশক্তি ইংরাজীকে রাজভাষা করেও ভারতীয়দের ভাষান্তরিত করতে পারল না কেন? ডঃ ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন, যে-ভাষার শক্তি বেশী তাই নিজের শক্তিতে প্রচার লাভ করে। তা না হলে সমতল বাংলার ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বেনেরা কেন ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কথা বলতে বাধ্য হবেন? সংখ্যালঘু হয়েও ঝাড়খণ্ডীদের শোষণ করবার জন্য এই উপভাষা ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। ঝাড়গ্রামের পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তুদের মধ্যে ঝাড়খণ্ডী উপভাষা কি-বিপুল প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে তা যে কোন কৌতূহলী ব্যক্তিকে আমরা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে বলি এবং এ-ও দেখতে বলি, পূর্ববাঙলার ভাষা এ-অঞ্চলে প্রভাব ফেলতে কতোখানি ব্যর্থ হয়েছে।

ডঃ ভট্টাচার্য সেনমহাশয়ের অনভিজ্ঞতা, শিক্ষণপ্রাপ্তিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র রূপ ও প্রকৃতি এবং ভাষা সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ ছিলেন, এমন দোষারোপ করেছেন। আমাদের প্রশ্ন, ডঃ ভট্টাচার্য অভিজ্ঞ, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গবেষক হওয়া সত্ত্বেও ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির রূপ ও প্রকৃতি এবং ভাষা সম্পর্কে যে-অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা কেমন করে সম্ভব হল? খুব সম্ভবতঃ তিনি 'যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাই যথাযথ লিখিতে হইবে, যাহা বুঝিলাম তাহা নহে' নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু তার ফলে বহিরাগতের হাতে পড়ে লোকসাহিত্য যে-বিকৃত কদাকার রূপ পায়, তাকে তার স্বাভাবিক সুন্দর রূপে পুনর্গঠিত করার জন্য যে আর একদল গবেষকের দরকার পড়তে পারে, তা'ও বোধকরি ভেবে দেখা দরকার।

ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য সেই আদিম যুগ থেকে আপন বেগে প্রবহমান। গানের ভাষার মধ্যেও কালান্তরে পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে। ভাষাও ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। আচারধর্মীয় গানে যে-ভাষা আমরা লক্ষ্য করে থাকি, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত গানে সে-ভাষা লক্ষ্যগোচর হয় না। দু'য়ের মধ্যে যে-বিবর্তনের ইতিহাস তা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ঘটলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে দু'য়ের মধ্যে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে।

ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে ঝাড়খণ্ড তার সামূহিক রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের আদিম ধর্মবিশ্বাস সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, সমাজ-ব্যবস্থা, ইতিহাস, অর্থনীতি সমস্তই এখানকার লোকসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানকার পাহাড়-পর্বত, বনডুংরি, গাছপালা, জীবজন্তু সবকিছুকে সাদরে স্থান দেওয়া হয়েছে গানে-গল্পে-কথায়-প্রবাদে-প্রবচনে। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের চরিত্রধর্ম রাঢ় বা সমতল বাঙলার লোকসাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানকার মৃত্তিকা যেমন কঠোর এবং অকরুণ, তেমনি এখানকার মানুষ এবং মানুষের জীবনও। তাদের লোক-সাহিত্যে তাদের জীবন-মরণ সংগ্রামের কাহিনী, অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাণের দুর্বার সংগ্রামের কাহিনী বিধৃত রয়েছে। কৃষিকর্ম, গৃহপালিত জীবজন্তু তাই লোকসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে।

যে-কোন অঞ্চলের লোকসাহিত্যেই লোকগীতি সর্বাধিক অংশ দখল করে থাকে। আনন্দে-বিষাদে, সুখে-দুঃখে, আশায়-নিরাশায় সবসময়ই গান মানুষের সহচর। ঝাড়খণ্ডী জীবনে সংগীত কখন ব্যবহার হয় না? ঋতুচক্রে আবর্তিত কৃষিভিত্তিক আনন্দ-উৎসবে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সামাজিক উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠানের মুহূর্তগুলো সুরের স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে বিয়ের আসরে, মন্ত্রতন্ত্রের আসরে। আচার-ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও গান এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাহ্‌রা (মাহারায়) বা ধরমপূজার গান এই শ্রেণীভুক্ত। আবার কিছু কিছু গান আছে যা কোন উৎসব, কি সামাজিক অনুষ্ঠান, কি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীত না হয়ে তা সারা বছর ধরে যখন খুশি গাওয়া চলে। ঝাড়খণ্ডে ঋতুচক্রের উৎসবসম্পর্কিত গান যখন তখন গাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ঝুমুর, ভাদরিয়া, টাঁড় ঝুমুর সব ঋতুতেই গাওয়া চলে।

গানের পরই ছড়ার নাম উল্লেখ করতে হয়। ছড়া নানান ধরনের হয়ে থাকে। আসলে ছড়া একদা আদিম মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। তার পূজা-অর্চনা, দেবতার প্রতি প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন থেকে শুরু করে সঙ্গীতও ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হত। শিশুদের জন্য ছড়া তো ছিলই। আমরা এখানে ছড়া বলতে শিশুদের জন্য রচিত ছড়ার কথাই বলতে চেয়েছি। এই সব ছড়ার মধ্যে সাধারণ ছড়া, ঘুমপাড়ানে ছড়া, খেলার ছড়ার কথাই বিশেষভাবে আলোচ্য।

গ্রাম্য মানুষের চিন্তা-ভাবনা বাঙময় রূপ নিয়ে প্রকাশ পেলেই তা লোক-

সাহিত্য হয়ে থাকে। এই বাঙময় রূপ সংগীত, ছড়া, রূপকথা, প্রবাদ-প্রবচন বা ধাঁধাও হতে পারে। ধাঁধা-ও লোকসাহিত্যের একটি অঙ্গবিশেষ। যাঁরা বলেন ধাঁধার ভেতরে শুধু কথার খেলা ছাড়া আর কিছু নেই, তাঁরা ধাঁধার প্রতি অবিচার করেন। ধাঁধার সৃষ্টিকার্যে হৃদয় এবং বুদ্ধি দুটোই সমানভাবে সক্রিয় থাকে। কবিত্ব, কল্পনা, চিত্রধর্মিতা, ইংগিত—সাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ-গুলো ধাঁধার মধ্যে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ধাঁধার পরে প্রবাদ-প্রবচন। প্রবাদ-প্রবচনগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচিত হলেও এর মধ্যে লোকসাহিত্যের গুণ বর্তমান। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা এখানেও সংক্ষিপ্ততম পরিসরে বাণীরূপ পেয়েছে। প্রবাদের মধ্যে দু'টি জিনিসের তুলনা, তাদের সামঞ্জস্য ইত্যাদি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। বহু কথা বলে যা প্রকাশ করা যায় না, কয়েকটি শব্দ দিয়ে রচিত একটি প্রবাদ তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

রূপকথা, উপকথা, লোককথা বা শুধুই কথা লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম জনপ্রিয় সম্পদ। কেউ কেউ বলেন, এই অরণ্যভূমিতে সত্যিকারের রূপকথার দর্শন মেলা ভার। আমরা এ-কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা কথা, উপকথা, রূপকথার জন্য একটি শব্দ 'রূপকথা' প্রয়োগ করার পক্ষপাতী।

আমাদের লোকসাহিত্য আলোচনার সর্বশেষ উপাদান হল ব্রতকথা, ইতিকথা এবং পুরাকথার সঙ্গে জড়িত কাহিনীগুলো। করম, জিতিয়া আদি ব্রতকথার কাহিনীর পাশাপাশি আমরা জীবজন্তু ইত্যাদির জন্মকাহিনীও আলোচনা করতে চাই। এগুলোর মধ্যেও আদিম মানুষের কল্পনার বিস্তার এবং কাহিনীগ্রন্থনের মুন্সিয়ানা সবিশেষ লক্ষ্যগোচর হয়।

এতোক্ষণে এটা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হয়েছে যে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত অঞ্চলের লোকসাহিত্যকে বিচারবিশ্লেষণ ও অধ্যয়নের সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি: (১) লোকগীতি (২) ছড়া (৩) ধাঁধা (৪) প্রবাদ-প্রবচন (৫) রূপকথা এবং (৬) ব্রতকথা-ইতিকথা-পুরাকথা সম্পর্কিত কাহিনী।

আমরা তৃতীয় পর্বে লোকসাহিত্যের ওপর বিশেষ ধরনের অধ্যয়নের প্রস্তাব রেখেছি। যে-কোন অঞ্চলের লোকসাহিত্য সেই অঞ্চলের জনতার সামগ্রিক রূপটিকে ধারণ এবং প্রকাশ করে থাকে। একটি সমাজের পরিপূর্ণ ছবি লোকসাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ধাপে-ধাপে পুনর্গঠন করা

এমন কিছু কঠিন নয়। এই ধরনের অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ অঞ্চলের জাতি-সম্প্রদায়ের বিচিত্র রীতি-রেওয়াজ, সমাজতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব খুঁজে বার করা সম্ভব। এসব জিনিষ যদিও সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, তবু লোকসাহিত্যের গবেষকের-ও এ সম্পর্কে কিছু করবার এবং বলবার আছে বলে আমরা মনে করি। তাই প্রস্তাবিত তৃতীয় পর্বে ঝাড়খণ্ডের প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তু, সামাজিক রীতি-রেওয়াজ, বিবাহবন্ধনে নবনারী, বিবাহ বন্ধনের বহির্ভূত জীবনে নবনারী, প্রেমভালোবাসার গতিপ্রকৃতি, যৌনতা, খাদ্য ও পানীয়, বিধিনিষেধ, নিষিদ্ধ অভিপ্রায় আদি বিশিষ্ট বিষয়বস্তু ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে যে-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার উদাহরণসহ রেখাচিত্র অঙ্কন করা আমাদের লক্ষ্য।

সাধারণতঃ লোকসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকেরা লোকগীতি ইত্যাদির আকার-প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করেন না। হয় তা বাহুল্য মনে করেন, নয় সে-কর্মটা ছান্দসিক এবং আলংকারিকদের এক্তিয়ারে পড়ে বলে মনে করেন। আমরা বিশ্বাস করি লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু যেমন আমাদের মধ্যে আদরণীয়, তেমনি আদরণীয় হওয়া উচিত এর আকার প্রকার ছন্দ কলা-কৌশল সব কিছুই। চতুর্থ পর্বে তাই আমরা লোকসাহিত্যের গঠনপদ্ধতি এবং ছন্দ-প্রকরণের ওপর আলোচনা করব।

লোকসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্য যেমন এক জিনিষ নয়, তেমনি এক মাপকাঠিতে এ দু'টির বিচার অযৌক্তিক তো বটেই, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। লোকসাহিত্যেরই ক্রমবিকশিত শিল্পসম্মতরূপ উচ্চসাহিত্য। লোকসাহিত্যের সর্ববিধ বিষয়বস্তু উচ্চসাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছে। উচ্চসাহিত্যের উৎস এবং ভিত্তিভূমিই হল লোকসাহিত্য। তাই লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু উচ্চসাহিত্যের শিল্পাদর্শ-অনুসারী হতে গিয়ে বারে-বারে বিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং পরিশীলিত হয়েছে। ফলে দু'টির মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। লোকসাহিত্যের মধ্যেও সাহিত্যিক সৌন্দর্য এবং মূল্য পুরোপুরি নিহিত আছে। আমরা পঞ্চম পর্বে এই দিকটি নিয়েও আলোচনা করব। বলা-বাহুল্য, লোকসাহিত্যের গবেষকরা ভ্রান্তিবশতঃই হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক এদিকটিকেও সম্পূর্ণতঃ এড়িয়ে গেছেন।

ঝাড়খণ্ডে উচ্চসাহিত্য বলে তেমন কিছু নেই, যা আছে তা এই লোক-সাহিত্য। এখানকার মানুষ তাই তাদের ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা ও স্বপ্ন, সৌন্দর্য-

বোধ ও শিল্পচেতনা, সমাজচিন্তা ও অর্থচিন্তা সব কিছুকেই লোকসাহিত্যের সাধারণ বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে।

আমাদের গ্রন্থভুক্ত লোকসাহিত্যের সমস্ত উপকরণ প্রত্যক্ষক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরে ধানবাদের পাঞ্চেত-কাতরাস-ঝরিয়া থেকে দক্ষিণে ধলভূম নয়াবসান গোপীবল্লভপুর, পূর্বে কলাইকুণ্ডা-সরডিহা-রাইপুর থেকে পশ্চিমে ঝালদা, বুণ্ডু সিল্লী, তামাড় অঞ্চলের লোকসাহিত্য আমাদের সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে সংগ্রহ করেছি, কখনো কখনো বিশেষভাবে নির্দেশপ্রাপ্ত আঞ্চলিক সংগ্রাহকের সাহায্য নিয়েছি; দু'একটি ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহার 'ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান' এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ মাহাত-র 'ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থদ্বয়ের সংকলন থেকেও উপাদান গ্রহণ করেছি। এগুলো এখানকার অরণ্য পরিবেশ, মৃত্তিকা এবং মানুষজনের মতোই অকৃত্রিম, রুক্ষসৌন্দর্যময়, সরল অনাড়ম্বর রূপটি নিয়েই এখানে উপস্থিত। একমাত্র রূপকথা ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই আদি এবং অকৃত্রিম রূপটির মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয় নি। স্বল্প পরিসরে কথাগুলোকে পরিবেষণ করার জন্যই সেগুলোকে শিষ্ট বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করতে হয়েছে। লোকগীতি, ছড়া, প্রবাদপ্রবচন ইত্যাদির ক্ষেত্রে হুবহু মুখের ভাষা, বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি রক্ষা করে চলবার চেষ্টা হয়েছে। ধ্বনি-অনুসারী বিশিষ্ট লিখনপদ্ধতি এখনো ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ক্ষেত্রে সর্ববাদীসম্মতক্রমে স্বীকৃত হয়নি। তবু আমরা চেষ্টা করেছি হুবহু উচ্চারণভঙ্গিকে, বিশেষভাবে বিপর্যস্ত ধ্বনিপ্রবাহকে, মোটামুটি একটি নিখুঁত লিপিবন্ধনে আবদ্ধ করতে।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মধ্যে উচ্চারণগত কিছু তারতম্য মানভূম, ধলভূম-ঝাড়গ্রামে কর্ণগোচর হয়ে থাকে। আমরা আমাদের সংগ্রহ কার্যে যখন যেখানে যে-উচ্চারণভঙ্গির সম্মুখীন হয়েছি সে-সংগ্রহে সেই উচ্চারণভঙ্গিই গ্রহণ করেছি। উচ্চারণ-পার্থক্যটা নিতান্তই ক্রিয়াপদে। 'কর্‍্যেঁ, কর্‍্যো, করি' অসমাপিকা ক্রিয়াপদের এই তিনটি রূপ খুব স্বল্প দূরত্বে, এমন কি একই গ্রামের মধ্যেও, শোনা যায়, তাই কোন উচ্চারণভঙ্গি কোথাকার, তা নির্দেশ করতে যাওয়াটাকে আমরা বাতুলতা এবং বাহুল্য মনে করি। ঝাড়খণ্ডী জনতা সব রকম উচ্চারণভঙ্গিই অত্যন্ত সহজে অনুধাবন করতে পারে এবং এই উচ্চারণভঙ্গি কখনো অঞ্চলভিত্তিতে কখনো গোষ্ঠীভিত্তিতে ঘটে থাকলেও

ঝাড়খণ্ডী জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কিংবা আঞ্চলিকতার বিষ লক্ষ্য করা যায় না। তাই একই নৃত্যের আসরে সব ধরনের উচ্চারণভঙ্গির গান গাওয়া হয়ে থাকে, এবং তা কখনোই হাস্য-পরিহাসের উদ্রেক করে না।

একই কারণে আমরা কোন গান বা উপকরণকে কোন বিশিষ্ট অঞ্চলের নামে চিহ্নিত করে ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের এক এবং অখণ্ড প্রবাহের মধ্যে বিভেদ এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকে সমর্থন করি না। ঝাড়খণ্ডী জনতা বেশ কয়েকটি আদিবাসী-অর্ধআদিবাসী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য ছাড়া এক এবং অখণ্ড পরিমণ্ডলের অংশীদার। কোন্ বিশেষ গানটি কুর্মি-ভূমিজ-মাল-বাগাল-কামার-কুমোরের একান্ত নিজস্ব তা বলার ধৃষ্টতা তারা যেমন কোনদিন দেখায় নি, আমরাও তা বলার ধৃষ্টতা দেখাইনি। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য সমগ্র ঝাড়খণ্ডী জনতার। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য সমগ্র ঝাড়খণ্ডী অরণ্যভূমির, এরচেয়ে বড়ো সত্য আর কি হতে পারে।

প্রথম পর্ব

ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিঃ ভূমিকা ও শ্রেণীবিভাগ

মানবিক প্রয়োজনেই লোকসংগীতের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছিল। আনন্দে হোক বেদনায় হোক, প্রেমে হোক অপ্রেমে হোক, মানুষ তার হৃদয়ের গভীর অনুভূতিগুলোকে নিষ্প্রাণ কথা-রূপ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, অমল সুরের প্রাণধারায় তাকে সঞ্জীবিতও করেছিল। তারই ফলশ্রুতি হল লোকসংগীতের উদ্ভব। আর দশটি নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের মতো সংগীতও অপরিহার্য এবং অনিবার্য রূপে দেখা দিয়েছিল। অচিরাৎ সংগীত মানবিক অস্তিত্বে সদর্থেই প্রাণধারায় পরিণত হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেন, লোকসংগীত পরিশীলিত মনের ফসল। তাই অসভ্য বর্বর মানুষের জীবনে সংগীতের কোন স্থান নেই কিংবা ছিল না। একথা কোনক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রতিটি মানুষ, সে বর্বর হোক কিংবা সভ্য, নিজের সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা এবং ক্ষমতা বা প্রতিভা প্রকাশের এবং প্রচারের চেষ্টা করে থাকে। লোকসংগীতের মধ্য দিয়েও এসব প্রকাশ এবং প্রচার করা সম্ভব। তাই বর্বর অসভ্যও লোকসংগীতে যেমন নিজেকে প্রকাশ এবং প্রচার করেছে, তেমনি আনন্দ এবং সান্ত্বনার জন্যও লোকসংগীতের ব্যবহার করেছে। লোকসংগীত কোন সুপরিকল্পিত কিংবা শিল্পাদর্শ-অনুসারী সংগীত নয়। স্বতঃস্ফূর্ততাই এর প্রাণধর্মের প্রধান লক্ষণ। যেসব লোকসংগীতে স্বতঃস্ফূর্ততা নেই সেগুলোকে খাঁটি লোকসংগীত হিসেবে স্বীকার করা যায় না।

লোকসংগীতের ধারাটি মৌখিক। যুগ যুগান্তর ধরে লোকসংগীত সাধারণ নিরক্ষর মানুষের মুখে-মুখে প্রচারিত হয়েছে এবং এইভাবেই তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। আদিযুগের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল না; তারা গান রচনা করে তা চিরকালের মতো লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারত না। সম্ভবতঃ তার ফলেই খাঁটি লোকগীতির আয়তন দুই চারি পংক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্মৃতিতে খুব বেশি পংক্তিকে ধরে রাখাও সম্ভব নয়। তাই ছোটখাটো লোকগীতিও বিভিন্ন গায়কের মুখে বিবর্তিত হয়ে

নবতর রূপ ধারণ করে। বিবর্তনের ফলে লোকগীতির উন্নতি এবং অবনতি দুই-ই ঘটতে পারে।

সজীবতা লোকগীতির অন্যতম প্রধান গুণ। এই গুণটির জন্যই লোকগীতি চিরপুরাতন হয়েও চির নূতন। এ-প্রসংগে জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন : **Indeed, a folksong is neither new nor old ; it is like a forest tree with roots deeply buried in the past but which continuously puts forth new branches, new leaves, new fruits.**[১] লোকগীতি নূতনও নয়, পুরাতনও নয়, লোকগীতি কালোত্তীর্ণ। লোকগীতিকে আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি তখন তাকে নবীনতর রূপেই দেখে থাকি, তার প্রাচীনতর রূপ আমরা কল্পনা করতে পারি কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে পারি না। লোকগীতির প্রাচীনতর রূপ যা লুপ্ত এবং নবীনতর রূপ যা বর্তমান দুটোই সমান সত্য। **A folksong is always grafting the new on to the old.**[২] মূল লোকগীতির ওপর বিভিন্ন গায়ক নিজ নিজ কবিত্ব-প্রতিভা প্রমাণ করবার জন্য কিছু বর্জন কিছু সংযোজন করে নবতর রূপ দান করছে। স্মৃতি-নির্ভর গায়ক কোন শব্দ বা পদ ভুলে গেলে নতুন শব্দ বা পদ জুড়ে গানটির উন্নতি বা অবনতি ঘটাচ্ছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই মূল গানটির রূপান্তর ঘটছে। এখানেই লোকগীতির communal growth-এর প্রসংগে আসতে হয়। A folksong is neither new nor old because it is continually taking on new life ; it is an individual flowering on a common stem.[৩] লোকগীতি বহুজনের মুখে মুখে ক্রমাগত বিবর্তিত হয়ে বহুজনের সৃষ্টিতে পরিণত হয়। এই communal growth বা সম্প্রদায়গত সৃষ্টি তত্ত্বটি অবশ্যই বিতর্কিত ব্যাপার। বহুজন মিলে মূল গানের সৃষ্টি করেছিল, এমন কথা বিশ্বাস করা যায় না। আদিতে কোন একজনই তার স্রষ্টা ছিল ; কিন্তু তার সৃষ্টিকার্য সম্ভব হয়েছিল সমগ্র সম্প্রদায়ের রুচি এবং অনুমোদনের ওপর। যা সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করতে পারে না বা অনুমোদন লাভ করে না তেমন লোকগীতির পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। লোকগীতি তাই ব্যক্তিস্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সমষ্টি-স্রষ্টার দাবীকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়। জনতার সম্পদে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে

১ R. V. Williams, 'Folksong', Encyclopaedia Britanica, 14th edn (1932) Pp. 448

২ Ibid

৩ ibid

মৌখিক আবৃত্তির পথে বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠে তার কবিত্বের স্পর্শে পরিবর্তিত হতে থাকে। A folksong evolves gradually as it passes through the mind of different men and different generations.[8]

ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনশীল লোকগীতির অবনতি ঘটে না বলে বলা হয়ে থাকে। তবে সব সময় উন্নতি ঘটে থাকে, এ কথাও আমরা স্বীকার করি না। গায়কদের সবাই কবি-প্রতিভার অধিকারী হবে, এমন কথা ভাবা ঠিক নয়। অকবির হাতে সুন্দর গানও বিশ্রী রূপ ধারণ করতে পারে। স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে গায়কের পাদপূরণ লোকগীতির শ্রীহানি ঘটাতে পারে। যাঁরা পরিবর্তনশীল লোকগীতির উন্নতিতে বিশ্বাসী, তাঁরা বলেন, অবনত লোকগীতিকে জনতা বর্জন করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তার বিলোপ ঘটে। বাণী যদি শ্রীহীন হলেও সেই লোকগীতির যদি সুরের ঐশ্বর্য বা মাধুর্য থাকে, তাহলেও কি বিনাশ অবশ্যম্ভাবী? আমাদের মনে হয় এ-সব ক্ষেত্রে লোকগীতি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কালস্রোত বেয়ে-আসা লোকগীতির মধ্যে বহু শতাব্দীর বহু সহস্র নরনারীর কল্পনা যে আশ্রয় করে থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একই গানের বিভিন্ন রূপান্তর বা পাঠান্তরও তাই অবহেলনীয় নয়। [illegible] পরিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করতে পারি। আসলে লোকগীতি এক মানুষের সৃষ্টি নয়, লোকগীতি যেন বারে বারে নিজেকে ভাঙে আর গড়ে —লোকগীতিকে স্বয়ংসৃষ্ট, স্বয়ম্ভূ বললেও বুঝি ভুল বলা হয় না।

উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরচনায় যেমন ছন্দ, অলংকার, শিল্পাদর্শ ইত্যাদি মেনে চলতে হয়, তেমন রীতি-পদ্ধতি লোকসংগীতের ক্ষেত্রে প্রচলিত নেই। গান রচনার কোন বাঁধা-ধরা পদ্ধতি যেমন নেই, তেমনি গান-সংরক্ষণেরও তেমন কোন নিয়ম নেই। মুহূর্তের আবেগে-আনন্দে এর সৃষ্টি, স্মৃতিশক্তির নির্ভরতায় এর সংরক্ষণ। ওস্তাদ রেখে লোকগীতি কেউ শেখে না। শুনে-শুনেই সুর ও তাল আয়ত্ত করতে হয়। যাদের মধ্যে এই সব প্রতিভা থাকে তারাই লোকগীতির স্রষ্টা, ধারক, বাহক ও গায়ক হয়ে থাকে।

লোকগীতির আর একটি বৈশিষ্ট্যও ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। তা হল যখনকার যা গান তখন তা-ই গাইতে হবে, অন্য সময়ে সে-গান গাওয়া নিষিদ্ধ। তাতে চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে বলে লোকবিশ্বাস আছে। জাওয়া গান করম পরবের এক মাস আগে থেকে গাওয়ার রীতি,

---

৪ ibid

উৎসব শেষ হলে সে-বছরের মতো জাওয়া গান নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে বসন্তপঞ্চমী পর্যন্ত টুসু গান গাওয়া চলে, অন্য সময় গাওয়া নিষিদ্ধ। পেশাগত গানগুলোও পেশা-বহির্ভূত লোকের গাওয়া নিষিদ্ধ। পটুয়ার গান, বাঁদর নাচের গান, সাপ খেলানোর গান একমাত্র সেই সেই পেশার লোকেরাই গেয়ে থাকে। অন্যদের ক্ষেত্রে এগুলোকে নিষিদ্ধ বলা চলে।

লোকগীতি মূলতঃ পল্লীর মানুষের সৃষ্টি, তাই পল্লীজীবনের সমস্ত উপকরণই লোকগীতির অন্তর্গত হয়ে পড়ে। এই কারণেই লোকগীতি সমস্ত পল্লীজনতার অন্তরের সম্পদ। লোকগীতি মিলিত কণ্ঠের গান, তারই মধ্যে এর পরিপূর্ণতা। লোকসংগীত খুব কম ক্ষেত্রেই একক অনুষ্ঠান। সমষ্টিগতভাবে গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই লোকসংগীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। ব্যষ্টিসত্তার অস্তিত্বকে ছাপিয়ে সমষ্টি-সত্তার অস্তিত্বই এখানে প্রধান হয়ে ওঠে। তার ফলে লোকসংগীতের আসরে একটি গোষ্ঠীর কামনা-বাসনা সামগ্রিকভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির অধিকাংশই সমষ্টিগতভাবে গীত হয়ে থাকে। করম, জাওয়া, ভাদু, আহীরা, টুসু, বিয়ের গান সমষ্টি-সংগীতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

লোকগীতি প্রধানতঃ কোন না কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই গীত হয়ে থাকে। তাই প্রতিটি আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে কখনো নৃত্য-গীত, কখনো শুধু গীত অনিবার্যভাবে এসে যায়। মনসা পূজার জাঁত গান; করম পরবে পাঁতাশালিয়া গান, জাওয়া গান; ভাদু পরবে ভাদুর গান; বাঁধনা পরবে আহীরা গান; টুসু পরবে টুসুর গান এবং সর্বশেষে ভক্তা (চড়ক) পরবে ছো নাচের গান; বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ের গান; ধরম পূজায় মাহ্‌রা (মাহারায়) গান—আমাদের বক্তব্যকে সপ্রমাণ করে।

বহু লোকগীতি আবার নৃত্য-নির্ভর। নৃত্যকে বাদ দিয়ে সাধারণতঃ এসব গান গাওয়া হয় না। এসব ক্ষেত্রে গীত এবং নৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এগুলোর পেছনে ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। ঝাড়খণ্ডে এই ধরনের গান হল পাঁতাশালিয়া যা, করম নাচের সঙ্গে গাওয়া হয়; মেয়েদের জাওয়া গান জাওয়া নাচের সঙ্গে এবং ছো নাচের সঙ্গে ছো গান গাওয়া হয়ে থাকে। লোকগীতিতে বাদ্যযন্ত্র অপরিহার্য নয়। ঝাড়খণ্ডে মূলতঃ নৃত্য-সম্পর্কিত গানে, জাঁত গানে, আহীরা গানে, সাথী গানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

লোকগীতির বিষয়বস্তুও বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। লোকগীতি গ্রামীন সমাজ থেকেই উদ্ভূত এবং এই সমাজেই তার প্রচার ও প্রসার। গ্রামগুলো এখনো কৃষি-নির্ভর। গ্রামের মানুষ সহজ সরল জীবনচর্যায় অভ্যস্ত। ঝাড়খণ্ডের জনজীবন এখনো পুরোপুরি কৌমবদ্ধ। কৃষি-নির্ভর মানুষগুলো সেই আদিম জীবনের বহু কিছু উপকরণ এখনো সযত্নে লালন-পালন করে চলেছে। সেখানে ব্যক্তিসুখ গৌণ, সমষ্টি-সুখই মুখ্য। কৌমজীবনের গোষ্ঠীবদ্ধতা এখানে এখনো আদিম কালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানকার লোকগীতি তাই গ্রামজীবনের সমষ্টিগত ভাব-ভাবনায় পরিপূর্ণ।

তাছাড়া খাঁটি লোকগীতির জন্ম সাধারণতঃ অনাড়ম্বর, অশিক্ষিত এবং শিষ্টাচারের বজ্রআঁটুনি-মুক্ত জনসমাজেই সহজে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। সহজ কথায় দু'চার পংক্তির মধ্যে এই সব লোকগীতি গভীর আবেগে স্ফুরিত হয়। ঝাড়খণ্ডের পথে-প্রান্তরে, বন-ডুংরি, গ্রামে-গ্রামান্তরে হাজারে-হাজারে এতো বিপুল পরিমাণে লোকগীতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যে তা কল্পনাও করা যাবে না। এই সব লোকগীতিতে ঝাড়খণ্ড জনপদের সমগ্র রূপ আমরা খুঁজে পেতে পারি। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা, কামনা-বাসনা, যৌনতা-জাদু—সমস্ত বিষয়ই লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত। একটি সম্পূর্ণ অঞ্চল তার সমগ্র ভাবনা, সমগ্র চেতনা এবং সমগ্র অস্তিত্বকে বুঝি-বা এমন করে আর কোন লোকসাহিত্যে নির্দ্বিধায় অবারিত করে দিতে পারে নি। কৌমজীবনে মানুষের কাছে দু'টি জিনিষের প্রাধান্য ছিল: সন্তান ও শস্য কামনা। এই দু'টি কামনা ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। এখানকার আচার অনুষ্ঠানেও এই দু'টি জিনিষেরই প্রাধান্য। এখানে প্রেম-ভালোবাসা এবং যৌনতার মধ্যে কোন সীমারেখা নেই। যেহেতু সন্তানকামনার পশ্চাতে যৌনতা এবং প্রজননের ভূমিকাই মুখ্য, তাই এগুলো কখনো রূপকের আড়ালে, কখনো-বা সরাসরি নগ্নতা নিয়েই উপস্থিত। কখনো-কখনো কামনা-বাসনার অভিব্যক্তি এমন নগ্নতায় উপস্থিত যে তা অশ্লীল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শ্লীলতা বা অশ্লীলতা বিচার করবার আগে যে-অঞ্চলে এগুলো প্রচলিত, সে অঞ্চলের জনতার মানসিকতা, রীতিরেওয়াজ, সমাজব্যবস্থা ও জীবনচর্যা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সবিশেষ অবগত হবে।

লোকগীতির মধ্যে বহুগীতিই পাওয়া যাবে যা সম্পূর্ণতঃ ধর্মাশ্রিত।

লোকসংগীত এবং ধর্মসংগীতের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন যে লোকসংগীত সুরে এবং কথায় পরিবর্তন স্বীকার করলেও ধর্মসংগীত তা করে না; লোকসংগীত যেহেতু জীবনসম্পর্কিত, সুতরাং তা সাহিত্যপদবাচ্য এবং ধর্মসংগীত তত্ত্বাশ্রয়ী, সুতরাং তা দর্শন। আচারধর্মী এবং জাদু-কেন্দ্রিক গানগুলোর ভাষা অবশ্য পরিবর্তিত হয় না; কিন্তু অন্যান্য গানের ভাষা যে ক্রমান্বয়ে যুগোপযোগী ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে চলে, তাতে সন্দেহ নেই। সুরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে কি না তা অবশ্যই বিতর্কিত ব্যাপার। ভাটিয়ালির বিশিষ্ট সুর যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে সে গানকে কি নামে ডাকব? ঝুমুর যদি তার বিশিষ্ট সুর হারায় তাহলে তা কি ঝুমুর থাকবে? ধর্মসংগীতে তত্ত্ব অবশ্যই থাকে কিন্তু সে তত্ত্ব সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। দৈনন্দিন জীবনচর্যার পথে জীবনের যে-সব উপলব্ধি তাকে অন্য এক পৃথিবী বা জীবনের কথা সচকিতে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাই তারা লোকগীতির ভাণ্ডারে ধর্মচিন্তা হিসেবে সঞ্চিত করে রাখে। এ ধর্মচিন্তা নিতান্তই লৌকিক ঘটনা। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বেড়াজাল তো থাকেই না, বরং এই সব ধর্মচিন্তা যেন সেই সব বেড়াজালকে ছিন্ন করবার জন্যই উদ্ভূত হয়। এইসব চিন্তা জীবনের রসে এমনিভাবে জারিত হয়ে থাকে যে তাতে নীরস ধর্মীয় দর্শন সম্পূর্ণ আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। রূপকের আড়ালে যা থাকে তা হয় তো সাধকের প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু গানের ভাষা, প্রকাশভঙ্গি এবং সুর সাধারণ জনতার মনোরঞ্জন করে থাকে যে-কোন সাধারণ লোকগীতির মধ্য দিয়েই। তাই ধর্মাশ্রিত হয়েও এসব গান জীবনের উপকরণ এবং মানবিকতার সমন্বয়ে লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ঝাড়খণ্ডে যে লৌকিক-ধর্ম, তা একান্তভাবে তাদের নিজস্ব। এই ধর্মীয় অনুভব তারা যে ভাবে এবং ভাষায় গানে প্রকাশ করে তা সম্পূর্ণ জীবন-রস সম্পৃক্ত। এখানকার লোককবি যখন বলে,

> মানুষ জনম ঝিঙা ফুলের কলি গ
> সাঁঝে ফুটে সকালে যায় ঝরি।

কিংবা,

> দিনা চারি, ধনি ভবেরই বাজার গ,

তখন এর ভাব এবং ভাষা, এর উপমা এবং রূপক সরাসরি সাধারণ নিরক্ষর মানুষের হৃদয়ের অনুভবের মূলে গিয়ে নাড়া দিতে সমর্থ হয়। তাই এখানকার বিভিন্ন গানে যে-ধর্মচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, কিংবা টুয়া (বাউল) গানে যে-

সব রূপকাশ্রয়ী চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, কিংবা মন্ত্রতন্ত্রে যে-সব জাদু-চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে তার সমস্তই জীবনের জারক রসে জারিত হয়ে স্বাভাবিক-ভাবেই লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। চুয়া গান কিংবা মন্ত্রতন্ত্র যদিও মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমিত থাকে তবু তার প্রতি সাধারণ মানুষের এক দুর্নিবার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্রগোষ্ঠির সম্পদ হলেও এগুলোও পটুয়ার গান, সাপুড়ের গানের মতোই ঝাড়খণ্ডের লোক-সংগীতে জাতীয় সম্পদ হিসেবে সঞ্চিত হয়ে আছে।

লোকগীতির একটি বিপুল অংশ জুড়ে আছে প্রেম-ভাবনা। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, যে-কোন দেশের লোকসংগীতের সর্বাধিক ব্যাপক বিষয় হল প্রেম। এইসব প্রেম-সংগীতে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ ইত্যাদির বিচিত্র মনোভাবের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। মিলনের চেয়ে পূর্বরাগ এবং বিরহ যেন বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। এর মধ্যে আবার বিরহই মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। প্রেমের বেদনা, আশাভঙ্গ, উৎকণ্ঠা, বিচ্ছেদ ইত্যাদি এই জাতীয় সংগীতগুলোকে উজ্জ্বল দ্যুতি দান করেছে। প্রেম এমন একটি বিশ্বজনীন অনুভূতি যা অসভ্য বর্বর থেকে শুরু করে সুসভ্য অভিজাত সমাজের লোকের হৃদয়ে একই ধরনের মধুর স্পন্দন সৃষ্টি করে থাকে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আপেক্ষিকতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকগীতিতে প্রেমের প্রকাশ ভাষায় এবং ভঙ্গিতে পৃথক মনে হতে পারে কিন্তু ভাব এবং অনুভবে কোন পার্থক্য থাকে না। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমসংগীত সমতল বাঙলাতেও আছে, আবার ঝাড়খণ্ডেও আছে। তবে ঝাড়খণ্ডের লোক-গীতিতে লৌকিক প্রেমেরই প্রাধান্য। যেখানে রাধাকৃষ্ণের নাম ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানেও তা লৌকিক নায়ক-নায়িকার নামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। একমাত্র ঝুমুরে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমসংগীতে বৈষ্ণব পদাবলীর কিছুটা উত্তরাধিকার অনুভব করা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের অনু-প্রবেশের ফলে লৌকিক প্রেমের আবহে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান রচিত হয়েছে। অন্যথা ঝুমুরেও রাধাকৃষ্ণের যে-প্রেমের কথা বলা হয়েছে, তা স্বীকার করে নিতে হলে গোঁড়া বৈষ্ণবের হৃদকম্প উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। এখানকার প্রেম-ভাবনা এখনো সেই আদিম যুগের দেহজ প্রেমের পরিমণ্ডল ছেড়ে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেনি।

ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে কৃষি-ভাবনাও বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। কোমবদ্ধ

জীবনে সামুহিক অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য শস্যের প্রয়োজন ছিল। তাই বিভিন্ন পূজা-উৎসব, জাদু-আচার, লোকগীতি সর্বত্রই এই শস্যের কামনা স্থান পেয়েছে। শস্যের জন্য বৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। এ সবের জন্য আনন্দ-উচ্ছ্বাস যেমন গানে আছে, তেমনি কাতর আর্তনাদও আছে। অস্তিত্ব রক্ষার আদিম আগ্রহের মূলে এই শস্য ও সন্তান কামনা ছিল। তাই এগুলোকে সাধারণ মানুষ লোকগীতির রূপ দান করে হৃদয়ের কামনা-বাসনাকে অবারিত করে দিতে পারত। লোকগীতির সৃষ্টির মূলে হয়তো এই বাসনাই ছিল। পরবর্তীকালে নিজেদের কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধকে বাণীরূপ দেবার জন্য লোক-গীতিকে তার মাধ্যম করে থাকবে। মেলা, উৎসব বা পূজাপার্বণকে কেন্দ্র করে লোকগীতি এক বিপুল আনন্দরসের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। লোক-গীতি মন্ত্রাচারের মতো গতানুগতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ না থেকে আলোকিত মুক্ত-প্রাঙ্গন রচনা করে এক আনন্দলোক সৃষ্টি করেছিল. যা ক্রমবিকাশের পথে বর্তমানের লোকগীতির ভূমিকা নিতে পেরেছে। একদা যে-লোকগীতি কৃষিকেন্দ্রিক লোক-উৎসবের অঙ্গনে নৃত্যসহ বিকশিত হয়ে উঠেছিল, বর্তমানেও সেই সব কৃষি-উৎসব থাকলেও লোকগীতির মধ্যে কৃষি-ভাবনার চেয়ে আনন্দ-ভাবনাই যেন বেশী গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা লাভ করেছে।

আমরা ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে করে আলোচনার প্রস্তাব রেখেছি :

১. ঋতু-উৎসব এবং নৃত্য-সম্পর্কিত সংগীত : ঋতু-উৎসব আসলে কৃষি-উৎসব। নৃত্য তার অনুষংগ। বলাবাহুল্য, এইসব উৎসব এবং নৃত্যের মাধ্যমে শস্য এবং সন্তান কামনাই ব্যক্ত হয়েছে। গানগুলো যেন অই কামনার বাণীরূপ। এর মধ্যে জাদু-ক্রিয়াও যে নিভৃতে সংগুপ্ত রয়েছে, তা আমরা পরবর্তী আলোচনায় বিশদভাবে দেখাতে চেষ্টা করব। আমরা এই করম নাচের গান (পাঁতাশালিয়া, দাঁড় শালিয়া, পাঁতা নাচের গান), জাওয়া গীত, আহীরা গান, টুসু গীত, ছো নাচের গান ইত্যাদিকে এই শ্রেণীভূক্ত করেছি।

২. সামাজিক এবং আচারধর্মী অনুষ্ঠানের গান : এই সব গান মূলতঃ আচারধর্মী, ব্যবহারিক। তাই গানের ভাষায় কোথাও কোথাও রক্ষণ-শীলতা দৃষ্টিগোচর হয়। বিয়ের গান, রুমুজ (ভাউ) গান, মন্ত্র গান, সাথী গান এই শ্রেণীভুক্ত।

৩. ধর্মাচার এবং পূজানুষ্ঠান সম্পর্কিত গান : লৌকিক ধর্মাচার বা পূজানুষ্ঠানে এই সব গান গীত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে আছে মাহ্‌রা বা ধরমপূজার গান, ঢুয়া গান ইত্যাদি।

৪. সর্ব ঋতু এবং কালের গান : এই সব গানের সাথে সামাজিক, ব্যবহারিক, ধর্মীয়, ঋতুগত বা আচারগত কোন অনুষ্ঠান জড়িত থাকে না। দিনক্ষণ বা সময়-সীমানা দিয়ে এই সব গানকে সংকীর্ণ করে তোলা হয় নি। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই এসব গান সব ঋতুতে গেয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এসব গান মূলতঃ প্রেমসংগীত। এই বিভাগটিকে প্রেমসংগীত নামে চিহ্নিত করলেও কিছু ভুল হবে না। আমরা ঝুমুর, ভাদরিয়া, উদয়া বা টাঁড় ঝুমুর বা কবিগানকে এই শ্রেণীভুক্ত করেছি।

৫. জীবিকাশ্রয়ী গান : জীবিকার্জনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এসব গান গেয়ে থাকে। বাঁদর নাচের গান, সাপুড়েদের গান, পুতুল নাচের গান, এই শ্রেণীভুক্ত। পটগানকে ও এই শ্রেণী ভুক্ত করা যায়। কেননা পটুয়ারা পট দেখিয়ে এবং গান গেয়ে ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে উদরান্ন সংগ্রহ করে থাকে।

ঋতু-উৎসবে ও নৃত্যরঙ্গে লোকসংগীত

ঝাড়খণ্ডের লোকসংগীত বিভিন্ন ঋতু-উৎসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ঋতু-উৎসব মূলতঃ কৃষি কেন্দ্রিক। আসলে ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি উৎসব কৃষি-কেন্দ্রিক। আমরা আগেই বলেছি, আদিম শ্রেণীহীন কোমসমাজে গোষ্ঠী-বদ্ধতাই জনতার পরিচয় বহন করত। তখন তাদের মধ্যে শস্য ও সন্তান-কামনা, প্রধানতঃ এই দু'টি কামনাই প্রকাশ পেত। বিভিন্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে আদিম কোমবদ্ধ জনতা শস্যের কামনা যেমন করত, তেমনি সন্তানেরও। শস্য এবং সন্তান দু'টোই আত্মসংরক্ষণের মূল বস্তু। তাই ঝাড়খণ্ডী জনতার মধ্যে এখনো প্রাচীন কোমজীবনের শস্য ও সন্তান কামনা ছাড়া অন্য কোন কামনাই নেই।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সুসমঞ্জস পরিণতি হচ্ছে শস্য। প্রকৃতির

মধ্যে যে-বৈচিত্র্য তা শস্যোৎপাদনে যেমন সাহায্য করে, তেমনি ক্ষতিও করে। শস্যের জন্য বসুন্ধরার অকৃপণ দাক্ষিণ্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বৃষ্টির উদার করুণা। এই দু'য়ের সমন্বয়ে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে। আত্মসংরক্ষণের উপকরণ এই ফসলের জন্য কতো না উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান। তাই শস্যের বপনের সময় থেকে আরম্ভ করে শস্য তুলে গোলাজাত করা পর্যন্ত ঋতু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বিচিত্র সব উৎসবেরও অনুষ্ঠান করা হয়। এই সব উৎসবে কখনো ভালো চারার জন্য, কখনো চারাগাছের বৃদ্ধির জন্য, কখনো বৃষ্টির জন্য, কখনো প্রচুর ফসলের ফলনের জন্য, আবার কখনো-বা নতুন ফসলের জন্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। নিছক সৌন্দর্যবোধ, কল্পনা কিংবা আনন্দের জন্য এইসব উৎসবের সূত্রপাত হয় নি। ও-সব উন্নততর মানসিকতার পরিচয়। আদিম মানুষের কাছে আত্মসংরক্ষণের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন ছিল না। এখনো ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে এর চেয়ে বড়ো প্রয়োজন কিছু নেই। কৃষি-উৎসবের প্রত্যক্ষ রূপটি বর্তমানে অবলুপ্ত হলেও পূজাপদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠানে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। ঝাড়খণ্ডী জনতা বর্তমানে কৃষি-উৎসব সম্পর্কে খুব একটা সচেতন না থাকলেও কিংবা পূজা-পদ্ধতি বা আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা না করলেও পূজার রীতি-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান যথারীতি গতানুগতিকভাবে পালন করে চলেছে। লোকগীতি যদিও বর্তমানে আনন্দরস বিতরণ করছে, তবু অতীতে যে এগুলো জাদুক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হত, তাতে সন্দেহ নেই। শস্যোৎসবকে কেন্দ্র করে একদা যে-সব লোকসংগীত রচিত হয়েছিল, আজ তা লোক-জীবনকে আনন্দরসে সম্পৃক্ত করে তুলেছে। অথচ এই সব গানে এখনো সেই আদিম দু'টি কামনা বারে-বারে উচ্চারিত হচ্ছে বিচিত্র রূপ এবং রসের মধ্য দিয়ে। এই অধ্যায়ে আলোচিতব্য সব শ্রেণীর গানেই আদিম কামনা-বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। ঋতু-সম্ভোগের প্রবল ইচ্ছার চেয়ে এই সব গানে একান্তভাবে জীবনসম্পর্কিত ভাব-ভাবনা, চাওয়া-পাওয়ার কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

এই সব ঋতু-উৎসবের অন্ততঃ কয়েকটি সম্পূর্ণতঃ কুমারী কন্যাদের উৎসব। তাদের নৃত্যগীত এবং কিছু পূজা-আচার এই সব ঋতু-উৎসব বা কৃষি-উৎসবের মূল উপকরণ। কুমারী কন্যাদের সাধারণতঃ উর্বরতাবাদের সঙ্গে জড়িত করা হয়। আদিম মানুষের সাধারণ বিশ্বাস হল, কুমারী

কন্যাদের মধ্যে প্রজনন-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। তাদের মধ্যে শস্য-উৎপাদন প্রজনন-ক্রিয়া ইত্যাদি উর্বরতাবাদের বিশিষ্ট গুণগুলো সংগুপ্ত থাকে। স্বভাবতঃই বিভিন্ন কৃষি-উৎসবের সঙ্গে কুমারী কন্যাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

জেমস ফ্রেজারের মতে, আদিম বিশ্বাস অনুসারে জাদু-ক্রিয়া সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করত। এই জাদু-ক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে যে-বিশ্বাসটি স্থান পেত, তা হল, প্রার্থিত কামনার রূপায়ণের জন্য বিশ্বস্তভাবে কিছু আচার-অনুষ্ঠানকে অনুকরণ করলেই প্রার্থিত কামনাকে রূপায়িত করা সম্ভব। ঋতুচক্রে পালা-বদল, অঙ্কুরোদ্গম, লতা-গুল্ম-ওষধি বৃক্ষের জন্ম এবং মৃত্যু, সব কিছুকে আদিম মানুষ কোন অপদেবতা বা দেবতার জীবন কাহিনীর বিভিন্ন অধ্যায় বলে মনে করত। তারা বিশ্বাস করত, জাদু-ক্রিয়াগুলো নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে পারলে যথাসময়ে বৃষ্টি এবং রৌদ্রের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলা যায়, যার ফলে দেবতার জীবনধারাকে সজীব চঞ্চল করে মানুষের কামনা-বাসনার উপযোগী করে নেওয়া সম্ভব। আর এখান থেকেই প্রকৃতি দেবতার জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি জটিল আচারগত বিশ্বাসের জন্ম হয়। ঝাড়খণ্ডেও এই লোকবিশ্বাস বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবের মধ্য দিয়ে আজো রূপায়িত হয়ে চলেছে। কোথাও তা নিষ্প্রাণ কিছু আচার পদ্ধতিতে পর্যবসিত, কোথাও বা তা সমষ্টিগত নৃত্যে-গীতে চঞ্চল এবং সজীব।

পয়লা মাঘে ঝাড়খণ্ডে যে-কৃষি বর্ষের সূত্রপাত, সে-অনুসারে ঝাড়খণ্ডের উৎসব-পরিক্রমায় প্রথমেই ভক্তা পরব (চড়ক পূজো) দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। বৈশাখে বর্ষ আরম্ভ ধরে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করব। প্রথম লোক উৎসব 'রোহিন'। রোহিনে উৎসব আছে কিন্তু সমষ্টিগত কোন নৃত্যগীত নেই, যা আছে তা হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ মন্ত্রগান। বলাবাহুল্য, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে মন্ত্রগান সীমাবদ্ধ থাকলেও তা সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত। সমষ্টিগত লোকসংগীত নয় বলে একে ঋতু-উৎসবসম্পর্কিত গান হিসেবে গণনা করা সংগত মনে করিনি, পরিবর্তে একে আচারঅনুষ্ঠান-সম্পর্কিত গানের শ্রেণীতে রেখেছি। এর পরের কৃষি উৎসব হল রজঃস্বলা, অম্বুবাচী, গমা (রাখী পূর্ণিমা), চিত অমাবস্যা, মনসা পূজা। এক মনসা পূজা ছাড়া অন্য উৎসবে কোন নৃত্যগীত চল নেই। মনসা পূজার সময় সাথীগান শোনা যায়। এর সঙ্গে কিন্তু কোনরকম নৃত্য প্রচলিত নেই। এগুলোও সীমিত সংখ্যক লোকের

মধ্যে প্রচলিত বলে এগুলোকেও আচারঅনুষ্ঠান-সম্পর্কিত গানের শ্রেণীতে 'রেখেছি। এর পরের কৃষি-উৎসব হল ভাদ্র একাদশীতে করম পরব। বহু ব্যাপক লোক- উৎসব হিসেবে করম পরব সর্বজনীন। করম পূজাকে কেন্দ্র করে করম নাচ এবং গানে সারা ঝাড়খণ্ড মুখর হয়ে ওঠে। এই করম পরবের সময়ই কুমারী মেয়েদের জাওয়া পরব অনুষ্ঠিত হয়, যার অনুষঙ্গ হল জাওয়া গান ও নাচ। এর পর ভাদ্র সংক্রান্তিতে ভাদু পরব। ভাদুগান এর মুখ্য অঙ্গ। এটিও কুমারী মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি উৎসব। এর পর ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উৎসব কার্তিক অমাবস্যায় বাঁধনা পরব; আহীরা গান এই উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঝাড়খণ্ডের জাতীয় উৎসব বা শ্রেষ্ঠ উৎসব হল টুসু পরব বা পৌষ পরব। এটিও কুমারী কন্যাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কৃষিব্রত-মূলক একটি উৎসব। অবশ্য এই ব্রতের পেছনে কোন কাহিনী নেই। পূজার আচার-অনুষ্ঠান কিছু আছে আর আছে গান, অসংখ্য, অজস্র গান; জীবনরসে সমৃদ্ধ ব্যাপক বিপুল অভিজ্ঞতার কাহিনী সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে কি পরিমাণ জীবন্ত, অর্থবহ, হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে, তা আপামর জনসাধারণের ওপর এই গানের জাদু-প্রভাব থেকেই অনুমান করা যায়। সর্বশেষে 'ভক্তা' পরবে অনুষ্ঠিত ছো নাচ এবং তার গান। যদিও এই নাচ এবং গান আচারমূলক, কয়েকজন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীই এর ধারক ও বাহক, তবু আমরা এ গানকে কৃষি উৎসব এবং নৃত্যসম্পর্কিত অধ্যায়ে সংযোজন করেছি এই কারণে যে এর মধ্যে কৃষি-ভাবনা যেমন আছে, তেমনি নৃত্যও আছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা করম নাচের গান, জাওয়া গান, ভাদু গান, আহীরা গান, টুসু গান, ছো নাচের গান আদি সম্পর্কে আলোচনা করব।

বিভিন্ন প্রকারের লোকগীতির আলোচনার পূর্বে লোকগীতি ও নৃত্যের সম্পর্ক নিয়ে দু'চার কথা বলা দরকার। আদিম শ্রেণীহীন সমাজে সব কিছু যৌথভাবে বা কৌমবদ্ধভাবে সম্পন্ন করা হত। ব্যক্তির কোন মৌলিক অধিকার ছিল না, ব্যক্তির অস্তিত্ব অপেক্ষা সমষ্টির অস্তিত্বই সর্বাগ্রে বিচার্য ছিল। আমরা আগেই বলেছি, সৌন্দর্যভাবনা কিংবা শিল্পাদর্শ লোকগীতি-সৃষ্টির মূলে ছিল না। নিছক প্রয়োজনেই লোকগীতির সৃষ্টি। কোন লোকগীতির একক স্রষ্টা থাকলেও সমষ্টির প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা হত বলে সমষ্টিগত ভাবে আদিম জনতাকেই স্রষ্টা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। লোকগীতি খুব কম ক্ষেত্রেই এককভাবে গীত হত। আসলে, লোকগীতি যৌথসংগীত।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে কৃষির উৎপাদন অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে আদিম মানুষের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয়ে যেত। সমস্ত শ্রম-প্রচেষ্টায় তাই যৌথভাবে অগ্রসর হতে হত। ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কোন জিনিস ছিল না। যৌথ মালিকানার মধ্যে যৌথপ্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দেবতা অপদেবতার রোষ ইত্যাদি থেকে শস্যকে বাঁচানোর জন্য, প্রচুর শস্যের ফলনের জন্য, শস্যক্ষেত্রের উর্বরতা বাড়াবার জন্য সেদিন তাদের অলৌকিক জাদুক্রিয়াকে আশ্রয় করতে হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই সময়ই যৌথসংগীত এবং যৌথনৃত্য জাদুক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, বিশেষ ধরনের সংগীত বা নৃত্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় (অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি) বা অপ-দেবতার হাত থেকে শস্যকে রক্ষা, শস্যের দ্রুত বৃদ্ধি এবং ফলন বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে তাদের সাহায্য করতে পারে। এই আদিম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে সেদিন যে সংগীত ও নৃত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আদিম মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল, ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে আজো তার প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ঋতু বদলের ফাঁকে-ফাঁকে বিভিন্ন শস্য-উৎসবে নৃত্যগীত সমানে আজো সেই অলৌকিক জাদুক্রিয়ার পরম্পরাকে বহন করে চলেছে। নৃত্যগীতকে জাদুক্রিয়ার আচারঅনুষ্ঠান বলা যেতে পারে। এগুলোকে আচার-নাটক বা Ritual drama ধরা যেতে পারে। Ritual drama সম্পর্কে লুইস স্পেন্স যে-কথা বলেছেন, তা এখানে বিচার্য: আচার-নাটকে দেবতারা কিভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি করেন, জনতার সৃষ্টি করেন এবং পৃথিবীকে শিকার ও শস্যে ভরে তোলেন সেই সব কাহিনী রূপকের আশ্রয়ে বিবৃত করা হয়। These plays or mysteries were repeated at the appropriate seasons when they were thought neccessary for the quickening of those processes of nature which replenished the stock of game and caused the seed to grow. By the acts of imitative or symbolic magic rehearsed in them the gods of nature were believed to be roused to action beneficial to man.[১] অন্যকথায়, এই সব নাটক নির্দিষ্ট ঋতুতে আবৃত্তি করা হত। ভাবা হত যে এর ফলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন আনা

---

১. The Outlines of Mythology—Lewis Spence, Premier Books 1961, P. 47.

সম্ভবপর, যার ফলে প্রচুর শিকার পাওয়া যাবে এবং অঙ্কুরোদ্গম হয়ে শস্যবৃদ্ধি ঘটবে। দেবতাদের কর্মকাণ্ডের অনুকরণ অথবা প্রতীকাশ্রয়ী ম্যাজিকের মহড়ার সাহায্যে দেবতাদের কর্মোদ্যোগী করে তুলতে পারলে দেবতার ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে মানবসমাজ উপকৃত হবার সুযোগ পাবে বলে তারা বিশ্বাস করত। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবে শস্যোৎপাদনকে কেন্দ্র করে যে সব নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান, আমাদের মনে হয়, তার লক্ষ্যও একই। দেবতাদের সন্তুষ্ট করে শস্যোৎপাদনে সাহায্য লাভের জন্যই এই নৃত্যগীতের জাদুক্রিয়া।

ডঃ সুধীরকুমার করণ বলেন, 'এই অঞ্চলে যে ধরনের যৌথনৃত্য আছে তা শিল্পচর্চার অবকাশের মধ্যে সুপরিকল্পিত নয়; তার মধ্যে সহজ প্রচেষ্টার এবং সহজ স্ফূর্তির এক অস্পষ্ট চেতনা এবং এর মধ্যেও কৃষিকার্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই ঋতু হিসাবে নাচ এবং গান পরিবর্তিত হয়।'[২] তিনিও স্বীকার করেছেন, পুরোপুরি না হলেও এর মধ্যে কৃষিকার্য-সম্পর্কিত আদিম জাদু বিশ্বাস যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আদিম সমাজে যৌথসংগীত এবং যৌথনৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। নৃত্য-গীতকে আলাদাভাবে কল্পনাও করা যেত না। আদিম কৌমজীবনের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ প্রকাশ পেত সংগীতে এবং নৃত্যের ভঙ্গিমায় তাকে শারীরী রূপ দিয়ে প্রত্যক্ষ করে তোলা হত। শুধু নৃত্যকে জাদু-ক্রিয়ার আচার হিসেবে ধরলে ভুল করা হবে, সংগীতও একই জাদু-ক্রিয়ার আচার ছিল। আচার-নাটকে যেমন শুধু কথাগুলো আবৃত্তি করলেই চলে না, অঙ্গভঙ্গি সহকারে তার অভিনয়ও প্রয়োজন। কথা এবং শারীরিক ভঙ্গিমা একীকরণ হলেই অভীষ্ট কামনা সফল হতে পারে; প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শস্যোৎপাদন এই দু'য়ের একীকরণের মধ্য দিয়েই প্রভাবিত হতে পারে। ঝাড়খণ্ডে আচার-নাটকের প্রচলন না-থাকলেও গীত-নৃত্যের প্রচলন আছে। তবে সব গানেই যে নৃত্য থাকে, এমন কথা নয়। বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিতব্য আহীরা, টুসু আদি গানে নৃত্যের প্রচলন দেখা যায় না।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'যে সকল লোকনৃত্যের উদ্ভবের মূলে কোন ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য কিংবা অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাহাই প্রধানতঃ

২ সীমান্ত বাঙলার লোকযান—ডঃ সুধীরকুমার করণ, পৃষ্ঠা ২০৭

সঙ্গীতবিবর্জিত হয়, নতুবা লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সহিত সঙ্গীত যুক্ত থাকিবেই।'[৩] আমাদের মনে হয় ডঃ ভট্টাচার্যের এই বক্তব্যে বিতর্কের অবকাশ আছে। করম নাচ ও জাওয়া নাচে পুরোপুরি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া এবং অলৌকিক বিশ্বাস বর্তমান আছে বলে আমরা মনে করি। এর মধ্যে ধান্যরোপণের উপযোগী জমি প্রস্তুত, ধান্যরোপণ, ধান্যচ্ছেদন আদির ভঙ্গিমা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। শরৎচন্দ্র রায়, ডাল্টন আদির মতে এই নৃত্য-ভঙ্গিমার মধ্যে কৃষি-উৎসবের অবশেষ বর্তমান ; প্রচুর শস্য কামনার ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্যও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অথচ এই নাচগুলো সংগীত-বর্জিত নয়, বরং প্রাণরসে পরিপূর্ণ আদিম অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সাবলীল সংগীতে মুখর হয়ে ওঠে নৃত্যের আসর। কিছুটা উচ্চাঙ্গের নৃত্য কাঠি নাচ ও ছো নাচও সংগীত-বর্জিত নয়, বলাবাহুল্য, এ গুলোর মধ্যেও ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য ও অলৌকিকতা বর্তমান। তাই লোকনৃত্যের উদ্ভবের মূলে ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য কিংবা অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস থাকলেই যে তা সংগীত-বর্জিত হবেই এমন কোন কথা নেই।

সব সংগীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে নৃত্য জড়িত না থাকলেও সংগীত-বর্জিত নৃত্য ঝাড়খণ্ডে লক্ষ্য করা যায় না। যে কয়েক প্রকারের নৃত্য প্রচলিত আছে, সেগুলো হল : করম নাচ, জাওয়া নাচ, কাঠি নাচ এবং ছো নাচ। করম নাচের অনেক ক'টি আঞ্চলিক নাম আছে : দাঁড় নাচ, পাঁতা নাচ, ঝুমুর নাচ। বলাবাহুল্য, প্রতিটি নাচের সঙ্গে অনিবার্যতঃ লোকগীতি গাওয়া হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে, লোকনৃত্য সব সময়েই লোকগীতির অনুসারী। ঝাড়খণ্ডে নৃত্য মানেই যৌথনৃত্য। একক নৃত্য একমাত্র ছো নাচে দেখা যায়, তা'ও এ-ধরনের নৃত্য বিরল বললেই চলে।

৩. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃ ৪৪

॥ এক ॥

করম নাচের গান

করম নাচের গান বিভিন্ন নামে পরিচিত। দাঁড়শা'ল, দাঁড়শাল্যা, দাঁড় ঝুমুর, দাঁড়গীত, পাঁতাশাল্যা, ঝিঙাফুল্যা, পাঁতা নাচের গান—একই গানের নানান নাম। প্রথম চারটি নামে 'দাঁড়' শব্দটি আদিতে সাধারণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'দণ্ড' শব্দ থেকে 'দাঁড়' শব্দের উদ্ভব, দণ্ডায়মান অবস্থায় যে-নৃত্য তার নাম দাঁড় নাচ; তার সঙ্গে যে-লোকগীতির সম্পর্ক তা স্বাভাবিক-ভাবেই স্থানভেদে প্রথমোক্ত চারটি নামে পরিচিত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের কোথাও কোথাও ঝুমুর শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই দাঁড় নাচের গান দাঁড় ঝুমুর নামেও পরিচিত। কোথাও কোথাও এই নাচ 'দেঁউড়া', বা 'দঁউড়া' নামেও পরিচিত। করম নাচ শ্লথ এবং দ্রুত উভয় গতিরই হয়ে থাকে। তবে দ্রুতগতির প্রাধান্যই বেশী। সম্প্রদায় বিশেষে এই নাচে যথেষ্ট তারতম্য আছে। খাড়িয়াদের করম নাচের গান যেমন অত্যন্ত দ্রুত লয়ের হয়ে থাকে, তেমনি তাদের নাচও। এক আদিম উদ্দামতা এবং উল্লাস যেন তাদের নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ-নৃত্য প্রায় দৌড়ানোর পর্যায়েই পড়ে। আমাদের মনে হয় 'দেঁউড়া' বা 'দউড়া' নামের উদ্ভব এই নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দ্রুতগতির মধ্যেই নিহিত আছে।

করম নাচের গানের 'ঝিঙা ফুল্যা' নামটির মধ্যেই তার নামকরণের ইতিহাস সংগুপ্ত আছে। এ-ফুল সন্ধ্যেবেলা ফোটে এবং সকালবেলা ঝরে যায়, অর্থাৎ একান্ত স্বল্পকালীন আয়ু। ('মানুষ জনম ঝিঙা ফুলের কলি। সাঁঝে ফুটে সকালে যায় ঝরি।') করম নাচের গানগুলো আকারে যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি গায়ন-কালও সীমিত। এই গানে ঝাড়খণ্ড যেন তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে। এক কলি, দু'কলির গান, একবার দু'বার আবৃত্তির পরই শেষ হয়, আরম্ভ হয় নতুন গান। এ গানের শেষ নেই, উদ্দাম নৃত্যেরও শেষ নেই। অক্লান্ত অশ্রান্ত নৃত্যগীতের আসর সারা রাত্রি জমজমাট হয়ে থাকে। এ সব গানে ঝাড়খণ্ডের মানুষের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু থেকে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধিও স্থান পেয়ে থাকে।

'পাঁতাশাল্যা' নামটি খুব সম্ভবতঃ করম নাচের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পংক্তি

নৃত্য থেকে এসেছে। পরস্পর হাত ধরাধরি করে একটি অখণ্ড নিটোল পংক্তিতে চক্রাকারে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমাদের বিশ্বাস, পাঁতাশাল্যা নাচ বা পাঁতা নাচ নাম দু'টি এই কারণেই এসেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'পাঁতা' শব্দটি ব্যবহার না করে 'পাতা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমি সর্বত্রই শব্দটিকে 'পাঁতা' উচ্চারণে শুনেছি, অন্ততঃ ঝাড়খণ্ডী উপভাষা-ভাষী আদিম জনতার মুখে। ডঃ ভট্টাচার্য এই নৃত্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই অঞ্চলের আর এক শ্রেণীর নৃত্যের নাম পাতা নাচ। স্ত্রীপুরুষ উভয়ই ইহাতে মিলিত-ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য হইতেই একদিন আদিবাসীর সমাজজীবনের সখা কিংবা সখীত্ব পাতানো হইত, অর্থাৎ স্বামীস্ত্রী নির্বাচন করা হইত বলিয়া ইহাকে পাতা নাচ বলে। করম উৎসব উপলক্ষ্যে পাতাশুদ্ধ ডালকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্য হয় বলিয়াও ইহার নাম পাতা নাচ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তবে কেবলমাত্র করম উৎসব উপলক্ষ্যেই যে এই গান গাওয়া হয়, তাহা নহে—অন্যান্য উৎসবেও পাতা নাচের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আদিবাসীর সমাজ হইতেই ইহা হিন্দুভাবাপন্ন সমাজে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছে।'[১] এর মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিতর্কিত ব্যাপার উত্থাপিত হয়েছে। প্রথমতঃ সামাজিক সখা বা সখীত্ব পাতানোর অনুষ্ঠান হিসেবে এর নাম পাতা নাচ ; দ্বিতীয়তঃ পাতাশুদ্ধ করম ডালের জন্য পাতা নাচ নাম ; তৃতীয়তঃ এ নৃত্য শুধুমাত্র করম উৎসব-কেন্দ্রিক নয় ; চতুর্থতঃ আদিবাসী সমাজ থেকে হিন্দুভাবাপন্ন সমাজে এর বিস্তার। আমরা করম নাচের মধ্যে পাঁতা নাচ, দাঁড় নাচ আদি শ্রাবণ-ভাদ্রে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নামের নৃত্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। করম উৎসবকে কেন্দ্র করে যে নৃত্য, তা করম নৃত্যই। ভাদ্রের একাদশীতে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও এর আয়োজন চলতে থাকে সুদীর্ঘ কাল ধরে। নৃত্যের আসর বসে প্রতি সন্ধ্যায় শ্রাবণ মাস থেকেই, চলে মাঝরাত্রি অবধি। আমরা আগেই আলোচনা করে দেখিয়েছি, ঝাড়খণ্ডে নৃত্যগীত ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য এবং অলৌকিক বিশ্বাসকে ত্বরান্বিত করবার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। করম উৎসব-কেন্দ্রিক এই নাচ ধান্যরোপণ থেকে শুরু করে ধান্যচ্ছেদন পর্যন্ত অর্থাৎ শ্রাবণ থেকে শুরু করে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সময়টা জমিতে শস্যোৎপাদনের সময়। বৃষ্টি,

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য়, পৃ ২০৫-২০৬

রৌদ্র যেমন চাই, তেমনি অপদেবতার হাত থেকে শস্যকে রক্ষাও করা চাই। তাই এই দীর্ঘকাল ধরে নৃত্যের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে জাদুক্রিয়া প্রকাশ করা হয়ে থাকে। করম-উৎসবের অনুষ্ঠান-সীমাকালও সুদীর্ঘ। ভাদ্র একাদশী থেকে আরম্ভ করে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা পর্যন্ত করম ডাল পুঁতে করম ঠাকুরের পূজো করা হয় এবং নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই এই নৃত্য শুধু করম উৎসবের নয় বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। একমাত্র 'জিতিয়া' বা 'জিতা' যা করমেরই স্বগোত্র, তাতেও এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। 'করমগাড়া' ও 'জিতিয়াগাড়া' দু'টি উৎসব সম্পর্কেই বলা হয়ে থাকে। দুটোই কৃষি উৎসব; একটায় শস্য-কামনা, অন্যটায় সন্তান-কামনা, প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই নৃত্যে পুরুষ-নারী উভয়েই যোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন সম্প্রদায়ের নারীদের এই নৃত্যে পুরুষের সঙ্গে একত্রে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। কুর্মি (মাহাত) নারী সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত। ডঃ ভট্টাচার্য হয়তো 'হিন্দুভাবাপন্ন' বলতে কুর্মিদের কথাই বলতে চেয়েছেন। কুর্মি-মাহাতদের সম্পর্কে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। কুর্মিরা এখানকার আদিম সন্তানদের অন্যতম, অন্য কথায় তারাও একদা আদিবাসীই ছিল। এই অবস্থায় আদিবাসী সমাজ থেকে তাদের মধ্যে করম নাচ কিংবা গান আসেনি, তা তাদের পরম্পরাগত ঐতিহ্য। আদিবাসী বলতে যদি তিনি সাঁওতালদের বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বক্তব্য এ নৃত্য সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত নেই। এ নৃত্য মাহাত-ভূমিজ-মুণ্ডা-খাড়িয়া-লোধা-কামার-কুমোর-বাগালদের মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ।

অতঃপর 'পাতা' নাচ সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। আগেই বলা হয়েছে, পংক্তি শব্দ থেকেই 'পাঁতা' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় 'পাঁতা' অর্থে পংক্তিই বুঝিয়ে থাকে। ডঃ সুধীর করণও একে পাঁতা নাচ বলেই উল্লেখ করেছেন।[২] সখা-সখীত্ব পাতানো থেকে কিংবা পাতাশুদ্ধ করম ডাল থেকে 'পাতা' শব্দের উদ্ভব কল্পনাকে কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। তাছাড়া শব্দটি 'পাতা' নয় 'পাঁতা'। যদি ধরে নেওয়া যায়, শব্দটি সাঁওতালী ভাষা থেকে এসেছে, তাহলে অবশ্য 'পাতা' শব্দটি গ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, সাঁওতালদের মধ্যে পাঁতা নাচ নেই, যা করমকেন্দ্রিক।

২. সীমান্ত বাঙলার লোকযান, পৃ ১১২

ওদের মধ্যে আছে 'পাতা' নাচ, যা একান্তভাবে মেলা বা উৎসবকেন্দ্রিক। 'পাতা'র অর্থ সাঁওতালী ভাষায় মেলা বা পরব। ডঃ সুধীর করণ সাঁওতালী নাচকে পাতা এবং পাঁতা উভয় শব্দ দিয়েই চিহ্নিত করেছেন, যা একান্ত বিভ্রান্তিকর।[৩] পাতা নাচও পংক্তি নৃত্য হলেও পাঁতা শব্দ বা নাচের সঙ্গে সাঁওতালদের কোন সম্পর্কই নেই। সাঁওতালদের পাতা নাচে অবশ্য ভাবী স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনের অবকাশ থাকে, কিন্তু 'পাতানো' শব্দ থেকে 'পাতা' শব্দের উদ্ভবের মীমাংসা তাতে হয় না। ডঃ করণ করম নাচকে দাঁড় নাচ এবং পাঁতা নাচ নামে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'আগে স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিত-ভাবেই এতে অংশগ্রহণ করতো। ইদানীং বহু ক্ষেত্রে পুরুষরাই সারা রাত ধরে নাচে নারীবিবর্জিত হয়ে।... মোটামুটিভাবে ধরে নিতে হবে যে সীমান্ত বাঙলায় সাঁওতাল ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী ছাড়া অন্য কোন হিন্দুধর্মী উপজাতিদের মেয়েরা নাচের আসরে যোগদান করছে না আজকাল।'[৪] তিনি হিন্দুধর্মী উপজাতি বলতে কুর্মি-মাহাত-বাগাল-কামার-কুমারকেই বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছেন। পাঁতা নাচ-দাঁড় নাচ স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্য বলে স্বীকার করে নিয়েও ডঃ করণ আরো বলেছেন, 'দাঁড়শাল নাচ বা দেঁউড়া নাচ শুধু পুরুষদের নাচ।... পাঁতা নাচে স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে নাচে।'[৫] পরস্পরবিরোধী মন্তব্যগুলো অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর।[৬]

আসলে করম, দাঁড়, পাঁতা একই নাচের বিভিন্ন নাম। এ নাচ স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ। কোথাও এ নাচে নারীর ভূমিকা অস্বীকার করা হয়েছে, কোথাও সনাতন ধারায় অব্যাহত আছে। এ নাচ শুধু করম উৎসবেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যতোদিন মাঠের ফসল ঘরে না আসছে ততোদিন এ নাচ আনন্দ-উল্লাসের অঙ্গ হিসেবে সন্ধ্যেবেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

করম উৎসব ঝাড়খণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শস্যোৎসব। নৃত্য-গীত এর মূল অনুষঙ্গ। নৃত্য-গীত বাদ দিয়ে করম উৎসব বা ব্রতের আয়োজন কল্পনাই করা যায় না। প্রচুর শস্যোৎপাদনের জন্য জাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হত।

৩. প্রাগুক্ত পৃ ২২০
৪. প্রাগুক্ত পৃ ১১২
৫. প্রাগুক্ত পৃ ২৪৮
৬. প্রাগুক্ত পৃ ২২৬

নৃত্য-গীতানুষ্ঠান আসলে জাদুক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। 'পণ্ডিতগণের অভিমত হচ্ছে এই যে নাচ হচ্ছে জীবনসার আহরণ ও সঞ্চার করার একটি পদ্ধতি বিশেষ।'[৭]

ভাদ্রমাসে করম পরবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে সময়টি একটি সন্ধিক্ষণ। একদিকে আউশ ধানের 'লৌতন ভাত' অন্যদিকে 'শোল' বা আমন ধানের রোপণ শেষ। করম পরব শস্যবৃদ্ধির পরব, উর্বরতাবাদের পরব। কেননা এই পরবের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কুমারী কন্যাদের জাওয়া পরব। করম পরবে দু'টি করম ডাল পাশাপাশি পুঁতে পুজো করা হয়। বলা যেতে পারে এযেন করম রাজা ও করম রাণীর বিবাহ অনুষ্ঠান। করম রাজা সূর্য্য আর করম রাণী পৃথিবীর প্রতীক। দু'য়ের পরিণয়ের মধ্য দিয়েই প্রচুর শস্যসম্ভাবনা ত্বরান্বিত হতে পারে। বিভিন্ন শস্যোৎসব সূর্য আর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকারের সংযোগ এবং মিলনের অনুষ্ঠান মাত্র। করম পরবের আচারঅনুষ্ঠান এবং উপকরণগুলোর প্রতি নজর দিলে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সূর্য এবং পৃথিবীর শুধু পরিণয়ই নয়, যৌন মিলনের প্রতীক অনুষ্ঠানও দেখতে পাওয়া যায়। এই উৎসব আদিম কৌমজীবনের শস্য ও সন্তান কামনাকে সফল করে তোলার উৎসব। এই উৎসবের জাদুতন্ত্র হিসেবে যে-নাচ সেই করম নাচের মধ্যেও এই শস্যকামনাই ব্যক্ত হয়ে থাকে। করম নাচে শরীরের যে অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ পায়, তাতে ধান্যরোপনের জন্য মাটি কাদা করা, ধান্যরোপণ, ধান্যচ্ছেদন আদি বিভিন্ন মুদ্রা প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মূলতঃ করম উৎসবকে কেন্দ্র করে যে নাচ তার নাম করম নাচ; এ-নাচের অনুষঙ্গ গান করম নাচের গান। এটাও দেখা গেল যে দাঁড় নাচ, পাঁতা নাচ আদি নামগুলো করম নাচেরই নামান্তর মাত্র; দাঁড়শা'ল, দাঁড়শাল্যা, দাঁড়গীত, দাঁড়-ঝুমুর, ঝিঙাফুল্যা, পাঁতাশাল্যা, পাঁতানাচের গীত, ভাদরিয়া গীত—সমস্তই করম নাচের গানেরই নামমালা মাত্র।

করম নাচের গানের সংখ্যার সীমা-পরিসীমা নেই। হাজারে হাজারে এই সব গান ঝাড়খণ্ডের জনতার চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। ঝাড়খণ্ডে এমন কোন নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ পাওয়া যাবে না, যার কণ্ঠে গান ধ্বনিত না

৭. প্রাগুক্ত পৃ ১১৩

হলেও স্মৃতিতে দু'চারটি করম নাচের গান সঞ্চিত হয়ে নেই। ক্ষণিকের আনন্দে কবিত্বের দোলায় বিদ্যুৎ চমকের মতো এ-গানের সৃষ্টি। এ-গান দুই তিন, চার পাঁচ চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ-গান দু'টি চরণের মধ্যে সীমায়িত হয়ে থাকে। লোকায়ত গান বলতে যা বোঝায় করম নাচের গান সম্পূর্ণতঃ তাই। লোকগীতির চরিত্রধর্মই হল স্বল্পায়তন। অকৃত্রিমতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং প্রত্যক্ষতা—এগানের সর্বাবয়বে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছে। আদিম জীবনের সামগ্রিক রূপ এর গঠনে এবং সুরে চিরকালের জন্য বিধৃত হয়ে আছে। আদিম বৈচিত্র্যহীন সুর যেমন এর অবলম্বন, তেমনি এ-গানের উপজীব্য বিষয়বস্তুও হল আদিম জীবনের শস্য ও সন্তান কামনা। জীবন-ধারণের সমগ্র পরিবেশ-প্রতিবেশ যেমন গানে স্থান পেয়েছে, বংশানুক্রমিক আত্মসংরক্ষণের ভাবনাও তেমনি প্রেম-ভালোবাসা-যৌনতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যারা এ-গানের স্রষ্টা কিংবা যাদের জন্য এ-গান, তারা যেমন অলংকারবর্জিত, অনাড়ম্বর, সহজ সাবলীল জীবনে অভ্যস্ত, তেমনি জীবনের রূপচ্ছবি ধারণ করে আছে নিরলংকার সৌন্দর্যের বাণীমূর্তি এই গানগুলো। করম নাচের গান ঝাড়খণ্ডের মানুষের এতোই আপনার যে সুখে-দুঃখে-বেদনায়, কৃষিকর্মে পথশ্রমে সব সময়ই আনন্দের, সান্ত্বনার উৎসকে মুক্ত করে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। করম নাচের গান তাই শুধু আখড়ায় নয়, শস্যক্ষেত্র, পথে-প্রান্তরে সর্বত্রই গাওয়া হয়ে থাকে। এগান শুধু করম-উৎসব নয়, শস্যোৎপাদনের সমস্ত সময় জুড়ে, সেই অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত, গাওয়া চলে।

করম নাচের গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা অন্যত্র দুর্লভ। আদিম মানুষের প্রাণপ্রবাহের প্রতিটি ধারা যেন এসে মিশেছে এই গানে। সাদামাটা কয়েকটি শব্দ দিয়ে গড়া এক একটি গান। যা কিছু চোখে পড়েছে, যা কিছু মনে পড়েছে, তাৎক্ষণিক অনুভূতির ছোঁয়া লেগে তা গানে পরিণত হয়েছে। অন্যকথায়, বাইরের দৃশ্যপুঞ্জ যেমন গানের বিষয়বস্তু, তেমনি অন্তরের অনুভূতিও। এ-অনুভূতি অমার্জিত, স্থূল ; দৃষ্টিকোণ অনুজ্জ্বল, অপরিশীলিত। তাই চাষ-বাস, ঘরবাড়ি, বনজঙ্গল পাহাড়-ডুংরি, ফল-ফুল, পশু-পাখি, খাদ্য-পানীয়, সামাজিক আচারঅনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ, প্রেম-ভালোবাসা-যৌনতা সবকিছুই যৌথসংগীতের যৌথ-ভাবনায় মিছিলের মতো সমস্ত ব্যক্তিনাম-স্বাতন্ত্র্যকে মুছে দিয়ে এ-গানের মুক্তাঞ্চলকে কলরবে-

কোলাহলে মধুর হাস্য-পরিহাসে মুখর করে রেখেছে। রুচিশীল মানুষের শ্রবণে এ-গান অশ্লীল বলে মনে হলেও অবাক হবার কিছু নেই ; এ-গানের দুর্বার বন্যতা এখানকার মানুষের মানসছবিটিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। ঝাড়-খণ্ডের সমাজজীবনে হিন্দু-প্রভাব পড়লেও এ-সমাজজীবন একান্তভাবে আদি-বাসীদেরই, যাদের মধ্যে এখনো কৌমজীবনের অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের সমাজজীবনে যৌনতা, বন্যতা, নিরাভরণ বাগভঙ্গি কোনটাই বর্জনীয় নয়, বরং তারই মধ্যে তাদের আত্মপরিচয় বিধৃত।

করম নাচের গানের সুবিশাল সংকলন হাতে তুলে দিলেও বুঝি-বা এর উদ্দাম, বন্য, চঞ্চল, অকৃত্রিম প্রাণপ্রবাহকে পাঠকের কাছে পেঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। এর সুর, নাচ, ঢোলধমসা-মাদলের বাজনা মেঘ-সিক্ত আকাশের তলায় এক গ্রাম্য আখড়ার পরিবেশে রাত্রির গহনে মাদকতার কুহকে প্রাগৈ-তিহাসিক যুগের বিস্মৃত দিনগুলোকে পুনর্বার সঞ্জীবিত করে তোলে। সেই অনির্বচনীয় পরিবেশে যিনি এই গান শোনেন নি, তাকে করম নাচের গান যে কি বস্তু তা কিছুতেই বোঝানো সম্ভব নয়।

১. মহলের ভিতরে থাকি জানালায় নয়ন রাখি
আমি শুব জানালার গড়াতে,
খঁচা দিয়ে উঠাবে আমাকে ;

২. তরেই লাগি আনাগনা তরেই লাগি জিহল খানা
তরেই লাগি রাইতে জুমুনা,
মাথার উপর উড়িছে ফুতুনা ;

গান দু'টির রসাস্বাদন শুষ্ক কাগজের পাতায় কি সম্ভব ? এর রসাস্বাদন করতে হলে এক বিচিত্র সিক্ত পরিবেশে আমাদের যেতে হবে। ওপরে মেঘসিক্ত আকাশ, নিচে বৃষ্টিসিক্ত পৃথিবীর আখড়া, মদ-হাঁড়িয়া সিক্ত আদিম জনতার জিহ্বা, উদ্দীপনা-আবেগে সিক্ত চোখ এবং প্রেম-ভালোবাসা-যৌনতায় সিক্ত-মন নিকষ রাত্রির অন্ধকারে এই গানের ভাষা নিঙড়ে যে-পরিমাণ রস প্রবাহের সৃষ্টি করতে পারে, তা সংকলনের পাতা থেকে পাওয়া যায় না।

এবারে করম নাচের গানের বিষয়বৈচিত্র্য এবং রসবৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে হলে ধারাবাহিক আলোচনার প্রয়োজন। আমাদের আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা গানগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে সাজিয়ে নেব। এ-থেকে কেউ যেন মনে না করেন, করম নাচের আসরে এমনিভাবে সাজিয়ে নিয়ে গান গাওয়া

হয়। গীতের আসরে অসংবদ্ধ এলোমেলো ভাবেই সাধারণতঃ গান গাওয়া হয়। আখড়াস্থাপনা কিংবা বন্দনার গান থাকলেও তা যে শুরুতেই গাওয়া হয়ে থাকে, তা নয়। একটি প্রেমের গানের পাশাপাশি বৈরাগ্যের আধ্যাত্মিক গান আসতে পারে, দৈনন্দিন জীবনচর্যার গানের পর মুহূর্তেই চটুল অর্থহীন গান গাওয়া হতে পারে।

৩ করম কাটিকুটি আখড়া থাপনা করি
গপিনী সব করে একাদশী,
আ'জ রে করম ভেল রাতি।
জ্বালি দিহ গ ধনি রেশমের বাতি।

আখড়া সর্বজনীন নৃত্য-গীতের যৌথ পীঠভূমি। আদিম জীবনে আদিবাসী সমাজ যূথবদ্ধভাবে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই সর্বজনীন আখড়ার স্থাপনা এবং বন্দনা প্রাথমিক রীতি ছিল। কেউ কেউ গোপিনীর সন্ধান পেয়েই রাধাকৃষ্ণলীলার সম্ভাব্য প্রভাবের কথা ভাবেন। এ প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের কল্পনা নিতান্তই উদ্ভট কল্পনা। লোককবি সে-অর্থে গোপিণী শব্দের প্রয়োগ করে নি, এখানকার গ্রামের রমণীই তার লক্ষ্য।

৪. আগেতে বন্দনা করি গায়ের গরাম হরি
তা পরে বন্দনা ব্রেজনারী,
ইঙ্গিতে ঝুম'র লাগে ভারী।

অন্যত্র যার বন্দনা প্রথমে করবার অনিবার্য রীতি চল আছে, সেই গণেশ ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে অনুপস্থিত। এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু দুর্গা কালী-ও। লোকায়ত গানে এদের দর্শন পাবার কথাও নয়। লৌকিক গানে গ্রাম-দেবতার কথাই প্রথমে আসা স্বাভাবিক। এখানে হরি এবং ব্রজনারীর মধ্যে রাধা কৃষ্ণের অস্তিত্বের কথা ভাবা যেতে পারে সত্যি, কিন্তু লৌকিকতার কারণে তা মেনে নিতেও দ্বিধা আছে। বৈষ্ণব ধর্মের অনুপ্রবেশের পর দ্বিতীয় পংক্তিটি প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে পারে।

অরণ্য পর্বতময় ঝাড়খণ্ডে চোখ মেললেই বন পাহাড় ডুংরি গাছপালা-ফুলফল-পশুপাখি নজরে পড়ে। তাদের কথাও খুবই নিষ্ঠাসহকারে লোককবি গানের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৫. বাগমুড়ির পাহাড়ে নানা রঙের ফুল ফুটে
দিদি গ, ডাঁটায়ে তুলিতে মন করে।

থঁপা ভরি পর্‌হব খঁচল ভরি তুলব আর ভাঙিব্‌ ফুল ডাল।

দু'হাজার ফুট উঁচু বাঘমুণ্ডি বা অযোধ্যা পাহাড় লোককবির দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করেছে। লোককবিরা স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীরই ছিল। করম নাচ স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্য। তাই নারী-সমাজও এর গান রচনা করেছে। নারীদের সৃষ্ট গানের সংখ্যা পুরুষের গানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। উদ্ধৃত গানটিও যে নারী রচিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৬. উঠিল পুন্নিমার চাঁদ দেশ হলা আল রে
রাজা, এই চাঁদে অযধ্যা শিকার।

আদিম মানুষ শিকার-নির্ভর ছিল। পরবর্তীকালেও বছরের একটি দিন শিকার-উৎসবের দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। রাজা, সামন্ত, ভূস্বামী-রাই এই শিকার-উৎসবের নেতৃত্ব করতেন। অযোধ্যা পাহাড় শিকারের প্রশস্ত অঞ্চল হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

বাঘমুণ্ডির পাহাড় শুধু যে ফুল-ফলের জন্য কিংবা হরিণ-বরাহ-খরগোশ শিকারের জন্যই লোককবির কাছে এতো আকর্ষণীয় তা নয়, এ-পাহাড় জীবনের রসদও জুগিয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডের বিপর্যস্ত অর্থনীতিতে হাসির সঞ্চার করতে পারে লাক্ষার প্রাচুর্য; লাক্ষার কল্যাণে দরিদ্র আদিবাসীদের বেশভূষায় অভাবিত-পূর্ব পরিবর্তন আসতে পারে।

৭. বাগমুড়ির পাহাড়ে লাহার বড চটি রে
লাহার দৌলতে দাদার এড়ি-জ‍ঁখা ধুতি।

বনের বুনো ফুলও লোককবির কাছে সমানভাবে আদরণীয়। গৃহবাসের ফলে আদিম জনতা অরণ্যবাসের যে বন্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, কাষ্ঠ আহরণে কিংবা অন্য কোন কারণে অরণ্যে প্রবেশ করলে তারা সেই জীবনের স্বাদ পুনর্বার পেয়ে থাকে। বিশেষতঃ রমণীসমাজ অরণ্যে গেলেই আত্মহারা হয়ে পড়ে। বুনোফুলের রূপে গন্ধে সমাজের শাসনের বেড়ি যেন খুলে খুলে পড়ে।

৮. বনে সামালি যখন জীবন হারালি তখন
বন ফুলে মন ভুলে, আমাকে ভুলালি তরা কত ছলে।

সে বুনোফুলের গন্ধই বা কি? বনের সীমানা ছাড়িয়ে মাঠ প্রান্তর ভাসিয়ে সে-গন্ধ এসে হানা দেয় গৃহ কোণে-কোণে। রমণী-মন উন্মন হয়ে ওঠে, গন্ধের মাদকতায় চলতে গিয়ে পা টলমল করে।

৯. বনে ফুটিল ফুল গাঁকে আল্য বাস রে
পথে চলিতে মন করে টলমল।

ঝিঙাফুলিয়া গানে ঝিঙে ফুলেরও যে বিশিষ্ট স্থান থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি। ঝিঙে ফুল, যার শুধু হলুদ রঙের বাহার আছে, গন্ধ বলে কিছু নেই, তাকে নিয়ে কাব্য করা বা গান রচনার কথা কি পরিশীলিত মন ভাবতে পারে? লোককবি পারে, কারণ তার কাছে তুচ্ছ বলে কিছু নেই; যা তুচ্ছ তা'ও যেন তার কাছে পরম মূল্যবান বস্তু। ঝিঙে-ফুলের মালার জন্যও তার লোভ। একটি মালার বিনিময়ে একটি চুম্বন দান—এ শুধু অকৃত্রিম প্রাণের রমণীর পক্ষেই বলা সম্ভব।

১০. ঝিঁগা ফুল গাঁথি দে ন মকে,
হাতে ধরি চুম খাব তকে।

'ঝিঁগা ফুল সারি সারি ডাহিন থঁসায়' শুধু শোভাই পায় না, 'দলকারি'-ও দেয় বই কি! সবার ওপর সারি সারি ঝিঙে ফুল দেখে বিরহিনী নায়িকার মনে প্রণয়ীর অভাব যে কি নিদারুণ বাজে, তা'ও লোককবি গানের মধ্যে গভীর নিষ্ঠায় প্রকাশ করেছে।

১১. ঝিঁগা ফুল সারি সারি বঁধু বিনে রইতে নারি
আ'জ বঁধু র'হল কন থানে,
সখি গ, আ'জ আমি র'হব কন থানে।

গ্রামের পথ বা 'কুল্হি' যুবক-যুবতীর ক্ষণিক-দেখা এবং গভীর ইঙ্গিতে সদাচঞ্চলে। গৃহে গুরুজনের ভয়, গ্রামের পথে রসালাপে সমাজের শ্যেন দৃষ্টির ভয়, তাই প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষণিক দেখা সাক্ষাত, চকিত চাহনি এবং নির্দিষ্ট স্থানে অভিসারের গভীর অর্থবহ ইঙ্গিত গ্রামের পথে যাতায়াতের সময়টুকুকে মধুর করে তোলে। তবু মুক্ত-প্রেমের আদিম সমাজে একটি মাত্র প্রেমে বাঁধা থাকবে পুরুষরতন, এমন কথা প্রেমিকা কল্পনাও করতে পারে না। তাই সংশয়ে সন্দেহে বুক দুরু দুরু করে। প্রেমিককে কাতর নিবেদন জানায়, অন্য নারী যেন দুজনের মাঝে এসে তার বুক না ভেঙে ফেলে:

১২. কুল্হি কুল্হি যাইহ না কার পানে চাইহ না
যাচিলে ফুলের মালা লিহ না,
অবলাকে প্রাণে কাঁদাইহ না।

প্রণয়রসে অস্থির প্রেমিকের চাহনি প্রেমিকাকে সংযমহারা করে তোলে।

ইঙ্গিতে-আবেদনে সে-চাহনি এমনি তীক্ষ্ণ যে প্রেমিকাকে দিশেহারা যৌবন-জলধি যেন গ্রাস করতে চায়। বিনীত নিষেধের অনুনয় যেন কাতর আর্ত-নাদের রূপ নিতে চায়, অথচ সে আর্তনাদ বাঁধ-ভাঙা পুলকের উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

১৩. কুল্হি কুল্হি যাতে ছিলি বঁধু করে ভালাভালি
আঁখি ঠার্য না বঁধু আঁখি ঠার্য না,
নবীন বয়সে আমার প্রেম মানে না।

করম গান প্রেমের বেদনামধুর অনুভবে সজল, যে কোন হৃদয়কে স্পর্শ করবার মতো ক্ষমতা এ-গানের আছে। বহুরূপে বহুভাবনায় বহু বিচিত্র চিত্রকল্প ও রূপকের আশ্রয়ে প্রেম এই গানকে জনচিত্তহারী করে তুলেছে। যৌবনবতী গরবিনী নারীর প্রতি ব্যর্থ প্রেমিকের তীব্র শ্লেষও এখানে স্থান পেয়েছে:

১৪. বাঁশ পাতের কাজললতা হাত লাড়্যে যাছিস কুথা
ভরা জৈবন মুখে নাই তর কথা ল,
জৈবন গেলে হবি ঝিঁগা চপা।

কুল-কলঙ্ক-ভাবনাও তেমনি এ-গানে প্রকাশ পেয়েছে:

১৫. বাইদে বহালে কাঁশি বিটি ছায়ে বাজায় বাঁশি
বিটি ছায়ের কুল রাখা হল্য দায়,
পাছে কাঁশি ফুল ফুট্যে যায়।

তবে বিরহের কথা যেন অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে বিধৃত হয়েছে। প্রণয়ীর প্রতীক্ষায় শবরী নায়িকা যে-কোন শব্দে সচকিত সতৃষ্ণ হয়ে উঠছে অথচ প্রণয়ীর দেখা নেই, শুধু তার শিস ভেসে আসে; তাই এক মন-কেমন করা অস্থিরতায় সে অধীর:

১৬. তালপাতের আগুড়টি হাড়াক-হুড়ুক করে
আমার বঁধু শিশিক মারে মন কেমন করে।

প্রেমিকের অবহেলা, এড়িয়ে-চলার বেদনাতেও এ-গান বিধুর:

১৭. সড়প ধারে ঘর কর্যেছি আলে গেলে সামাও না,
কিসে তুমার মন ভাঙ্যেছে আমায় খুল্যে বল না।

দেখাসাক্ষাতের স্থান, অভিসারস্থলে গেলে বিরহিনী নায়িকার চক্ষু ঝাপসা হয়, মন উন্মন হয়, স্বভারতঃই পদস্খলন ঘটে। তবু সব কিছুকে ছাপিয়ে প্রেমিকের স্মৃতি সারা চেতনাকে উদ্ভাসিত করে তোলে:

১৮. যমুনাকে জলকে গেলে পিছলে পড়ে পা ল
থাক্যে থাকো, মনে পড়ে আমার বঁধুয়া ল।

করম গানে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণলীলায় যে সব দশার কথা পাই, তার কোনটাই অনুপস্থিত নয়। অভিসারের গানও তাই সহজভাবেই করম নাচে এসেছে :

১৯. আমার বঁধু রা'তকানা বাড়িব পথে আনাগনা
বাড়ির পথে যাইহ না ভাই উধারে বুন্যেছে গড়া ধান।

রা'তকানা বঁধুর অভিসারের কথা বলতে গিয়ে এখানে নায়িকা যেন কিছুটা রসিকতার আশ্রয় নিয়েছে। ঝাড়খণ্ডের প্রেম সর্বাংশে দেহজ প্রেম বললেও চলে। তাই দেহের ক্ষুধা সমাজ-শাসন মানে না; প্রেমের ক্রমঃবিকাশের ফলশ্রুতিও নয় এ দেহ প্রেম। পূর্বে আলাপ থাক বা না থাক যুবক-যুবতী-তনু সন্নিকটে এলে সৃষ্টির অনিবার্য আনন্দে সংশ্লেষে নিবিড় হয়। ভদ্রসমাজের শালীনতা হযতো এতে বিপর্যস্ত হয় তবু আদিম সৃষ্টির মাহাত্ম্য এতে ক্ষুণ্ণ হয় না। নায়িকার শরীরে দুঃসাহসী নায়কের হস্তস্পর্শ পড়লে আদিম নারী তার গোপন পুলক লুকিয়ে রেখে কপট ভৎ'সনায় নায়ককে যেন আরো বেশি দুঃসাহসী করে তোলে :

২০. এত যদি ছিল মনে আগে না বলিলি কেনে
ঘুমের ঘোরে, ছুঁড়া খেঁচরাই উঠালি মোরে।

নারী কিন্তু তার অভিসারে রাধার মতোই সমস্যার জালে জড়িত। মিলনের জন্য অন্তরে প্রবল আকুতি, অথচ অভিসারের পথে দুরতিক্রম্য বাধার পাহাড় :

২১. আঙিনায় কুকুর ভুঁকে রে দুয়ারে প্রহরী জাগে রে,
পায়ের নেপুর বাজে রুমঝুম, কেইসে হামে বাইরাব রে।

বাইরে প্রেমিকের সংকেতময় বংশীধ্বনি, ভেতরে ঘরগেরস্থালির কাজ, দোটানায় নায়িকা-মন দ্বিধাবিভক্ত :

২২. কাড়াবাগাল কাড়া খুলে বাঁশি-এ দেই শান,
কি করে্য বাইরাব বাগাল ঘরে কুটি ধান।

দেখা যাচ্ছে প্রেম তার সমগ্রতা নিয়ে এ-গানে উপস্থিত। আগেই বলা হয়েছে, ঝাড়খণ্ডের প্রেম সাধারণতঃ দেহজ প্রেম। আদিম কৌমজীবনে দেহজ প্রেমেরই প্রাধান্য ছিল। প্রেমের মধ্যেই নিহিত থাকে সন্তান-কামনা।

যৌনতাকে বাদ দিলে সে-কামনার পরিপূর্ণতা আসে না। যৌনতা তাই প্রেমের মধ্যে একীভূত হয়ে বিরাজ করে।

২৩. পথ'র কুড়ালে বঁধু না বাঁধালে ঘাট,
ডালিম লাগায়েঁ বঁধু গেলে পরবাস।
পাকিল ফাটিল ডালিম পরে ভাঙ্যে খায়,
ইদেশে পণ্ডিত নাই সঁয়াকে বুঝায়।
পাকিল ফাটিল ডালিম চোরে ভাঙ্যে খায়,
আমাব বঁধু ঘরে নাই জৈবন বহ্যে যায়।

ঝাড়খণ্ডের লৌকিক প্রেমের গানে 'বাগাল' (গরুমোষ রক্ষক)-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। করম গান এবং মেয়েদের জাওয়া গানে রমণীমন এই বাগালেব জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। তার বাঁশির শব্দে নারীদেহে কদম্ব বিকশিত হয়; বাগাল তাব প্রেমিক, তার নাগর, তার বেগবতী যৌবন-নদীর অকুতোভয় কাণ্ডারী। বাগালেব জন্য গুরুজনের গঞ্জনা, স্বামীব প্রহাব সমস্তই তুচ্ছ হয়ে যায়। কে জানে, এই বাগাল কৃষ্ণের ছায়া নিয়ে এখানকার লোকায়ত গীতে আবির্ভূত, না কি বাগালের ছায়াকে বৈষ্ণব কবিরা বিভিন্ন অনুভবের উপকরণ দিয়ে উদ্ভাসিত করেছেন এক নবতর চরিত্রে। আমাদেব মনে হয়, আদিবাসী সমাজের বাগালই ছায়া ফেলেছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। কেন না বৈষ্ণব পদাবলীর উত্তরাধিকারী ঝুমুরে বাগালেব কোন ভূমিকাই নেই; শুধু মাত্র লোকায়ত গানেই বাগাল তার বিশিষ্ট ভূমিকায় সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত। লোকায়ত গান বৈষ্ণব পদাবলীরও পূর্বসুরী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৈষ্ণববাদ ঝাডখণ্ডের নারী সমাজে কোনদিনই প্রভাব ফেলতে পারে নি, অথচ এই নারীসমাজের গানে এবং কথায় বাগালেব দর্শন মেলে—

২৪. কন্ ঠিনে বাগালিয়া বাঁশি-এ দিল শান্ রে,
কন্ ঠিনে গুণমণি পাত্যেছিল কান রে ?
কুল্হির মুড়ায় বাগালিয়া বাঁশি-এ দিল শান্ রে,
বাঁধের ঘাটে গুণমণি পাত্যেছিল কান রে।

বৈষ্ণবধর্ম ঝাডখণ্ডের আদিবাসী অর্ধআদিবাসীদের জীবনেও প্রভাব ফেলেছে। যাদের হিন্দু-ভাবাপন্ন উপজাতি বলা হয় সেই মাহাত-ভূমিজ-কামার-কুমোর-বাগালদের মধ্যে এ-ধর্মের প্রভাব একেবারে নগণ্য নয়।

তাই তারাও গয়া গঙ্গা বারাণসীর লোভ না করে তুলসীতলাকেই মোক্ষধাম বলে জেনেছে—

২৫. কাশী যাব না গয়া যাব না আর যাব না বিন্দাবন
ঘরে বস্তে ভজরে মন, দুয়ারে তুলসীর বন।

বৈষ্ণবধর্মের গুরুবাদ, কৃষ্ণবাদ এবং বৈষ্ণববাদ ঝাড়খণ্ডের মানুষকেও প্রভাবিত করেছে। তাদের এ উপলব্ধিও লোককবি করম গানে বিধৃত করে রেখেছে।

২৬. গুরু কিষ্ট বৈষ্টমেতে যার না হল্য মতি রে,
কেমনে হইবে তার পরকালে গতি রে।
না লাগিবে ধনকড়ি না লাগে শকতি রে,
মনে মনে ভজিলে বৈকুণ্ঠে হবেক গতি রে।

করম গানে কালা, কিষ্ট, শ্যামের উল্লেখ থাকলেও এর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণ একেবারে অনুপস্থিত। ঝাড়খণ্ডীদের লৌকিক জীবনের যে-কোন প্রেমিকই এই কৃষ্ণ বা শ্যামের ছদ্মবেশে উপস্থিত আছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

২৭. আইল কালাচাঁদ ডাঁঢ়ায়েঁ ফিরিয়েঁ কেনে যায়
দেখা দিতে অবসর-অ নাই।
কলসীতে জল নাই কি দিব ঢালিয়েঁ,
শামচাঁদ ডাঁঢ়াই আছে ঐ পিরিতির লাগ্যে।

কোন কোন গানে ইতিহাসের কিছু স্মৃতিকথা যেন লুকিয়ে আছে। মুসলমান যুগে ঝাড়খণ্ড তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারলেও পাঞ্চেত শিখরভূম অবধি মুসলমানরা অগ্রসর হয়েছিল। হয়তো সেই সময়ই কোন এক নৃত্যগীতের আখড়ায় মুসলমানরা হানা দিয়েছিল—

২৮. আখড়ায় সামাল্য জড়া মুসলমান,
দেখ ভগবান, নিশি দাঢ়ি ছাতির সমান।

একদা বর্গীর হাঙ্গামা সারা পূর্বভারতে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। বর্গীরা যে কখনো কখনো এই অরণ্যভূমিতেও হানা দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২৯. উপর কুল্‌হি ছলছল নাম কুল্‌হি কিসের গোল
মাঝ কুল্‌হি, দাদা, বর্গী সামাল্য রে।
উপর কুল্‌হি হড়হড়ানি নাম কুল্‌হি ঢড়া
কি কর্যে পাইরাব দাদা তুই ঠেঙ্‌ যে খড়া।

অ ননদী, দেখ, দেখ ল, বর্গী কত ধুরে,
বর্গী আল্য লক পালাল্য বর্গী কত ধুরে, ননদী দেখ, দেখ ল…

করম গানে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শও লেগেছে—

৩০. কিবা লয়ে আলি রে মন কিবা লয়ে যাবি
এমন সুন্দর দেহ মাটিতে মিশাবি,
রে মন, এ ভব সংসার ছাড়্যে যাবি।

জীবন বড়োই ক্ষণস্থায়ী, এ-কথা জেনেও ঝাড়খণ্ডের মানুষেরা হতাশ হয় না। তারা হাসে, গায়, নাচে। তারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী; ঈশ্বর যা বিহিত করবেন, তাই হবে। তাই বলে জীবনকে উপবাসী রেখে কৃচ্ছ্র সাধনায় প্রাণের সমস্ত কোলাহলকে নিস্তব্ধ করে দিতে হবে, তা তারা স্বীকার করে না:

৩১. মানুষ জনম ঝিঙা ফুলের কলি রে
সাঁজে ফুটে সকালে যায় ঝরি।
তবু ফুটে নাচে হাসে পিথীমকে ভালবাসে
যাবার বেলায় কাঁদে না রে ভরসা শুধু হরি॥

॥ দুই ॥

জাওয়া গীত

জাওয়া পরব এবং করম পরব একই দিন অর্থাৎ ভাদ্রমাসের পার্শ্বৈকাদশীর দিন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর চলনভূমি ছোটনাগপুর মালভূমির সর্বত্র; পূর্বে পশ্চিম বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম শালবনী এবং দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চল। অর্থাৎ যে-সব অঞ্চলে কুর্মি-মাহাত-ভূমিজ-খাড়িয়া কামার-কুমোর-বাগাল ইত্যাদি উপজাতির বাস সেই সব অঞ্চলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডের সর্বত্রই করম পরবকে কেন্দ্র করে এর অনুষ্ঠান হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল প্রধানতঃ পুরুলিয়া জিলার পশ্চিমাংশে যেখানে কুর্মালি উপভাষা প্রচলিত,

সেখানে বর্ষাকালীন একটি শস্যোৎসবের নাম জাওয়া পরব। ইহা শস্যের জন্মোৎসব।'[১] ডঃ ভট্টাচার্যের বক্তব্যের প্রথমাংশ যে নিঃসংশয়ে ভুল তা জাওয়া পরবের চলনভূমি প্রসঙ্গে দেখা গেল। পুরুলিয়া জিলার পশ্চিমাংশ বলতে তিনি খুব সম্ভবতঃ ঝালদা-বাঘমুণ্ডি অঞ্চলকে বোঝাতে চেয়েছেন। ঝালদা অঞ্চলে কুর্মি-মাহাতরা কুর্মালি উপভাষায় কথা বলে থাকেন, স্বভাবতঃই তাঁদের গানও এই ভাষায় রচিত। শুধু ঝালদার কুর্মি-মাহাতরাই এই পরবে একমাত্র অংশীদার নয়। ঝাড়খণ্ডের প্রায় সমস্ত উপজাতিই (সাঁওতাল আদি বাদে) এই পরবে শরিক। আলোচনাকালে আমরা ঝালদা থেকে সংগৃহীত গানের নিদর্শনও উপস্থিত করব। জাওয়া গীতে, শুধু ঝালদায় কেন, সর্বত্রই কুর্মালি উপভাষার প্রভাব দেখা যাবে। আসলে জাওয়া গীত আচার-মূলক, তাই অনেকাংশে রক্ষণশীল। ঝাড়গ্রামেও যে জাওয়া গীত গাওয়া হয়ে থাকে তাতেও কুর্মালি উপভাষার স্মৃতি-অবশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে।

জাওয়া পরব একটি শস্যোৎসব। জাওয়া শব্দটি 'জাত' শব্দ থেকেই উৎপন্ন। তবে 'জাওয়া' না 'যাওয়া' এ নিয়েও মতভেদ আছে। এ গানে 'যাওয়ার' কথাই প্রাধান্য পেয়েছে, এ কথা ঠিক। তবে ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা যে পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে 'যাওয়ার' কথা বলেছেন,[২] মনে হয় তা ঠিক নয়। আসলে ভাদ্র মাসে করম পরবে ঝাড়খণ্ডের শ্বশুর-গৃহে বন্দিনী বধূরা পিতৃগৃহে যাবার ছাড়পত্র পেয়ে থাকে; অবশ্য সব সময়ই যে অনুমতি পেত, তা নয়। নববিবাহিতা বধূরা ইঁদ-করমের দিন গুণে শ্বশুরালয়ে সব দুঃখকষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করে প্রতীক্ষা করে থাকে।

১. ইঁদ করম ল' জকাল্য ভাই আল্য লিতে ল
আস্তু ভাই বস্তু পিঁঢ়ায় বেউনী দলাঁই দিব।

ইঁদ-করমে যে-বধূ পিতৃগৃহে ফিরে যেতে পারল না, তার মতো ভাগ্যহীনা আর কে আছে? তাই পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি না পেলে বধূ ক্রোধে-ক্ষোভে দিশেহারা হয়ে পড়ে:

১. বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য়, পৃ ১২১
২. ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান, পৃ ১৮

২. ইঁদ পরব ল' জকাল্য ভাই আল্য লিতে গ
থালভরা নাই দিল যাতে।
থালভরাকে খাতে দিলে চুল্‌হাশালে বসে গ
উচিত কথা ব'লতে গেলে জুমড়া কাঠে ধাশে।

শ্বশুরালয় থেকে পিত্রালয়ে 'যাওয়া'র কথা থেকে গানের নাম 'যাওয়া গীত' বলা হলে আমাদের গ্রহণে আপত্তি নেই। তবে 'জাত' শব্দ থেকে 'জাওয়া' শব্দটির উদ্ভব তত্ত্বটিকেই আমরা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। এই উৎসব সত্যিই শস্যের সমৃদ্ধিকামনায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আচার-অনুষ্ঠানের উপকরণ থেকেও বোঝা যায়, এটা শুধু শস্য-কামনায় অনুষ্ঠিত হয় না, সন্তান-কামনাও এর পশ্চাৎপটে রয়েছে।

'জাওয়ার' উপকরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে এই অনুষ্ঠান অঙ্কুরোদ্গমের অনুষ্ঠান। জাওয়া শস্য-কামনার উৎসব, উর্বরতাবাদ বা fertility cult এর মুখ্য পরিচয়। পার্শ্বৈকাদশীর তিন কিংবা পাঁচ কিংবা সাতদিন আগে কুমারী মেয়েরা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে বন থেকে শালের দাঁতন কাঠি ভেঙে নিয়ে আসে। তারপর স্নান করে ডালায় কিংবা চুপড়িতে পুকুর বা নদীর বালি ভরে তার ওপর মুগ, কলাই, অড়হর আদি রবিশস্য এবং ধানের বীজ ছড়িয়ে দেয়। তার ওপর হলুদ গোলা জল ছিটিয়ে দাঁতন কাঠিগুলো ভেঙে কম্পাস্ কাঁটার মতো ডালার বালিতে পুঁতে দেয়। এই ডালাটিকে 'জাওয়া ডালি' বলে। ডালাটিকে সযত্নে কোঠাঘরের ভেতরে কোন উঁচু জায়গায়, তক্তায় কিংবা শিঁকেতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। 'জাওয়া ডালি'কে কোথাও কোথাও 'দৌড়া'ও বলা হয়। এরপর প্রতি সন্ধ্যায় কুমারী মেয়েরা সবাই মিলে ডালাটির চারপাশে ধরে গান গাইতে-গাইতে আঙিনায় নিয়ে যায় এবং এই ডালাটিকে ঘিরে ওদের নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। পরস্পর হাতে-হাতে ঘন-সংবদ্ধভাবে ধরাধরি করে বৃত্তাকারে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতাল মেয়েদের নৃত্যের চেয়ে এর লয় একটু দ্রুত। একটু এগোনো একটু পিছানো এ নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাওয়া গীতে নৃত্য অপরিহার্য। নৃত্য এবং গীত এখানে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ধলভূম ঝাড়গ্রামে কোথাও এ নৃত্যে বাজনা বাজানো হয় না। পুরুলিয়ার কোথাও কোথাও, বিশেষভাবে ঝালদা অঞ্চলে, কোন কোন আখড়ায় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। কুমারী মেয়েদের কণ্ঠে শুধু গান থাকে, পদযুগলে নৃত্যের মৃদু ললিত ছন্দ। জাওয়া পরব অবি-

সংবাদিতরূপে একটি শস্যোৎসব। অঙ্কুরোদ্গমের আয়োজন জাওয়ার ডালিতে। নৃত্য-গীত জাদুক্রিয়ার অনুষঙ্গ বিশেষ। বৃত্তাকার নৃত্য প্রাচীনতম নৃত্যধারা। এই নৃত্যের মধ্যে আচার-ধর্মী জাদুক্রিয়া সংগুপ্ত আছে। আদিম মানুষ বৃষ্টির জন্য বা শস্যের জন্য দেবতার মুখাপেক্ষী থাকত না, বরং নিজেরাই নৃত্যের মাধ্যমে প্রচুর বৃষ্টি এবং শস্যের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে তোলবার চেষ্টা করত। তাছাড়া, কুমারী মেয়েরা উর্বরাশক্তি এবং প্রজনন-ক্ষমতার অধিকারিণী হিসাবে আদিম সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাই প্রতিটি শস্যোৎসবের সঙ্গে কোন না কোন প্রকারে কুমারী কন্যাদের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

জাওয়া অনুষ্ঠানে যে সন্তান-কামনাও লুক্কায়িত আছে, তা পূজোর উপকরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। জাওয়া আসলে করম ব্রতেরই অঙ্গবিশেষ। করম পূজার সময় গৃহাঙ্গনে, দুটি পাশাপাশি বৃত্তাকার আল্পনার মধ্যে গর্ত খুঁড়ে, কোথাও বা মাটি খুঁড়ে সেই মাটি দিয়ে আয়তাকার পুষ্করিণী তৈরী করে তার দু'পাড়ে, দু'টি করম ডাল পুঁতে দুটোকে একটি সুতো দিয়ে গাঁঠছড়ার মতো বেঁধে দেওয়া হয়। করম রাজা এবং করম রাণীর প্রতীক এই দু'টি ডাল আসলে সূর্য এবং পৃথিবীরও প্রতীক; এই অনুষ্ঠানটি তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান। কোথাও কোথাও করম পূজামণ্ডপে সাপ ছেড়ে দেবার রীতি আছে; কোথাও কোথাও জনশ্রুতি আছে, করম ডালের আড়াল থেকে সাপ বেরিয়ে থাকে। বিয়ে এবং সাপ দুটোই সন্তান-প্রজননের প্রতীক। পূজার উপকরণের মধ্যেও সন্তান-কামনা বিরাজিত থাকে। প্রধান উপকরণগুলো হল: সন্ধ্যেবেলা শালপাতার 'থালা' বা দোনায় তুলে-আনা বালি, মাটির প্রদীপ, সলতে এবং তা জ্বালাবার জন্য ঘি, স্নানান্তে শুদ্ধ অবস্থায় তোলা একপাত্র জল, দুধ, চালের গুঁড়ো পিটুলি এবং সিন্দুর, চিঁড়ে, গুড়, মিষ্টি। এবং সব উপকরণের সেরা উপকরণ একটি কাঁকুড় বা শশা, কুমারী ব্রতিনীরা কাঁকুড়টিকে 'বেটা' (ছেলে)-র প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। 'বেটা'কে শোয়াবার জন্য কাঁকুড় পাতা এবং ঢাকা দেবার জন্য হলুদছোপানো টুকরো কাপড়ও উপকরণের অন্তর্ভুক্ত।

করম ব্রত এবং জাওয়াতে শুধুমাত্র কুমারী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করতে পারে। বিবাহিতা মেয়েরা ব্রত উদ্‌যাপনে, জাওয়া রাখায় এবং পুজোয় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কোথাও কোথাও বিবাহিতা মেয়েরা বিয়ের

প্রথম বছরে মাত্র অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে বিবাহিতারা নৃত্য-গীতে স্বচ্ছন্দে অংশ নিতে পারে।

করম নাচ এবং গান শ্রাবণ থেকেই শুরু হয়ে থাকে। কোথাও শ্রাবণ-সংক্রান্তি থেকে, বেশির ভাগ অঞ্চলে পয়লা ভাদ্র থেকে, জাওয়া গান এবং নাচের মহড়া শুরু হয়। এই সময় জাওয়া ডালি থাকে না। মেয়েরা আঙিনায় গান গেয়ে বৃত্তাকারে নৃত্য করে শুধু। ভাদ্রমাস পড়লেই মেয়েদের কণ্ঠে জাওয়া গান আপনা থেকে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

জাওয়া পরব শস্যোৎসব হওয়া সত্ত্বেও কারো কারো মতে জাওয়া গানে শস্য সম্পর্কে কোন সংকেত পাওয়া যায় না। তাঁদের মতে, জাওয়া গানে শস্য বা ফসল সম্পর্কে কোন গান প্রচলিত নেই। মনে হয়, তাঁদেব সংগ্রহে শস্য-সম্পর্কিত গান না থাকায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ শস্য-সম্পর্কিত বহু গানই জাওয়া গানের সম্পদ। বহু জাওয়া গান করম গান বা পাঁতা নাচের গান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডে এক শ্রেণীর গান স্বচ্ছন্দে অন্য শ্রেণীতে গৃহীত হয়ে থাকে, অথবা বলা ভালো, অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে। তবে এই ঝোঁকটা সাধারণতঃ পুরুষদের মধ্যেই থাকে। নারীসমাজ সব ব্যাপারেই রক্ষণশীল। তাই বর্তমানে যে-নাচ একান্তভাবে পুরুষের, সেই করম নাচের গান গ্রহণ করে জাওয়া গানের মধ্যে আত্মসাৎ করে নেওয়া হয়েছে, এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ছো নাচের গান-ও রমণীসমাজ কখনো জাওয়া গানের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে না। অথচ জাওয়া গানে প্রচলিত এমন বহু গান পাঁতা নাচে এবং ছো নাচে ব্যবহার করতে দেখা যায়। যা হোক, জাওয়া গানে শস্য-সম্পর্কিত গানের অভাব নেই। নিদর্শন হিসেবে তু'একটি গান আপাততঃ উদ্ধৃত করা যায়ঃ

৩. বায়গণ বাড়ি রুঁধ দাদা রুঁধ চারিধার রে
রাখি দিহ খিড়িকি তুয়ার ;

৪. উপর থেতে হাল দাদা নাম খেতে কামিন রে
কন্ খেতে লাগাব দাদা কামিন কাজল ধান রে।

জাওয়া গানের রচনা সর্বাংশে নারীসমাজের। অন্য গান যেমন করম গান, টুসু গান ইত্যাদিতে নারীপুরুষের সম্মিলিত রচনা থাকলেও জাওয়া গানে পুরুষের কোন অধিকার নেই, তাই রচনায় অংশগ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। যেহেতু এ-গান একান্তভাবে নারীসমাজের তাই এ-গানে নারীসমাজের ছবি

সামগ্রিকভাবে ফুটে উঠেছে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্যের নারী-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, ঘর-গেরস্থালী, হিংসা-দ্বেষ সব কিছু আশ্চর্য উজ্জ্বলতায় জাওয়া গানে চিত্রিত হয়েছে। এমন সরাসরি তীক্ষ্ণ ঋজু লোকগীতি খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। রক্তমাংসের মানুষের মতো এতো সজীব ভাবনা আর কোথায় পাওয়া যাবে? লোকগীতির অকৃত্রিমতা, সরলতা, প্রত্যক্ষতা এবং স্বাভাবিকতা গুণধর্মগুলো খুব কম লোকগীতিতেই এমন করে ফুটে উঠেছে। করম গান কিংবা টুসু গান, যা ঝাড়খণ্ডের সর্বাধিক প্রচারিত গান, তার মধ্যেও এমন সহজ সুন্দর নিরলংকার শোভন গান বিরল বললেই চলে। আসলে জাওয়া গান একান্তভাবে গৃহকোণের নিপীড়িতা, নিগৃহীতা, অথচ বসুন্ধরার মতো আশ্চর্য সহনশীলা নারীসমাজের সুখ-দুঃখের কথার প্রতিলিপি; পরস্পরের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনা নিয়ে অস্ফুটস্বরে যে আলাপ তাই যেন এ গানে অবিকল ভাষা-রূপ পেয়েছে। ঝাড়খণ্ডে বিবাহবন্ধন যেন সন্তান-উৎপাদনের জন্যই সংঘটিত হয়ে থাকে। যৌনতাই যেন নরনারীর সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু। নিতান্ত ভাত-কাপড়ের লোভে কোন নারী স্বামীর ঘর করে না। তবু নারী যেন এখানে ক্রীতদাসী। তার উপর যা খুশি ব্যবহার করা চলে, অকথ্য কথা বলা চলে, প্রহারে জর্জরিত করা চলে, যে-কোন মুহূর্তে হাতের নোয়া খুলে নিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো চলে। নারী এখানে বড়ো অসহায় জীবন যাপন করে। তবু সে সর্বংসহা বসুমতীর মতোই বলতে পারে 'মা বাপকে বলো দিবে বড় সুখে আছি।' এমন বেদনাবিধুর সজল পংক্তি অথচ এমন সহজ উচ্চারণ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে।

জাওয়া গান তাই নারী সমাজের দৈনন্দিন জীবন-চর্যার বেদনা-মধুর ভাষ্য। সুখের কথার চেয়ে দুঃখের কথাই যেন এ গানের মূল উপজীব্য। অশ্রু যেন প্রবল অভিমানে জমে কঠিন বরফ হয়ে গেছে, অথচ তার সজলতা তাকে তখনো বেষ্টন করে আছে। শ্বশুরগৃহ তো সুখের গৃহ নয়, যেন কারাগৃহ। বন্দিনী রমণীর দু'চোখে অগ্নিশিখা দপ্ দপ্ করে জ্বলে ওঠে, আর সেই আগুনে শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর স্বামী দেবর ননদের সঙ্গে যে সম্পর্ক মধুর হতে পারত, তা ভস্ম হয়ে যায়। তাই জাওয়া গানে শ্বশুরগৃহের প্রতি তাচ্ছিল্য, নিন্দা, কটাক্ষ মূর্ত হয়ে ওঠে। শ্বশুর-গৃহে কেই-বা ভালো; তাই বলে সব গানেই যে এই বিতৃষ্ণা এবং তিক্ততা

প্রকাশ পেয়েছে, তা নয়। বহু গান শ্বশুরগৃহের বর্ণনাতেও মধুর। পিতৃগৃহের স্মৃতি বহুবর্ণ লোভনীয় পদার্থের মতো তাকে আকর্ষণ করে। পিত্রালয় তার কাছে স্বর্গের প্রতিচ্ছবি। তাই জাওয়া গানে পিত্রালয়ের স্মৃতিরসে জারিত গানগুলো বড়োই মধুর। পিতামাতা ভাই দাদা সবার ছবি যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

জীবনের কথা এমন আশ্চর্য বাণীরূপ পেয়েছে বলেই জাওয়া গান সরল এবং সজল। এ গান আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, ভাবায়, কাঁদায়, আনন্দ দেয়। কাব্যরস এখানে অত্যন্ত ঘন হয়ে দানা বেঁধেছে। লোকগীতি হিসেবে জাওয়া গান সত্যিই সম্পদবিশেষ। নারী সমাজকে তার সামগ্রিক ভাবনার ক্ষেত্রে একযোগে কোথাও পেতে হলে জাওয়া গানের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

জাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে জাওয়া দেওয়া হয়। তারপর জাওয়ার চারা যাতে ভালো হয়, তার জন্য বিবিধ আচার-নিয়মের পালন করতে হয়, করম পরবের দিন উপবাস করতে হয়। এই কথাগুলোকেই তারা গানে বেঁধে চারাগাছ দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য আচারমূলক মন্ত্র বা প্রার্থনা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে :

৫. কাঁসাই নদীর বালি আন্যে জাওয়া পাতিব ল
আম্‌দের জাওয়া উ'ঠবে বাগে তাল গাছের পারা ল।
সুরুজ উঠে খিন খিন আমার জাওয়া উঠে না
তুমার লাগি দিব এক উপাস।
সাত দিন জাওয়ার লাগি নিয়ম পালন করি গ
তবু আমরা জাওয়া তুলিব।

জাওয়া দিলেই যে ভালো চারা হবে, এমন কোন কথা নেই। কারো ভালো চারা দেখেই হলুদের কথা মনে পড়ে। হলুদগোলা জল ছাড়া চারার বৃদ্ধি ঘটে না। তাই প্রশ্ন :

৬. জাওয়া যে দিলে তরা হল'দ কুথায় পালে গ
তদের জাওয়া লহকে বাঢ়িল।

গানগুলোর ভিতর যে শস্য-কামনার ঐন্দ্রজালিক লক্ষ্য নিহিত আছে, বিচার করে দেখলেই তা বোঝা যায়। এই জাওয়া ডালা বা 'দৌড়া'কে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঘরের ভিতর থেকে ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে আঙিনায়

নিয়ে আসা হয় এবং জাওয়া ডালাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়। জাওয়া ডালা গৃহাঙ্গনে নিয়ে আসবার সময় গাওয়া হয়—

৭. আওসিনি যাওসিনি দৌড়া ল
দৌড়ার ভিতরে মাঝ্যান বেহুলা ল।

৮. ডহর ডহর ডহর দাদা ডহর কত ধুরে,
ভুলা কানা রতনপুর দেশ কত ধুরে।

৯. এক পইলা সুরগুঁজা বুনলম গটা গড়া,
পাতে ত শিগির বিগির ফলে বেহুলা।

এই গানগুলোকে আমরা জাওয়া গীতের ডহরিয়া গান (ডহর=পথ) বলতে পারি। জাওয়ার ডালি ঘর থেকে আঙিনায় এবং আঙিনা থেকে ঘরে নিয়ে যাবার সময়ই এগানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে। এগুলো পুরোপুরি আচারধর্মী গান। প্রতিটি শব্দ অপরিবর্তনীয় থাকা উচিত ছিল, কিন্তু যৌথসংগীতের ধর্মই হল তা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে; লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে তা কখনো উন্নতি কখনো বা অবনতি লাভ করে থাকে। এখানে প্রথম গানটিতে যে অবনতি ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; অবনতি ঘটলেও যে আচারধর্মী গান সমাজ বর্জন করে না এটি তার নিদর্শন। বলা বাহুল্য, এগানগুলো কুর্মালি থেকে ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতে রূপান্তরিত হবার পথে বিপর্যয় ঘটেছে।

আঙিনায় জাওয়া নৃত্য-গীতের প্রারম্ভে যে গানটি শ্রুতিগোচর হয়, তা'ও অনেকটা আচারধর্মী। এ গানটিতেও কৃষির প্রসঙ্গ আছে পাহাড়-প্রান্তরে কর্মরত মুনিসের (জনমজুর) উল্লেখে :

১০. অতি অতি যাও কিয়া কিয়া যাও
যাও ল মা এক পাঁতা সর পাঁতা হর'ণা রাঁডা।
চরচরি গেলা রে হরি রাবু রাবু, সুরো রোজি গেলা,
সরবরতে হুঁট গেলা গজলা ঘটির পানী।
পাহাড়ে আছে সাত মুনিস
সাত মুনিসকে বাবা সাত ঘটি জল।
ছ বহু রাণী এক বহু কানী
কানীকে দিওল বাবা গয়লা ভরি পানী।

কারো কারো মতে জাওয়া পরব শস্যোৎসব হলেও জাওয়া গীতে শস্যের

কোন প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় না। 'জাওয়া গানের মধ্য দিয়া কোন শস্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।'[৩] 'শস্যের সমৃদ্ধি কামনার গূঢ় আবেদনই এই গানের উৎস কি না নিভু'লে নির্ণয় করা কঠিন।'[৪] তাই আমরা কৃষি বা শস্যসম্পর্কিত কয়েকটি গান দিয়েই জাওয়া গীতের আলোচনার সূত্রপাত করব।

১১. কদ বাড়িতে কদ বাড়িতে সাটনা চল্যে যায় গ
পণ্ডিত ঘরের মাঝলী বহু বাস্যাম নিয়েঁ যায়।
মাথায় ত মুড়িঠেকা কাঁখে গাগরা গ
কামিনবা ত খুজে বালিগুড়।
মা' চলা তলের ঘাঁস গিলি করে লহলহ গ
পণ্ডিত ঘরের মাঝলী বহু বাস্যাম নিয়েঁ যায়।
মাথায় বাস্যাম বাটি কাঁখে গাগরা গ
মুনিসবা ত খুজে মাছেব ভেকা।

গানটিতে কদ শস্যের কথা আছে।

নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে বৃষ্টির অভাবে ফসলের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বুক-ফাটা চাপা আর্তনাদের আভাস পাওয়া যায়।

১২. পাঁচ পঞ্চম মাসে জল হল্য নাই শরাবনে
হালের গরু পালে চর‍্যে খায়।
যার বঠে হিড় চাস তার বা কিছু আশ-বাস
বাইদ ধান চাষার অ গ পরাণ উড়্যে যায়।

কিন্তু জমিতে যদি ভালো ফসল হয়, তাহলে কৃষক গৃহিনীর আনন্দের অন্ত থাকে না। চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে সিঁদুর পরে মনের সুখে পাড়া বেড়াতে বার হয়ঃ

১৩. ধান কা'টলম হালা হালা মাথা বাঁ'ধলম ডালা গ
এক খাড়ি ঝুরা সিঁদুর পর‍্যে বাইরাব পাড়া।

ধানের অতিরিক্ত অন্যান্য চাষ-বাসের আভাসও পাওয়া যায়ঃ

১৪. আলতি রুইলম সারি সারি কলা রুইলম মাঝারি।
বাছ্যে বাছ্যে কলা কা'টবে কা'ল যাব শ্বশুর বাড়ি।

---

৩ বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য়, পৃ ১২২
৪ ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান, পৃ ১৮

'বায়গণ বাড়ি রুঁধ দাদা রুঁধ চারিধার,' 'বাড়ি নাময় স'রষা বুঁনলম স'রষা ঝলমল করে,' ইত্যাদি পংক্তিগুলোতেও চাষের প্রসঙ্গই আছে।

জাওয়া গীতে সাধারণতঃ নারীর বিবাহিত জীবনের কথাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবু এরই মধ্যে কখনো কখনো কোন গানে ছেলেবেলার স্মৃতি-রোমন্থন আছে, অতীতের সেই আনন্দময় দিনগুলোর জন্য দীর্ঘশ্বাস আছে।

১৫. বনি চলে খিচিব বিচিব জয়াঁ চলে খাতা গ
কবে পড়ল ভাদর মাস।
ভাদর মাসে গাদর জম্মা'র লাল টুপায় খাব গ
আর কি ছাল্যা জনম পাব।
বনি চলে খিচির বিচির জয়াঁ চলে খাতা গ
কবে পড়ল ভাদর মাস।
ভাদর মাসে গাদর জম্মা'র আশিন মাসে খই গ
কাত্তিকে জম্মা'ব লেট তায় চেঁকা দই।

ভাই বোনের অন্তরঙ্গ ছবি জাওয়া গীতের অন্যতম বিশিষ্ট বিষয়বস্তু। বলা যেতে পারে, এ-গানের এইটিই মধুরতম বিষয়। ভাই-বোনের গভীর ভালোবাসার কথা, দাদার প্রতি বোনের অসীম শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য, দাদার ওপর অটুট বিশ্বাস সমস্তই এ-গানে নিখুঁত তুলির টানে চিত্রিত হয়েছে। একই মাতার গর্ভজাত দুই সন্তান তারা। অথচ বিধাতা পুরুষের একি নিষ্ঠুরতা, দু'জনের বিধিলিপির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। বোন তাই অভিমানে দাদার কাছে তার অবুঝ হৃদয়ের অভিযোগ তুলে ধরে :

১৬. এক মায়ের এক বাপের ভাই-অ বহিন গ
চঁঘরি চঁঘরি খায় দুধ।
তরই খাওয়ান ভাই রে দহি দুধ ভাত রে
আমারই খাওয়ান পাখাল ভাত।
তরই জনম ভাই রে বাবু দরশন রে
আমারই জনম পরের ঘর।
আমি কি লিখ্যেছি বহিন বিধাতা লিখ্যেছে রে
বিধাতা লিখ্যেছে পরের ঘর।
পরেরই ঘরে বহিন খাটি-লুটি খাও রে
রাখি দিহ বাপের ভায়ের নাম।

বড় নদী অর্থাৎ সুবর্ণরেখার ওপারে দূরে বোনের বিয়ে দেবার জন্য বোন মর্মস্পর্শী ভাষায় তার অভিযোগ-অনুযোগ নিবেদন করে, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার এতো দিনের হাজারো স্মৃতিভরা বাড়ি তার কাছে বহু দূরে সরে যায়। তাই দাদাকে বলে :

১৭. বেহা যে দিলি ভাই রে বড় লদীর পারে রে
আনা লেগা কে করিবে আর।
বাপ যদি মরে মায়ের দিশা হারায় রে
আনা লেগা কে করিবে আর।
ভাই যদি আনে লেগে মোর ভা"জ থুতুনা ফুলায় বে।
ফুলাও ফুলাও ফুলাও ভা"জ নাই যাব তব গৃহবাসে গ
মোর ঘরে আছে কাঁচা জল।

১৮. শশুরবাড়ি যাবার বেলা দেওয়া কলম পাড়বি পগার গ
সেহ পগার গাছ হইল।
গাছ হইল পগার ফুল ফুটিল গ
তবু দাদা আ'নতে না গেল।
আ'নতে যে গেলি দাদা মাগ মাসের মুড়ায় বে
ছ দিনের কড়ার দিয়েঁ ছমাসে গেলি।

দাদা তার কথা রাখে নি ; ছ'দিনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার কথা কিন্তু ছ'মাস বাদে একেবারে মাঘ মাসের শেষে বোনকে আনবার জন্য তার শ্বশুর বাড়িতে গেছে। দাদাও কি বোনের কথা ভোলে ? তারও মনে আছে, শ্বশুর বাড়িতে তার বোন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে, ঠিক যেমন কচি বাঁশ বেড়ে ওঠে, তেমনিভাবে। গানটিতে বোনের প্রতি অবহেলার জন্য দাদার মনে দুঃখ এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে, স্নেহরসও এখানে প্রবল।

১৯. বাঁশ ঝাড়ে উঠল লহ লহ বাঁশ গ
শশুর ঘরে লহরয়ে বহিনী আমার।
কেসি করি আনবে লহলহ বাঁশ গ
কেসি করি আনবে বহিনী আমার।
গাড়ি জুড়ি আনব লহলহ বাঁশ গ
পিঠা হাঁড়ি দিয়েঁ আনব বহিনী আমার।
কাঁহা আমি রাখব লহলহ বাঁশ গ

কাঁহা আমি রাখব বহিনী আমার।
ছাঁচা কলে রাখব লহলহ বাঁশ গ / মাঝ্যাঘরে রাখব বহিনী আমার।
কিয়া কিয়া খাওয়াব লহলহ বাঁশ গ/কিয়া কিয়া খাওয়াব বহিনী আমার।
ছাঁচার পানী খাওয়াব লহলহ বাঁশ গ/দহিদুধা খাওয়াব বহিনী আমার।

২০ আগুয় আগুয় তিতির মেজুর রে / তাহার পেছু সহোদর ভাই।
আগুয় আগুয় ভার ভারতী তাহার পেছু ডালা রে
ডালার ভিতর আছে সাদা লুঁগা।
শাউড়ী লিল আ'ড় পা'ড় আম্‌কে দিল সাদা রে
আঁচলে ত নাই দিল লেখা।

করম ডালা আসলে তত্ত্বের ডালা। করম ডালার ভেতরে থাকে কাপড়, কাঁকুড়, কাঁকুড় পাতা, হলুদ মাখানো চাল, অড়হব, মাষকলাই, তিসি, ছোলা ইত্যাদি। ভার বা বাঁকে করে চিঁড়ে মুড়কি এবং পিঠে-সন্দেশ পৌঁছানো হয়। ভালো কাপড়চোপড় শাশুড়ী নিয়ে নেয়, এব জন্য কিশোরী বধুর মনে ক্ষোভ জমে।

২১ যন বনে যন বনে চিমটি না চলে রে/সেহ বনে দাদা আল্য লে'গতে বে।
আস দাদা বস দাদা মাচিলার উপরে রে
কহ ভাই দুখের সুখের কথা রে।
কিয়া কহব বহিন দুখের সুখের কথা রে / ভা'জ মরল তিনমাস রে।

বোন দাদার খাবারের আয়োজন করে। কিন্তু দাদা বোনের বাড়িতে মহা সুখে ভূরিভোজে যোগ দিতে পারে না। তখনো বোনকে চরম দুঃখের সংবাদটি দিতে বাকি :

লেহ দাদা পানী লেহ, লেহ দাদা পিঁঢ়া রে/খাঁযে লেহ দহি দুধ ভাত রে।
নেহি খাওয়ব বহিন দহি দুধ ভাত রে / মা-অ মরল ছয়মাস।
মা-অ মরল দাদা খবর-অ না দিলি রে
আমি হলি রে দাদা জনমের টুঅর রে।

দাদাকে তাই সে সরাসরিই বলে ফেলে, মা নেই, এবার আমি সারা জীবনের জন্য অনাথিনী হলাম। এ-গানটি সত্যিই হৃদয়স্পর্শী এবং ঝাড়খণ্ডের সমাজজীবনের একটি বেদনা-বিধুর দিককে আলোকিত করে তুলেছে।

বোনকে নিতে-আসা দাদার মুখে মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনে মুহূর্তের মধ্যে বোনের দু'চোখ থেকে আলো নিভে গিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দাদা তো তার কাছে দাদাই ; শিশুকাল থেকে স্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছে ; অভাবে-অভিযোগে সুখে-দুঃখে দাদা ছিল তার বন্ধু। তাই দাদা এবং স্বামীর ক্ষেত্রে আচার-ব্যবহারে সে তারতম্য না দেখিয়ে পারে না।

২২ দাদাকে খাতে দিব দহি দুধ ভাত গ
সঁয়াকে খাতে দিব খেড়ী গুঁদলীর ভাত।
দাদাকে শুতে দিব লাল পালংখ গ
সঁয়াকে শুতে দিব গুঁদলু পুয়াল।
দাদা মোর আনি দেয় ত গাছি গাছি শাঁখা গ
সঁয়া মোর আনি দেয় ত লেডপী সতীন !
ভাঙি-চুরি যাবে ত দুই হাতের শাঁখা গ
জনম যুগ রহি যায় ত লেড়পী সতীন।

সপত্নীর কথা নারী-সমাজের কাহিনী, গান ইত্যাদিতে একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়ে এসেছে। সপত্নী-বিদ্বেষের জ্বালাযন্ত্রণাভরা অভিজ্ঞতা যে-নারীর জীবনে থাকে, সেই জানে সতীন বস্তুটি কি। বধূ-জীবনে এর চেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা আর কিছু হতে পারে না।

২৩ ডুংরি কে ধারে ধারে এক তাঁতির ঘর গ
দিহ তাঁতি অসার-বিসার শাড়ি।
পাইড়ে লেখিবে তাঁতি চাঁদ সুরুজ গ
আঁচলে লেখিবে তাঁতি জড়া সতীন।
পাইড় দেখ্যে হাঁসব আঁচল দেখ্যে কাঁদব
তখন শাসুর নয়ন বহে লর।

জাওয়া গীত একান্তভাবে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সংসারের ছবি। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ওপর বিন্দুমাত্র রং চড়ানো হয়নি এ-গানে। বধূর চতুষ্পার্শ্বে শ্বশুরালয়ের যেসব আত্মীয়স্বজন রয়েছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক, সংঘর্ষ তার জীবনে প্রতিদিন নূতনতর অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। তার সে অভিজ্ঞতা সাধারণতঃ যন্ত্রণার রক্তিম বর্ণচ্ছটায় বিষণ্ণ, বিধুর।

স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল নয়। ঝাড়খণ্ডের নারীর জীবন ক্রীতদাসীর জীবন বললেও চলে। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে লাঞ্ছনাগঞ্জনা, গালাগালি এবং প্রহার। বধূ বুঝেছে তার উচিত অনুচিত সব কথার একটিই পুরস্কার : প্রহার।

২৪ বালি ছাতুর তরকারি বাস্থাম দিতে যাব ল/খালভরাদের হাল কত ধুরে।
খালভরাকে খাতে দিলে চুল্‌হাশালে বসে ল
উচিত কথা ব'লতে গেলে পয়না নিয়েঁ উঠে।

জাওয়া গানে শাশুড়ী চরিত্রটিকে অত্যন্ত নীচমনা, স্বার্থপর এবং বধূপীড়ক রূপে দেখতে পাওয়া যায়—

২৫ শাসু কাদেশে বাবা ঢাকল ঢাকল পাত গ/শাসুয় বাঁটে মুঠা খানেক ভাত।
বাঁট বাঁট বাঁট শাসু আপন কা ভাত গ/নহর গেলে খাব দুধ ভাত।

বধূ ভাবে শাশুড়ীকে যদি বাঘে খেত, তাহলে সব ল্যাঠা চুকে যেত :

বনে যে গেলে শাসু বাঘে নাহি খাল্য গ/বাঘে খালে হতে আউদান।

খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই শাশুড়ী বধূ-নিগ্রহ করে থাকে :

শাউড়ী খায় ডা'ল ভাত শাউড়ী খায় ডা'ল ভাত
হামে খাই তিতা লাউ রে করলা।

পোশাকআশাকেও শাশুড়ীর জন্য ভাল শাড়ি, বধূর জন্য ছেঁড়া কম্বল :

শাস পিঁধে লীল শাড়ি দিদি পিঁধে লাল শাড়ি
হামে গ পিঁধে হামে পিঁধে ছিঁটল কম্বল।

নৃত্য-গীতের আখড়ায় গিয়ে বধূ নাচবে, তার উপায় নেই। শাশুড়ীর জ্বালায় তাই তাকে কপাট কোণেই নাচতে হয় :

শাস নাচে আখড়ায় দিদি নাচে আঁগনায়
হামে গ রই হামে রই টাটি কণায় ঠাড়।

দাদা বোনকে তার শ্বশুরালয় থেকে নিয়ে যেতে এসেছে। পিত্রালয়ে ফেরার জন্য তার মন চঞ্চল। তাই সে দ্রুতহস্তে ঘরগেরস্থালির কাজ শেষ করল। রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে সবাইকে খাইয়েদাইয়ে এবারে সে বিদায়ের উদ্যোগ আয়োজন করে। ক্রমান্বয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাশুর, জেঠানী, ননদ দেওর সবার কাছে সে বিদায়ের অনুমতি চাইতে গেল। সবাই জানাল তারা কেউ কিছু জানে না। শ্বশুর বলল শাশুড়ীর কাছে যেতে, শাশুড়ী বলল ভাশুরের মত নিতে ইত্যাদি :

২৬ চা'রকুন্যা পথ'রটি শান-বাঁধা ঘাট গ / চার্যকুনে উঠে মাগুর মাছ।
জালে ধরব মাছ আঁচলে ভরব গ / ঝাল বাঁটনা দিয়েঁ লহকে রাঁধব।
লহকে রাঁধব মাছ মহকে খাওব গ / হাত ধুয়েঁ শ্বশুর মাচিলায় বসবে।
মাচিলায় বসিয়েঁ শ্বশুর তুমি বড়লক গ / দেহ শ্বশুর আমারে বিদায়।

আমি কি দিব বহু তুমারে বিদায় গ / বুঝ্যে লিহ আপন শাশুড়ী।
মাচিলায় বসিয়েঁ শাসু তুমি বড় লক গ / দেহ শাসু আমারে বিদায়।
আমি কি দিব বহু তুমারে বিদায় গ / বুঝ্যে লিহ আপন ভাশুর।

এমনিভাবে গানের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। একে-একে ভাশুর জেঠানী ননদ দেওর একই কথা বলে এবং পরবর্তী জনের কাছে তাকে পাঠিয়ে দেয়। তার বিদায়ের ব্যাপারে তারা মতামত দেবার কেউ নয়। তবু বিভিন্ন গানে এই ধরনের পুনরাবৃত্তি দেখে অনুমান করা যেতে পারে, আদিম সমাজব্যবস্থায় বধূকে সবার কাছেই অনুমতি প্রার্থনা করতে হত। সবার কাছেই সে যেন নিতান্ত আজ্ঞাবহ দাসীমাত্র ছিল। যাহোক, সর্বশেষে বধূ তার স্বামীর কাছে গেল বিদায়ের অনুমতি চাইতে। অমনি তার স্বামী ক্রোধে ঝাঁঝিয়ে উঠে লাঠি হাতে প্রহারের হুমকি দিল :

মাচিলায় বসিয়েঁ সঁয়া তুমি বড় লক গ / দেহ সঁয়া আমারে বিদায়।
আন গ মঞ্জুরা ভাঙ্যে দিব ঠেঙ গিলা / ছাড়াই দিব নহরা কা আশ।

তার মনে হয় নারীজন্মটাই বৃথা, কেননা পরের ঘরে তাদের বুক পুড়ে যায়, অন্তর কাঁদে বেদনায় :

২৭ ক'লকা ফুল ক'লকা ফুল ফুটে লালে লাল গ
ঝি ছানার মিছা জনম কাঁ'দছে অন্তর।

ঝাড়খণ্ডের নারীসমাজের একমাত্র বিধিলিপি হল ক্রীতদাসীর জীবন যাপন করা। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, গালাগালি, প্রহার, অঙ্গহানি—শ্বশুরবাড়ীর লোকের, বিশেষ করে স্বামীর, খেয়াল খুশির ওপর নির্ভর করে। তবু ঝাড়খণ্ডী নারী সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সব কিছু নিঃশব্দে মুখ বুজে সহ্য করে, চোখের অশ্রুকে পাথর করে বুকের বেদনাকে আড়ালে ঢেকে জীবনাতিপাত করে থাকে। নিচের গানটি এখানকার সর্বংসহা বধূর এমন এক শ্রদ্ধেয় ছবি ফুটিয়ে তুলেছে যা ক্বচিৎ কদাচিৎ অন্য কোন লোকগীতিতে মেলে। প্রচণ্ড উৎপীড়ন অত্যাচারের মধ্যেও যে-নারী বলতে পারে 'মা-বাপকে বল্যে দিবে বড় সুখে আছি', এমন নারীর দর্শন অন্য কোন্ দেশের লোক-সাহিত্যে পাওয়া যায় আমরা জানি না; তবে এমন চরিত্র শুধু যে দুর্লভ তা নয়, বিরলও। অথচ এই 'বড় সুখে আছি' কথাটুকুর মধ্যে যে কি বুকভাঙা যন্ত্রণা, কতো অশ্রু কতো কান্না লুকিয়ে আছে, তা শুধুমাত্র তারাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, যাদের সঙ্গে তার আত্মার সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, তার এই খবর শুনে মা-বাপ ভাই-এর চোখ

ছলছল, মন কেমন-কেমন করে উঠল। মা ভালো মানুষের মেয়ে, তাই কথাটা শুনে কেঁদেই ফেলল। শ্বশুরবাড়িতে প্রহারে অত্যাচারে অনাহারে উৎপীড়নে এতোই দুর্বল যে স্নানের ঘাটে যাওয়া-আসার পথে দম নেবার জন্য বসে পড়তে হয়। তবু যেখানে 'শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি' সেখানে লোকজনের মাঝে তার ভাইকে বুক-ভাঙা বেদনার কথা বলতে পারে না। সে শুধু বলে, 'মা বাপকে বল্যো দিবে ভাই বড় সুখে আছি রে।' এমন মর্মস্পর্শী অথচ গভীর অর্থবহ পঙক্তি অন্যত্র দুর্লভ; এ-পঙক্তি আমাদের আবিষ্ট করে, আনন্দে-বেদনায় এমন রমণীকে শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে করে:

২৮ একদিনকার হল'দ বাঁটা তিনদিনকার বাসি গ
মা বাপকে বল্যো দিবে বড় সুখে আছি।
মা শু'নল বাপ শু'নল শু'নল সাধের ভাই গ
মা বড় সুজাতের বিটি কাঁ'দতে লাগিল।
একদিনকার হল'দ বাঁটা তিনদিনকার বাসি গ
যমুনাকে নাইতে গেলে পথের মাঝে বসি।
মা-বাপকে বল্যো দি'ব ভাই বড় সুখে আছি রে।
মা শু'নল বাপ শু'নল শু'নল সাধের ভাই গ
আর শু'নল জন্মের সংগতি।

শ্বশুরবাড়ি থেকে বধূ স্বচ্ছন্দ সাদর বিদায় পেয়েছে, এমন গান আমাদের সংগ্রহে নেই। আমরা ধরে নিতে পারি, বধূ চিরকালের মতো শ্বশুরালয়ে বন্দিনী হয়ে থাকেনি। দাদার সঙ্গে পিত্রালয়ে যাবার সুযোগ সে পেয়েছে। কোন বধূ হয়তো ফিরে গিয়ে তার মাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে যথারীতি দেখা হয়েছে। পিত্রালয়ে সে নিজে আর বধূ নয়, ভ্রাতৃজায়ার ননদ। কাজেই সেখানে সেও হয়তো 'কালভাঁড়কী ননদিনী'তে পরিণত হয়। যা হোক, 'ননদ-ভাজে দেখাদেখি' হয়, 'কার কেমন দশা' হয়তো দু'জনেই বুঝে দেখার চেষ্টা করে। সদ্য স্বামীগৃহ থেকে ফেরা ননদকে হয়তো-বা ভাজ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে: 'কি-অ যে কাঁদ ননদ গুকুরে গুকুরে গ।' ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে নিষেধ করলেও কি উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত মন প্রবোধ মানে! পিত্রালয়ে এসে সে শান্তি পায়, সান্ত্বনা পায়, সন্দেহ নেই। খাওয়া দাওয়া, বেশ-বাসে পরিবর্তন আসে:

২৯ তেঁত'ল পাতে ধান ঘাঁ'টলম পায়রা খদবদ করে গ

নহর গেলে তেল পালে খঁপা ঝলমল করে।

কিন্তু সাজসজ্জায় যতোই উজ্জ্বলতা আসুক না কেন, ভালোমন্দ খাবারের সুযোগ পাক না কেন, শ্বশুরবাড়ির গালাগালি সে কিছুতেই ভুলতে পারে না, প্রতি মুহূর্তে তা যেন তীক্ষ্ণমুখ স্থচের মতো তার হৃদয়ে বিদ্ধ হতে থাকে ঃ

৩০ শাগ তু'ললম লতাপতা মাছ ধ'রলম গেঁতা গ

শ্বশুব ঘরে গা'ল দি'ইছে হিয়ায় আছে গাঁথা।

ননদ-ভাজের সম্পর্ক কোনদিনই মধুর হয় না। শ্বশুবালয়ে বধূজীবনে সে যেমন ননদের খোঁটা, কুৎসা, পীড়ন ভোগ করেছে হয়তো পিত্রালয়ে সেও একই ধরনে ভাজদের খোঁটা, কুৎসায় বিব্রত করে তোলে। হয়তো বড়ভাজকে বলেই বসল,

৩১ হাত ভরি ভরি সুরু শাঁখা মুখ ভবি ভরি পান গ

বড় বহুর ঝাট্যান পাট্যান কাম।

ঝাট্যান পাট্যান ধান বহু কাকে দিয়েঁ আলি গ

পাছে বহু চিড়া কিনেঁ খালি।

চিড়া কিনেঁ খালি বহু দই কুথায় পালি গ / তকে বহু দেয় তর ভাই।

তীব্র এবং তীক্ষ্ণ খোঁটার উপস্থিতিটা সহজেই অনুভব করা যায়। দই চিঁড়ে ঝাড়খণ্ডের বিলাসের খাদ্যবস্তু। শ্বশুরালয়ে বধূর তা পাবার উপায় নেই। সে কিছু অপরাধ করুক বা না করুক খোঁটা, নিন্দা সহ্য করতেই হয়। গানের ভেতর দিয়ে ননদের খোঁটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। প্রথমাংশে দেখা গেল, ঘরের ধানচাল গোপনে পাচার করে খাবার জোগাড়ের প্রতি ইঙ্গিত এবং খোঁটার সাথে-সাথে আরো কিছু সন্দেহ আছে। পরবর্তী অংশে এর তীব্রতা ক্রমবর্দ্ধমান।

হাত ভরি ভরি সুরু শাঁখা মুখ ভরি ভরি পান গ

বড় বহুর ঝাট্যান পাট্যান কাম।

ঝাট্যান পাট্যান ধান বহু কাকে দিয়েঁ আলি গ

পাছে বহু পান কিনেঁ খালি। / পান খাইলি বহু খয়ের কুথায় পালি গ

তকে বহু দেয় পাড়ার লকে।

পাড়ার লোকে বিনা স্বার্থে বধূকে কোন কিছু দিতে পারে না; অতএব এই ইঙ্গিতটুকু যথেষ্ট কটু, কুৎসিত এবং বধূর চরিত্রহননের অপচেষ্টা—সহজেই বোঝা যায়।

জাওয়া গীতে নারীর বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক, অসদ্ভাব কিংবা

তার তিক্ত অভিজ্ঞতা, যন্ত্রণাবেদনা ইত্যাদি প্রধান অংশ দখল করে থাকলেও তার ঘর-গেরস্থালির টুকিটাকিও এর অন্তর্গত হয়ে আছে। 'মাছ রাঁধোছি চাকা চাকা,' 'বালি ছাতুর তরকারি,' 'লাল লট্যা নীল লট্যা মেশাঁই রাঁধিব' 'ইচলা মাছের ঝোল,' 'ছাগল ঠেঙের পিঠা পড়া,' 'পস্ত বাঁটি ঘসর-ঘসর মুগ-কলাই-এর ডা'ল' 'আঁশ পাল্‌হা বাঁশ পাল্‌হা ছুলকাঁই রাঁধব' 'পস্ত দিয়েঁ রাঁধব গেঁতা মাছ, 'ঝাল বাঁটনা দিয়েঁ লহকে রাঁধব/লহকে রাঁধিব মাছ মহকে খাওব', 'ঝিঙা তুলি ডালি ডালি আরই ঝিঙার জালি/ফলুক বাছা রাঁ'ধব তরকারি' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে এবং বাক্যাংশে ঝাড়খণ্ডী রমণীর রন্ধনভাবনার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব ছবি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

জাওয়া গীতের বিষয়বস্তুতে তেমন কোন বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-গান একান্তভাবে নারীসমাজের হওয়ার ফলেই সম্ভবতঃ বিভিন্ন অনুভবের বর্ণসমারোহ এই গীতে দেখা যায় না। সম্পূর্ণ ঘরগেরস্থালির কথাই এতে স্থান পেয়েছে। পারিবারিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-বেদনা জাওয়া গীতের আকাশকে কখনো আলোকিত কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে! শ্বশুর বাড়ির প্রসঙ্গে রমণী-মন যেমন কঠোর হয়েছে, তেমনি পিতৃগৃহের কথায় কোমল হয়েছে। পিতৃগৃহের প্রসঙ্গে মা-বাপের চেয়ে ভাই বা দাদার প্রসঙ্গ অনেক বেশি উজ্জ্বল অন্তরঙ্গ ভাষায় গীতবদ্ধ হয়েছে। মূলতঃ ঘরোয়া বিষয়-বস্তুই এ-গীতের উপজীব্য হলেও স্বল্প রেখার টানে অন্য কয়েকটি বিষয়বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'আ"খ বাড়ির ধারে ধারে কাহার ছাল্যা কাঁদে গ / আস ছাল্যা কলে লিব বড় দয়া লাগে', গানটিতে বাৎসল্য রসের আমেজ আছে। জাওয়া গীত নারীসমাজের হলেও, আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এ-গানে বাৎসল্যরস-সমৃদ্ধ সন্তানপ্রসঙ্গ একেবারেই নেই।

জাওয়াগীতে প্রেমের প্রসঙ্গও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রেমের গান বলা যেতে পারে এমন গান সত্যিই বিরল। তবে বাগালদের জন্য নারীমনের কোণে যে একটু স্থান থাকে, তা বিভিন্ন ঝাড়খণ্ডী লোকগীতিতেই প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও একটি গীতে প্রেমের সামান্য আভাস মেলে—

৩২ মাট্যাবাঁধির কাড়াবাগাল দখিন দিগে খুলে গ
হাতে লাঠি কাঁধে ছাতা চ'লল বাগালি।
মাট্যাবাঁধির কাড়াবাগাল দখিন দিগে খুলে গ
হাতে লাঠি কাঁধে ছাতা টুইলা বাজাছে।

হাঁসিতে খেলিতে বাগাল লাগাল্য মহিনী গ / লাগি যায় ত জগমহিনী।

আমরা জাওয়া গীতের আলোচনা একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ দিয়ে শেষ করব। করম পূজার দিন সারাদিনে যেমন ষোলবার নাচবার নিয়ম আছে, তেমনি পাশের গ্রামে গিয়ে জাওয়া নৃত্য-গীতের নিয়মও আছে। কোথাও কোথাও আবার কোন একটি মাঠে পাঁচসাতটি গ্রামের মেয়েরা জড়ো হয়ে নৃত্যগীতের আসর বসায়। ফলে রেষারেষি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। প্রতিপক্ষ দলকে ঘায়েল করবার জন্য গানে-গানে গালাগালি, নিন্দা কুৎসা অবারিত ভাবে বর্ষিত হয়। জাওয়া শস্যোৎসব। শস্যের বৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের কামনায় একদা বিভিন্ন আদিম সমাজে গালাগালি, অশ্লীলগান ও বাক্যালাপের রীতি প্রচলিত ছিল। এর ফলে শস্যকে অপদেবতার হাত থেকে বাঁচানো যায় বলে লোকবিশ্বাস ছিল।

৩৩ পাথরাঘাটির ছানাগিলাব গঁছা গঁছা চু'ল গ
মচড়ায়েঁ বাঁধ্যেছে মাথা রেশম গেঁদা ফুল।
মালকুঁড়ির ছানাগিলার বিচু রিচু চু'ল গ
মচড়ায়েঁ বাঁধ্যেছে মাথা যেমন ফুচির ডিম।
পাথরাঘাটির ছানাগিলার চু'ল গঁছা গঁছা গ
চুয়াচন্দনে ঘঁষা মাথা।
মালকুঁড়ির ছানাগিলার চু'ল কেনে জঁটা গ
চিলে শুগুনে করে বাঁসা।

॥ তিন ॥

জঁাত গান

জঁাত গান বলতে ঝাড়খণ্ডে মনসামঙ্গলের গানকেই সাধারণতঃ বোঝানো হয়ে থাকে। মনসামঙ্গলের গানকে 'মনসা-জঁাত,' এমন-কি শুধু 'জঁাত'-ও বলতে শোনা যায় ('জাত' শব্দটিও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে)। জঁাত বা জাত শব্দটির ব্যুৎপত্তি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। উৎপন্ন অর্থে যে জাত শব্দ তার সঙ্গে জঁাত বা জাত শব্দের কোন অর্থসামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

মনসা পূজা উপলক্ষ্যে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল পুঁথি থেকে গান করা হয়। ঢাকী (ডম্বরু জাতীয় যন্ত্র) বাজিয়ে একটি বিশিষ্ট সুরে এই গান গাওয়া হয়। একটি ধ্রুবপদ বা ধুয়ো কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে সুর এবং তালমান ঠিক করা হয়। এই ধ্রুবপদটিই জাঁত নামে পরিচিত। জাঁত গান সব সময় মূল কথাবস্তু অর্থাৎ মনসা চাঁদ সদাগর বেহুলা-লখিন্দর সম্পর্কিত হবেই এমন কোন কথা নেই। বহু ক্ষেত্রেই মনসামঙ্গলের কাহিনীর ধ্রুবপদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই জাঁত গানগুলো কখনো কাহিনী-সম্পর্কিত, কখনো রাধাকৃষ্ণ-সম্পর্কিত, কখনো বা লৌকিক জীবন-সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এই জাঁতগুলো খুবই স্বল্পায়তনের হয়ে থাকে, অনেকটা করম নাচের গানের মতো; আয়তনে চরিত্রে মেজাজে খুব একটা পার্থক্য ধরা পড়ে না। কখনো কখনো করম নাচের গানও সরাসরি মনসামঙ্গলের জাঁত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রধানতঃ লৌকিক জীবন-সম্পর্কিত জাঁত গান গুলোরই আলোচনা করব।

প্রথমে দু'একটি মনসামঙ্গলের কাহিনী-সম্পর্কিত জাঁত গান উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

১. তাই গুড় গুড় বাজনা বাজে কন গাঁয়ের বর।
   চাঁদ সদাগরের বেটা ভালাই লখিন্দর॥

২. তাই গুড় গুড় বাজনা বাজে নিছনি নগরে।
   চাঁদ বান্যার বেটার বেহা সায় বান্যার ঘরে॥

ওপরের গানগুলোতে বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ের প্রসঙ্গ রয়েছে। 'মনসার ডরে / সাঁতালি পর্বতে বান্যা লহার বাসর গড়ে।' কিন্তু তবু শেষ রক্ষা হয় না; কাল নাগিনীর দংশনে বিষজর্জ্জর লখিন্দর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বেহুলার সকরুণ কান্না আর দীর্ঘশ্বাস লোহার বাসর ঘরের চার দেয়াল ছাপিয়ে সাঁতালি পর্বতের সীমানা ছাড়িয়ে ঝাড়খণ্ডের জন-মানসেও তা ছড়িয়ে পড়ে আর এখানকার মানুষগুলোকেও বেহুলার কান্নার দোসর করে তোলে।

৩. আমার প্রাণনাথে ঘেরিল কালিয়ার গরলে।
   আমার এ রূপ যৌবন গেল বিফলে॥

৪. আমি কার কাছেতে যাঁয়ে ডাঁড়াব।
   আমার সাধের পরাণপতি কেমনে পাব॥

স্বামী নেই, কাছে দাঁড়াবার কোন লোক নেই। বেহুলার মনে তাই শোকোচ্ছ্বসিত প্রশ্ন : আমার সাধের পরাণপতি কেমনে পাব। তার এই বেদনা দরদী হৃদয়ে অনাবৃত অকুণ্ঠ সহানুভূতির সঞ্চার করে :

৫. বেহুলা ভাঁসে রে ভাঁসে রে অগম দরিয়ায়
 অভাগিনী বেহুলার নাই রে গাছের তলা ॥

এই সব গানে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ থাকলেও বৈষ্ণব পদাবলীর নায়ক-নায়িকার সঙ্গে খুব বেশি মিল নেই, বরং লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবেই এদের পরিচয় সবিশেষ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

৬. কন বনে বাজিল বাঁশি শুন গ মরম সই।
 বিনা সুতায় হার গাঁথ্যেছি কালা আল্য কই ॥

৭. শামের বাঁশি বাজে ল কাল্যার বাঁশি বাজে ল কদমতলায়
 চল সজনী জলকে যাব কলসী কাঁখে আয় ॥

৮. সখি, অই বনে কে বাজায় বাঁশি।
 আয় গ সখি চল গ তরা দেখ্যো আসি মনচরা
 বরং কুল রয় রবে কুল যায় যাবে দেখ্যো আসি ॥

এ-প্রেম-ভাবনা নামে রাধার, আসলে কোন লৌকিক নায়িকার। বংশীধ্বনি ঝাড়খণ্ডের লৌকিক প্রেমগীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বংশীধ্বনি গৃহকোণে আবদ্ধ কুলনারীদের বুকে গভীর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, দুর্বার বিদ্রোহিনীর মতোই তখন তারা বলতে পারে : 'বরং কুল রয় রবে কুল যায় যাবে দেখ্যো আসি।' প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে তাদের মন কেমন-কেমন করে :

৯. কাক ডাকে কঁকিলা ডাকে আর ডাকে কে রে
 ককিলার সুরে, মন আমার কেমন কেমন করে ॥

জাঁত গানের মধ্যে লোকজীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের কথাও রূপ লাভ করেছে। মাঝে মাঝে এক একটি গান আমাদের উপভোগে কৌতুক রসের সঞ্চার করে। লোকজীবনের অন্নচিন্তা থেকে শুরু করে প্রেম-ভাবনা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই জাঁত গানের বিষয়বস্তু হতে পারে। মনসামঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে এই সব জাঁত গানের কোনই সামঞ্জস্য থাকে না, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। মনসামঙ্গলের ধ্রুবপদ হিসেবে এই সব গান গাওয়া হয়।

১০. বনে পা'কল পিয়াল।
 যত ছানার গণ্ডগোলে পালাল্য শিয়াল ॥

১১. মাসী দঁড়বি গ দঁড়বি গ কাওয়ায় জন্‌হা'র থাছে।
বাড়ি বাটে খে'দতে গেলে পিঁদাড় বাটে যাছে ॥

১২. মশা কামড়িল কামড়িল খরখস্তা গায়।
যত ছেল্যা মিলে তারা তাল কুড়াতে যায় ॥

১৩. ঘরে ভাত নাই ভাত নাই শাগ তু'লতে গেছে।
বাড়ি-এ আছে সনলা মুড়া গাঁড়র লাগ্যে গেছে ॥

১৪. বেহাই যাছ হে বাস্থাম খাঁয়ে যাও।
কেঁদকুঁড়া মরিচ গুঁড়া গাঁইঠে বাঁধ্যে লাও॥

১৫. জামাই ভাত খাঁয়ে যাও, জামাই ভাত খাঁয়ে যাও, লইতন তরকারি।
শিল ভাঙ্গা নড়াপুড়া জাঁতার চড়চড়ি ॥

॥ চার ॥

ভাদু গান

ভাদুপুজা পূর্ব মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্দ্ধমান, বীরভূম জেলার অংশ বিশেষ এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার উত্তর সীমান্ত জুড়ে সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাচীন ঝাড়খণ্ডের বেশ কিছু অংশ এই বিশিষ্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হলেও ভাদু-উৎসব কোন ক্রমেই ঝাড়খণ্ডের উৎসব নয়। নিম্নবর্ণের বাগদী-বাউরী-ডোমের মধ্যে ভাদুপূজার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও এ-পূজায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ভাদুগানের ভাষায় ভাষাতত্ত্বের বিচারে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রভাব একেবারেই লক্ষ্য করা যায় না। অন্ততঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীর কুমার করণ, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় আদির সংগ্রহ থেকে আমরা এ-ধরনের নিদর্শন খুঁজে পাই নি। ভাদুগান শুধু যে ঝাড়খণ্ডের লোকসংগীত হিসেবেই গ্রহণযোগ্য নয়, ভাদুগান ঝাড়খণ্ডী লোকভাষাতেও রচিত নয়, তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি ডঃ ধীরেন্দ্র নাথ সাহা এই গানের জন্য তাঁর গ্রন্থ 'ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান'-এ সামান্যতম স্থানও দেন নি।

ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট আদিবাসী-অর্দ্ধআদিবাসী ঝাড়খণ্ডী উপভাষী লোকে-

দের মধ্যে প্রধানতম হল মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা। এর পরই কামার কুমোর বাগাল কুইরী মাল খাড়িয়া লোধা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ঝাড়খণ্ডের এই সব আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ভাদুপূজার প্রচলন নেই। তবু যেহেতু এই ভাদু-উৎসব ঝাড়খণ্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাই ঝাড়-খণ্ডের লোকসাহিত্য পরিক্রমায় ভাদু গানের আলোচনা স্বল্প পরিসরে হলেও অপরিহার্য।

ভাদু উৎসব ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভাদুনামের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, ভাদ্রমাসের উৎসব বলে এর নাম ভাদু; আবার কেউ-বা বলেন, পঞ্চকোট রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরী বা ভাদুরানীর নাম অনুসারেই এর নাম ভাদু। আমাদের মনে হয় দ্বিতীয় মতটিই ঠিক। ঝাড়খণ্ডে মাসেব নামানুসাবে পূজা-উৎসবের নামকরণ করা হয় নি। তাছাড়া ভাদুপূজা খুব বেশি প্রাচীনতার দাবি করতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজা নীলমণি সিংহদেব পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং ইংরাজ সরকাব কর্তৃক বন্দীও হন। তাঁরই কন্যা অপরূপা সুন্দরী ভদ্রেশ্বরীর অনূঢ়া অবস্থায় অকালমৃত্যুকে কেন্দ্র করে টুসু পূজার অনুকরণে ভাদুপূজার সূত্রপাত করা হয়। তবু এই পূজা একটি বিশিষ্ট অঞ্চলে এবং কয়েকটি গোষ্ঠী ছাড়া বিশেষ প্রসার লাভ করে নি। অথচ ঝাড়খণ্ডের অন্যান্য লোক-উৎসব রোহিন, রজঃস্বলা, চিত্ত, গোমা, মনসা, করম, জাওয়া, বাঁধনা, টুসু, ভক্তা (চৈত্র পরব) সামগ্রিকভাবে সর্বত্র সাধারণ মানুষের প্রাণকে স্পর্শ করে থাকে। এই সব উৎসবই ঝাড়-খণ্ডের সত্যিকার লোক উৎসব, আঞ্চলিক উৎসব বা জাতীয় উৎসব। আসলে ভাদুপূজার মধ্যে নায়ক-পূজার সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। পর্বটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক পর্ব। তাই এটি একদিকে যেমন জন-উৎসব হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তা শস্যোৎসব হিসেবেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ভাদু উৎসবকে 'আদিবাসীরই করম উৎসবেরই একটি হিন্দুসংস্করণমাত্র' বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না। করম উৎসব আসলে বৃক্ষপূজা, করম উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শস্যোৎসব। হিন্দুপ্রভাববশতঃ করম উৎসবই বঙ্গীয় সমাজে ভাদু উৎসবের রূপ নিয়েছে, ভাবা চলে না। করম উৎসবের মতো ভাদু

উৎসব বৃক্ষ-পূজার উৎসবও নয় কিংবা শস্যোৎসব-ও নয়। ভদ্রেশ্বরী বা ভাদুরানীর নামানুসারেই মনে হয় এই উৎসবের দিনক্ষণ স্থির হয়েছে ভাদ্র-সংক্রান্তিতে এবং ঝাড়খণ্ডের সর্বাধিক প্রাণচঞ্চল জাতীয় উৎসব টুসুর অনুকরণে সারা ভাদ্রমাস জুড়ে কুমারী কন্যাদের ভাদুগান গাওয়ার রীতিও প্রচলিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, টুসু গানের সুর এবং কথাও সরাসরি অপরিবর্তিতভাবে ভাদুগানে গ্রহণ করা হয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্য কিভাবে ভাদুগানের সুরে টুসু গান গাওয়ার সিদ্ধান্তে পৌছলেন, আমরা তা অনু-ধাবন করতে পারি নি। ভাদু যদি শস্যোৎসবই হত এবং ভদ্রেশ্বরী-সম্পর্কিত কাহিনী যদি নিতান্তই কিংবদন্তী হত তাহলে তা সংকীর্ণ অঞ্চল এবং গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত না। জনজীবনকে সামগ্রিকভাবে যে-উৎসব স্পর্শ বা প্রভাবিত করতে পারে না, তা লোক-উৎসব হলেও প্রাচীন কোন শস্যোৎসব হতে পারে না। তার উৎস এবং আবির্ভাব তাই খুবই সম্প্রতিকালের হওয়াই সম্ভব। তবে বহিরাগত বঙ্গীয় হিন্দুসম্প্রদায় যদি করম জাওয়ার অনুকরণে ভাদ্রফসলের উৎসব হিসেবে ভাদুর প্রবর্তনা করে থাকে, তাহলে বলার কিছু থাকে না। অবশ্যি সেদিক দিয়ে বিচার করলেও ভাদুউৎসবের আবির্ভাব খুবই সম্প্রতিকালের হওয়াই স্বাভাবিক। করমের পর ঈদের মতো ভাদু-বিসর্জনের দিন ছাতা পরব এ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় যা ঈদেরই অনুকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। ছাতা পরব ভাদুর মতোই ধলভূম-ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় না।

টুসু গান যেমন সারা পৌষমাস ধরে গাওয়া হয়ে থাকে এবং পৌষ সংক্রান্তিতে টুসুর বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গীতোৎসবের সমাপ্তি ঘটে থাকে, ভাদুর ক্ষেত্রেও তেমনি সারা ভাদ্রমাস জুড়ে ভাদুপ্রতিমা সম্মুখে রেখে কুমারী কন্যারা গানে-গানে রাত্রির প্রথম প্রহরকে মুখর করে রাখে এবং ভাদ্রসং-ক্রান্তিতে ভাদুপ্রতিমার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এর-ও গীতোৎসবের পরি-সমাপ্তি ঘটে থাকে। এ-উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গ হল সংগীত। পূজা-অর্চনা ভাদু উৎসবের অপরিহার্য অনুষঙ্গ নয়।

ভাদু গানের মধ্য দিয়ে নারীসমাজের নানাবিধ কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কারো কারো মতে, ভাদুগানে কুমারীহৃদয়ের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাই রূপায়িত হয়ে থাকে। আরম্ভে হয়তো তাই ছিল, কিন্তু বর্তমানে ভাদুগানে সব প্রসঙ্গই স্থান লাভ করে থাকে। টুসু গানের মতো ভাদু গানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখা যায়।

তাই স্বাভাবিকভাবেই গানের মধ্য দিয়ে নিন্দা, কুৎসা রটনা, এমন কি অশ্লীল কেচ্ছাকাহিনীও প্রকাশ পেয়ে থাকে। দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বীদল যে একে অন্যের ভাদুকে আক্রমণ করবে, নিন্দা করবে, কুৎসা রটাবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, বরং টুসু ও ভাদুগানের এটা একটা অনিবার্য এবং অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এ-ধরনের গানে অনেক সময়ই গ্রাম্যতা এসে যায়, যা পরিবেশ প্রতিবেশের কথা মনে রাখলে স্বাভাবিক বলেই মনে হবে :

১. ও পাড়াতে দেখে এলাম চিপসে ভাদু গড়েছে।
নড়ে না চড়ে না ভাদু সন্নিপাতে ধরেছে॥
তদের ভাদু অনামুখী লো, ভেবে দেখ মনে মনে।
তপড়াগালী চেপটাবুকী পান্তাখাকী তার সনে॥
আমার ভাদুর স্বর্গশোভা লো, তোদেব পাতাল ভুবনে।
সত্য মিথ্যা দেখ না চেয়ে চোখ থাকিতে অন্ধ কেনে॥

ভাদ্রমাসের প্রথম দিন থেকে কুমারী কন্যারা ভাদুপ্রতিমা সম্মুখে রেখে সংগীত-চর্চা শুরু করে। আগমনী গান ভাদু গানে অপরিহার্য রূপে ঢুকে পড়েছে। বলাবাহুল্য, বাঙালীর উচ্চ সংস্কৃতির দুর্গাপূজার প্রাক্কালে যেমন আগমনী এবং আবাহনী গীত গাওয়া হয়ে থাকে, তেমনি গিরিকন্যা উমার পিত্রালয়ে ফেরার মতো ভাদুর পিত্রালয়ে ফেরার কথাই যেন গানে-গানে ঘোষিত হয় :

আদরিণী ভাদুরাণী এল আজি ঘরকে।
২. ভাদুব আগমনে, / কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে।
ভাদু আজি ঘরে এলো গো এলো গো শুভদিনে।
মোবা, সাজি ভর্তি ফুল তুলেছি যত সব সঙ্গিগণে॥
মোরা, সারা রাতি করব পূজা গো ফুল দিব গো চরণে।
আনব সন্দেশ থালা থালা খাওয়াব ভাদুধনে॥

কাশীপুরের রাজকন্যা ভাদু সোনার খাটে বসে রুপোর খাটে পা রেখে হীরে দিয়ে দাঁত মেজে থাকে :

৩. কাশীপুরের রাজার বিটি সোনার খাটে বসন।
রুপার খাটে চরণ দিয়া হীরায় দাঁত ঘঁষণ॥

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজকন্যা ভাদু আর কাশীপুরের রাজ-অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। সে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে, দেশে-দেশান্তরে। রাজবাড়ি ছেড়ে সোজা গিয়ে হাজির হয় বাগদী বাড়িতে।

৪. কাশীপুরের বাজার বিটি বাগদী ঘরে কি কর।
হাতের জালি কাঁখে লয়ে সুখ-সায়রে মাছ ধর॥
মাছ ধরণে গেলে ভাদু ধানের গুছি ভাঙিও না।
একটি গুছি ভাঙলে পরে পাঁচ সিকা জরিমানা॥

ভাদু যেন কোথাও আবদ্ধ থাকে না। সে গ্রাম থেকে শহরে চলে যায় এক নিমেষে। তার বিয়েরই বা কি বিচিত্র আয়োজন।

৫. বেড়ো বাঁধে বেড়ো বাঁধে বেড়ো বাঁধে কে তুমি।
শেওড়া গাছে ডগ মেলেছে হরতকী তলায় আমি॥
আমার ভাদুর বেড়োয় বিহা পঞ্চকোট শ্বশুর ঘর।
পুরুলিয়ায় বাজবাজনা আসনশোলে বাসরঘর॥

বলাবাহুল্য, কিংবদন্তীর ভাদুরানীর অনূঢ়া অবস্থায় অকালমৃত্যু হয়েছিল। ভাদুরানী ছিল রাজারানীর নয়নের মণি, প্রজাসাধারণের ভালোবাসার ধন। তাকে তারা আদরে ভালোবাসায় ধরে রাখতে চেয়েছিল :

৬. বেড়া যাব পদ্ম আনব বেনাই দিব সিংহাসন।
তার ভিতরে খেলা করে রাজকুমারী ভাদুধন॥

কিন্তু রাজকুমারী ভাদুধন সিংহাসনের মায়া কাটিয়ে ভালোবাসার বাঁধন ছিঁড়ে অজানা লোকে যাত্রা করল। শোকার্ত প্রজাসাধারণ তাই ভাদুর স্মৃতি-পূজার আয়োজন করল। আর সেইস্মৃতি পূজার গানের মাধ্যমে অন্ততঃ তারা ভাদুরানীর বিয়ের প্রসঙ্গকে টেনে আনল। ভাদুগানে তাই বিয়ের প্রসঙ্গ একটি অপরিহার্য বিষয়বস্তু। বলা বাহুল্য, টুসু গানও এর ব্যতিক্রম নয়।

অপরূপা রূপবতী ভাদুরানী। রমণীসৌন্দর্যের বৃদ্ধির জন্য হলুদের স্বর্ণ রঙের যোগসাজস প্রয়োজন। ভাদুর তার প্রয়োজন পড়ে না। তবু লোকের প্রশ্নের মুখে তাকে বলতেই হয়, শাশুড়ী ননদ হলুদ-মাখা পছন্দ করে না।

৭. হলুদ বনে ছিলে ভাদু হলুদ কেনে মাখ না।
শাশুড়ী ননদী বলে হলুদ মাখা সাজে না॥

ভালোবাসার ধন ভাদুকে সাজাবার কতোই না কামনা-বাসনা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে। ভাদু যেন ঘরের মেয়ে; পরের ঘর করতে যাবে, সেখানে সে কি পরবে, কি খাবে ইত্যাদি চিন্তা মা-বাপকে অস্থির করে তোলে। তাই মেয়ের সাধ মিটিয়ে নিজেদের সাধ্যমতো গহনা-পত্রে মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে শ্বশুরালয়ে পাঠায় বিচ্ছেদকাতর মা-বাপ :

৮. কি কি গয়না লিবি ভাদু বল না গো আমারে।
পায়ে লিব নেপুর তোড়া সাজাবো গো বাহারে ॥
আর কি কি গয়না লিবি ভাদু বল না গো আমারে।
নাকে লিব নথের টানা সাজব গো বাহারে ॥
কি কি শাড়ি লিবি ভাদু বল না গো আমারে।
কদমফুল্যা শাড়ি লিব শায়া লিব বাহারে ॥

এমনিভাবে ভাদুকে কেন্দ্র করে নিজেদের কামনা-বাসনার কথা গানে-গানে প্রকাশ করতে করতে ভাদ্রমাস ফুরিয়ে যায়। আসে সেই অমোঘ বিদায় বা বিসর্জনের দিনটি। মাসাবধি যে মৃন্ময়ী প্রতিমাকে তারা পূজা করে এসেছে. যার সম্মুখে নিজেদের হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার কথা গানে-গানে প্রকাশ করেছে, এবার সেই ভালোবাসার ধন ভাদুরানীকে বিদায় দেবার পালা। মাটির প্রতিমাও হৃদয়ে মোচড় দিয়ে বেদনার সৃষ্টি করতে পারে, এই মুহূর্তে তারা তা অনুভব করতে পারে। বুক-ভাঙা বেদনায় গান গাইতে গাইতে প্রতিমাগুলো বয়ে নিয়ে তারা কোন পুষ্করিণী বা নদী-তীরে যায়। এ অনেকটা বিজয়ার বিসর্জনের মতো ব্যাপার, বেদনার পরিমাণও তাই কোন অংশে কম থাকে না। এতো কালের স্মৃতিবিজড়িতা ভাদুরানীকে বিসর্জন দিতে গিয়ে তাই সংগীত যেন আর্তহাহাকারে পরিণত হয় ঃ

৯. প্রাণে ধৈর্য ধরে / প্রাণের ভাদু বিদায় দিই কেমন করে ॥
সারা বছর কেঁদে-কেঁদে গো পেয়েছি বছর পরে।
সুখের হাট ডুবাই কেমনে বিপদেরি সাগরে ॥
সুখের বাদী হয়ে সদা দুঃখ দেয় কঠিন অন্তরে।
জুড়াইব দুঃখজ্বালা গো কাহার চাঁদবদন হেরে ॥

॥ পাঁচ ॥

কাঁঠি নাচের গান

কাঁঠি নাচ বা কাঠি নাচের অনুশীলন সাধারণতঃ করম পরব শেষ হবার পরই শুরু হয়ে থাকে। আখড়ায় প্রধানতঃ কিশোরবয়সী ছেলেদের এই নাচে সুশিক্ষিত করে তোলা হয়। তবে সর্বসাধারণ্যে সেজেগুজে নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হয় দুর্গাষষ্ঠীর দিন থেকে এবং বিজয়াদশমী পর্যন্ত চলে। এই দিনগুলোতে নৃত্যকারীরা নিজেদিগকে স্ত্রীলোকের বেশবাসে সজ্জিত করে থাকে। পরিধানে থাকে শাড়ি, যা মেয়েলি ঢঙে না পরে মালকোঁচা করে পরা হয়ে থাকে। কখনো কখনো আবরণ দিয়ে মাথাটি ঢেকে চুলের অভাব লোকচক্ষু থেকে আড়াল করা হয়। সর্বশরীরে রমণীদের অলংকার শোভা পায়। কানে দুল, নাকে ফুল, গলায় হার বা সোনার মাদুলির ছড়া, হাতে চুড়ি এবং পায়ে ঘুঙুর অথবা নূপুর। দুই করতলে ধরা থাকে দু'টি রুমাল, যা নৃত্যের তালে-তালে হাতের মুদ্রায় বাতাসে ওড়ানো হয়ে থাকে। সুদূর বা অদূর অতীতে যদি এই নৃত্য সম্পূর্ণতঃ নারীসমাজের এক্তিয়ারভুক্ত থেকে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। কাঁঠি নাচ করম নাচ বা জাওয়া নাচের মতো সহজ তালমান-লয়ের নয়। স্বভাবতঃই এর মধ্যে উচ্চমার্গের নৃত্যকলার সন্ধান মেলে। তবে ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য বলতে যা বোঝায়, কাঁঠি নাচ মোটেই তা নয়, লোকনৃত্যের সমস্ত লক্ষণ এর মধ্যে বর্তমান; কখনো-কখনো উচ্চাঙ্গ নৃত্যের কিছু কিছু লক্ষণ আভাসিত হয়ে থাকে মাত্র। ছো নাচের মতো পরিশ্রমসাধ্য নৃত্য নয় কাঁঠি নাচ, আবার জাওয়া নাচের মতো বিলম্বিত লয়ের রমণীসুলভ নৃত্যও নয় এটা। বলা যেতে পারে, করম নাচ এবং ছো নাচের মধ্যবর্তী দেহকলাগত নৃত্য হল কাঁঠি নাচ। কাঁঠি নাচের বৈশিষ্ট্য হল হাত এবং পায়ের বিভিন্ন মুদ্রার গতিভঙ্গি।

বর্তমানে কাঁঠি নাচে কাঠির ব্যবহার একেবারে কমে এসেছে। তবু কাঠি নিয়ে এক আধটা নাচ এখনো অনুষ্ঠিত হয়; বলা চলে, অতীতের জের টেনে দেখাতেই হয়। দু'হাতে কাঠি নিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ের ভঙ্গিতে নৃত্য করতে হয়। বাজনার তালে-তালে দ্রুত গতিতে একে অন্যের কাঠির আঘাতকে প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করে থাকে, এরি মধ্যে মাথা বাঁচিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে গলে পার হয়েও যেতে হয়। খুব সম্ভব, অতীতে এটি

যুদ্ধেরই নৃত্য ছিল। অন্ততঃ লাঠিয়ালদের লাঠি খেলার সমস্ত লক্ষণই এই কাঠিসহ নৃত্যের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। কারো কারো মতে যুদ্ধনৃত্য সামন্ত রাজাদের বৃত্তিভোগী পাইকরা দুর্গোৎসব এবং অন্যান্য সময় রাজা জমিদারদের সম্মুখে প্রদর্শন করত। আমরা এই মত আংশিকভাবে এইটুকু মানতে পারি যে, এটি অতীতে যুদ্ধনৃত্যই ছিল, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এর অনুষ্ঠানের কথা মেনে নেওয়া যায়না। কেননা কাঁঠি নাচ করম পরবের পর থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারপর এ নাচের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। কিংবদন্তী শোনা যায়, এই নৃত্য রাম-রাবণের যুদ্ধের স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাঁঠি নাচ রামের সৈন্যদের নৃত্য এবং সাঁওতালদের দশাঁয় বা ভুয়াঙ নাচ রাবণের সৈন্যদের নৃত্য। এ কিংবদন্তী অলীক কিংবদন্তী ছাড়া কিছু নয়; তবে এর সার নির্যাস, সৈন্যদের নৃত্য বা যুদ্ধনৃত্য যে এই কাঁঠি নাচ তা অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তীকালে এই নৃত্যের ওপর বৈষ্ণব প্রভাব যে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমানে কাঁঠি নাচের গান হিসেবে সাধারণতঃ বৈষ্ণব পদাবলী গাওয়া হয়ে থাকে, কখনো-কখনো রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী-ভিত্তিক গানও গাওয়া হয়ে থাকে। নৃত্যগীতে আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মাদল এবং করতালই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদাবলীগীতি-মুখরিত রমণীবেশভূষায় অনুষ্ঠিত এই নৃত্যের ওপর রাসনৃত্যের প্রভাব পড়ে থাকাও অসম্ভব নয়।

কাঁঠি নাচ হাতে-হাতে ধরাধরি করে অনুষ্ঠিত হয় না। এই নৃত্যে নৃত্যকারীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, কিন্তু নৃত্যের সময় অর্ধবৃত্তাকার পঙক্তি যথাসম্ভব রক্ষা করে চলতে হয়। এই বৃত্তাকার নৃত্যও ঘড়ির বিপরীত নিয়মে (anti-clockwise) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাঁঠি নাচে নৃত্যকারীর মুখ সাধারণতঃ পঙক্তির বৃত্তরেখার দিকে অর্থাৎ সম্মুখের লোকটির পিঠের দিকে ঘোরানো থাকে। তবে নৃত্যের প্রয়োজনে তালে-তালে নৃত্যকারীকে কখনো ডাইনে কখনো বামে যেতে হয় এবং আবার পুরনো পঙক্তিতে ফিরে আসতে হয়। এ ছাড়াও কয়েকটি আলাদা পঙক্তি রচনা করে নৃত্যের অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত একই পঙক্তিতে ফিরে আসতে হয়।

কাঁঠি নাচে কিছুটা উচ্চাঙ্গের ভাব কিংবা বৈষ্ণব প্রভাব থাকলেও মূলতঃ এ নৃত্য লোকনৃত্যই। ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি নৃত্যগীতই সাধারণতঃ কৃষিউৎসব বা শস্য-কামনার সঙ্গে জড়িত। ঝাড়খণ্ডে দুর্গাষ্টমী বা 'বড় পূজা'র দিনে

'পেটরান' বা শস্যগর্ভ ধানের গাছগুলোকে সাধভক্ষণ করানো হয়ে থাকে এবং প্রচুর ফসল কামনা করা হয়ে থাকে। অই দিনই ধানের ক্ষেতে পিটুলি ছিটিয়ে সাধ খাওয়ানোর মতোই ঘরে ঘরে রঙ্গ-রসিকতা সম্পর্কের যুবতী বধূদের শরীরেও পিটুলির হোলিখেলা শুরু হয়। এই সময় যৌনতার বিধি-নিষেধে কিছুটা শৈথিল্য দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রজননশীলতা এবং প্রচুর ফলনশীলতার কামনা আভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই এই কৃষি-উৎসবের সময়ে অনুষ্ঠিত কাঁঠি নাচও যে কৃষি-সম্পর্কিত নৃত্য তা এর গতিভঙ্গি মুদ্রা ইত্যাদি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। কাঁঠি নাচে আশ্বিনের মৃদু বাতাসে আন্দোলিত সুপুষ্ট ধানের গাছের মুদ্রা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এ যেন শস্যগর্ভ ধানের গাছের পরিপূর্ণতার আনন্দে আন্দোলনেরই নৃত্যরূপ।

কাঁঠি নাচ যে পরিপূর্ণতঃ লোকনৃত্য এবং শস্যকামনা-সম্পর্কিত তা এর সঙ্গে পাঁতা নাচের অনুষ্ঠান লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। যতোক্ষণ ধরেই কাঁঠি নাচের অনুষ্ঠান হোক না কেন, অনুষ্ঠানের শেষে পাঁতা নাচের একটা অপরিহার্য এবং প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা আছে। কাঁঠি নাচ সাধারণতঃ এক আধটি পাঁতা নাচের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই শেষ করতে হয়। এই পাঁতা নাচ যে শস্যকামনার সঙ্গে জড়িত, সে-কথা আমরা পাঁতা নাচের গান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

ঝাড়খণ্ডের অন্যান্য নৃত্যের মতো কাঁঠি নাচ-ও গান সহযোগেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে নৃত্যকারীরা নিজে নৃত্য এবং গীত যুগপৎ পরিবেশন করে না। করম নাচ, জাওয়া নাচে শারীরিক পরিশ্রম কম বলে নৃত্যকারীরা নৃত্য এবং গীত দুটোই পরিবেশন করতে পারে। কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য নৃত্য বলে নৃত্যকারীরা কাঁঠি নাচ এবং ছো নাচে স্বয়ং গান পরিবেশন করতে পারে না। সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আলাদা লোক থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, কাঁঠি নাচের গান হিসেবে বর্তমানে বৈষ্ণব পদাবলীই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবু এই নাচের 'রং' হিসেবে যেসব গান ব্যবহার করা হয় তা একান্তভাবেই লৌকিক জীবনের কথাবার্তায় প্রাণবন্ত। এই ধরনের গানের সংখ্যা কম হলেও এ গান প্রাণরসে সঞ্জীবিত। সাধারণ মানুষের বিচিত্র ভাবনাও এসব গানে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

গানগুলো অনেকটা ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত। ছন্দ-দোলায় ছড়ার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ রূপ লক্ষ্যগোচর হয়; এমনকি ছড়ার মতোই একটি পঙক্তির সঙ্গে আর একটি পঙক্তির সুষম সাদৃশ্য নজরে পড়ে না।

কোন কোন গানে জীবনের অভিজ্ঞতা সাদামাটা শব্দে সুন্দরভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। মাকাল ফলের রূপৈশ্বর্য গুণৈশ্বর্যের অভাবে মানুষের আদর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, এ কথা সবারই জানা। ঝাড়খণ্ডের সাধারণ মানুষের চোখে এই উপলব্ধিই এনে দিয়েছে পাট জাতীয় শণ গাছের ফুল। সোনার বরণ হলে কি হবে, তার না আছে গন্ধ, না আছে গুণ, বরং সূক্ষ্ম কণ্টক তার বৃন্ত ঘেঁষে জেগে থাকে। সুন্দর ফুল দেখলে ঝাড়খণ্ডের নর-নারী তা তুলে নিয়ে কানে কিংবা খোঁপায় গোঁজার লোভ সামলাতে পারে না। কিন্তু শণ ফুলের গুণহীনতার জন্য এ ফুল কানে গোঁজবার জন্য উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না কেউ। আসলে গুণহীন ব্যক্তি কিংবা রূপবান, কেউই এ-পৃথিবীতে আদব পায় না; গুণের জয় সর্বত্র, গুণের আদর সর্বত্র। এই উপলব্ধিই নীচের গানটিতে পবিস্ফুট :

১. সনার বরণ শণ ফুলটি কানে কেন্ নাই পবে।
অন্তরে যার গুণ নাই রূপে কিবা করে॥

কখনো বা কোন গানে ভাই তাব সদ্য বিবাহিত দাদাব অপরূপা রূপসী বধুব প্রশংসায় মুখর :

২. মরিচের তলে তলে সুরু সুরু বালি।
আমার দাদা বউ আন্যেছে যেমন রূপের ডালি॥

কোন কোন গানে বিষণ্ণ, বিরহ-ক্লিষ্ট প্রণয়ীর করুণ বেদনা বাণীরূপ পেয়ে থাকে। স্মৃতি যেন সে গানে চাপা কান্নায় হাহাকার করে ওঠে। জলের ঘাট, তা সে পুকুর বা নদীর ঘাট যাই হোক না কেন, সাধারণতঃ প্রেমের উদ্‌গম এবং বিকাশের বিশিষ্ট স্থান হিসেবে গানে-গল্পে স্থান পেয়ে এসেছে। আবার এই জলের ঘাট কখনো-কখনো প্রেমের সমাধিস্থল হিসেবে, অথবা নিষ্করুণ স্মৃতিমণ্ডল হিসেবে, বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় প্রেমিকাকে উদ্‌ভ্রান্ত অন্যমনস্ক করে তোলে; তার চোখের দৃষ্টি থেকে বাস্তব জগৎ হাবিয়ে গিয়ে স্মৃতির প্রেমময় পৃথিবী যেন তাকে বিভ্রান্ত কবে। নীচের গানটিতে লোক কবি স্বল্প-পবিসরে আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় এক প্রেমরিক্ত বিরহিণী নায়িকার হৃদয়ে স্মৃতিসর্বস্ব প্রেমকে ভাস্বর করেছে :

৩. কু'ল পখ'রে নাইতে গেলে হ'ড়কে পড়ে পা।
থাক্যে থাক্যে মনে পড়ে আমার বঁধুয়া॥

ক'াঠি নাচের গানেও বৈষ্ণব প্রভাব সহজেই নজরে পড়ে। এখানেও বংশী-

ধ্বনি রাধা রাধা বলে অনন্তকাল ধরে বেজে চলেছে। আসলে এই বংশীধ্বনি শাশ্বত প্রেমের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছু নয়। এ রাধা বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা নয়, এ যেন নিতান্তই ঝাড়খণ্ডের মুক্ত প্রেমের লৌকিক নায়িকা, যার জন্য প্রণয়ীর কণ্ঠস্বর চিরকাল আকুল আহ্বানে ধ্বনিত হয়ে চলেছে এবং বিরহ-বেদনায় দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হচ্ছে :

৪. বাঁশ নাই বাঁশলি নাই রে তরল বাঁশের ধজা।
বিনা ফুঁকে বাজে বাঁশি বলে রাধা রাধা॥

॥ ছয় ॥

আহীরা গান

আহীরা গান ঝাড়খণ্ডের সুপ্রাচীন জনপ্রিয় লোক উৎসব 'বাঁধনা' বা 'বাঁদনা' পরবকে উপলক্ষ্য করে গীত হয়ে থাকে। স্বভাবতঃই আহীরা গান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাঁধনা পরব সম্পর্কে আলোচনা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

বাঁধনা বা বাঁদনা পরব গো-পূজার উৎসব। এই উৎসব কার্তিক-অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অমাবস্যার রাত্রে জাগরণ, প্রতিপদের দিন পূর্বাহ্নে গোরৈয়া পূজা, দ্বিতীয়ার দিন মধ্যাহ্নে 'বুঢ়ী বাঁধনা' এবং তৃতীয়ার দিনও মধ্যাহ্নে 'দেশ বাঁধনা' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অমাবস্যা এবং প্রতিপদের অনুষ্ঠানগুলোতে মূলতঃ গো-বন্দনা করা হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে বিচার করলে এ উৎসবের 'বাঁদনা' (<বন্দনা) নামটি সার্থক। অন্যদিকে দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়ার মূল অনুষ্ঠান হ'ল গরু-কাড়া (মোষ) কে গ্রামের রাস্তায় বা মাঠে ময়দানে শক্ত খুঁটি পুঁতে তাতে বেঁধে খেলানো। গরুকাড়াকে বন্ধন করে খেলানো থেকে 'বাঁধনা নামটি আসা অসম্ভব নয়। আবার ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, কোন অল্পপ্রাণ অক্ষর যেমন মহাপ্রাণিত হতে পারে, তেমনি মহাপ্রাণ অক্ষর অল্পপ্রাণিত হতে পারে। স্বভাবতই 'বাঁধনা' এবং 'বাঁদনা' শব্দযুগলের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়, বরং তা অপ্রয়োজনীয়ও বটে। আমাদের মতে, দুটো শব্দই

গ্রহণযোগ্য, তবে 'বাঁধনা' শব্দটি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতিতে বন্দনা আদি অনুষ্ঠানগুলো আর্য সংস্কৃতির প্রভাবের অতিরিক্ত কিছু নয়।

তবে এই উৎসবটি যে গো-পূজা বা গো-বন্দনা-সম্পর্কিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই গো-পূজা কতো প্রাচীন, তা নির্দিষ্ট দিনক্ষণ স্থির করে বলা সম্ভব না হলেও এটুকু বলা যেতে পারে যে আদিবাসী অনার্য সমাজে আর্যপূর্ব যুগ থেকেই এ-পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে আর্যরা অনার্যদের অনুকরণে গো-পূজার সূত্রপাত করে। তার জন্য নির্দিষ্ট তিথিক্রম গোপাষ্টমীর অবতারণা করা হয়। তবে এই ঘটনা যে কোনক্রমেই ইতিহাস-পূর্ব যুগের নয়, এ-ব্যাপারে পণ্ডিতগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পেরেছেন। গো-খাদক অনার্যরা কেন এই পূজার অনুষ্ঠান শুরু করবে? কিংবা গো-খাদক আর্যগণও কেন এই পূজার অনুকরণ শুরু করে? এ-সম্পর্কে পণ্ডিত গণের মত এই যে, পঞ্চগব্য গোমূত্র আদি যেহেতু জাদুক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাই এই পূজাটিও জাদুক্রিয়াচারের অনুষ্ঠিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। আদিম মানুষ জাদুক্রিয়ায় বিশেষ বিশ্বাসী ছিল। আত্মসংরক্ষণ এবং বংশবৃদ্ধির জন্য জাদুক্রিয়ার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আদিম মানুষের আগ্রহ খাদ্যবস্তু এবং সন্তানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। মানুষকে বাঁচতে হলে খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন; তার বংশের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রয়োজন সন্তানের। ডঃ ফ্রেজার ঠিকই বলেছেন, To live and to cause to live, to eat food and to beget children, these were the primary wants of man in the past, and they will be the primary wants of man in the future so long as the world lasts. ফলে খাদ্য এবং সন্তান কামনায় আদিম মানুষ ঋতুপর্যায়কে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য জাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে পারত না। গো-পূজাও একটি জাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান। গরু কৃষিজীবী মানুষের জীবনে অপরিহার্য। শস্য উৎপাদনের জন্য গরুর শ্রম যেমন প্রয়োজনীয়, খাদ্যবস্তু হিসেবে গোমাংসও তেমনি প্রয়োজনীয় ছিল। কৃষিজীবী মানুষের কাছে ষাঁড় বা বলদের পবিত্রতা অত্যন্ত বেশি। ষাঁড়ের ওপর সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকের কামনা-বাসনা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। ষাঁড় তাদের কাছে পবিত্র বস্তু; এর কাছ থেকে বিশেষ ধরনের প্রাণনা এবং ক্ষমতালাভের তীব্র

ইচ্ছাবশতঃ ষাঁড়কে সশ্রদ্ধায় সরিয়ে রাখা হয়। পবিত্র ষাঁড়ের স্পর্শ থেকে সবাই প্রাণপ্রাচুর্য এবং ক্ষমতা লাভ করে থাকে। এই পবিত্র জীবকে বলি দেওয়া হত এই কারণে যে, এর মাংস সম্প্রদায়ের লোকেরা ভক্ষণ করতে পারবে এবং ষাঁড়ের পবিত্রতাসহ প্রাণ এবং ক্ষমতারও অধিকারী হবে। ষাঁড়কে বলি দেওয়া হত এই কারণেই যে, এই পবিত্র জীবটি পুনর্জন্ম লাভ করবে।[১] এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে গোপূজার একটা বিশেষ অর্থ সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের বিশ্বাস, ঝাড়খণ্ডের বাঁধনা পরব অনেকাংশে এই লোক-ভাবনার ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এ ছাড়াও কার্তিকী অমাবস্যায় গো-পূজা সম্পর্কে যে পুরাকাহিনীটি চল আছে, তাও বিচার করে দেখা দরকার। পশুপালন এবং কৃষিকার্যের সূত্রপাতের যুগের কথা। একবার গরু-মোষের দল কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মানুষের জন্য তাদের পরিশ্রমের অন্ত নেই, অথচ অকৃতজ্ঞ মানুষ তাদের শুধু দৈহিক নিপীড়নই নয়, খাদ্যঘটিত ব্যাপারেও নিপীড়নের চূড়ান্ত করেছিল। তারা তাদের এই অভিযোগ মহাদেবের (মারাং বুরু, মারাং বোঙা বা বড় পাহাড়) কাছে পেশ করেছিল। তাদের এই অভিযোগের কথা শুনে মহাদেব তাদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, অমাবস্যার গভীর অন্ধকারে নিজের চোখে তিনি ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবেন। সমস্ত ঘটনাটা, যে কোনভাবে হোক, মানুষের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। মহাদেব আসবার আগেই তারা ঘর-দোর পরিষ্কার করে গরুমোষকে ঘষে-মেজে স্নান করিয়ে তেল মাখিয়ে প্রচুর খাবার খেতে দিল। মহাদেব গভীর রাত্রে এসে দেখলেন, গরুমোষের অভিযোগ মিথ্যে। গরুমোষের যত্ন-পরিচর্যার অন্ত রাখে নি মানুষ। মহাদেব গরুমোষকে চিরকাল মানুষের ঘরে খেটে খাওয়ার-অভিশাপ দিয়ে গেলেন এবং মানুষকে লক্ষ্মীলাভ করবার আশীর্বাদ করে গেলেন। ঘটনাটি, শ্রমজীবী মানুষের ওপর পুঁজিবাদী মানুষের সুকৌশলী ষড়যন্ত্র এবং শোষণের সঙ্গেই তুলনীয়। এই পুরাকাহিনীটিকে পুনর্জীবিত করার জন্য কার্তিকী অমাবস্যায় গো-জাগরণের অনুষ্ঠান অস্বাভাবিক নয়। ডঃ কুক মনে করেন, পুরাকাহিনী এবং জাদুক্রিয়া প্রায়শঃ একে অন্যের ওপর প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে।[২] এখানে পুরাকাহিনীটিকে

১. J· E. Harrison : Ancient Art and Ritual : III, P 98
২. Dr· Cook : Religion of the Semites, 3rd Edn. 1927

পুনর্জীবিত করবার জন্য কার্তিকী অমাবস্যার রাত্রে জাগরণের এই যে জাদু-অনুষ্ঠান তা গরুমোষের ওপর তাদের কর্তৃত্ব রক্ষা এবং লক্ষ্মীলাভের বাসনা থেকেই সংঘটিত হয়ে থাকে বলে মনে হয়।

কার্তিকী অমাবস্যার রাত্রি জাগরণের রাত্রি হিসেবে চিহ্নিত। শহরাঞ্চলের মতো গৃহাঙ্গন আলোকমালায় সজ্জিত করা না হলেও গোয়ালে মাটির প্রদীপ টিমটিম করে সারা রাত ধরে জ্বলে। যারা গরুকে গান গেয়ে জাগায়, তারা ঘরে-ঘরে ঘুরে গানে-বাজনায় শুধু গরুমোষকে জাগিয়েই ক্ষান্ত হয় না, গৃহস্থ বাড়ির সবাইকে যেন জাগিয়ে রাখতে চায়। মনে হয় একদা এই রাত্রে মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ করবার জন্য সদর দরজা খোলা রেখে সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করত। জাগরণের রাতে মানুষজন জেগে থাকবে না, তা হতেই পারে না। কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীদেবীর যেমন জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে গৃহস্থের ঘরে-ঘরে গিয়ে 'কে জেগে আছো' (কঃ জাগর্তি) প্রশ্ন করে ধনসম্পদ দানের পুরাকাহিনী প্রচলিত আছে, কার্তিকী অমাবস্যায় গভীর নিকষ রাত্রে মহাদেবের লক্ষ্মীলাভ আশীর্বাদ দানের পুরাকাহিনীও একই অর্থে প্রচলিত আছে। কার প্রভাব কার ওপর পড়েছে, তা বিতর্কিত ব্যাপার। তবে আমাদের মনে নয়, গো-জাগরণের পুরাকাহিনীই প্রাচীনতর। গরু-মোষ মানুষের জীবনে প্রথম সম্পদ, তার পরই লক্ষ্মী-ভাবনার জন্ম—যে লক্ষ্মী আদিকালে আদিম জনতারই দেবী ছিলেন। অমাবস্যার সারা রাত জেগে থাকলে গো-সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে থাকে, তা একটি আহীরা গানে (জাগরণের গান) সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

জাগ মা লক্ষ্মীনি জাগ মা ভগবতী / জাগে ত আমাবস্যা রা'ত।
জাগে কা পতিফল দেবে মা লছুমন (ক. মহাদেব)
পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই যে॥

গরু-মোষ কৃষিকার্যের অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। তাই এই কৃষি-উৎসবে গরু-মোষের ভূমিকাই সবিশেষ নজরে পড়ে। গরু মোষের উন্নতি, উৎকর্ষ-সাধন এবং বংশবৃদ্ধির জন্য বাঁধনা পরবের পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আসলে এই উৎসব গো-মহিষাদির প্রজননের উৎসব। গো-মহিষের প্রজননের জাদু অনুষ্ঠান এই উৎসবে পালন করা হয়ে থাকে। গো-মহিষাদির প্রজনন-ক্ষমতা, উৎপাদিকা শক্তি এবং উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির কামনায় ঝাড়খণ্ডের মানুষ কার্তিকী অমাবস্যায় এই কৃষি তথা পশু উৎসবের অনুষ্ঠান করে থাকে। এই সময়ে

গো-মহিষের প্রজননের সময় হিসেবে এই বাঁধনা পরবের অনুষ্ঠান। বাঁধনা পরবটি আসলে গো-মহিষাদির বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। বলাবাহুল্য, বিবাহ মানেই বন্ধন, এবং বংশবৃদ্ধির জন্য প্রজননের প্রথাসিদ্ধ অনুষ্ঠান। আমাদের মনে হয়, বাঁধনা পরবের আসল উদ্দেশ্য এবং রহস্য গো-মহিষের বংশবৃদ্ধির জন্য প্রজননের জাদু অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত। অনুষ্ঠানের মধ্যে ষাঁড় এবং গাভীর, কাড়া (পুং মোষ) এবং মোষের বিবাহ-আচার পালন করা হয়ে থাকে। মানব সমাজে দম্পতিকে গাঁঠ ছড়ার বাঁধনে বেঁধে 'নিমছান' (<নির্মঞ্ছন) এবং 'চুমান' (<চুম্বন=আশীর্বাদ) হয়ে থাকে, তেমনি গো-মহিষ দম্পতিকেও দড়ি দিয়ে 'বাঁধনা' (<বন্ধন) করে বিয়ের গান গেয়ে 'নিমছান এবং 'চুমান' হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এই অনুষ্ঠানটি থেকেই 'বাঁধনা' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে, যেহেতু এইটিই বাঁধনা পরবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান।

এবারে কার্তিক-অমাবস্যায় বাঁধনা পরবের অনুষ্ঠানের উৎস বিচার করে দেখা যেতে পারে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, 'যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে আছে, মাঘ কৃষ্ণাষ্টমীতে উত্তরায়ণ হয়। তদনুসারে জানিতেছি, আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে আটমাস ও তদনন্তর আট দিন পরে কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদে শরৎ ঋতু আরম্ভ হইত।'[৩] অর্থাৎ মাহাত-ভূমিজ-কামার-কুমোর-বাগাল-ভুঞাদের বাঁধনা পরব প্রাচীন শরৎ ঋতু এবং শরৎবর্ষের স্মৃতিবাহী উৎসব। কার্তিক শুক্ল প্রতিপদ বাঁধনা পরবের মুখ্য দিন। এই দিন 'গোরৈয়া' পূজা করা হয়ে থাকে। এই দিনটি প্রাচীনকালে শরৎবর্ষ এবং ঋতুর প্রথম দিন হিসেবে প্রচলিত ছিল। স্বভাবতঃই কার্তিকে অনুষ্ঠিত বাঁধনা পরব নববর্ষের অনুষ্ঠান। নববর্ষ উৎসবের লক্ষণ বাঁধনা পরবেও দেখতে পাওয়া যায়। 'খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে যজুর্বেদ প্রণীত হইয়াছিল।' কার্তিক শুক্ল প্রতিপদে যে শরৎবর্ষ আরম্ভ হত. তা যজুর্বেদ প্রণীত হবার কিছু আগে থেকে চলে আসছিল, ধরা যেতে পারে। এদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে কার্তিকের বাঁধনা পরব কম পক্ষে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো স্মৃতিকেই অনুসরণ করে চলেছে।

সাধারণতঃ তিন, পাঁচ, সাতদিন ধরে গরু-কাড়ার শিং-এ তেল মাখাতে হয়। অমাবস্যা, প্রতিপদ এবং দ্বিতীয়ায় তেল তো দিতেই হয়, তারো আগে

৩. পূজাপার্বণ : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পৃঃ ২০

অর্থাৎ অমাবস্যার দু'দিন বা চারদিন আগে থেকেও গরু-কাড়ার শিং-এ তেল দিতে হয়। বলাবাহুল্য, গরু-কাড়ার শিং-এ একবার তেল পড়লে তাদের পূর্ণ কর্মবিরতি এসে যায়। তখন আর গরু-কাড়াকে দিয়ে লাঙল বা গাড়ি টানানো হয় না। সারা দিন গরু-কাড়াকে বনে জঙ্গলে চরানো হলেও সন্ধ্যেবেলায় গোয়ালে ঘাস খেতে দেওয়া হয়।

গরু-কাড়ার শিং-এ তেল দেবারও বিশেষ নিয়ম আছে। গরুর শিং-এ তেল দেবার আগেই বাড়ির লোকজনদের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে হয়। এঁটো-কাঁটা পরিষ্কার করে ফেলতে হয়, ঘরের কোণে উচ্ছিষ্ট বস্তু রেখে তেল দেওয়া নিষিদ্ধ। হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হয়। সাধারণতঃ গরুর শিং-এ 'কুজ্‌রী' (কুজরী) নামক এক ধরনের বুনো লতার ফল থেকে নিষ্কাষিত তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে, গরুর শিং-এ কুজরী তেল দেওয়াই নিয়ম। বর্তমানে বনজঙ্গল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কুজরীর তেল আর পাওয়া যায় না, তাই যে কোন তেলের সঙ্গে দু' চারটি কুজরী ফল মিশিয়ে সেই তেল গরুকে মাখানো হয়। প্রথমে বাড়ির 'শিরিবরদা' বা শ্রীবলদ এবং 'শিরিগাইয়া' বা শ্রীগাই (গাভী)-এর শিং-এ তেল দেওয়া হয়, তারপর অন্যান্য গরু-বাছুরের শিং-এ দেবার নিয়ম। গরু-বাছুরের হয়ে গেলে 'শির কাড়া' এবং 'শির মইষিণী'র শিং-এ তেল দেবার নিয়ম এবং তারপর অন্যান্য মোষের শিং-এ দিতে হয়। গরুর আগে মোষের শিং-এ তেল দেওয়া নিষিদ্ধ।

এই দিন গরু-বাগালেরা 'গঠ' (<গোষ্ঠ) পূজা করে থাকে। কোথাও এই পূজা দুপুরের আগে, কোথাও দুপুরে, কোথাও বা বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সমস্ত গরু নিয়ে বাগালেরা গোরুবাথানে উপস্থিত থাকে। পূজার উপচার দুধ গুড় ঘি আতপচাল সিঁদুর ধূপধুনো ইত্যাদি। এই পূজা সাধারণতঃ 'লায়া' (<রায়া <রাজা) বা গ্রামের পূজারীই করে থাকে। কোথাও কোথায় একে 'দেহরী' বা 'দেহুরী' (<দেবগৃহী) বলা হয়ে থাকে। লায়া গঠ-মাঠে একটি বৃত্ত আঁকে এবং তারই মধ্যস্থলে পূজা করে। বলা-বাহুল্য, এই পূজা মূলতঃ বাঘুত্‌ দেবতার ; ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়িও পূজা পেয়ে থাকে। গরু বাছুর সব সময় বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে বাঘের আক্রমণ ঘটতে পারে কিংবা সাপের বিষাক্ত ছোবল নেমে আসতে পারে ; তাই এই বাঘুৎ দেবতার পুজো। দুর্গম অরণ্যের লতায়

অনেক সময় গরু বাছুরের শিং, লেজ কিংবা পা এমনিভাবে জড়িয়ে যায় যে সহজে সেই বাঁধন ছিঁড়ে গরুবাছুর ঘরে ফিরতে পারে না: তাই ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়ির পূজা। বাঘুৎ পুরুষ দেবতা, তাই এর পূজায় মোরগ বলি দেওয়া হয়, ক্বচিৎ ক্ষেত্রে পাঁঠা। এই পূজার অন্যতম উপকরণ হল হাঁস বা মুরগীর একটি ডিম। পূজা শেষ হয়ে গেলে এই ডিমটি পূজাস্থান থেকে দূরে রেখে দিয়ে গরুর পাল তার ওপর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যে গরু ডিমটিকে মাড়িয়ে বা পায়ের আঘাতে ভেঙে ফেলে তার বাগাল সেবা বাগাল তো বটেই, গরুর মালিক সে-বছরের ভাগ্যবান লোক। তাই ভাগ্যবানকে কাঁধে তুলে হৈ-হৈ করে সবাই তার বাড়িতে যায়। সেখানে সে তার সাধ্যমত সবাইকে ভালোমন্দ খাবার পরিবেশন করে। ভাগ্যবানের গরুটিকে কাঁচাধানের 'মোড়' (মুকুট) পরিয়ে তাকেও সম্মানিত করা হয়।

সন্ধ্যেবেলায় কাঁচি-জীউরী অনুষ্ঠান। চালের গুঁড়ো গরুর দুধে মেখে পিণ্ড তৈরী করা হয়। নতুন কার্পাসের গুটির তুলো দিয়ে ছোট ছোট সলতে পাকানো হয় এবং তা ঘিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। টুকরো টুকরো গুঁড়ির পিণ্ড কাঁচা শাল পাতার ওপর বসানো হয়, এবং তাতে একটি করে সলতে গুঁজে দেওয়া হয়। 'মড়দা' ঘাসের ছোট ছোট আঁটি তৈরী করা হয়। প্রথমে তুলসীতলায় এবং তারপর কুল্‌হি-দুয়ারে গোবরের পিণ্ডের দু'পাশে দু'টি বাতি এবং দু'মুঠো মড়দা ঘাস রেখে প্রণাম করতে হয়। তারপর প্রতিটি দরজায় এবং জানালায় দুটো করে বাতি এবং দু' আঁটি মড়দা ঘাস দিতে হয়। কুয়োতলায়, গোবর গাদায়, সব্জি খেতে, ফসলের খেতে একটি করে বাতি এবং এক আঁটি মড়দা ঘাস দিয়ে প্রণাম করতে হয়। এই বাতি জ্বালানো গুঁড়ির পিণ্ডগুলো অন্য বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সংগ্রহ করে এবং কুল্‌হি-তে আগুন জ্বেলে শালপাতায় মুড়ে পিঠে পুড়িয়ে খেয়ে থাকে। লোক বিশ্বাস আছে, এই পিঠে খেলে খোসপাঁচড়া হয় না। তবে নিজের বাড়ির কাঁচি-জীউরীর গুঁড়ির পিঠে খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।

কাঁচি-জীউরীর চালের গুঁড়োর পিণ্ডের ওপর দীপ জ্বালানো এবং তার সঙ্গে মড়দা ঘাস দেবার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। মড়দা শব্দটি আমাদের মেন্‌ঢা দাহ-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রায় ছ'হাজার বছর আগেকার নববর্ষোৎসবের স্মৃতি দোলযাত্রা। দোলপূর্ণিমার আগের দিন বহ্ন্যুৎসব, সেদিন রাত্রে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে

ছাগ বা মেষরূপী মেনঢাসুরকে দাহ করা হয়ে থাকে। মেনঢাসুরের রূপ কোথাও গৃহ, কোথাও পশু, কোথাও নরমূর্তি, কোথাও বা পিঠালি নির্মিত মেষ। এই মেনঢা যেন আপদ বিশেষ, তাই এই মেনঢাদাহ অনুষ্ঠানে বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা যায়।[৪] দোল যাত্রার সঙ্গে নানান দিক দিয়ে বাঁধনা পরবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাঁধনা পরব ও নববর্ষোৎসবের স্মৃতি। দোল পূর্ণিমার আগের দিন অর্থাৎ নববর্ষের পূব দিন মেনঢাসুর দাহ করা হয়। একদা কার্তিক শুক্ল প্রতিপদে নববর্ষ আরম্ভ হত, তার পূর্বদিন অমাবস্যার রাত্রে ঝাড়খণ্ডেও মেনঢাসুর দাহ অগ্ন্যুৎসব পালিত হয়ে আসছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিদ্যানিধি মহাশয় পিঠালি দিয়ে কোথাও কোথাও মেনঢাসুরের মূর্তি রচনার যে-কথা বলেছেন, তা ঝাড়খণ্ডের স-দীপ গুঁড়ির পিণ্ড এবং মড়দা ঘাস ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি। এই পিণ্ডগুলো সংগ্রহের ব্যাপারে ঝাড়খণ্ডের গ্রামে গ্রামে অমাবস্যার সন্ধ্যায় ছেলেদের মধ্যে বিপুল হর্ষোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। এই পিণ্ডগুলো সংগ্রহ করে ছেলেরা গাঁয়ের রাস্তায় আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে খেয়ে থাকে। আগেই বলা হয়েছে, সামান্য বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে এই গুঁড়িপিণ্ডের পোড়ানো পিঠে খেলে চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। অমাবস্যার রাত্রিটি জাগরণের রাত্রি, যা নববর্ষ পালনের একটি পরিচিত রীতি। সারারাত্রি ধরে পাট ও শণকাঠি পুড়িয়ে অগ্ন্যুৎসব করা হয়। তাছাড়া প্রতিটি গৃহস্থের আঙিনায় সারারাত্রি বড়ো 'মুঢ়া' কাঠ (<মুণ্ড) জ্বালিয়ে রাখতে হয়, এটি এই উৎসবের একটি অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠান। 'মড়দা' যে মেনঢাদাহর সঙ্গে সম্পর্কিত, ওপরের আলোচনা থেকে আমরা তা স্পষ্টীকরণের প্রয়াস পেয়েছি। হয়তো মিলটা নিতান্তই আপাত মিল, তবু আপাত-মিলের ওপর ভিত্তি করেও আমরা যে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে পেরেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কাঁচি জীউরীর পর ঘরে ঘরে তেলে-ভাজা পিঠে 'ছাঁকা পিঠা,' তৈরী করা হয়। সেদিন আর ভাত রান্না করা হয় না, পেট-ভরতি পিঠে খায় সবাই। তারপর এঁটোকাঁটা তুলে গরুমোষের শিঙে তেল দেওয়া হয়। অন্যদিন থেকে এই দিনের নিয়মে কিছু পার্থক্য থাকে। প্রথমে শির বলদ

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৪—৬

এবং গাভীর শিঙে তেল দিয়ে গরুবাছুরকে দেওয়া হয়। তারপর শির বলদ এবং গাভীকে একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে, অনেকটা গাঁঠছড়ার মতো, পূর্বমুখে পাশাপাশি দাঁড় করানো হয়। তারপর ঝাড়খণ্ডের বিবাহ-অনুষ্ঠানের চুমানো আচারটি গরুর ক্ষেত্রেও পালন করা হয়। বাড়ির গৃহিণী ধোয়া কাপড় বা নতুন কাপড় পরে কুলোয় ধানদূর্বা দীপ ধূপধুনো এবং হাতে হলুদ-গোলা জলের ঘটি, তাতে একটি স-পল্লব আম্রশাখা নিয়ে চুমোবার জন্য বেরিয়ে আসে। প্রথমে হলুদ-গোলা জল ছিটিয়ে গো-দম্পতির পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটি 'ভেলা' পাতার দোনায় ধূপধুনো জ্বেলে সেই দোনাটি গরুগুলোর মাথার ওপর ঘুরিয়ে বাড়ির গৃহিণী দু'পায়ের ফাঁকে গলিয়ে তিনবার এর পুনরাবৃত্তি করে। তারপর সেটি বাগালের হাতে তুলে দেয় এবং সে সেটি নিয়ে গোয়ালের গরু বাছুরের মধ্য দিয়ে ঘুরে কুলহি দুয়ারে গিয়ে দোনাটি উপুড় করে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'নিমছান' (নির্মঞ্ছন)। এর ফলে ভূত প্রেত অশুভ অপদেবতা সব কিছু থেকে গরুবাছুর মুক্ত হয় বলে ওরা বিশ্বাস করে। ভেলা পাতা অশুভ অপদেবতা, কুনজর ইত্যাদির প্রতিষেধক হিসেবে ঝাড়খণ্ডে সব সময় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিমছানো হয়ে গেলে কুলো থেকে আতপচাল ধান দূর্বা ঘাস তিনবার করে ছিটিয়ে স-আম্রপল্লব ঘট থেকে দু'পাশে একটু একটু জল ঢেলে গৃহিণী গো-দম্পতিকে ভক্তিভরে প্রণাম করে। সাধারণতঃ পরিবারের তিন জনকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়। একে 'চুমান' (<চুম্বন) বলা হয়। আমাদের মনে হয় এই অনুষ্ঠানটি যেন গায়ে-হলুদের আশীর্বাদ বিশেষ। চুমানো হয়ে গেলেই এই আচারটিরও সমাপ্তি ঘটে। যার বাড়িতে মোষ-কাড়া থাকে, সেখানে গরু চুমানোর পর অন্য কুলোয় উপকরণ এনে একই ভাবে মোষ-কাড়াকেও চুমানো হয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে চারপাশে আহীরা গান বিভিন্ন লোকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন গৃহ থেকে শঙ্খধ্বনি উঠতে থাকে। বোঝা যায় সব বাড়িতেই চুমানো হচ্ছে। চুমানোর পরই আঙিনায় মুঢ়া কাঠের আগুন জ্বেলে দিতে হয়। এর পর শুরু হয়ে যায় জাগরণের রাত, আহীরা গানের রাত। সমস্ত ঝাড়খণ্ড যেন আহীরা গানে গানে মেতে ওঠে। বন-ডুংরি কাঁপিয়ে ঢোল ধমসা মাদলের গুরুগম্ভীর আওয়াজ চারপাশে শোনা যায়। নববর্ষের পূর্ব রাত্রের প্রতিটি লক্ষণ যেন ফুটে ওঠে। মানুষজন ভাং সিদ্ধি গাঁজা খেয়ে

সারারাত নেশা করে। অগ্নিকুণ্ডের আলোকে আঙিনা যেমন আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি অগ্ন্যুৎসবের খেলা গ্রামের রাস্তায়-রাস্তায় জমে ওঠে। এই সময় যৌনতার ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দেখা যায়। গানের ভেতব কখনো কখনো গ্রাম্যতা এবং অশ্লীলতাও দেখা যায়। সারারাত্রি জাগবণের রীতিও আছে।

গরু চুমানোব পব গোয়ালে-গোয়ালে প্রচুব তেল ভরে দীপ জেলে দেওয়া হয়। দীপটিব প্রতি মাঝে-মাঝেই নজর দিতে হয়। দীপটি যেন বাত্রিবেলা কোনক্রমেই নিভে না যায়। এই বাত্রে বাড়ির সদব দরজা খোলা রাখা হয়। আশ্চর্যেব ব্যাপার, রাতটি দীপাবলীব রাত হলেও সর্বত্র দীপ জ্বালানো হয় না; শুধুমাত্র গোয়াল ঘরে এই দীপ জ্বলতে থাকে। এ-প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখিত পুবাকাহিনীটি স্মরণ কবা যেতে পাবে। মহাদেব গরুবাছুরের দুঃখদুর্দশা স্বচক্ষে তদন্ত কবতে এসেছিলেন একদা। তাবই স্মৃতিতে এখনো বাড়িব সদব দরজা খোলা বেখে গোয়াল ঘরে দীপ জ্বালিযে রাখা হয় বলে আমাদের মনে হয়।

এর পরই গরু জাগানোব পালা শুরু হযে যায়। আহীরা গান গেয়ে এবং ঢোল ধমসা মাদল বাজিযে ঘবে ঘবে গরু জাগানো হয়। আহীবা গান অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিক গান হয়ে থাকে। গানের ভাষায় মগহী-মৈথিলীর ছাপ আছে। আসলে কুর্মিদের নিজস্ব ভাষা কুর্মালিব সঙ্গে মগহী মৈথিলী ভাষার আত্মিক যোগ আছে। যেহেতু আহীরা গান আচার-সঙ্গীতের অন্তর্গত, তাই রক্ষণশীলতা এই গানে সমধিক লক্ষ্যগোচর হয়। উৎসবের প্রতিটি আচাব যেমন নিখুঁতভাবে পালন করতে হয়, তেমনি গানগুলোর কার্যকারিতা রক্ষার জন্য এর ভাষাও সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। তবে ধলভূমে ঝাডগ্রামে এসে গানগুলোব ভাষা যে কিঞ্চিৎ পবিবর্তিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুর্মি-মাহাতরা নিজেদের আদিভূমি ছেড়ে দক্ষিণ পূর্বে ছড়িয়ে পড়েছে ধলভূমে-ঝাডগ্রামে-ময়ূরভঞ্জে। সংস্কৃতির অনেক কিছু বহন করে নিয়ে গেলেও তাবা কুর্মালি ভাষা ব্যবহার না করে ঝাডখণ্ডী উপভাষায় কথাবার্তা বলে থাকে। স্বভাবতঃই এই সব আচারধর্মী গানেও ভাষা-গত কিছুটা পরিবর্তন অবশ্যই সাধিত হয়েছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আহীরা গান কুর্মালি উপভাষাতেই বচিত হয়েছিল। আহীরা গানের প্রচার এবং প্রসার কুর্মি-মাহাতদের সাহায্যেই সারা ঝাড়খণ্ডে ঘটেছে।

এ-গান বার বার রচিত হয় না, মন্ত্রের মতো, বিয়ের গানের মতো এগুলোকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে রাখা হয় মাত্র। বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ সময় ছাড়া এ-সব গান গাইবার রীতি নেই। আহীরাগান প্রধানতঃ প্রশ্নোত্তর মূলক, কোথাও বা কথোপকথন মূলক। দু'পঙক্তির বিস্তৃতি থেকে সুদীর্ঘ পালার আকারেও এক একটি গান দেখতে পাওয়া যায়। আহীরা গানে সুরের বৈচিত্র তেমন লক্ষ্যগোচর হয় না, মুখ্যতঃ দুতিনটে সুরই এর অবলম্বন।

গো-জাগরণের রাত বলে শুধু যে গরুবাছুরকেই জাগানো হয়, তা নয়। এ রাত মানুষজনেরও জাগরণের রাত। এই রাতে জেগে থাকলে লক্ষ্মীলাভ হয়, গো-সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে।

গরুবাছুরকে যারা জাগিয়ে থাকে, তাদের বলা হয় 'ধাঁগ্ড়িয়া'। শব্দটি 'ধাঁগড়' বা 'ধানগর' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ চাকরবাকর বা ভৃত্য। মূলতঃ বাগাল-ভাতুয়া-মুনিসেরাই গো-জাগরণে অংশগ্রহণ করে থাকে। কণ্ঠে গান আর উল্লাসের ধ্বনি আর বিবিধ ঝাড়খণ্ডী বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত বাজনা সহ এরা গৃহস্থের গৃহে ঢোকে। তারা আঙিনায় পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আসন দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। গান গেয়ে গরু-জাগানো হয়ে গেলে ধাঁগড়দের পিঠে, মুড়ি ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে মদ বা হাঁড়িয়া। তবে রাত্রিবেলা সাধারণতঃ গাঁজা, ভাং বা সিদ্ধির চলটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। গান-বাজনা কিন্তু থামে না, গৃহস্থের আঙিনায় তারা যতোক্ষণ থাকে ততোক্ষণ গান-বাজনায় ঘর-বাহির গমগম করতে থাকে। কোন গৃহস্থের বাড়িতে গরু-জাগানো শেষ হলে বিদায়ী কিছু পয়সাকড়ি তারা পেয়ে থাকে। এইভাবে গ্রামের প্রতিটি গৃহে গিয়ে গরু-জাগানো হয়। এই সময়কার গানগুলোকে 'গরুজাগান্যা' গান বা জাগরণের গান বলা হয়ে থাকে। ধাঁগ্ড়িয়ারা বা ধিঁগুয়ানিরা গৃহস্থের আঙিনায় ঢুকেই প্রথমে গরুবাছুরকে জাগানো গান গেয়ে থাকে।

১. জাগ মা লক্ষ্মী জাগ মা ভগবতী জাগে ত আমাবস্যা রাই ত রে।
জাগাকে পতিফল দেবে মা লছমী পাঁচপুতায় দশ ধেনু গাই রে।

ঝাড়খণ্ডে গরুবাছুরকে লক্ষ্মী-ভগবতী বলা হয়ে থাকে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু গরুবাছুরকেই নয় অমাবস্যা রাতকে জাগিয়ে রাখাও তাদের উদ্দেশ্য। গৃহস্থবাড়ির মানুষজন জেগে থাকলে তার পুরস্কার হিসেবে পাঁচপুত্রের জন্য দশটি 'ধেনু গাই' লাভ করবার সম্ভাবনা থাকে।

২. কুল্‌হি কুল্‌হি যাতে ছিলি রাজার শহরে রে তরই বড়দার ডাকিয়েঁ ঘুরাল্য রে।
চল বাছা আমার গলা ঘর।
বসিতে দিব ভালা অলগ অলগ মাচিলা সেহি লাগি দেয় ত গুয়া পান ॥

৩. গঙ্গাগহালে জ্বলে ভালা ভাচাক ভুচুক রে মানমীর চাওহা নাহি মিলে।
মানমী কা ঘরে ভালা সুরহি রে বাবু হ রনঝন বাজে সারারা'ত ॥

গোয়ালে টিমটিম করে দীপ জ্বলে কিন্তু মানুষজনের সাড়া মেলে না। মানুষের ঘরেই সুরভি অধিষ্ঠান করে আছে, তার গলায় থেকে থেকে রুনুঝুনু ঘুঙুর বেজে ওঠে।

৪. রিমিঝিমি রিমিঝিমি পানী বরষে যে
আঙিনায় ত কাঁই পড়ি যায়।
কতই আমরা নাচিব কতই আমরা খেলিব
আঙিনায় ত ধুলা উড়ি যায়।

রিমঝিম বৃষ্টি হয়েছে, তাতে আঙিনায় শেওলা পড়ে গেছে। তারই ওপর আমরা কতোক্ষণ ধরে নাচ-খেল করছি, আঙিনার শেওলা কাদা শুকে ধুলো উড়তে আরম্ভ করেছে।

৫. নিতি নিতি মাগয়ে ভাটভিখারী রে আইজ ত মাগে ধেঙ্গুয়ান রে।
ধেঙ্গুয়ানকে দিলে ভালা জলে নাহি পড়য়ে যুগে যুগে রহি যায় ত নাম রে ॥
পয়সাকেরি বাত অহীরা রিঝি বুঝি দিহ রে হামে যাব দসর দুয়ার রে।
নাহি যদি আঁটয়ে নাহি যদি জুটয়ে সুমুখে করবে বিদায় রে ॥
নাহি যে আসি ভালা ভাতেকেরি লভে রে নাই আসি পয়সাকেরি লভে।
তরি যে ঘরে আছে দশ মুড় কাঁশি ফুল তাহাদিগে জাগাতে আস্যেছি ॥
নাহি যে আসি অহীরা পিঠাকেরি লভে রে নাহি আসি ধুতিকেরি লভে।
গঙ্গা গহা'লে আছে কপিলা সুন্দরী গ চান্দে সুরুজে টলমল ॥

রোজ রোজ ভাটভিখারী ভিক্ষে নিতে আসে, ধেঙ্গুয়ানরা শুধু আজকের মতোই কিছু চায়। ওদের দান করলে সে দান জলে পড়ে না, যুগে-যুগে দাতার নাম থেকে যায়। পয়সার কথা, যা দেবার তা খুশি মনে দাও, আমরা অন্য বাড়িতে চলে যাই ; আর যদি দেবার মতো কিছু না থাকে, তাহলে ভালো মনে আমাদের বিদায় দাও। আমরা ভাত কিংবা পয়সা পাবার লোভে তোমার ঘরে আসি নি ; তোমার গোয়ালে ধেনু গাই আছে, ওদের জাগাবার

জন্যই এসেছি। আমরা পিঠে কিংবা ধুতির লোভে আসি নি; তোমার গঙ্গা-গোয়ালে কপিলা-সুন্দরী আছে, চাঁদ, সূর্যের আলোয় সে টলমল করছে আমরা তাকেই জাগাতে এসেছি।

৬. কন্ ঠিনে জাগয়ে চাঁদ সুরুজ রে কন ঠিনে জাগে বস্‌মাতা রে।
কন ঠিনে জাগয়ে বাঁশ কা লরা রে কন ঠিনে জাগে ধেনু গাই রে॥
সরগে হিঁ জাগয়ে চাঁদ সুরুজ রে পাতালে ত জাগে বসমাতা রে।
ঘরে হিঁ জাগয়ে বাঁশ কা লরা রে গহা'লে ত জাগে ধেনু গাই রে॥

ওরে গোয়ালা, কোথায় চাঁদ-সূর্য জেগে থাকে, কোথায় বা বসুমতী জাগে; কোথায় বাঁশের রোলা জাগে, কোথায় বা ধেনুগাই জাগে। স্বর্গে চাঁদ-সূর্য জেগে থাকে, পাতালে বসুমতী; ঘরে বাঁশের রোলা জাগে, গোয়ালে ধেনুগাই জাগে।

৭. গিরিপর্বতে চঢ়ি নাম্‌হি গেল কপিলা ঠেসি গেল গঙ্গা কী কিনার।
হা হা রে কপিলা মতি পানী জুটবে তুহে কপিলা বড়ই অপরাধী॥
শউবহি কপিলা গঙ্গায় মিনতি রে শুনি লিহ কানেকে লাগাঁই রে।
পানী পিয়তে দেবে গঙ্গা হৃদয় জুড়াব তবে গঙ্গা নব ত বাতাব॥
শুনহি শুনহি কপিলার বচন রে তুহে গঙ্গা বড অপরাধী।
মরা যে খা'স গঙ্গা জীয়ত যে খা'স রে পচা মড়া বহিস বারবার॥
শুনহি শুনহি কপিলার মিনতি রে শুনি লেহ কানেকে লাগাঁই।
হামারা বেটা গঙ্গা আগুহালে চলে গে বেটি ত চল্যে যায় যৌতুক॥

ওপরে উদ্ধৃত গানটিতে কপিলা এবং গঙ্গার মধ্যে দ্বন্দ্ব-এর কথা আছে। গঙ্গার চেয়ে কপিলার কৌলীন্য এবং পবিত্রতা যে বেশি তা'ও এই গানটির বিষয়বস্তু। ঝাড়খণ্ডী লোকমানসে কপিলার স্থান অত্যন্ত উচ্চে; তার পবিত্রতা প্রশ্নাতীত রূপে সব দেবতার ওপরে। গানটি কপিলাগাভী সম্পর্কে লোকমুখে প্রচলিত সুদীর্ঘ পালার অংশবিশেষ বলে মনে হয়। লৌকিক কাহিনীই গানটির উপজীব্য। পুরাণে কোথাও এর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৮. চন্দ্রমা দপদপ ভুরকা উঠিল রে সুরঙ্গী ত ঠুঁকে রে কাঠাড়।
উঠ রে পুতা জাগ রে পুতা চল্যে যাও ত সুরঙ্গী মইলান॥
নাহি হামে জাগব নাহি হামে উঠব নাহে যাব সুরঙ্গী মইলান।
জাড়ে শিশিরে ভালা আট অঙ্গ ভিজে রে আর ভিজে মাথাকেরি কেশ॥
পায়ে যে দিব পুতা রুচুমুচু জুতা রে গায়ে ত দহটি চাদর।

মাথায় ত দিব পুতা ষোল হাতের পাগড়ী চল্যে যাও ত সুরঙ্গী মইলান ॥
কথায় যে পাবি ভালা রুচুমুচু জুতা রে কথা পাবি দহটি চাদর।
কথায় যে পাবি ভালা ষোল হাতের পাগড়ী নাহি যাব সুরঙ্গী মইলান ॥
মুচিঘরে পাব পুতা রুচুমুচু জুতা রে জল্হা ঘরে দহটি চাদর।
শেট ঘরে পাব পুতা ষোল হাতের পাগড়ী যাহ পুতা সুরঙ্গী মইলান।
কিয়া কর্যে দিবি ভালা রুচুমুচু জুতা রে কিয়া কর্যে দহটি চাদর।
কিয়া কর্যে দিবি ভালা ষোল হাতের পাগড়ী নাহি যাব সুরঙ্গী মইলান ॥
দুধ বিক্যে দিব পুতা রুচুমুচু জুতা রে দই বিক্যে দহটি চাদর।
ঘিয়া বিক্যে দিব পুতা ষোল হাতের পাগড়ী যাহ পুতা সুরঙ্গী মইলান ॥
নাহি যে লিব ভালা রুচুমুচু জুতা রে নাহি লিব দহটি চাদর।
নাহি যে লিব ভালা ষোল হাতের পাগড়ী নাহি যাব সুরঙ্গী মইলান ॥
পায়ে যে লিব ভালা পিয়াল কাঠের খড়ম রে গায়ে ত ভিড়ী কা কম্বল।
মাথায় ত লিব ভালা বাঁশেরি কা ছাতা রে তবে হামে সুরঙ্গী করব মইলান ॥

গানটিতে গরু-বাগালদের দুঃখের কথা বর্ণিত হয়েছে। একবার শিশির পড়তে শুরু করলে ভোর রাত্তিরে গরু-কাড়া খুলে মাঠে নিয়ে যাওয়া ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়ে। ঝাড়খণ্ডের লোকেরা অত্যন্ত গরীব, ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাদের পায়ে না থাকে জুতো, না থাকে গায়ে শীতের পোষাক। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই সমস্যাটিই গানটিতে রূপায়িত হয়েছে। গানটিতে কোথাও কল্পনার স্পর্শ নেই, বেদনাময় নিষ্ঠুর বাস্তবের সোচ্চার উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। আসলে আহীরা গানে কোথাও কল্পনার ছিটে-ফোঁটা দেখতে পাওয়া যায় না। বাস্তব কাহিনী, বাস্তব বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা, বাস্তব নায়ক-নায়িকা এ-গানের উপজীব্য। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব গান রচিত হয়ে থাকে। অনেকটা ধাঁধাঁর মতোই। কিন্তু ধাঁধার সঙ্গে এ গানের পার্থক্যটাও সহজেই নজরে পড়ে। ধাঁধা স্বল্পায়তনের হয়ে থাকে, তার বাঁধুনি অত্যন্ত আঁটোসাঁটো। ধাঁধার উত্তরটা বাস্তব বস্তু হতে পারে কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি রীতিমতো কবিত্বময়, সৌন্দর্য-বোধের এবং কল্পনার পরিচয় যত্রতত্র সর্বত্রই মেলে। ধাঁধায় কখনো উত্তরটা বলে দেওয়া হয় না, অনেকটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ধাঁধাকে প্রতিপক্ষের সামনে পেশ করা হয় এবং জনশ্রুতিমূলক উত্তরটা না দিতে পারা পর্যন্ত

সমাধান হয় না। কিন্তু আহীরা গান কখনোই ধাঁধার মতো স্বল্পায়তনের হয় না। গান বলে আহীরা গান সুববদ্ধ এবং বিশেষ একটি ছন্দের বাঁধনে বাঁধা; বলা-বাহুল্য, এ বাঁধুনি খুব একটা আঁটোসাঁটো নয়। আহীরা গানের প্রশ্নোত্তরের বিষয়বস্তু সব সময়ই বাস্তব হয়ে থাকে, প্রকাশভঙ্গি ক্বচিৎ কদাচিৎ কবিত্বময়, সৌন্দর্যবোধ এবং কল্পনার দর্শন লাভ অত্যন্ত বিরল ঘটনা। সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নিরাবরণ এবং নিরাভরণ শব্দে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। শুধু মানুষই নয়, পশুপক্ষী গাছ-পালার জীবনের কথাও এ গানের উপজীব্য। এ গানে বৈচিত্র্য আছে বিষয়বস্তুতে, ঝাড়খণ্ডের বাস্তব সংসারের বিভিন্ন খুঁটিনাটি কথা এর অন্তর্ভুক্ত। আহীরা গানে প্রেমের কথা থাকার কথা নয়, তাই এ গান প্রেম-গীতি বিবর্জিত। তা সত্ত্বেও আহীরা গান জীবনরসে সমৃদ্ধ গান। জীবন-ধর্মিতার দিক দিয়ে ধাঁধার চেয়ে আহীরা গানই বেশি পরিপুষ্ট। আহীরা গানের প্রশ্নে উদ্ধত আক্রমণ থাকে না, উত্তরটাও জনশ্রুতিমূলক নয়, নিতান্তই অভিজ্ঞতাপুষ্ট বাস্তব জীবনের টুকিটাকি বস্তুই এর উত্তর। আসলে আহীরা গানে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বয়োজ্যেষ্ঠদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বয়োকনিষ্ঠদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত পরিচিত বস্তুই আহীরা গানের বিষয়বস্তু। সেগুলো পরিবারের ভাবী কর্ণধাররা কতোটুকু জানে বা বোঝে তা জানবার জন্যই যেন ধাঁধার আকারে প্রশ্ন করা হয়, পরে তার উত্তরটাও জানিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ওপরের গানটিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, মুচির কাছে জুতো মেলে, তাঁতির কাছে চাদর মেলে, শেঠের কাছে পাগড়ি মেলে; জুতোর চেয়ে চাদরের দাম বেশি, চাদরের চেয়ে পাগড়ির দাম বেশি—এই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে দুধের চেয়ে দই-এর দাম বেশি, দই-এর চেয়ে ঘি-এর দাম বেশির তুলনা দিয়ে।

৯. কন্ ঠিনে রে অহিরা গাইয়া চরালি রে কন ঠিনে পানিয়া পিয়ালি
কন ঠিনে রে অহিরা গাইয়া বাঁথালি রে কন ঠিনে বাঁশিয়া বাজালি ॥
বনে-বনে বনে বনে গাইয়া চরালি রে মালাদহয় পানিয়া পিয়ালি।
বৌরি তলে রে অহিরা গাইয়া বাথালি রে ডালে বসেঁ বাঁশিয়া বাজালি ॥
কিয়া লাগি রে অহিরা গাইয়া চরালি রে কিয়া লাগি পানিয়া পিয়ালি।
কিয়া লাগি রে অহিরা গাইয়া বাথালি রে কিয়া লাগি বাঁশিয়া বাজালি ॥

দুধ লাগি রে অহিরা গাইয়া চরালি রে পিয়াস লাগি পানিয়া পিয়ালি।
সাহার লাগি রে অহিরা গাইয়া বাথালি রে রিঝলাগি বাঁশিয়া বাজালি॥

বাগাল গোচারণ থেকে ফিরে আসবার পর তাকে জিগ্যেস করা হল, রে গোপ, তুই কোথায় গরু চরালি, কোথায় গরুকে জল খাওয়ালি, কোথায় গরুর বাথান (গোষ্ঠ) করেছিলি, কোথায়ই বা তুই বাঁশি বাজালি। বাগাল জানাল, গভীর অরণ্যে গরু চরিয়েছি, মালাদহে জল খাইয়েছি, বটতলায় গরুর বাথান করেছি আর সেই গাছের ডালে বসে বাঁশি বাজিয়েছি। আবার প্রশ্ন করা হল, রে গোপ, কিসের জন্য তুই গরু চরালি, কিসের জন্য গরুকে জল খাওয়ালি, কিসের জন্য গরুর বাথান করেছিলি, কিসের জন্যই বা বাঁশি বাজালি। বাগাল জবাব দিল, দুধের জন্য গরু চরিয়েছি, তৃষ্ণার জন্য গরুকে জল খাইয়েছি, সার-গোবরের জন্য বাথান করেছি আর খুশিতে বাঁশি বাজিয়েছি।

১০.

কেইসে চড়ি নামে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে কেইসে চড়ি নামে রে গুসাঁই।
কেইসে চড়ি নামে ভালা নন্দ গুয়ালা রে মাথায় তার কুমুণ্ডল পাগ॥
কড়ম চড়ি নামে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে ঘড়ায় চড়ি নামে রে গুসাঁই।
কাড়ায় চড়ি নামে ভালা নন্দগুয়ালা রে মাথায় তার কুমুণ্ডল পাগ॥
কথায় কথায় বুলে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে কথায় কথায় বুলে রে গুসাঁই।
কথায় কথায় বুলে ভালা নন্দগুয়ালা রে মাথায় তার কুমুণ্ডল পাগ॥
কুল্‌হিমুড়ায় বুলে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে গাঁয়ে গাঁয়ে বুলে রে গুসাঁই।
মাঠে মাঠে বুলে ভালা নন্দগুয়ালা রে মাথায় তার কুমুণ্ডল পাগ॥
কিয়া লাগি ঘুরে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে কিয়া লাগি ঘুরে রে গুসাঁই।
কিয়া লাগি ঘুরে ভালা নন্দ গুয়ালা রে মাথায় তার কুমুণ্ডল পাগ॥
গাঁজা লাগি বুলে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে বার্ষিক লাগি বুলে রে গুসাঁই।
কপিলা লাগি বুলে ভালা নন্দ গুয়ালা রে মাথায় তার কুমুণ্ডল পাগ॥

গানটিতে তিনটি চরিত্র স্থান লাভ করেছে: ঈশ্বর মহাদেব, গুরু গোস্বামী এবং নন্দ গোয়ালা। মহাদেব গ্রাম রক্ষা করে থাকেন বলে লোকবিশ্বাস আছে। তিনি খড়ম পায়ে সারা রাত গ্রাম পাহারা দিয়ে থাকেন; এক ছিলিম গাঁজার জন্যই তাঁর গাঁয়ের মাথায় ঘোরাঘুরি। এখানে গাঁজা ভাং-খোর শিবই যেন উপস্থিত হয়েছেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের ফলে এখানেও

গুরুবাদ দেখা দেয়। গোস্বামীরা কান ফুঁকে অর্থাৎ কানে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়ে পরিবর্তে শিষ্যদের কাছ থেকে বেশ মোটা পাওনাই আদায় করে থাকেন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত আদিবাসীদের শোষণ করে তাঁরা যে পুষ্ট হয়ে ওঠেন তা তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেই সুপরিস্ফুট। বার্ষিক পাওনা আদায়ের জন্যই তিনি ঘোরেন কথাটিতে কিঞ্চিৎ শ্লেষ থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। তৃতীয় চরিত্র নন্দ গোয়ালা। ব্রজে নন্দ গোপালক, বাংলার মাটিতে সে নন্দ ঘোষ। মোষের পিঠে চড়ে নন্দ গোয়ালা গরু মোষ চরিয়ে বেড়ায়। সে ঝাড়খণ্ডের এতোই পরিচিত একটি চরিত্র যে তার গুরুত্ব আমাদের দৃষ্টি সহজেই এড়িয়ে যায়।

১১. কার ত বঠে ভালা বনজঙ্গল রে কার ত বঠে খেড় ঘাঁস।
কার ত বঠে ভালা ভৈঁস ধনির পাল রে ঠড়কা ঠুঁকিয়ে বনে যায়॥
রাজার ত বঠে ভালা বনজঙ্গল রে পর্জার ত বঠে খেড় ঘাঁস।
নন্দগুয়ালার বঠে ভৈঁস ধনির পাল রে ঠড়কা ঠুঁকিয়ে বনে যায়॥
কিয়া হইল ভালা বনজঙ্গল রে কিয়া হইল খেড় ঘাঁস।
কিয়া হইল ভালা ভৈঁস ধনির পাল রে ঠড়কা ঠুঁকিয়ে বনে যায়॥
কাটেঁ কুটেঁ গেল ভালা বনজঙ্গল রে ডুঁড়কিয়ে গেল খেড় ঘাঁস।
মরেঁ হারাঁই গেল ভালা ভৈঁস ধনির পাল রে ঠড়কা ত রহলা টাঁগাঁই।

গানটিতে কয়েকটি জিনিষ লক্ষণীয়। বনজঙ্গলের ওপর রাজার অধিকার। কিন্তু পশুখাদ্য বুনো ঘাসে প্রজার অধিকার। গরুমোষের দল একদা গভীর জঙ্গলে কাষ্ঠঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বুনো ঘাস খেয়ে বেড়াত। রাখাল-বাগাল এই ঘণ্টার শব্দে বুঝতে পারত গরুমোষের পাল কতো দূরে রয়েছে; শব্দ অনুসরণ করে গরুমোষের পাল খুঁজে বার করতে মোটেই অসুবিধে হত না। এই কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনেই একদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছোটনাগপুরের জঙ্গলে চমকিত হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে অযথা কাটাকুটির ফলে বন-জঙ্গল ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘাসও শেষ হয়ে গেছে। গোচারণের জঙ্গল নেই, মাঠ নেই, তাই আজ ঝাড়খণ্ডে গরুমোষের পাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ এই সেদিন অবধি প্রতিটি গৃহস্থের গোয়াল-ভরা গরুমোষ ছিল, এখন শুধু হালের গরু-কাড়াই যা সম্বল। শুধু পুরনো দিনের প্রচুর পশুসম্পদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এখনো দেয়ালের গায়ে অজস্র কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলে আছে। তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে

বেদনাময় স্মৃতি জেগে আছে। পশুসম্পদসর্বস্ব মানুষের বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস গানটিতে লুকিয়ে আছে। বনজঙ্গল, গরু-মোষ আদির প্রতি এদের যে কি মমতা, তা গানটি থেকে আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি।

১২. কাঁহা হারালে কানু ঝিরিহিরি বাঁশি কাঁহা হারালে ধেনু গাই।
কাঁহা হারালে কানু নবরঙ্গ্যা রসিকা কাঁহা হারালে দশ ভাই॥
বাজাইতে হারালি ঝিরিহিরি বাঁশি চরাতে হারালি ধেনু গাই।
আখড়াহি হারালি নববঙ্গ্যা রসিকা দরবারে হারালি দশ ভাই॥
কেইসে চিন্‌হবে কানু ঝিরিহিরি বাঁশিরে কেইসে চিন্‌হবে ধেনু গাই।
কেইসে চিন্‌হবে কানু নবরঙ্গ্যা রসিকা কেইসে চিন্‌হবে দশভাই॥
ফুঁকেতে চিন্‌হব ঝিবিহিরি বাঁশি দাগে চিন্‌হব ধেনু গাই।
আখড়ায়হিঁ চিন্‌হব নবরঙ্গ্যা রসিকা মহড়ায় চিন্‌হব দশ ভাই॥
কেইসে আনবে কানু ঝিরিহিবি বাঁশিবে কেইসে আনবে ধেনু গাই।
কেইসে আনবে কানু নবরঙ্গ্যা বসিকা কেইসে আনবে দশ ভাই॥
লুটি আনব বাবু ঝিবিহিরি বাঁশি খেদি আনব ধেনুগাই।
আখড়ায়হিঁ আনব নববঙ্গ্যা রসিকা দরবারে আনব দশ ভাই॥

ওপরের গানটিতে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। অহিরার পরিবর্তে এখানে যেন কানু বিনে গীত নেই কথাটির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন কববার জন্যই কানুর আবির্ভাব ঘটেছে। এ-কানু কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর কানু নয়। নিতান্তই লৌকিক কানু, ঝাড়খণ্ডের গরুমোষ-বাগাল। এই কানু বনে- জঙ্গলে বাঁশি বাজাতে গিয়ে তাব ঝিরিহিরি বাঁশি হারিয়ে ফেলেছে, গভীর অরণ্যে গোচারণে ধেনুগাই হাবিয়েছে, নাচের আখড়ায় রসিককে হারিয়েছে আর রাজদরবারে বিচারে তার দশ ভাইকে হারিয়েছে। কানু কিন্তু হতাশ হয়নি। সে বাঁশিতে ফুঁ দিলেই তার ঝিরিহিরি বাঁশি চিনতে পারবে, আর অমনি সে তার বাঁশি ছিনিয়ে আনবে। বনে-অরণ্যে গরু হারালেও সে যে কোন গরুর পালের ভেতর থেকে তার গরুর গায়ের দাগ দেখে চিনে নিয়ে ধেনুগাইকে তাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনবে। নাচের আখড়ায় নাচের ধরন দেখে সে তার রসিককে চিনতে পারবে এবং তাকে ফিরিয়ে আনবে। দরবারে দশভাইয়ের মুখের আদল আর গলার স্বরে তাদের চিনে নেবে, আর নতুন করে বিচার করিয়ে তাদের দরবার থেকে বের করে আনবে।

কয়েকটি গানে পরিবারের বিভিন্ন জন সম্পর্কে সরস কথা আছে। নিচের

গানটিতে পরিবারের তিন ভাই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বড়োকে মানায় দালান কোঠা, মেজকে মানায় দরবারে আর ছোট ভাইয়ের মানায় বাড়ির দুয়ারে ঘোড়া বেঁধে রাখা।

১৩ কনে ত সাজে ভালা উঁচু-উঁচু বাখ'ল কনে ত সাজে দরবার।
কনে ত সাজে ভালা দুয়ারে ঘড়া বাঁধা ছুটয় বড়য় করে নমস্কার॥
বড ভাইকে সাজে ভালা উঁচু-উঁচু বাখ'ল মাঝ্য ভাইকে সাজে দরবার।
ছুটভাইকে সাজে দুয়ারে ঘড়া বাঁধা ছুটয় বডয় করে নমস্কার॥

পরের গানটিতে মা-বোনের কথাও এসেছে। বোনের আদর-যত্ন, মায়ের হাতের অন্নজল কেউ কি ভুলতে পারে? তাই বোনের বিয়ে হলেও বোনকে পরবে ফিরিয়ে আনবার কথা যেমন আছে তেমনি মায়ের মৃত্যু হলেও তাঁকে অমৃত জল খাইয়ে পুনর্জীবিত করার ঘোষণার কথাও আছে। তাছাড়া একজন ঝাড়খণ্ডী বাগালের আর দুটি সহচর—লাঠি এবং বাঁশি—নষ্ট হয়ে গেলেও নতুন করে বানাবার কথা অথবা বিশেষ উপায়ে সংরক্ষিত করার কথা আছে। একজন বাগালের কাছে মা-বোন লাঠি আর বাঁশির চেয়ে বড়ো আর কি আছে।

১৪ কেও যে দিবে ভালা পানী যে পিঁঢ়া রে কেও যে দিবে অন্নজল।
কেও যে বাবু তোরি সঙ্গে সঙ্গে ফিরয়ে কনে ত দেয় ত রে হুংকার॥
বহিনে যে দেয় ত ভালা পানী যে পিঁঢ়া রে মায়েত দেয় রে অন্নজল।
পাড়'রই ঠেঙা ভালা সঙ্গে সঙ্গে ফিরয়ে বাঁশিয়ায় ত দেয় ত রে হুংকার॥
তর-ই যে মা বাবু মরি হারাঁই যাবে রে বহিন ত যাবে শ্বশুর ঘর।
ভাঙিটুটি যায় ত বাবু পাড়'রই ঠেঙা রে বাঁশিয়ায় ত লাগি যাবে ঘুণ॥
অমৃত পানী আনব মাকে যে খাওয়াব বহিনকে ত ফিরাব পরবে।
পাড়'রই ঠেঙা ভালা দুসরা যে কুঁদাব বাঁশিয়াকে হিঙ্গুলায় বাঁধাব॥

পরবর্তী গানের বিষয়বস্তু হল, পিতার মৃত্যু হলে মানুষ নাবালক শিশুর দশা প্রাপ্ত হয়, মায়ের মৃত্যু হলে অনাথ হয়। ভাই-এর মৃত্যু হলে তার বাহুবল নষ্ট হয় এবং স্ত্রীর মৃত্যু হলে গৃহ শূন্য হয়।

১৫ কেহু মরলে অহিরা কাঞ্চি-কুঁয়ার রে কেহ মরলে রে টুঅর।
কেহু মরলে ভালা বাঁহি-বল টুটয়ে কেহু মরলে ঘর শূন রে॥
বাপ মরলে অহিরা কাঞ্চিকুঁয়ার রে মা-অ মরলে রে টুঅর।
ভাই মরলে অহিরা বাঁহি বল টুটয়ে মেহরালু মরলে ঘর শূন॥

স্ত্রীর মৃত্যু হলে গৃহশূন্য হয় বলে ওপরের গানটিতে বলা হলেও তার পতিভক্তি নামক বস্তুটি যে একেবারেই থাকে না এবং স্বামীর শোকে লোক-দেখানো কাতরতা ছাড়া গভীর বেদনায় সে আচ্ছন্ন হয় না, পরের গানটিতে স্বল্প কথায় তা বলা হয়েছে। মা কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে আজীবন শোকে কান্নাকাটি করেন ; বোন অন্ততঃ ছ মাস শোকে কাতর হয়ে থাকে।

১৬ কেহু ত কান্দে অহিরা জনম জনম রে কেহু ত কান্দে ছয় মাস।
কেহুত কান্দে অহিরা ডেড় পহর রা'ত সিঁদুরে কাজলে টলমল ॥
মাঁই ত কান্দে অহিরা জনম জনম রে বহিনী ত কান্দে ছয় মাস।
মেহরারু ত কান্দে অহিরা ডেড় পহর রা'ত সিঁদুরে কাজলে টলমল ॥

এমনিভাবে নানান গানে গরুজাগানো হয়ে থাকে। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি, রাত ভোর হবার আগে গ্রামের সব ক'টি বাড়ির গরুকে জাগাতে হয়। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি যাবার পথে এক ধরনের টুকরো টুকরো আহীরা গান গাওয়া হয়ে থাকে। এগুলোকে ডহরিয়া গান বলা হয়। ডহর শব্দের অর্থ পথ। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যাবার পথে এই সব গান গাওয়া হয়ে থাকে। স্বল্প দুরত্বের পথ। তাই স্বল্প কথার গান ; সুরেও দ্রুত লয় গরুজাগানো গান থেকে এগুলোকে পৃথক সত্তা দিয়ে থাকে।

১৭ তুঁইও আলি মুঁইও আলি ঘরে আছে কে ?
ঘরে আছে মীনার মা হাঁড়্যা পাকাঁইছে ॥

১৮ দে ন গ সীম ছুটি র'স ন হে থাম,
কুটুম জন আস্তেঁছে ভজকট থাম ॥

১৯ পরবে পরবে পিঠা দিলি না,
পরব পাইরালে পিঠা খাব না।
পিঠা নাই দিলেই কি,
পরব পাইরালে পিঠা ক'রব কি ॥

এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। তাই ডহরিয়া গান যেমন খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তেমনি এ-গানের বিষয়-বস্তুও নিতান্ত নগণ্য হয়ে থাকে। এগান অনেকটা তাৎক্ষণিক সৃষ্টির ফসল। এতে না থাকে চিন্তার গভীরতা, না থাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার তেমন কোন

উল্লেখযোগ্য কথা। উচ্ছল মুহূর্তের উচ্ছল সৃষ্টি। সুর আর ছন্দের দোলা ছাড়া এগানে লক্ষণীয় কিছুই নেই। অত্যন্ত চপল, অনেক সময় অর্থহীন, কথাবস্তুই এর উপজীব্য। এ গানের সঙ্গে ছড়ার যথেষ্ট মিল আছে। অসংগতি, অর্থহীনতা, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, দ্রুত লয় এবং সুর ডহরিয়া গান এবং ছড়াকে একসূত্রে বেঁধেছে বলে আমাদের মনে হয়।

যখন সারা গ্রামের সব বাড়ির গরু-জাগানোর পালা শেষ হয়, তখন এক প্রান্ত থেকে গ্রামের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধাঁগড়িয়ারা গান গেয়ে নেচে খেলে গাঁয়ের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। সারা রাত্রি জাগরণের ফলে তাদের বিস্রস্ত বেশবাস, নেশার ঘোরে টলমল উচ্ছৃংখলতা, অসংবৃত নৃত্যকলা, কখনো কখনো অশ্লীল এবং গ্রাম্যতা-প্রধান সংগীত এই সময় সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। গাঁয়ের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এইভাবে নেচে খেলে গান গেয়ে কিছুটা অসংবৃত অঙ্গভঙ্গি করে যাওয়াকে 'মাছি খেদা' বা 'মাছি বাট্যানা' (বাট=পথ) বলা হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডে মশা শব্দের চল নেই বললেই চলে। মাছি শব্দটিই তাই বৃহত্তর অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। মশার কামড়ে মানুষজন গরু বাছুর অস্থির হয়ে থাকে। তাছাড়া মশা মাছি ধানের ফসলেরও ক্ষতি করে থাকে। এই জন্যই এই অনুষ্ঠানটির এই নাম। তবে আরো গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যাবে, এই অনুষ্ঠানটি ভূত প্রেত অপদেবতা অশুভশক্তি আদির বিতাড়নের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। আগেই বলা হয়েছে, নববর্ষের পূর্বে এমনি ধরনের অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দেখা যায়। এর সঙ্গে অসংবৃত নৃত্য, গ্রাম্যতাভরা সংগীত—কখনো কখনো তাতে যৌনতার আভাস, সমস্তই নববর্ষ প্রবেশের লক্ষণ বিশেষ। বিজয়া দশমীর শবরোৎসব এই একই লক্ষণাক্রান্ত। 'মাছি খেদা' অনুষ্ঠানে যখন ধাঁগড়িয়ারা গাঁয়ের রাস্তা নৃত্য গীত করে পার হয়ে যেতে থাকে তখন বিভিন্ন বাড়ির কুলবধূরা বাটি ভরে পিটুলি-গোলা জল নিয়ে বেরিয়ে এসে রঙ্গ-রসিকতাসম্পর্কিত লোকেদের গায়ে দোল যাত্রার আবির-গুলাল খেলার মতো ছিটিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, যুবক পুরুষরা পাল্টা আক্রমণও করে থাকে। তারা কুলবধূদের হাত থেকে বাটি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের গায়েও পিটুলি-গোলা জল ঢেলে দেয়। অনেক সময় এই ধ্বস্তাধ্বস্তি শালীনতার সীমাও ছাড়িয়ে যায়। আগেই বলা হয়েছে, যৌনতার ক্ষেত্রে এই উৎসবে কিছুটা শিথিলতা দেখা দেয়। পিটুলি গোলা জল ঢালাঢালির মধ্য দিয়ে

তা আভাসিত হয়ে ওঠে। বর্তমানে রঙ্গ-রসিকতাসম্পর্কিতদের মধ্যেই এই পিটুলিগোলা জল ছোঁড়াছুঁড়ি সীমাবদ্ধ থাকলেও অতীতে নারী সম্প্রদায় পুরুষ নির্বিশেষে সবার সঙ্গেই এই খেলা খেলত, মনে হয়। পিটুলির ছিঁটে লাগা শাদা দাগগুলোকে রঙ্গ করে বলে 'বক গু-এর দাগ।' অর্থাৎ শরীরকে অশুচি করাই যেন অনুষ্ঠানটির লক্ষ্য। সারা বছর যাতে কোন বিপদ-আপদ অপদেবতার উপদ্রব না ঘটতে পারে, তাই আচারটি পালন কবা হয়ে থাকে।

'ঝাছিখেদা' অনুষ্ঠানের গানগুলোর মধ্যে অশুচিবস্তুর উল্লেখ ঘন ঘন পাওয়া যায়। বিশেষভাবে বিষ্ঠা প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বৎসরের শেষ দিনে নববর্ষের প্রাক্কালে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে অশ্লীল ক্রীড়াকৌতুক, অশ্লীল গীত ও খেউড় অদ্যাবধি চলে আসছে। পুরাণে-শাস্ত্রে এর বিধান আছে। তাই ঝাড়খণ্ডের এইসব গানে কুরুচি বস্তু প্রসঙ্গ কোন ক্রমেই নিন্দনীয় নয়। এই গান একটি প্রাচীন রীতি-ধাবাকেই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। ধাঁগড়িয়ারা নেচে-গেয়ে যেতে-যেতে মাঝে-মাঝেই ধুয়োব মতো করে ছড়া কাটে:

১৯. লে হাগি, লে হাগি/মাহত ঘরের চুলহায় হাগি।

এখানে কুকুরকে ডেকে গ্রাম-প্রধানের উনুনে মলত্যাগ করাব উপদেশ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য একই, যা কিছু এতোদিন শুচি ছিল, তাকে অশুচি করা। যমদূত, অপদেবতা, অশুভ দৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

২০ কুল্‌হি মুড়ায় কুল্‌হি মুড়ায় নাচ লাগ্যেছে।
সেহ শুন্যে রে ভাই বড বহু চুল্‌হায় হাগ্যেছে॥

নিম্নোদ্ধৃত গানগুলোতে সরাসরি যৌনতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এর মধ্যে যৌনতার ইঙ্গিত অবশ্যই আছে।

২১ শালার বাড়ি-এ নানা রঁগের ফুল ফুটে
শালার বহিন যাতে মানে নাই।
দে ন হে শালা বুঝাঁই-মানাঁই পাঠাঁই দে
তর বহিন যাতেই মানে নাই॥

২২ শুখনি শাগ শুখনি শাগ কতই সিঝাব।
দিদির ভাতার থালভরাকে কতই বুঝাব॥

ধাগড়িয়ারা গ্রামের শেষ প্রান্তে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যার অনুষ্ঠান শেষ হয়। শুরু হয় শুক্লা প্রতিপদের অনুষ্ঠান, যার মধ্য দিয়ে প্রাচীন নববর্ষের

ধারা এখনো অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। লাঙল, জোয়াল, মই আদি কৃষি যন্ত্রপাতি পুকুব থেকে ধুয়ে নিয়ে আসা হয়। তারপর গর'য়া পুজা শেষ হলে এগুলোকে মাচার ওপর মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলে রাখা হয়। 'হাল পুণ্য' এর আগে (পয়লা মাঘ) এই সব কৃষি যন্ত্রপাতিকে মাটিতে নামানো নিষিদ্ধ। এই অনুষ্ঠানটি ঝাডখণ্ডেব কৃষি-ভাবনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্রপাতি-গুলো ধুয়ে এনে তুলে রাখাব অর্থ হল, চলতি বছবেব মতো চাষের কাজ শেষ হল। নতুন বছবেব আগে হলচালনা নিষিদ্ধ। মনে হয়, এই অঞ্চলে অতীতে একটিই ফসল তোলা হত।

গব'য়া পুজার দিন সবকিছুই ধুয়ে ঝকঝকে কবে নিতে হয়। রাত থাকতেই স্ত্রীলোকেবা 'গোবব বাকড়'-এর কাজ শুরু কবে দেয়। পুবনো উনুন ভেঙে নতুন উনুন কবা হয। পুবনো হাঁড়ি ফেলে দিয়ে নতুন হাঁড়ি কাডতে হয়। নতুন ঠেকা-কুলো আমদানি কবতে হয। একটু বেলা হলেই কুল-বধূবা নতুন ঠেকা-ডালা-কুলো নিয়ে পুকুবে স্নান কবতে বেবিয়ে পড়ে। নতুন কুলোয় নিয়ে যায় আতপ চাল। স্নান কবে ডালা-কুলো আতপ চাল ধুয়ে ঘরে ফেরে। আসবাব সময় পুকুব থেকে এঁটেল মাটি নিয়ে আসে। এই মাটি দিয়ে তিনটে স্তম্ভ গড়ে উনুন বানানো হয়। গব'য়া পুজার পিঠে এই উনুনে ভাজা হয়ে থাকে। যজ্ঞকুণ্ডেব জ্বালানির মতো এই উনুনের জ্বালানিব জন্য শাল কাঠের কুচোব প্রয়োজন পড়ে। গুড়-ঘি মেখে পিটুলি বানানো হয়। বলাবাহুল্য, গরু গোয়ালেব দেবতার জন্য, আসলে এই দেবতাই গর'য়া, গাওয়া ঘি দিয়ে এই সব ছোট ছোট পিঠে ভাজতে হয়; মোষ গোয়ালের পুজোর পিঠে মোষ ঘি দিয়ে ভাজতে হয়। গরু-মোষের পুজোর পিঠে আলাদা আলাদা উনুনে ভাজবার নিয়ম। ঝাডখণ্ডী উপভাষায় অবশ্য 'পিঠা ছাঁকা' বলা হয়ে থাকে।

ওদিকে গৃহস্বামী অথবা তার পুত্র উপোষ কবে থাকে পুজো করবার জন্য। আয়োজন সম্পূর্ণ হলে সে পুকুর থেকে স্নান করে আসে, জমি থেকে খানিকটা মাটিও নিয়ে আসে। এই মাটি দিয়ে গোয়াল ঘরে গর'য়া খুঁটোর সামনে একটি পিণ্ড তৈরী করে তার ওপর একটি শালুক ফুলের কুঁড়ি গুঁজে দেওয়া হয়। এটি যে যৌনমিলনের প্রতীক, প্রজননের প্রতীক তা অনুধাবন করতে আমাদের অসুবিধে হয় না। গর'য়া খুঁটার সামনে আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে নয়টি ঘর তৈরী করা হয়। এই পুজোয় সম্মান অনুসারে পরপর ন'টি

ঘরে বিভিন্ন দেবতার ক্ষেত্র স্বীকার করে নেওয়া হয়। কোন ক্রমেই দেবতাদের ক্ষেত্র পরিবর্তন করা উচিত নয়। ওপরের তিনটি ক্ষেত্রে বাম থেকে দক্ষিণে অধিষ্ঠান করেন যথাক্রমে গর'য়া, গুসাঁই, কালাপাহাড, পরের সারিতে বড পাহাড (মারাং বুরু, মাহাদেব), ছাঁদন দড়ি, বাঁধন দড়ি; শেষের সারিতে বাঘুৎ, গবাম এবং অবশিষ্ট দেবদেবী। ন'টি ঘরে ন'টি তুলসী পাতা দেওয়া হয়, তারপর ওগুলোর ওপর আতপ চাল, গর'য়া পিঠে ইত্যাদি দিয়ে দেবতাদের পুজো করতে হয়। শালুক ফুলের কুঁড়ি আর মাটির পিণ্ডে সিঁদুর এবং পিটুলি লেপন করতে হয়। পুজো শেষ হয়ে গেলে গোয়ালঘরে এবং অন্যান্য ঘরের কড়িকাঠে শালুক ফুল ঝুলিয়ে দিতে হয়। গরুর গলাতে বা কপালেও শালুক ফুল বেঁধে দেওয়া হয়। এর পর ফুল পাতা দিয়ে বলির পশুকে 'চরান' হয়। গর'য়া স্ত্রী দেবতা, তাই এই পুজোয় পাঁঠা বলি দেওয়া নিষিদ্ধ, এই পুজোয় 'পাঁঠী' (অক্ষতযোনি ছাগী) বলি দেওয়া হয়। যে-পাঁঠীটিকে বলির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, তার ওপর দীর্ঘদিন ধরে নজর রাখা হয়। অন্তঃসত্ত্বা ছাগী বলি দেওয়া শুধু নিষিদ্ধ নয়, মহাপাপ এবং অকল্যাণকর। এ পুজার আসল লক্ষ্য গো-প্রজনন। এটি প্রজননের উৎসব। উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উৎসব। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, কুমারী মেয়েরা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে, কুমারী কন্যাদের মধ্যে প্রজননের ক্ষমতা যেমন সর্বাধিক থাকে। তেমনি তাদের মধ্যে উর্বরতা এবং উৎপাদিকা শক্তিও থাকে অপরিমিত। তাই সমস্ত কৃষি-উৎসবের মূল অনুষ্ঠানগুলো এই সব কুমারী মেয়েদের ব্রত হিসেবে অনুষ্ঠিত হত। করম পরবে জাওয়া এবং পৌষ পরবে টুসুপুজো কুমারী মেয়েদের ব্রত। সধবারা এই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও জাওয়া দেওয়া কিংবা টুসু পুজো করবার অধিকার একমাত্র কুমারী মেয়েদেরই থাকে। দু'টি উৎসবই ঝাড়খণ্ডের অন্যতম প্রধান কৃষি উৎসব বা শস্যোৎসব। একই কারণে প্রজনন ক্ষমতা, উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য শস্য ক্ষেত্রে, গোয়ালে দেবতার সম্মুখে আদিম কালে কুমারী কন্যাদের বলিও দেওয়া হত। আমাদের মনে হয় সুদূর অতীতে গর'য়ার সামনে কুমারী কন্যা বলি দেওয়া হত। যে গৃহস্থের পাঁঠা বলি দেবার ক্ষমতা থাকে না, সে 'কাটুল' (কুমারী) মুরগী বলি দিয়ে থাকে। গোয়ালপুজোয় অসংখ্য কাটুল মুরগী বলি দেওয়া হয়ে থাকে। গরুগোয়ালের পুজা শেষ হলে মোষ গোয়ালে পুজো দেবার নিয়ম। তবে গরু-গোয়ালের পুজাই আসল পুজা।

পুজো শেষ হয়ে গেলে গৃহস্বামী ধানের শীষের মোড় বা মুকুট তৈরী করে। এই ধানের শীষ বপন করা-'কাত্তিকা' ধানের ক্ষেত থেকে কাস্তে দিয়ে কেটে নিয়ে আসতে হয়, রোপন-করা ধানের শীষ দিয়ে মোড় বানানো নিষিদ্ধ। তুলসী মঞ্চের সম্মুখে ধোয়া চাটাই পেতে শুদ্ধ হয়ে বসে মোড বানাতে হয়।

বিকেলে 'গরু চুমানো' অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। চুমানো শব্দটি চুম্বন শব্দ থেকে উদ্ভূত। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় এর অর্থ আশীর্বাদ করা বা পুজো করা। আসলে বরকনেকে চুমানো হয়ে থাকে। গরু চুমানো অনুষ্ঠানটিতেও নব-বিবাহিত গোদম্পতিকে আশীর্বাদ করা হয়। বরকনেকে যেমন গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে থাকে, এই অনুষ্ঠানেও শিবগাই ও শিববলদকে এক সাথে 'বাঁধনা' (<বন্ধন) করে চুমানো হয়ে থাকে। আমরা আগেই বলেছি, এই 'বাঁধনা' অনুষ্ঠানটি থেকেই এই উৎসবের নাম 'বাঁধনা পরব' হয়ে থাকা সবচেয়ে সঙ্গত কারণ।

সাধারণতঃ প্রথমে গ্রাম-প্রধানের বাড়িতে গরু চুমানো হয়। প্রতি-বেশিনীরা সবাই এসে জড়ো হয়। আঙিনায় শিববলদ ও শিবগাইকে একটি দড়িতে বেঁধে বরকনের নিয়মমতো পাশাপাশি দাঁড় করানো হয়। গৃহস্বামিনী নতুন কুলোয় করে চুমানোর উপকরণ নিয়ে আসে। আগের দিনের মতো একটি ঘটিতে সআম্রপল্লব হলুদ-গোলা জল থাকে। প্রথমে হলুদ-গোলা জল ছিটিয়ে গাই ও বলদের পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর ভেলাপাতার দোনায় ধূপধুনো দিয়ে আগের দিনের মতোই 'নিমছানো' (<নির্মঞ্ছন) হয়। তারপর গৃহস্বামিনী গাভী ও বলদের শিঙে এবং কপালে তেল মাখিয়ে দেয়, এরপর শিঙে ও কপালে সিঁদুর লেপন করা হয়, গাভী ও বলদের মাথায় 'মোড়' (<মুকুট) পরিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে চুমানো অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। এক বাড়িতে চুমানো শেষ হয়ে গেলে সব প্রতিবেশি মিলে অন্য বাড়িতে যায়। এই চুমানো অনুষ্ঠানটি যে বিবাহ-অনুষ্ঠান তা এর বিভিন্ন আচার থেকে সহজেই বোঝা যায়। বিবাহের অনুষ্ঠান যৌন মিলনের, প্রজননের প্রতীক অনুষ্ঠান।

যতোক্ষণ ধরে চুমানো অনুষ্ঠান চলতে থাকে ততোক্ষণই প্রতিবেশিনীরা গান গেয়ে থাকে। আহীরা গান পুরুষেরাই সাধারণতঃ গেয়ে থাকলেও

এই অনুষ্ঠানের গানগুলো কুলবধূরাই গেয়ে থাকে। তাদের পরণে থাকে নূতন বস্ত্র, মুখে থাকে পান। এই সব গানকে 'চুমানোর গান' বলা যেতে পারে। এই গানগুলো আহীরা গানের সুরে গাওয়া হয় না; অনুষ্ঠানটি বিবাহঘটিত, তাই চুমানোর গান বিয়ের গানের সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। কতকগুলো চুমানোর গান উদ্ধৃত করা হল।

২৩. ডিগিমিগি ডিগিমিগি বাজ বাজনা রে বেঁধা রাজা সাজল বৈরাত রে।
গাটার ভিতরে মশা যে গুঞ্জরে আমি দাদা যাব রে বৈরাত॥
কতি ধুরে আওয়ে হাতি বল ঘড়া রে কতি ধুরে আওয়ে রে বৈরাত।
কতি ধুরে আওয়ে ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুরুজে ঝলমল॥
আশি কশে আওয়ে হাতি বল ঘড়া রে বা'ট কশে আওয়ে রে বৈরাত।
চল্লিশ কশে আওয়ে ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুরুজে ঝলমল॥
কেইসে হিঁ রাখবে হাতি বল ঘড়া রে কেইসে রাখবে রে বৈরাত।
কেইসে রাখবে ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুরুজে ঝলমল॥
বকুল তলে রাখব হাতি বল ঘড়া রে ছামড়া তলে রাখব বৈরাত।
মাঝ্যা ঘরে রাখব ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুরুজে ঝলমল॥
কেইসে বধাবে অহিরা হাতি বল ঘড়া রে কেইসে বধাবে রে বৈরাত।
কেইসে হিঁ বধাবে ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুরুজে ঝলমল॥
ডালে-পাতে বধাব হাতি বল ঘড়া রে মুটি চিড়ায় বধাব বৈরাত।
কন্যাদানে বধাব ময়না সুন্দর সনা চাঁদ সুরুজে ঝলমল॥

২৪. কনে ত দেয় ত ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ কনে ত দেয় ত ধেনুগাই।
কনে ত দেয় ত ভালা দুই কানের সনা গ কনে দেয় সীঁতাকে সিন্দুর॥
বাপে যে দেয় ত ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ মায়ে ত দেয় ত ধেনুগাই।
শ্বশুরে দেয় ত ভালা দুই কানের সনা গ তার পুতায় সীঁতাকে সিন্দুর॥
কেইসে রাখবে ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ কেইসে রাখবে ধেনুগাই।
কেইসে রাখবে ভালা দুই কানের সনা গ কেইসে রাখবে রে সিন্দুর॥
পেড়ি-এ যে রাখব ঝিলিমিলি শাড়ি গ গহা'লে রাখব ধেনু গাই।
কানে রাখব ভালা দুই কানের সনা গ সীঁতায় রাখব যে সিন্দুর॥
ছিঁড়ি-ফাটি যায় ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ মরি-হারাই যাবে ধেনুগাই।
কিকি-কিনি খায় ভালা দুই কানের সনা গ রহি যায় সীঁতার সিন্দুর॥

ওপরের দু'টি গানে বিবাহ-প্রসঙ্গ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে; বর, বরযাত্রী,

বাজ-বাজনা, হাতিঘোড়া, কন্যাদান, সিন্দুর দান ইত্যাদি কথা যেমন আছে, তেমনি বিবাহবাড়ির ভোজের আয়োজন, যৌতুক আদি প্রসঙ্গও আছে। নারীর জীবনে দান যৌতুক ইত্যাদির ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য, কেননা এগুলো অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী; তার জীবনে উজ্জ্বল হয়ে থাকে শুধু সিঁথির সিন্দুর। সিন্দুরের রক্তবর্ণের মধ্যেই তার নারীত্বের সবটুকু গৌরব নিহিত থাকে। চুমানো অনুষ্ঠানটি তাই শুধু বিবাহের আচার পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আচার-ঘটিত বিবাহসংগীতও খুব স্বাভাবিকভাবেই এর অনুষঙ্গ হয়ে থাকে। বিবাহ-অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিক উপকরণের কথাও এইসব গানে শুনতে পাওয়া যায়। তেল হলুদ ধূপ-ধুনো সিন্দুর, নতুন কাপড-চোপড, ধান দূর্বা, ঝলমলে বেশবাস সব কিছুই চুমানো গানের উপজীব্য হয়ে থাকে।

২৫. কন মালংকাকেরি নারায়ণ তেল গ কন মালংকা কে সিন্দুর।
কন মালংকাকেরি রাই যে ধুনা গ রাই ধুনায় করে মহমহ ॥
কুলহু মালংকাকেরি নারায়ণ তেল গ বান্যা মালংকা কে সিন্দুর।
খাডিয়া মালংকাকেরি রাই যে ধুনা গ রাই ধুনায় করে মহমহ ॥
কেইসে রাখবে মালিন নারায়ণ তেল গ কেইসে রাখবে ত সিন্দুর।
কেইসে রাখবে মালিন রাই যে ধুনা গ করবে ভগবতীর পূজা ॥
শিঁশিতে রাখব নারায়ণ তেল গ সিন্দুর কৌটায় রাখব সিন্দুর।
মাটি সরায় রাখব রাই যে ধুনা গ করব ভগবতীর পূজা ॥

২৬. কনে কা ফুলে মালিন উঢ়ন পিঁধন গ কন কা ফুলে রে ভক্ষণ।
কন কা ফুলে মালিন খঁপারে চিকণ কন ফুলে রাখে রে সংসার ॥
কাপা কা ফুলে ভালা উঢ়ন পিঁধন গ ধান কা ফুলে রে ভক্ষণ।
তিল কা ফুলে ভালা খঁপারে চিকন সিঁদুর ফুলে রাখে রে সংসার ॥
কেইসে চিন্হবে মালিন উঢ়ন পিঁধন গ কেইসে চিন্হবে রে ভক্ষণ।
কেইসে চিন্হবে মালিন খঁপারে চিকন কেইসে চিন্হবে সিঁদুর ফুল ॥
পরহিতে চিন্হব উঢ়ন পিঁধন গ খাইতে চিন্হব ধান ফুল।
মাখিতে চিন্হব খঁপা রে চিকন সীঁতাতে চিন্হব সিঁদুর ফুল ॥

পরবর্তী গানে নারীজীবনে অন্নবস্ত্রের সমস্যা, পুত্রহীনতার বেদনা এবং স্বামী-সর্বস্বতার কথা ফুটে উঠেছে। অল্পকথায় অন্নের বিহনে অঙ্গের বিবর্ণতা, তাম্বুল বিহনে মুখের মলিনতা, সন্তান বিহনে শোকে আলুলায়িত কেশ, এবং স্বামী বিহনে অন্ধকার জগৎ সংসারের চিত্রগুলি উজ্জ্বল রেখায় আঁকা হয়েছে।

২৭. কিয়া বিনে গে মালিন বয় বিবয় গে কিয়া বিহু মুখ রে মলিন।
কিয়া বিনে গে মালিন আউলালি কেশ গে কন লাগি দুনিয়া আঁধার ॥
অয় বিনে গে ধনি বয় বিবয় গে পান বিহু মুখ রে মলিন।
ছেল্যা বিনে গে ধনি আউলালি কেশ গে সঁয়া লাগি দুনিয়া আঁধার ॥

চুমানো অনুষ্ঠানে টাটকা তেলের প্রয়োজন পড়ে। গৃহস্বামিনী নতুন কাপড় পরে অঙ্গসজ্জা করে মুখে পান নিয়ে গরু চুমিয়ে থাকে। ধান-দূর্বা আতপ চাল ছিটিয়ে গো-দম্পতিকে চুমানো বা আশীর্বাদ করবার নিয়ম।

২৮. আগুয় আগুয় বুনিলম রাই বুঁগী ধান
তার পেছুয় বুনলম খেড়ী রে গুঁদলিয়া
মুখে লিলম পাকল পান থঁচলে লিলম আওয়া চা'ল
চলি গেলা আমার গুলিন গাইয়া চুমায়।
এক চুমায় চুমালম দুই চুমায় চুমালম
তিন চুমায় পড়ি গেল শিরি বরদা।
না কান্দ না খিজ শিরা রে ববদা
তর গুলিন দেয় ত দুবধান ॥

চুমানো অনুষ্ঠান ছাড়াও এই দিন আর একটি অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। এটিও মূলতঃ মেয়েলি আচার ছাড়া কিছু নয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'চোক পুরা।' স্নান করবার সময় ধুয়ে-আনা আতপচাল ঢেঁকিতে গুঁড়ো করে নেওয়া হয়। পানিয়া লতা থেঁতলে বড়ো বাটিতে বা থাপরিতে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। পানিয়া লতার রস অত্যন্ত চটচটে হয়ে থাকে। পানিয়া রসের জলে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে পিটুলি তৈরী করা হয়। বলাবাহুল্য, এই পিটুলিও চটচটে হয়ে থাকে। মেয়েরা গাঁয়ের রাস্তা থেকে ঘরের ভেতর আঙিনা সর্বত্র এই পিটুলির সাহায্যে আলপনা দিয়ে থাকে। ডান হাতের পাঁচটি আঙুল ডুবিয়ে অত্যন্ত দ্রুত ওপর থেকে মাটির ওপর পিটুলি ছড়িয়ে লতাপাতা ফুল আদির আলপনা দেওয়া হয়। এই আলপনার প্রতিটি সন্ধিস্থলে সিন্দুর লেপন করার নিয়ম আছে। তারপর এগুলোর ওপর গাঁয়ের রাস্তা থেকে গোয়াল পর্যন্ত ঘাস ছড়ানো হয়। গরুবাছুর ঘাস খেতে খেতে এই আলপনার ওপর হেঁটে গোয়ালে গিয়ে ঢোকে। এই অনুষ্ঠানটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র। এই সময় 'চোক পুরা' সম্পর্কিত আহীরা গানও গাওয়া হয়ে থাকে।

২৯. কন মাল্যানী ভালা গুঁড়ি যে কুটে রে কন মাল্যানে গুঁড়ি ঝাড়ে।
কন মাল্যানী ভালা চোক যে পূরে রে দাঁয়ে-বাঁয়ে ফেঁকে তরু-ডাল ॥
বড়কী মাল্যানী ভালা গুঁড়ি যে কুটে রে মাঝলী মাল্যানে গুঁড়ি ঝাড়ে।
ছটকী মাল্যানী ভালা চোক যে পূরে রে দাঁয়ে বাঁয়ে ফেঁকে তরু ডাল ॥

পরবর্তী গানে গৃহস্বামিনীর কন্যার এই অনুষ্ঠানে শিল্প-সম্মত আলপনা দেবার আশ্চর্য ক্ষমতার জন্য প্রশংসাবাদ আভাসিত হয়ে উঠেছে।

৩০. ছুটুমুটু ছুটুমুটু মাল্যানের বেটি রে লেখাপড়াই সবগ পাতাল।
আঁগিনাই ত লেখে ভালা চাঁদ সুরুজ রে কপাটে ত লেখে হনুমান ॥

আচার-অনুষ্ঠানগুলো শেষ হয়ে যাবার পর প্রতিটি গৃহস্থের বাড়িতে মহা-সমারোহে ভোজের আয়োজন করা হয়। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনদের ডেকে একসঙ্গে বসে ছাঁকা পিঠে, মাংস পিঠে, মাংস ভাত, মদ্য মাংস খাবার ধুম পড়ে যায়। তুচ্ছ বিরোধের অবসান ঘটিয়ে এই দিন আনন্দমুখর মানুষ সবার দিকে বন্ধুত্বের, মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দেয়। নববর্ষের আনন্দোচ্ছ্বাসের সব লক্ষণ এদিন প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ঝাড়খণ্ডে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনটি বাঁধনা পরবের শেষ দিন বললেও চলে। এদিনটিকে বলা হয় 'বুঢ়ী বাঁধনা'; পরবের দিনেও বাঁধনা হয়ে থাকে, তাই তৃতীয়ার দিনটি 'দেশ বাঁধনা' নামে পরিচিত। দ্বিতীয়ার দিনে পূর্বদিনের মতো শিববলদ ও শির গাইকে 'বাঁধনা' করে নিমছানো চুমানো আচারগুলো পালন করা হয়: এ যেন অনেকটা বাসি বিয়ের মতো। এই দিনও 'চোক' পূরণ করা হয়ে থাকে। পূর্বদিনের আচারঅনুষ্ঠানের প্রতিটি নিয়মই এদিনও পালন করা হয়। আলপনা দেবার অতিরিক্ত কুলবধূরা এদিন খড়ি-গোলা জলে ন্যাকড়া ডুবিয়ে দেওয়াল ও মেঝের সন্ধিস্থলে শাড়ির পাড়ের মতো চওড়া দাগ টেনে থাকে। এটিকে বলা হয় 'পাইড দেওয়া'। দ্বিতীয়ার পর আর কোন আচার-অনুষ্ঠান পালনের রেওয়াজ নেই। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিনই বাঁধনা পরবের সমাপ্তি ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়ার দিন 'বুঢ়ী বাঁধনা'র দিন। বিকেল বেলা 'বাঁধনা'র অনুষ্ঠান হয়। একে 'গরু খুঁটানো'-ও বলা হয়ে থাকে। দুপুর থেকেই এর আয়োজন শুরু হয়ে যায়। সাধারণতঃ গ্রামের রাস্তায়, কোথাও কোথাও মাঠে, দূরে-দূরে শক্ত দড়ি দিয়ে গরু-কাড়াকে বাঁধা হয়। গরু-কাড়ার শিঙে তেল-সিঁদুর চকচক করে। কপালে ধানের 'মোড়' ঝিলমিল করে, গলায় দোলে গাঁদা

ফুলের মালা। সারা গায়ে রঙ-বেরঙের নানা ধরনের ছাপ। চতুর্দিকে ঢোল ধমসা মাদলের গুরুগম্ভীর বাজনা। গৃহপালিত পশুগুলো তাই এই দিন খুব স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে থাকে। তাদের উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলবার জন্য তাদের গলাতেও পরিয়ে দেওয়া হয় ঘাঘর ঘাঁটি ঘুঙুরের মালা, যতোই উত্তেজিত হয়ে ছটফট করে ততোই গলার ঘাঘর-ঘাঁটি ঝনঝন করে বেজে ওঠে। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় বাঁধনা (<বন্ধন)। এই অনুষ্ঠানটি থেকেও বাঁধনা পরবের নামটি এসে থাকতে পারে। এইটি উৎসবের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান বলেই 'বুটী বাঁধনা' 'দেশ বাঁধনা' নামগুলোব উদ্ভব হয়েছে।

গরু-কাড়াগুলোকে খুঁটিতে শক্ত করে বাঁধবাব পর গরু-খেলানো আরম্ভ হয়ে যায়। ঢোল মাদল-ধমসা বাজিয়ে আহীরা গান গেয়ে-গেয়ে উত্তাল মাতাল জনতা এগিয়ে আসতে থাকে। তাদের বিচিত্র বেশবাস, টলোমলো এলোমেলো ভঙ্গি, হাতের গরু-মোষের শুকনো চামড়া কি লাল শালু, বস্তা আদি দূব থেকে দেখেই পশুগুলো ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে ছটফট করতে থাকে। খুঁটিব চারপাশে চরকির মতো পাক খেতে থাকে। কখনো শিং দিয়ে মাটি খোঁড়ে, কখনো পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হুংকার তোলে। এই সব উত্তেজিত শৃঙ্গী পশুগুলোকে খেলানো সহজ কথা নয়; তাই মানুষগুলো মদের হাঁড়িয়ার নেশায় চুর হয়ে এই বিপজ্জনক খেলায় নেমে থাকে। প্রায়ই গরু কাড়ার গুঁতো-লাথি খেয়ে মাতালেরা আহত হয়ে থাকে, কোথাও কোথাও প্রাণ নিয়েও টানাটানি দেখা দেয়। এই অনুষ্ঠানে মাতাল জনতাও যেন অনেকটা হিংস্র হয়ে ওঠে। গরু-মোষকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে হিংস্র করে তোলে। এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কোথায়? এ-ব্যাপারে অনেকে অনেক কিছুই বলে থাকেন। কেউ বলেন, এটা নিছক খেলা মাত্র; কেউ-বা বলেন, হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষায় যাতে গৃহপালিত পশুগুলো সক্ষম হয়, তাই এই ভাবে বেঁধে খেলিয়ে তাদের লড়াই শেখানো হয়। আমাদের মনে হয়, এই ব্যাখ্যাগুলোর কোনটিই ঠিক নয়। গভীরে অন্য কোন অর্থ লুকিয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। আগেই বলা হয়েছে, কৃষিজীবী মানুষের ভাবনায় ষাঁড়ের পবিত্রতা অত্যন্ত বেশি, বলা যেতে পারে অপরিসীম। সমগ্র গোষ্ঠীর লোকেদের সাধ-আহ্লাদ এই ষাঁড়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। একই ভাবে শিকার জীবীদের কাছে ভালুক এবং অরণ্যচারীদের কাছে বৃক্ষও অত্যন্ত পবিত্র

বস্তু। জেন হ্যারিসন বলেন, Bear and Bull and Tree are sacred, that is, set apart, because full of a special life and strength is desired. They are led and carried about from house to house that their sanctity may touch all, and avail for all; the animal dies that he may be eaten; the Tree is torn to pieces that all may have a fragment, and above all, Bear and Bull and Tree die only that they may live again.[৫] পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কেন কৃষিজীবী মানুষেরা গরুজাতির প্রতি এতো শ্রদ্ধাশীল। গো-জাতিকে পবিত্র পশু হিসেবে সশ্রদ্ধ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয় যাতে তাদের কাছ থেকে গোষ্ঠীর সবাই পবিত্রতা লাভ করা তো বটেই, তদুপরি বিশিষ্ট জীবন এবং শক্তি লাভও করতে পারে। এই পবিত্র পশুকে হত্যা করে তার মাংস গোষ্ঠীর প্রত্যেকে ভক্ষণ করে থাকে, কারণ তাতে গোষ্ঠীর সবাই এক বিশেষ ধরনের জীবন এবং ক্ষমতা অর্জন করে। পবিত্র পশুর মৃত্যু ঘটানো হয়, কারণ তাতে পশুটি পুনর্জীবন লাভ করে। প্রকৃতির মধ্যে মৃত্যু ঘটে, কারণ তারই মধ্য দিয়ে পুনর্জন্মের ভিত্তিও রচিত হয়। আমাদের বিশ্বাস, সুদূর অতীতে ঝাড়খণ্ডেও এই বাঁধনা পরবে ষাঁড় হত্যা করে গোষ্ঠীর প্রত্যেকে তার মাংস ভক্ষণ করত। গরু-খুঁটানো অনুষ্ঠানটি অতীতে ষাঁড়কে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে হত্যা করার স্মৃতিই বহন করে চলেছে। অনেকে ষাঁড় হত্যা করে ভক্ষণের কথায় শিউরে ওঠেন। তাঁদের বক্তব্য, এই অনুষ্ঠানে গো-হত্যার কথা ভাবা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক; কারণ, যে গো-জাতির পূজো এবং বন্দনা করা হয়, তাদের হত্যা করার কথা অকল্পনীয়। কিন্তু আদিম মানুষের ভাবনার গভীরে প্রবেশ করলেই বোঝা যাবে, এটি ভ্রমাত্মক তো নয়ই, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। যা কিছু পবিত্র, তার স্পর্শ অন্যের শরীরে পবিত্রতা সঞ্চার করতে পারে; যার মধ্যে বিশিষ্ট জীবন এবং ক্ষমতা আছে, তার মাংস ভক্ষণের ফলে সেই বিশিষ্ট জীবন এবং ক্ষমতা লাভ করা যায়, লোক-ভাবনার এই বিশেষ দৃষ্টিকোণটি অনুধাবন করলে পবিত্র পশুহত্যা এবং তার মাংসভক্ষণ ব্যাপারটি খুবই সংগত এবং স্বাভাবিক বলে মনে হবে। মনে রাখতে হবে, আদিম মানুষের ভাবনায় আত্মসংরক্ষণের ক্ষেত্রে বড়ো প্রশ্ন

৫ Ancient Art and Ritual: J. E. Harrison, P 98

আর কিছু ছিল না। সন্তান এবং ফসল উৎপাদন ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ তাদের কোনদিনই আকৃষ্ট করে নি। ফসল উৎপাদনের জন্য গো-জাতির ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। মানুষের বংশবৃদ্ধির জন্য যেমন সন্তানোৎপাদনের প্রয়োজন, তেমনি গো-জাতিব বংশবৃদ্ধির জন্য তাদের প্রজননের প্রয়োজন। গোজাতিব প্রজনন এবং সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই এই বাঁধনা পরব। বিবাহ আদি কতকগুলো আচার পালনেব মধ্য দিয়ে আদিম মানুষ গো-জাতিব মধ্যে অলৌকিক উপায়ে প্রজনন এবং সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা ত্বরান্বিত কবত। তাই বাঁধনার আচার-অনুষ্ঠানগুলো অনেকাংশে জাদু-ক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়; তেমি পবিত্র পশু ষাঁড়কে হত্যা করে ভক্ষণ করার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে ষাঁড়ের পবিত্রতা, প্রজননক্ষমতা, দৈহিক শক্তি ইত্যাদি মনুষ্যশরীরে সঞ্চারিত হওয়াবকথায় আদিম মানুষ বিশ্বাস কবত।

অতঃপর আমবা গরু-খুঁটানোব গান নিয়ে আলোচনা কবব। বেশিব ভাগ গানই প্রশ্নোত্তবমূলক, কিন্তু গাইয়েদেব মধ্যে কবি-গানের মতো কিংবা তর্জা গানের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব থাকে না। একই ব্যক্তি গানেব প্রশ্ন এবং উত্তব দু'টি অংশই গেয়ে থাকে, কখনো কখনো সম্মিলিত কণ্ঠেও এ গান গাওয়া হয়ে থাকে। জাগবণেব এবং গরু খুঁটানোব আহীরা গানের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট সীমাবেখা থাকে না। তাই একই গান জাগরণের সময় এবং গরু খুঁটানোর সময় গীত হতে শোনা যায়। সব সময় যে গানেব বিষয়বস্তু গরুকাড়া হয়ে থাকে, তা নয়; কখনো কখনো মনুষ্য, অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগৎও গানের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। তবে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রসঙ্গই এ গানে সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়। আদিম মানুষের পারিপার্শ্বিক জীবজগৎ এবং উদ্ভিদজগৎ সম্পর্কিত অত্যন্ত সহজ সরল অভিজ্ঞতাগুলোই আহীরা গানে বিধৃত হয়ে আছে।

গরু-খেলানো দলটি নেচে-গেয়ে যখন কোন খুঁটানো বলদের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন তাবা ঢোল-ধমসা-মাদলের বাজনায় সম্মিলিত গানে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে বলদ বা ষাঁড়টিকে উত্তেজিত করে তোলে। 'শ্রীবরদা'র সম্মুখে দাঁড়িয়ে তারা গো-জাতি-সম্পর্কিত গান গাইতে শুরু করে। গরু-খেলানো এবং কাড়া-খেলানো গান আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। তবে অনেক সময়ই একই গানের বলদ বা কাড়া শব্দটি বদলে উভয় ক্ষেত্রেই গাইতে শোনা যায়। প্রথমে গরু-খেলানো গান নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

৩১. কনে ত ছাঁচয়ে কনে ত ছুলয়ে কনে ত গাড়ে মাল থাম।
সেই থামে বাঁধব কনে কা পুতা হো মাইরে ত ধুলা উড়ি যায়॥
ঈশ্বরে ছাঁচয়ে মাহাদেবে ছুলয়ে মানমী-এ গাড়ে মাল থাম।
সেই থামে বাঁধব কপিলা কা পুতা হো মাইরে ত ধুলা উড়ি যায়॥

ঈশ্বর মাল থাম (<মল্লস্তম্ভ ?) ছাঁচলেন, মহাদেব ছুললেন এবং মানুষ সেই খুঁটা মাটিতে পুঁতল। সেই মাল খুঁটায় বাঁধা কপিলাপুত্র ষাঁড নেচে-খেলে চারপাশ ধুলোয় ভরে তুলল। এখানে মাল থাম শব্দটি লক্ষণীয়; মল্লক্রীড়ার খুঁটিতে ষাঁড়কে বেঁধে একদা খেলা অথবা লড়াই করা হত বলে মনে হয়।

পরবর্তী গানে বলা হয়েছে, শিখরভূমে বলদের জন্ম, বরাভূমে তার গৃহবাস, বাগালের হাতে তার লালনপালন আর গোয়ালিনী (এখানে গৃহস্বামিনী) তার নাম রেখেছে ভোমরা।

৩২. কন ঠিনে রে বরদা তোহরি জনম রে কন ঠিনে লিলি গিরহবাস।
কার হাতে রে বরদা লালন পালন রে কেহু ত ধরে ভমরা নাম॥
শিখর ভুঁই-এ রে বরদা তোহরিজনম রে বরহাভুঁই-এ লিলি গিরহবাস।
বাগালের হাতে বরদা লালন পালন রে গুলিনে ত ধরে ভমরা নাম॥

কালো গাই দুলালী হয়, ধবলী গাই দেখতে সুন্দরী হয়, রাঙী গাই দেখতে যেমন রূপসী তেমনি সোনার পাত্র ভরে দুগ্ধদানেও পারদর্শিনী।

৩৩. কন যে গাই ভালা উলালী দুলালী রে কন্ গাই ত দেখিতে সুন্দর।
কন গাই যে ভালা বড় রূপসিনী গ সনার কটোরায় দুধ দেয়॥
কাইলী যে গাই ভালা উলালী দুলালী রে ধলী গাই দেখিতে সুন্দর।
রাঁগী যে গাই ভালা বড় রূপসিনী গ সনার কটোরায় দুধ দেয়॥

কাড়া বা মোষ বলদের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর পশু। ক্ষমতায় যেমন বিপজ্জনক, তেমনি তার উত্তেজিত উন্নত চেহারাও অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। হিন্দু পুরাণে এই মোষই সাক্ষাৎ মৃত্যুর দেবতা যমের বাহন, তাই মালখুঁটায় কাড়া বেঁধে তাকে খেলানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রায়শঃই মাতাল ধাঁগড়িয়ারা মোষের আঘাতে ঘায়েল হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি মোষ-খেলানোর গান উদ্ধৃত করা হল।

৩৪. কিয়া বরণ কাড়া তরি আট অঙ্গ রে কিয়া বরণ দুই শিঙ্গ।
কিয়া বরণ কাড়া তরি দুই আঁখি রে কিয়া বরণ চারি পা যে॥
তামাল বরণ কাড়া তরি আট অঙ্গ রে কাদা বরণ দুই শিঙ্গ।

কাজল বরণ কাড়া তরি দুই আঁখি রে উথল বরণ চারি পা যে ॥
কিসে সাজাব কাড়া তরি আট অঙ্গ রে কিসে সাজাব দুই শিঙ্গ।
কিসে সাজাব কাড়া তরি দুই আঁখি বে কিসে সাজাব চারি পা যে ॥
গুঁড়ি-এ সাজাব তরি আট অঙ্গ রে সিন্দুরে সাজাব দুই শিঙ্গ।
কাজলে সাজাব কাড়া তরি দুই আঁখি বে নেপুরে সাজাব চারি পা যে ॥

৩৫. কন মাসে রে কাড়া ধুলায় ধুসুর রে কন মাসে লিলি কাদা লেওয়া।
কন্ মাসে বে কাড়া মইলকেঁ বাহিরালি কন মাসে লিলি ঘাড়ে দড়া ॥
চ'ৎ বৈশাক মাসে ধুলায় ধুসুর রে আষাঢ় মাসে লিলি কাদা লেওয়া
আশিন মাসে রে কাড়া মইলকেঁ বাহিবালি কাত্তিক মাসে লিলি ঘাড়ে দড়া ॥

গরু-খেলানো বা কাড়া খেলানো বিশিষ্ট গানের অতিরিক্ত আরো বিভিন্ন বিষয়বস্তু আহীরা গানেব অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। বলা যেতে পাবে, গরু-কাড়া প্রসঙ্গবর্জিত আহীরা গানেব সংখ্যাই বেশি। গরু কাড়া নির্বিশেষে এই সব গান গেয়ে খেলানো হয়ে থাকে। গরু-কাড়াব কথা থাকলেও এই সব গানে তাদেব প্রাধান্য থাকে না। অন্যান্য মনুষ্যেতব প্রাণীব সঙ্গে তাদেব প্রসঙ্গও গানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

৩৬. কেহ ত পুষে ভালা লাল নীল পাখি বে কেহ ত পুষে ধেনু গাই।
কেহ ত পুষে ভালা রাড়াবাম্পা কাড়া জভি ক্ষেতে দেয় ত ঠেঁসাই ॥
রাজায় ত পুষে ভালা লাল নীল পাখি বে রাণীএ ত পুষে ধেনু গাই।
চাষায় ত পুষে ভালা রাড়াবাম্পা কাড়া জভি ক্ষেতে দেয় ত ঠেঁসাই ॥

লক্ষণীয় রাজা-বাণী অল্প আয়াসে লালিত প্রাণী পোষেণ কিন্তু চাষীকে পুষতে হয় এমন প্রাণী যার উদরপূরণের ভাবনা তার কাছে এক রীতিমতো সমস্যা। তাই মোষ-কাড়াকে ছেড়ে দিতে হয় 'জভি' ক্ষেতে বা জলা তৃণভূমিতে।

৩৭. কেহ ত আনে ভালা লতা বল পাতা রে কেহ ত আনে কাদা-লেওয়া।
কেহ ত আনে ভালা বাঁধনা পরব রে ঘবে ঘরে গরয়া ঠাকুর ॥
মৈষ্ ধনি আনে লতা বল পাতা রে কাড়ায় ত আনে কাদা-লেওয়া।
গাই ধনি আনে ভালা বাঁধনা পরব বে ঘরে ঘরে গরয়া ঠাকুর ॥

৩৮. কনে ত খুজে ভালা চৈত বৈশাখ গ কনে ত খুজে আষাঢ় মাস।
কনে ত খুজে ভালা গলা কাত্তিক মাস যে পহঁচল ঋতকেরি দিন ॥

শিরি বরদায় খুজে ভালা গলা কাত্তিক মাস যে পছঁচল ঋতকেরি দিন ॥
কেই সে চিনবে বাবু চৈত বৈশাক গ কেই সে চিনবে আষাড় মাস।
কেই সে চিনবে বাবু গলা কাত্তিক মাস যে পছঁচল ঋতকেরি দিন ॥
ধুলায় চিনব বাবু চৈত বৈশাক গ কাদায় চিনব আষাড় মাস।
ধান ফুলে চিনব গলা কাত্তিক মাস যে পছঁচল ঋতকেরি দিন।

গানটিতে বিভিন্ন পশুর বিভিন্ন ঋতুতে স্বচ্ছন্দ বিহারের কথা বলা হয়েছে। ছাগল শুকনো খটখটে জমি পছন্দ করে, তাই তাদের প্রিয় সময় হল চৈত্র-বৈশাখ মাস; মোষ-কাড়া কাদা মাটি পছন্দ করে, তাই তাদের প্রিয় সময় হল আষাঢ় মাস বা বর্ষাকাল; গরু-বলদ খরা বা বৃষ্টি কোনটাই পছন্দ করে না, তাদের পছন্দ প্রচুর সবুজ ঘাসে-ঢাকা ভেজা মাটি—তাই তাদের প্রিয় কার্তিক মাস। এ মাস তারা চেনে কি ভাবে? চারপাশে ধূলো উড়তে থাকলে তা চৈত্র-বৈশাখ, কাদা দেখলেই বোঝে আষাঢ় মাস আর বিলে-ক্ষেতে সর্বত্র ধানের ফুল দেখে বোঝে সময়টা কার্ত্তিক মাস—যখন চার পাশে আনন্দের বাজনা বেজে ওঠে আর বাঁধনা পরব এগিয়ে আসে।

৩৯. কন মরিলে ভালা ঘুরি ফেরি আসে রে কন মরিলে নাহি ঘুরে।
বনেকেরি কাঠপাত গাঁয়েকেরি আগুন খসি খসি পড়ে ত আঁগার ॥
পরব মরিলে ভালা ঘুরি ফেরি আসে রে মানষী মরিলে নাহি ঘুরে।
বনেকেরি কাঠপাত গাঁয়েকেরি আগুন খসি খসি পড়ে ত আঁগার ॥

কে মারা গেলে আবার ফিরে আসে, কে মারা গেলে আর ফিরে আসে না? বনের কাঠ-পাতা আর গাঁয়ের আগুন দিয়ে রচিত চিতা থেকে শুধু জলন্ত অঙ্গার খসে-খসে পড়ে। পরব মারা গেলেও (অর্থাৎ পরব শেষ হলেও) আবার পরের বছর ফিরে আসে, কিন্তু মানুষ মারা গেলে আর ফেরে না: বনের কাঠ আর গাঁয়ের আগুন দিয়ে রচিত চিতা থেকে শুধু জলন্ত অঙ্গার খসে-খসে পড়ে। গানটিতে মানুষের নশ্বর জীবনের কিছুটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আছে। কিন্তু তবু ঝাড়খণ্ডী মানুষের জীবনে আনন্দ-উৎসব তাকে মৃত্যু চেতনার বিষাদে ম্লান হতে দেয় না। এখানকার মানুষ তাই আনন্দ-উৎসবকে আবাহন জানাবার জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকে। বাঁধনা পরব ফুরিয়ে গেলেও সে জানে আবার সে পরব ঘুরে-ফিরে আসবে, আবার তারা আনন্দ-উৎসবে মত্ত হবার অবকাশ পাবে—

পরব মরিলে ভালা ঘুরি ফেরি আসে রে ॥

॥ সাত ॥

টুসু গীত

টুসুগীত ঝাড়খণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক উৎসব, বলা যেতে পারে জাতীয় উৎসব, মকর পরব উপলক্ষে গাওয়া হয়ে থাকে। মকর পরব টুসু-পরব নামেও পরিচিত। বলা বাহুল্য, এই উৎসবটিও শস্যোৎসব, অনেকের মতে ফসল তোলার উৎসব (Harvest Festival)। এই উৎসবটি ঝাড়-খণ্ডের নববর্ষোৎসবও বটে, কৃষিবর্ষ এখানে পয়লা মাঘ থেকে আরম্ভ হয়ে থাকে। কিন্তু সবার উপরে এই উৎসবে যার প্রাধান্য তা হল টুসু। টুসু পুজো উপলক্ষে টুসুগীত গাওয়া হয়ে থাকে। টুসুগীত ঝাড়খণ্ডের সবচেয়ে নিরংলকার, প্রাণ-তপ্ত গীত। অন্য কোন গীতে একটা অঞ্চলের জাতীয় জীবনকে এমন সামগ্রিকভাবে পাওয়া যায় না, যেমনটা পাওয়া যায় টুসুগীতে। টুসুগীতের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্বেল সুর-ঝংকারে সারা ঝাড়খণ্ড অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে মকর পরব পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে যে-ভাবে প্রাণচঞ্চল হয়ে থাকে, তেমনটি খুব কম উৎসবেই খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার শারদোৎসবের প্রাণচাঞ্চল্যও এর কাছে ম্লান মনে হয়। এই টুসুকে কেউ-কেউ ব্রত বলবার পক্ষপাতী, যদিও টুসু পুজোয় উপবাস কিংবা প্রার্থনার মন্ত্র বা ছড়া নেই। তবে টুসু পুজো যে আচারঅনুষ্ঠান-মূলক শস্যোৎসব তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা প্রথমে টুসু পরবের এই সব বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

ঝাড়খণ্ডে সাধারণতঃ অঘ্রাণ সংক্রান্তির মধ্যেই ফসল তোলার কাজ শেষ হয়। এই অঘ্রাণ সংক্রান্তিকে বলা হয় 'চাঁউড়ী' (<চাউনী ?) বা 'ছট মকর'। এ-দিনও ঝাড়খণ্ডে পিঠে করে খাবার নিয়ম আছে। এই দিন সন্ধ্যা থেকেই টুসুসংগীত অনুশীলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়ে থাকে। সারা পৌষ মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা টুসুগীতের চর্চা করে থাকে। পৌষ পরবে এই সঙ্গীতচর্চার সমাপ্তি ঘটে; তবে কোথাও কোথাও শ্রীপঞ্চমীতেও টুসুপুজো করে টুসুগীত গাওয়া হয়ে থাকে। মকর পরবের আগের দিনটিকে ঝাড়খণ্ডে 'বাঁউড়ী' (<বাউনী ?) বা 'সঁদেশ' অর্থাৎ সন্দেশের দিন বলা হয়। এই দিন সন্ধ্যাবেলা মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পিঠে-পুলির প্রচুর আয়োজন করা হয়। এই রাত টুসু জাগরণের রাতও বটে, তাই সংগীতের

সুরে-সুরে সারা ঝাড়খণ্ড যেন জেগে থাকে। এ-গানে বাস্তব জীবনের নানা কামনা-বাসনার কথা, কুৎসা আর দেহমিলনের কথাও অনাবৃত ভাবে প্রকাশ পায়। ওদিকে সারা রাত ধরে ছেলেরাও টুসুগীতে, অগ্ন্যুৎসবে সচকিত করে রাখে সমগ্র জনপদকে। পরের দিন মকর সংক্রান্তি। সেদিন ভোর রাত্রি থেকে স্নানের ধুম পড়ে যায়। স্নান না করে জল গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। স্নানান্তে নূতন বস্ত্রপরিধানের নিয়ম আছে। ঝাড়খণ্ডে অন্য কোন উৎসবে নূতন বস্ত্র পরিধান সর্বজনীন নয়, যাদের অর্থবল নেই, তারা অন্ততঃ গেঞ্জি কি গামছা কি এক টুকরো নতুন কাপড় শরীরে জড়িয়ে থাকে। স্নানান্তে অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের আগে তিলের বীজ খাবার রীতি আছে। উল্লিখিত আচারগুলো শুধু যে কৃষি-সম্পর্কিত তা নয় ওগুলো নববর্ষের আচারও বটে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন, 'ষোলশত বৎসর পূর্বে পৌষ সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। পরদিন ১লা মাঘ নূতন বৎসরের প্রথম দিন। সেদিন আমরা দেব-খাতে প্রাতঃস্নান করি। লোকে বলে মকর স্নান।' তাঁর মতে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ হত। মকর পরব যে ঝাড়খণ্ডের নববর্ষ উৎসব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নববর্ষোৎসবের প্রতিটি লক্ষণই মকর পরবের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে।

পয়লা মাঘ নববর্ষের প্রথম দিন। ঝাড়খণ্ডে এই দিনটিকে 'আখিয়ান যাত্রা' বা 'যাত্রা' বলা হয়। 'আখিয়ান' শব্দটি 'অক্ষ-অয়ণ' শব্দজাত বলে মনে হয়। অক্ষ অর্থে সূর্য এবং অয়ণ অর্থে গতি অর্থাৎ সূর্যের গতি। যাত্রা অর্থে গমন, বলাবাহুল্য সূর্যেরই গমন। এখানে উত্তরায়ণের কথাই প্রকাশ পেয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য আখিয়ান শব্দের উৎপত্তি অর্ক-অয়ণ থেকেও এসে থাকতে পারে, অর্থ একই, সূর্যের গতি।

পয়লা মাঘ সূর্যের উত্তরায়ণ এবং নববর্ষের প্রথম দিনই শুধু নয়, ঝাড়খণ্ডে এই দিনটি কৃষিবর্ষের প্রথম দিনও বটে। এই দিনটিকে তাই 'হালপুণ্যা' ('হালপূর্ণ' শব্দসঞ্জাত হতে পারে) বলা হয়। এদিন বছরের প্রথম হলচালনা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হয়। বাঁধনা পরবের গরয়া পূজার দিন লাঙল-জোয়াল ধুয়ে মাচার উপরে তুলে রাখা হয়; হালপুণ্যের দিনের আগে মাটিতে নামানো নিষিদ্ধ। তাই এই দিন লাঙল নামিয়ে বছরের প্রথম হালচালনা করা হয়।

ওপরে দেখানো হল মকর পরব শুধু নববর্ষোৎসবের স্মৃতিই বহন করছে না, কৃষিবর্ষোৎসবও এর মধ্যে নিহিত আছে। অন্য কথায় এই উৎসব শস্যোৎসবও বটে। কেউ কেউ বলেন, এটি ফসল তোলার উৎসব। ঝাড়খণ্ডে অগ্রাণ সংক্রান্তির মধ্যে সাধারণতঃ ফসল তোলার কাজ শেষ হয়ে যায়। টুসুগীতের উদ্বোধন যখন করা হয়, তখন চারপাশে শূন্য মাঠ খাঁ খাঁ করতে থাকে। মকর-পরবের ফসল তোলার কথা তো ওঠেই না। এদিক দিয়ে বিচার করলে একে সরাসরি ফসল তোলার উৎসব বলা চলে না। তবে যেহেতু এই সময় সবার ঘরেই নতুন ফসল উঠে থাকে, তাই ফসল কাটার উৎসব বললে খুব একটা ভুল বলা হয় না। টুসু পরব যে আদিম শস্যোৎসব তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না তাই টুসুকে পৌষলক্ষ্মী রূপে যাঁরা দেখতে চান, তাঁরা এই আদিম শস্যোৎসবকে অস্বীকার করে টুসুকে আর্যদেবীত্ব দান করে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবের ফল বলে প্রতিপন্ন করতে চান। কিন্তু টুসু প্রতিষ্ঠার উপকরণগুলো, যার মধ্যে মুখ্য হল নতুন ধানের তুষ, গোবর ইত্যাদি, স্পষ্টতঃ প্রমাণ করে যে সার মাটি দিয়ে উর্বরতা সৃষ্টির কামনাই টুসুকে উর্বরতাবাদের প্রতীকে পরিণত করেছে। ডক্টর সুকুমার সেনও একে শস্যোৎসব হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন, টুসু উৎসব তিষ্যানক্ষত্রে অনুষ্ঠিত শস্যোৎসবের প্রবহমান ধারা।

টুসুর রূপ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও মাটির সরার মধ্যে তুষ আর পিটুলিগোলা-ছেটানো গোবরের নাড়ু রাখা হয়, কোথাও বা ছোট কুণ্ডের মধ্যে গোবর রাখা হয়, কোথাও বা বাঁশের 'ডালির' (ছোট ডালা) ভেতর তুষ আর গোবর নাড়ু রাখা হয়, কোথাও দেখতে পাওয়া যায় রঙিন কাগজ আর সোলা কঞ্চি দিয়ে তৈরী চৌডল বা চতুর্দোলা। ধলভূম এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বর্তমানে ভাদুর অনুকরণে টুসুর মূর্তিপূজা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, মূর্তিগুলো পুতুলের মতো, বিভিন্ন ধরনের মূর্তির ওপর হিন্দুদের দেবীমূর্তির প্রভাব সহজেই নজরে পড়ে। তবে মূর্তির চল হলেও সরার মধ্যে তুষ, গোবরের নাড়ু পিটুলির নাড়ু রেখে পুজো করা হয়। কয়েক দশক আগে ধলভূম-ঝাড়গ্রামেও চৌডল প্রচলিত ছিল।

টুসু শব্দটি যে তুষ শব্দ থেকেই এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধানের তুষ জাদুক্রিয়ার যেমন অঙ্গ তেমনি মৃত ধানেরও প্রতীক। টুসুকে জলে

বিসর্জন দেওয়ার অর্থ হল তাকে কবর দেওয়া। আদিম মানুষ মৃত্যু এবং পুনর্জন্মকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি ঘটনার অতিরিক্ত কিছু মনে করত না। জাওয়া এবং টুসু ঝাড়খণ্ডের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শস্যোৎসব। জাওয়া (<জাত) উৎসবে শস্যোৎপাদনের জাদু-আচার পালন করা হয়ে থাকে। জাওয়া তাই শস্যের জন্মোৎসব। আদিম মানুষ প্রকৃতিতে বিচিত্র লীলাপ্রকাশ দেখত। গাছপালা লতাগুল্ম এক বিশেষ সময়ে জন্মগ্রহণ করে, আবার এক সময় শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু কিছু কাল বাদে আবার চারা গজিয়ে ওঠে। এই দেখেই তারা জন্ম মৃত্যু এবং পুনর্জন্মকে একসূত্রে গ্রথিত করে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। এই জন্যই প্রকৃতিতে মৃত্যু দেখে মোটেই আশাহীন হত না। তাই মৃত্যু সম্পর্কিত উৎসবেও তারা জীবনের আনন্দ-গান করত, কারণ তারা জানত, বৃক্ষলতাগুল্ম জীবজন্তু মানুষের মৃত্যু ঘটে এই কারণেই যে তারা পুনর্জীবন লাভ করবে। এই লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত জন্ম-মৃত্যু দু'টি ঘটনা জাওয়া এবং টুসুর মধ্য দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে। জাওয়া শস্যের জন্মোৎসব এবং টুসু মরণোৎসব। In hot cuntries the seeds sprang up rapidly, but as the plants had no roots they withered away quickly. At the end of the eight days they were carried out with the images of the dead Adonis and thrown with them into the sea or springs.১ জেন হ্যারিসনের এই বক্তব্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখলে জাওয়া পরবকে মোটেই এ্যাডোনিস-তত্ত্ব থেকে পৃথক মনে হবে না। জাওয়া ডালির মধ্যে বালির ওপর বিভিন্ন শস্যবীজ বপন করে হলুদ-গোলা জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ জাওয়া মূল পরবের সাত দিন আগে দেওয়া হয়। তারপর করম পরবের পরদিন জাওয়ার চারাগুলোকে করম-ডালসহ জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। চারাসহ এ্যাডোনিস-এর বিসর্জন এবং চারাসহ করমের বিসর্জন কোনক্রমেই ভিন্ন বস্তু হতে পারে না। অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে উদ্ভিদজগতের রহস্যই ফুটে উঠেছে, স্বল্পকালীন অস্তিত্বের পর মৃত্যু ঘটে কিন্তু সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই পুনর্জীবনও যেন আভাসিত হয়ে ওঠে।

১ The Ancient Art and Ritual J. E. Harrison P 55

টুসু পরব শস্যের মরণোৎসব। তুষ থেকে টুসু শব্দের উদ্ভব; তুষ মৃত ধানের প্রতীক। কিন্তু টুসু উৎসব কোনক্রমেই শোক-উৎসব নয়, বরং টুসু উৎসব ঝাড়খণ্ডের সবচেয়ে প্রাণবন্ত উৎসব। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির মতোই গাছ-গাছড়ার জন্ম মৃত্যু পুনর্জন্ম যে এক সুতোয় বাঁধা তা আদিম জনতার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল। তাই পুনর্জন্মের সম্ভাবনাকে তীব্রতর এবং ত্বরান্বিত করবার জন্য বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক আচার পালন করত। মৃত্যু অনুষ্ঠানের মধ্যেও তাই উর্বরতা-বৃদ্ধির ব্যগ্রতাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। মৃত ধানের প্রতীক তুষের সঙ্গে গোবর, পিটুলি গোলা, হলুদ জল, গাঁদা ফুল আদি ঐন্দ্রজালিক উপকরণ মিশিয়ে উর্বরতা বৃদ্ধি এবং শস্যের পুনর্জীবন লাভের কামনা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কুমারী মেয়েদের মধ্যে উর্বরতাবাদের প্রজনন ক্রিয়া, শস্যোৎপাদন আদি গুণগুলো সর্বাধিক থাকে বলে লোকবিশ্বাস আছে, আর তাই ঝাড়খণ্ডের দুটি শ্রেষ্ঠ শস্যোৎসব জাওয়া এবং টুসুর মধ্যে কুমারীকন্যাদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জাওয়ার মতোই টুসু পূজায় একমাত্র কুমারী মেয়েদেরই অধিকার। যৌনতার শিথিলতা এই উৎসবেও দেখা যায়, গানের মধ্য দিয়েও এই দেহ মিলনের উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিরাবরণ ভাষায় প্রকাশ পেয়ে থাকে। সারা রাত্রি মৃত শস্যের ডালিকে কেন্দ্র করে কুমারী মেয়েরা যে আচার পালন করে তা মৃত শস্যের মধ্যে প্রাণসঞ্চার এবং উর্বরতা বৃদ্ধির কামনাতেই করে থাকে। টুসু বিসর্জনের সময় খই ছড়ানো নিয়ম আছে, যা আমাদের শবযাত্রার আচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোথাও কোথাও টুসুর চৌডল-এর চার কোণে দড়ি বেঁধে দু'টি লাঠিতে বেঁধে চারজন কাঁধে তুলে নেয় এবং মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবার রীতির অনুকরণ করে। তারপর পুকুর বা নদীতে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়, বলা যেতে পারে, টুসুকে সমাধি দেওয়া হয়। এই সমস্ত আচার থেকে এটাই সপ্রমাণিত যে, যে-টুসুকে কেন্দ্র করে এই উৎসব তা আসলে মৃত শস্যই। এই আচারগুলো অনুকৃত ইন্দ্রজাল (Imitative Magic) ছাড়া কিছু নয়। উদ্দেশ্য, শস্যদেবতার জীবনধারাকে গতিশীল প্রাণবন্ত করে তোলা এবং তাকে নিজস্ব প্রয়োজন এবং কার্যসিদ্ধির উপযোগী করে তোলা। শস্যের দেবতা প্রায় সব সময়েই মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের সঙ্গে জড়িত। এ-প্রসঙ্গে জেন্ হ্যারিসন বলেন, when the death and burial are once accomplished the hope of resurrection and new birth begins and with the

hope the magical ceremonies that may help to fulfil that hope.[২]

যখন মৃত্যু এবং সমাধি-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় তখনই পুনর্জীবন এবং নব-জন্ম লাভের আশার সূত্রপাত হয় এবং এই আশাকে পূর্ণ করে তোলার জন্য ইন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া হয়। টুসু উৎসব এই পুনর্জীবন এবং নবজন্মলাভের আশার পরিপূর্ণতার জন্য অনুষ্ঠিত ঐন্দ্রজালিক আচার-উৎসব বলেই মনে হয়।

এবারে বিচার করে দেখা যেতে পারে, টুসু আদৌ কোন ব্রত কিনা। ব্রত সাধারণতঃ সমষ্টিগত কোন কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, এবং শস্যব্রতে প্রধানতঃ কুমারী মেয়েদেরই ভূমিকা থাকে। আমরা ওপরের আলোচনায় দেখেছি, ব্রতের এই ধর্মগুলো জাওয়া এবং টুসু উভয় শস্যোৎসবেই পুরোপুরি বর্তমান। জাওয়াতে কুমারী কন্যারা শস্যের জন্মোৎসব পালন করে প্রচুর ফসলের কামনায, টুসুতে কুমারী কন্যারা শস্যের মরণোৎসব পালন করে শস্যের পুনর্জীবন এবং নব-জন্মের কামনায়। কিন্তু ব্রতের অন্য একটি বিশিষ্ট ধর্ম হল, ব্রতের প্রার্থনা মন্ত্র থাকবে অথবা কামনার বাণীরূপ ছড়া থাকবে। ছড়া বলার রীতি নাকি ব্রতের প্রাচীনতার পরিচয়। ডঃ সুধীর কুমার করণের মতে ভাদুর প্রভাবের ফলেই নাকি ঝাড়খণ্ডের টুসু ব্রত থেকে ছড়া এবং তৎসঙ্গে কামনাবাসনা-প্রার্থনা লুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর মতে 'বাঙলাদেশের তোষলা ব্রত সীমান্ত বাঙলার টুসু'তে পরিণত হয়েছে'[৩]। ঝাড়খণ্ডের টুসু উৎসবে কোন ছড়া নেই, কোন কামনা-বাসনার মন্ত্র বা প্রার্থনা নেই; টুসু উৎসবে শুধু গান আছে। যে-গানে একটা সমগ্র অঞ্চলের জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়ার কথা আছে। জাওয়াতে-ও কোন ছড়া নেই, শুধু গান আছে যে গানে নারী-জীবনের সুখ দুখ আনন্দ-বেদনার কথা আছে। দুটোই শস্যোৎসব। দুটোতেই কোন ছড়া নেই কিন্তু বিভিন্ন আচার আছে; কথা নেই, কিন্তু কথার ব্যঞ্জনার চেয়েও তীব্রতর ব্যঞ্জনা আছে আচারগুলোতে। ছড়া মানুষের পরিণত বুদ্ধির সৃষ্টি, কিন্তু

২ Ifid P 55

৩ পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার লোকযান।

আচার ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসপুষ্ট আদিম মানুষের সৃষ্টি। যে কোন পূজানুষ্ঠানে আচারের ভূমিকাই মুখ্য, ছড়ার বহুপূর্বে আচারের সৃষ্টি। ঝাড়খণ্ডের আদিম মানসিকতায় প্রার্থনার কোন স্থান ছিল না। জাওয়াগীত এবং টুসুগীত ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু এই গীতগুলো বহু পরে এই উৎসবের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই ভাদুর প্রভাবের ফলে ঝাড়খণ্ডের টুসু উৎসব থেকে ছড়া এবং কামনা বাসনা লুপ্ত হয়ে গেছে, একথা বিশ্বাস করা যায় না। জাওয়া বা টুসুতে কোন দিনই ছড়ার মধ্য দিয়ে কামনা-বাসনা প্রকাশ করা হত না। আদিম মানুষ কোনদিনই প্রার্থনায় বিশ্বাস করে নি: তারা বিশ্বাস করত তুকতাক, জাদু-ক্রিয়া এবং ইন্দ্রজালে। The savage is a man of action. Instead of asking a god to do what he wants done, he does it or tries to do it himself; instead of prayers he utters spells. In a word, he practises magic, and above all he is strenuously and frequently engaged in dancing magical dances[8]. অসভ্য আদিবাসীরা সক্রিয় হয়ে থাকে, তাই তার যে কাজ সম্পন্ন করতে চায় তার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা না জানিয়ে নিজে করে কিংবা করবার চেষ্টা করে, প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ না করে তুকতাক করে। অন্য কথায়, তারা জাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে এবং কঠিন পরিশ্রমের সাথে প্রায়শঃ ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের আয়োজন করে। জাওয়াতে যেমন ঐন্দ্রজালিক আচার আছে তেমনি ঐন্দ্রজালিক নৃত্যও আছে। টুসুতেও শস্যের পুনরুজ্জীবন এবং পুনর্জন্মের জন্য জাদু আচার পালিত হয়, এতে সরাসরি নৃত্য না থাকলেও পুকুর ঘাটে, নদী ঘাটে কিংবা দীগড়ি (গালুডি), জয়দা (চাণ্ডিল), সতীঘাট (তোড়াং-মুরী) আদি মেলায় টুসু বিসর্জনের সময় টুসুগীত সহ বিক্ষিপ্ত নৃত্য যে একেবারেই নজরে পড়ে না তা নয়; নারীতনু দৃশ্যমান করে অশ্লীলতার পরিবেশ রচনা করাও ঐন্দ্রজালিক আচার বিশেষ। এর ভেতর দিয়ে প্রজনন ক্রিয়া, নবজন্ম আদি ইচ্ছাগুলো প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ছড়ার চেয়ে এই আচারগুলো তীব্রতায় অনেক বেশি সক্রিয় তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে না। এই ব্রতানুষ্ঠানে ছড়া অপরিহার্য,

৪ The Ancient Art and Ritual. P 30

এমন সিদ্ধান্ত সংগত নয় বলেই মনে হয়। জাওয়া এবং টুসুকে ব্রত হিসেবে তাই স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করা যেতে পাবে। টুসু যে বাংলাব তোষলা ব্রতেব ঝাড়খণ্ডী রূপ নয়, তা'ও তলিয়ে বিচাব করলে বোঝা যায়। যে-কোন ব্রতেব আচাবই মৌলিক পবিচয, ছড়া কিংবা প্রার্থনামন্ত্র পরবর্তী কালেব সংযোজন। ঝাড়খণ্ড যদি বাংলাব তোষলা ব্রতকেই গ্রহণ করে থাকত তাহলে ছড়াটিও গ্রহণ করত। টুসুব মধ্যে এই ব্রতেব আদিমতম রূপটি পাওয যায় যা বাংলার তোষলা ব্রতেব মধ্যে নেই। তাই বাংলাব তোষলা ব্রত ঝাড়খণ্ডে টুসুতে পবিণত হয়েছে এমন কথা যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে হয়। বরং এখনকাব টুসু ঝাড়খণ্ডেব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেব উঁচুবর্ণেব লোকেদেব মধ্যে প্রচারলাভ করে উন্নত পর্যায়েব তোষলা ব্রতে পবিণত হয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া টুসু ব্রত যদি বাংলাদেশ থেকে ঝাড়খণ্ডে আমদানি কবা হয়ে থাকত তাহলে তাব প্রভাব কি এতো ব্যাপক হতে পাবত? টুসু উৎসব ঝাড়খণ্ডেব জাতীয় উৎসব, কোন উৎসব যে একটা অঞ্চলেব সমগ্র মানুষেব জীবনকে আনন্দেব স্পন্দনে উদ্বেল প্রাণবন্ত কবে তুলতে পাবে, ঝাড়খণ্ডে টুসু পবব না দেখলে বোঝা যায় না। বাঙালিব দুর্গোৎসবও বাঙালি জাতির সর্বস্তবে প্রাণেব এমন স্পন্দন জাগাতে পারে না। তাই টুসু ঝাড়খণ্ডেব নিজস্ব সম্পদ, এ উৎসবের সম্পর্ক এখনকাব মাটি বন গাছপালা মানুষজন সবাব সঙ্গে। টুসু ঝাড়খণ্ডীদের প্রাণেব উৎসব, মিলনের উৎসব, নবজন্মের উৎসব। তাই টুসু ঝাড়খণ্ডের এক বিশিষ্ট ব্রত এবং এই ব্রত এখানকার আদিম মানুষেব আদিম ভাবনার জাবক-রসে জারিত হয়ে জন্মলাভ কবেছে।

টুসু উৎসব ঝাড়খণ্ডের জাতীয় উৎসবে পরিণত হওয়ার কারণ হিসেবে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যে কথা বলেছেন, তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য: 'জাতীয় উৎসব বলিতে যাহা বুঝায় এবং পুরুলিয়াব টুসু উৎসবের মধ্যে আমরা আজও যাহা দেখিতে পাই, তাহার কোন রূপ পূর্ব বাংলা কিংবা পশ্চিম বাংলার কোথাও দেখা যায় না। ইহার কারণ, সামাজিক সংহতি ব্যতীত জাতীয় উৎসব সম্ভব হয় না। পুরুলিয়ায় এখন পর্যন্ত সমাজ জীবনের যে সংহতি বর্তমান আছে, বাংলাদেশের আর কোথাও তাহা নাই, সেই জন্য জাতীয় উৎসবের রূপ এই অঞ্চলেই এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্য কোথাও নহে। সেই জন্য শস্যোৎসব বলিতে যাহা বুঝায়,

পুরুলিয়া ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার আর কোথাও নাই।[৫] আমরা ডঃ ভট্টাচার্যের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বাংশে একমত। আমরা শুধু 'পুরুলিয়া' শব্দটির পরিবর্তে 'ঝাড়খণ্ড' শব্দটি ব্যবহার করবার পক্ষপাতী। টুসু উৎসব ঝাড়খণ্ডের একান্ত নিজস্ব উৎসব, প্রাণের উৎসব।

টুসু মেয়েলি ব্রত; কুমারী মেয়েরা এই ব্রত উদ্যাপনের অধিকারিণী। সধবা বিধবা রমণীরা টুসু পূজায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কোন কোন আলোচক জাওয়া এবং টুসু ব্রতে কুমারী মেয়েদের সঙ্গে সধবা বিধবা বয়স্কা-নারীদেরও অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের তথ্য পরিবেষণ বিভ্রান্তিকর। জাওয়া ব্রতে 'জাওয়া দেওয়া বা উঠানো' অনুষ্ঠানে একমাত্র কুমারী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে থাকে; নৃত্য-গীতে সধবা বয়স্কা রমণীরা অংশগ্রহণ করতে পারে, কেন না এতে কোনরকম বাধা-নিষেধ নেই। তেমনি টুসু পূজাতেও কেবলমাত্র কুমারী মেয়েরাই অংশ গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু গীতে যে-কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে—পুরুষ-নারীর কোন বাছবিচার থাকে না। দু'টি ব্রতই দু'টি প্রধান শস্যোৎসবকে উপলক্ষ করে উদ্যাপিত হয়ে থাকে; ব্রতপালনের যে লক্ষ্য তা কুমারী মেয়েরা ছাড়া অন্য কোন নারীর সাহায্যে সিদ্ধ হতে পারে না।

টুসু মেয়েদের নিজস্ব ব্রত হলেও টুসু গীতে পুরুষেরাও সমানভাবে অংশ-গ্রহণ করে থাকে। তাই এই উৎসব পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত অংশগ্রহণের ফলে ঝাড়খণ্ডের জনজীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে জাতীয় উৎসবের পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে। তবে শুধু টুসু পরব হিসাবেই এ উৎসব এতো ব্যাপক এবং জনপ্রিয় হয়েছে ভাবা ঠিক নয়; এর সঙ্গে শস্যোৎসব এবং নববর্ষোৎসবের আনন্দও মিলে-মিশে আছে, কথাটা স্বীকার করে নিলে উৎসবের একটি সুষ্ঠু সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

টুসু শুধু শস্যোৎসবের দেবী নন। তিনি ঝাড়খণ্ডের মানুষের নিতান্ত আপন জন, অন্তরের দেবতা, জীবনের দেবতা বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। টুসু শাস্ত্রীয় দেবী নন, তিনি বহুজনপূজিতা লক্ষ্মীদেবীও নন। টুসু নিতান্তই লৌকিক দেবী, ঝাড়খণ্ডের সীমিত অঞ্চলে প্রাণচেতনার মূর্তিমতী দেবী। টুসু ঝাড়খণ্ডী নারীর কাছে কি নয়? ডঃ সুধীরকুমার করণ বলেন, 'টুসুকে কামনাপূরণের দেবী রূপে আর দেখা হয় না; পরিবর্তে টুসু এখন মাতা-

কন্যা-ভগ্নী-সহচরী-বান্ধবী-রূপা, সমাজেরই একজন অন্তরঙ্গা নারীমাত্র।[৬] উচ্চতর সংস্কৃতিতে দেবতার সঙ্গে ভক্তের দুস্তর ব্যবধান, কিন্তু টুসুর সঙ্গে ভক্তের ব্যবধানের কোন সীমারেখা নেই। টুসু উৎসবে দেবতা এবং ভক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়; দেবতা এবং ভক্ত পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার; পরস্পর পরস্পরের কাছে মন-প্রাণ উজাড় করে আনন্দ-বেদনার কথা অকপটে প্রকাশ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। তাই টুসু গানের মধ্য দিয়ে ঝাড়খণ্ডের সামগ্রিক জীবনের কথা যেমন অবারিত অকপট ভাষায় প্রকাশ পায় তেমনটি আর কোন গানে প্রকাশ পায় না। টুসু গান যেন কেউ রচনা করে নি, এগান যেন আপনা আপনি জন্মেছে। ছড়ার মতোই এর রূপসজ্জা, চেতনা আর মেজাজ-মর্জি। ছড়ার মতোই টুসু গীত ভারহীন, অনায়াস গতিতে প্রবহমান। টুসু গীত ঝাড়খণ্ডের মানুষের জীবনের সঙ্গীত। ব্যক্তিগত জীবনের কথা, পারিবারিক জীবনের কথা, সামাজিক জীবনের কথা, ঝাড়খণ্ডের জাতীয় জীবনের কথা—কি নেই টুসু গানে। অন্য কোন্ গানে একটা পুরো অঞ্চল এমন বিচিত্ররূপে ধরা পড়েছে, আমাদের জানা নেই। এমন সহজ ভাষায়-সুরে এমন হৃদয়স্পর্শী গান আর কোথাও আছে কি না, তা'ও বলা কঠিন।

টুসু গীতে টুসু তত্ত্বসম্পর্কিত গীত একেবারেই নেই এমন কথা বলে চলে না। আগেই বলেছি, আদিম মানুষ তত্ত্বকথায় বা প্রার্থনায় বিশ্বাস করত না। তাই টুসু গীতে টুসু-তত্ত্ব অন্বেষণ সংগতও নয়। তবে টুসুগীতে টুসু বিচিত্ররূপে বিচিত্রসাজে বিচিত্রকামনার মূর্তি ধরে বার বার জনচিত্তের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। আসলে টুসু তো উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার প্রকাশ, টুসুগীতে ঝাড়খণ্ডী মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, ঈর্ষা-ঘৃণা, প্রেম-ভালোবাসা, নিন্দা কুৎসা—জীবনসম্পর্কিত প্রতিটি অনুভব প্রতিটি অভিজ্ঞতা গভীর মমতায় প্রকাশ করা হয়েছে। টুসুগীত ঝাড়খণ্ডের গার্হস্থ্য জীবনের কথায় রস-সমৃদ্ধ। লোকসংগীতের এমন সহজ সুন্দর প্রকাশ অন্য কোন গানে দেখা যায় না। জীবনের কথার এমন সাবলীল অকপট প্রকাশ আছে বলেই এ গান এত অন্তরঙ্গ, এত সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ। টুসুগীতে মানুষ

এতই সজীব এবং প্রাণবন্তভাবে উপস্থিত হয়েছে যে তাদের সান্নিধ্য সম্পর্কে আমরা স্বভাবতই সচেতন হয়ে উঠি। তাদের কামনা-বাসনার তাপ আমরা অনুভব করি; তাদের আনন্দ আমাদের প্রাণে আনন্দসঞ্চার করে, তাদের দীর্ঘশ্বাস আমাদের গায়ে লাগে। টুসুগীতের মতো সজীব এবং গতিশীল খুব কম লোকগীতিই আছে। টুসুগীতের সংখ্যার কোন পরিসীমা নেই। প্রতি বছর মুখে মুখে হাজার হাজার তাৎক্ষণিক গানের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতি বছর নিত্য নূতন বিষয়বস্তু এর অন্তর্গত হচ্ছে।

করমনাচের গানের মতোই টুসুগীত স্বল্পায়তনের হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এগীত দু'পঙক্তির চার চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে এর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। মূল গানের সঙ্গে ধুয়ো বা 'রং' থাকে, যা সব সময়ই দু'টি চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মূল গানের সঙ্গে রং-এর সম্পর্ক কখনো থাকে, কখনো থাকে না। রং-গানগুলো চকিতে-চমকে মুখে মুখে উচ্চারিত হয়; চোখের সামনে যা পড়ে তাই রংএর বিষয়বস্তু হয়। এগান সর্বাধিক সজীব এবং প্রাণ-তপ্ত।

টুসু গীতে যে আচার-সংগীত একেবারেই নেই, তা বলা চলে না। নিম্নোদ্ধৃত গানটি প্রতি দিন সন্ধ্যেবেলা টুসু পূজার সময় গাওয়া হয়ে থাকে। গানটির বিষয়বস্তু সন্ধ্যা দেওয়া অর্থাৎ দীপ জ্বালিয়ে টুসুর আরতি ও পূজা করা। সাধারণতঃ এই গান গেয়ে পুজো করা হয় এবং তারপর অন্যান্য গান গাওয়া হয়।

১. সন্ঝ্যা-দেওয়া বউ গ তরা সন্ঝ্যা কেন্ নাই দেও গ।
কুমহার শালায় পদ্দীপ দেয় নাই কিসে সন্ঝ্যা দিব গ॥
সন্ঝ্যা-দেওয়া বউ গ তরা সন্ঝ্যা কেন্ নাই দেও গ।
খট্টা শালায় কাপড় দেয় নাই কিসে সন্ঝ্যা দিব গ॥
সন্ঝ্যা দেওয়া বউ গ তরা সন্ঝ্যা কেন নাই দেও গ।
কুলহু শালায় তেল দেয় নাই কিসে সন্ঝ্যা দিব গ॥
তেল দিলম স'লতা দিলম সগগে দিলম বাতি গ।
যত দেবতায় সন্ঝ্যা লেয় মা ঘরের কুলবতী গ॥

সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো যে একটি পবিত্র অনুষ্ঠান গানটি থেকে তা স্পষ্ট। কুমোরের দেওয়া নতুন প্রদীপে খোট্টার দেওয়া নতুন কাপড় থেকে সলতে তৈরী করে কলুর দেওয়া তেল দিয়ে পুজোর দীপ জ্বালাবার নিয়ম। শুধু

দেবতাদের জন্যই যে সন্ধ্যারতির আয়োজন করা হয় না, কুলবধূও এর শরিক হয়ে থাকে, তাও লক্ষণীয়। গানটিতে 'শালা' শব্দটি অনুযোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২ তিরিশ দিন যে ছিলে টুসু তিরিশটি ফুল ধরো গ।

আর রা'খতে না'রব টুসু মকর হলা বাদী গ॥

সারা পৌষ মাস জুড়ে টুসু গীত গেয়ে টুসু পূজা করার প্রসঙ্গ এখানে সুস্পষ্ট। একমাস ধরে আনন্দ-অনুষ্ঠানের পর মকরসংক্রান্তিতে টুসুকে বিসর্জন দেওয়া হয়। মকরসংক্রান্তি এই আনন্দ অনুষ্ঠানে বাদ সাধে, টুসুকে বিসর্জন না দিয়ে উপায় থাকে না।

৩ ষোল ঘড়ি ষোল পূজা খা গ টুসু খই ভাজা।

তুমার মা ত অভাগিনী কুথায় পাবেক দই চিড়া॥

সে ত যাবার বেলা, খাঁযে লে গ দই চিড়া ফুল বাতাসা॥ বং॥

জাগরণের রাতে ষোল বার পূজা করবার নিয়ম। ষোল ঘড়ি ষোল পূজা প্রসঙ্গে পরমের দিনে ষোল বার জাগরণ নৃত্যানুষ্ঠানের মিলটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৪. শালুক ফুলটির লাগ্যে টুসু বুল আড়ায় আড়ায় গ।

পদ্মফুলটির লাগি টুসু দরিয়ায় ঝাঁপ দিলে গ॥

দরিয়ায় ঝাঁপ দিলে টুসু কর উঁকুবুঁকু গ।

দু'হাতে দু সনার ছাতা উঠ্যে খেলা কর গ॥

টুসুর দরিয়ায় ঝাঁপ-দেওয়া ঘটনাটি যে আত্মনিমজ্জনের ব্যাপার তাতে কোন সন্দেহ নেই। দু'টি হাতে দু'টি সোনার ছাতা চিত্রটিও বিশেষ অর্থবহ। আমরা আগেই দেখিয়েছি, টুসুর এই আত্মনিমজ্জনের মধ্যে পুনর্জীবনের সুনিশ্চিত আশাও আছে। শস্যের মৃত্যুর মধ্যেই পুনর্জীবনের বীজ নিহিত থাকে। গানটিতে শালুক ফুল পদ্মফুলের লোভেই টুসুর আত্মনিমজ্জনের কথা ব্যক্ত হয়েছে কিন্তু টুসু পূজার উপচার হিসাবে গুলাত (কাঠ গোলাপ) আর ধুতুরো ফুলের কথাই পাওয়া যায়।

৫. শিব পূজা শীতলা পূজা কি ফুলে কিষ্টের পূজা।

গুলা'ত্ ফুলে টুসুর পূজা ধুত্‌রা ফুলে হয় মজা॥

জলের ভেতরেই টুসুর আসল স্থান। জল সব কিছুকে ঢেকে ফেলে, সব কিছুর সমাধি রচনা করে। মৃত শস্যের প্রতীক টুসুকেও জলে বিসর্জন দিয়ে সমাধি

দেওয়া হয়। লক্ষ্য, শস্যের পুনর্জীবন। টুসুর যেন জলের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্খা আছে। জলের ভেতর তার সব কিছু আছে ; জলের ভেতর তার বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি এমন কি তার ভাবের লোকও আছে।

৬. জল জল যে কর টুসু জলে তুমার কে আছে।
মনেতে ভাবিয়েঁ দেখ জলে শ্বশুর ঘর আছে॥

৭. ঝিক্‌ঝিকি পাথরের তলায় বল টুসু তর কে আছে।
মাও আছে বাপও আছে আর ভাবের লক আছে॥

তাই টুসুকে বিসর্জন না দিয়ে উপায় থাকে না। বিচ্ছেদের বেদনা অবশ্যই সমস্ত চেতনাকে অসাড় করে তোলে, তবু একটা ভরসা থাকে : টুসুর বিসর্জনই শেষ কথা নয়, টুসু পুনর্জীবন লাভ করে প্রত্যাবর্তন করবে।

৮. নাচা বিলে চাঁদ উঠ্যেছে পিথিমী আল করো।
এমনি আল ক'রবে টুসু একড্যা কদম তলে॥
টুসু যাও মা জলে. আ'সছে বছর আ'নব গ টহবে॥

ওপরের গানগুলো থেকে দেখা গেল টুসু গীতে শুধু জীবনের সুখ-দুঃখের কথাই নেই, টুসু-তত্ত্বও আছে। ওপরের গানগুলোতে যে টুসুর স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করা হল, সে-টুসু শস্যস্বরূপিনী। পরবর্তী গানগুলোতে যে-টুসু রূপ পরিগ্রহ করেছে, সে টুসু মর্তবাসিনী রমণী। কখনো কন্যা, কখনো জননী, কখনো সখীসহচরী, কখনো সাধারণতমা রমণী—টুসু যেন বহুরূপিনী বিচিত্ররূপিনী নারী, ক্ষণে-ক্ষণে তার রূপ বদলায়। এই নারীস্বরূপিনী টুসু-সম্পর্কিত গানগুলো জীবনরস-সম্পৃক্ত প্রকীর্ণ কবিতার মতোই উজ্জ্বল। নিঃশ্বাসের মতোই সহজ অনায়াস এবং ভারহীন এই সব গান।

প্রথমে টুসুর রূপবর্ণনা। ঝাড়খণ্ডের লোকবিশ্বাসে টুসু অপরূপ সুন্দরী। বাংলাদেশে যেমন কোন রমণীর রূপ-প্রসঙ্গে দুর্গাপ্রতিমার উপমা দেওয়া হয়, তেমনি ঝাড়খণ্ডে রমণীর সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ বোঝাবার জন্য টুসুর রূপের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

টুসু গৌরাঙ্গিনী, হেলে-দুলে চলে আবার যখন-তখন রাধে রাধে বলে দু'হাত তুলে নৃত্য করে—

৯. দলমা পাহাড়ের উপর হাঁসা পাথর লড়ে গ।
আমার টুসুর গউর বরণ হেল্যে দুল্যে চলে গ॥

টুসু তন্বী-ও বটে। পথ চলতে গেলে তার তনু-লতা বিনা বাতাসেও

দুলে ওঠে। তার গায়ে কেয়া ফুলের গন্ধ মাখানো। সে যেখানেই যায় সে-খানেই তাব গন্ধে চাব পাশ ভাবি হয়ে ওঠে।

১০ এক সড়পে দুই সড়পে তিন সড়পে লক চলে।
আমদের টুসু এমনি চলে বিন বাসাতে গা লড়ে।
গেল অই শহরে, কিয়াফুলের বাস র'হল নগরে॥

টুসুব নবনী তনুতে কোমলতা ও লাবণি সুপরিস্ফুট। টুসু অপরূপা সুন্দবী।

১১ উত্‌লা বনের পুত্‌লা থাড়ি কুড়চি বনে ঘব কবি।
জুসনা বাইতে টুসু আ'নব যেমন দুধেব সরখানি॥

১২ ডাল ভা'ঙলম ফুল তু'ললম পান বনালম খনজবী।
আমদের টুসু বস্তে আছে যেমন কন্যা সুন্দবী॥

কিন্তু টুসুর অপরূপ রূপ এতে ও বুঝি ফুটে ওঠে নি। টুসু ফুলকুমাবী. পুষ্পস্বরূপিনী, তাব সর্বশবীবে বিকশিত পদ্মফুলেব যেন মেলা বসেছে, তাব হাতে পদ্ম, পায়ে পদ্ম আর সেই পদ্মকে ঘিবে ভ্রমরেব গুঞ্জন। এ রূপকল্পনা বুঝি বা কোন অলংকাবশাস্ত্রেব ধবা-ছোঁয়ার বাইরে, এ রূপ কল্পনা শুধু ঝাড়খণ্ডী লোকভাবনাতেই বুঝি বা সম্ভব।

১৩ আঁচিবে পাচিবে পদ্ম পদ্ম বই আব ফুটে নাই।
টুসুব হাতে জড়া পদ্ম ভমব বই আব বসে নাই॥
আদাড়ে পাঁদাড়ে পদ্ম পদ্ম বই আর ফুটে নাই।
আম্‌দেব টুসুব পায়ে পদ্ম ভমব বই আব বসে নাই॥

এবারে কন্যারূপিনী টুসুব কথা। ঝাড়খণ্ডী নারীর কাছে টুসু এতোই কাছেব দেবতা যে তাকে তাবা অত্যন্ত স্নেহভরে কন্যারূপেও গ্রহণ করেছে। জননীই জানে সন্তানের বেদনার কথা, তাই পরের সন্তানকে কোলে নিলেও মায়েব মন কেমন কবে ওঠে। কন্যা টুসুব আবদারে জননী কি কম বিব্রত; টুসু চায় আকাশের চাঁদ, গাছের ফল হলে বরং কথা ছিল।

১৪ ছাল্যা ছাল্যা কর তরা ছাল্যার বেদন কি জান।
পবের ছাল্যা কলে লিলে মায়ের মন কেমন করে॥
বল টুসুধন চাঁদ কুথায় পাব, গাছের ফল লহে যে তুল্যে দিব॥

টুসু কখনো ধুলায় অঙ্গ মলিন করে মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়ায়।

১৫ বাড়ি নামায় শিম'ল গাছে পায়রা কুহরে গ।
পাখি নয় পাখুড়া নয় মা টুসু খেলা করে গ॥

খেল্য না খেল্য না টুসু কাপড় হবে মলিন গ।
তুমাব মা ত অভাগিনী সাবন কুথায় পাবে গ।।

কখনো-টুসু বনে-বাদাড়ে গিয়ে সোনায় বাঁধানো লাল ছাতা হারিয়ে আসে—

১৬ ছট বনের লতাপাতা বড় বনেব শাল বাতা।
কন্ বনে হাবালে টুসু সনায বাঁধা লাল ছাতা॥

টুসু কখনো লক্ষ্মী মেয়েটিব মতো তপোবনে পড়তে যায, মায়ের ডাক তাব কানে পৌছায় না।

১৭ আমাব টুসু পুঁথি পড়ে তপুবনেব কাননে।
কি করো মা শুনতে পাব জ'ড়ের বানে ঢেউ মাবে॥

টুসুর এমন লক্ষ্মীমন্ত রূপ কম সময়ই দেখা যায। সে তাব মানবী মাকে চিন্তায়-ভাবনায় অস্থিব করে রাখে।

টুসু ক্রমশঃ সখী-সহচবী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঝাড়খণ্ডী রমণী নিজেব জীবনের সাধ-আহ্লাদ টুসুর জীবনেব মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করতে দেখলে তৃপ্তি লাভ করে। তাই তারা নিজেদেব জীবনেব অপূর্ণ সাধ আহ্লাদ টুসুব জীবনে আবোপিত করে গানে পূর্ণতার চিত্র অঙ্কন করেছে। ছেলে বেলায় খেলা-ধুলোর অবোধ আনন্দের দিনগুলোতে সাথী কেবল সাথী। কিন্তু যতোই বযোবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, ততোই মনেব কোণে বিচিত্র সব অনুভবের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, মনেব গোপন ভাবনাগুলো কারো কাছে খুলে বলাব জন্য সখী-সহচবী 'ফুল'-এব প্রযোজন। এই 'ফুল' পাতানো বা সই পাতানো অনুষ্ঠানটি এক কালে ঝাড়খণ্ডী নারীর জীবনে অপরিহার্য ছিল, বর্তমানে এর গুরুত্ব যথেষ্ট মৃদুতর হয়ে এসেছে। টুসু কখনো-কখনো রাজকন্যা রূপেও বর্ণিত হয়ে থাকে, তবু সই পাতাবাব জন্য তাকে বেরিয়ে আসতে হয সাধারণতমা কিশোরী তরুণীর কাছে। আবার টুসু কখনো নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থ-কন্যা, তবু সে রাণীব সঙ্গে ফুল পাতায় আব মনের গোপন ভাবনা গোলাপ ফুলের ভেতরে পুরে চিঠি পাঠায়।

১৮ আলতা পাতে চালতা পাতে বিনদ পাতে মেখ্যেছে।
টুসু নকি রাজাব বিটি সেই পাতাতে আস্যেছে।।

১৯ আমার টুসু ফুল করেছে ঝাড়গাঁ গড়েব রাণীকে।
মনে মনে চিঠি ছাড়ে গলাপ ফুলেব ভিতবে॥

'মনে-মনে চিঠি ছাড়ে গলাপ ফুলের ভিতরে' চিত্রকল্পটি নিঃসন্দেহে অনবদ্য কবিত্বময় এবং স্বভাবতঃই মনোহারী। লোককবির সৌন্দর্য-ভাবনা যে কতো সুন্দর হতে পারে এটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু মনের ভাব নয়, শরীরের গন্ধও যেন এ-চিঠিতে ভাসমান।

টুসু এবার প্রেমিকা রূপে দেখা দেয়। ঝাড়খণ্ডী তরুণী টুসুর ওপর তার প্রেম ভাবনা আরোপিত করে আত্মতুষ্টি চরিতার্থ করে। রাজার ছেলের সঙ্গে প্রেম করার কথা কোন যুবতী না ভেবে পারে? ঝাড়খণ্ডে যে রাজার ছেলেদের সঙ্গে যুবতী গ্রাম্যবালাদের প্রণয় এবং দেহমিলন প্রায়শঃই ঘটত, তার নজির শুধু টুসু গীতে নয় করম নাচের গানেও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

২০ কু'ল গাছে কুহলীর বাঁসা ডালিম গাছে বেরকেটা।
আমদের টুসু ফাঁস আড়োছে লাগোছে রাজার বেটা॥
গলায় লাগা নিশা, খাঁয়ে লে রে লম্পট্যা রাজার বেটা॥

টুসু মাঝে-মধ্যেই অভিসারে বেরিয়ে পড়ে: মায়ের মন কত কি সম্ভব-অসম্ভব দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়; তাই টুসুর ওপর সব সময় নজর রাখা হয়:

২১ কলাতলে বাট রাখোছি পাছে টুসু পার হছে।
নন্দের বেটা চিকণ কালা সে ত বাঁশি বাজাছে॥

সংসার-ধর্ম নারী-জীবনে একটি অনিবার্য স্তর বিশেষ। তাই টুসুকেও সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতে হয়, তাকেও বিবাহ করতে হয় এবং গৃহস্থ পরিবারের বধূ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। তাই পরবর্তী গানগুলোতে টুসু বধূরূপিনী।

রাজ-বাজনার আয়োজনে টুসুর বিয়ে দেওয়া হয়—

২২ লৌতন পথ'রের আড়ায় চাঁদে লাগে কদমা।
আম্‌দের টুসুর বিভা দিলে ঝরি-ঝম্পার বাজনা॥

টুসুর বিয়ে নিশ্চয়ই আনন্দের! কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠান আনন্দের হলে-ও কোন্ জননীর বুকে ব্যথা বাজে না কন্যার বিয়েতে? নাড়ি-ছেঁড়া ধন কন্যার জন্য স্বভাবতঃই জননীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তাই কন্যার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে কন্যাকে আদর যত্ন করার অনুরোধ জানান, কারণ কন্যা জননীর কাছে চিরকালই শিশু,—শিশুর কি শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে কোন বোধ থাকে?

২৩ আল্যা রে গুনগুন্যা মাছি দখিণ দিগের হাওয়াতে।
উড়াল্য সনার পাল্‌খি নিয়েঁ গেল টুসুকে ॥
টুসু লে 'গলে ভাল ক'রলে রা'খবে গ যতন কর্যে।
আম্‌দের টুসু শিশু ছাল্যা শ্বশুর ঘরের কি জানে ॥

বিয়ের রাত্রিশেষে বিদায়ের বেলা। বর-পক্ষের পালকি হয়তো-বা ভাঙ, তাই টুসুর জন্য জননী কাঁচ-বসানো পালকির ব্যবস্থা করেন। টুসু কাঁচের ফাঁক দিয়ে চারপাশ দেখে-শুনে শ্বশুরবাড়ি যেতে পারবে; পেছনে তাকিয়ে দেখবে পরিচিত মাটি ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে, সামে তাকিয়ে দেখবে চার পাশে অচেনা দেশ জেগে উঠছে। মায়ের এই একটি আয়োজনের মধ্য দিয়েই তাঁর হৃদয়ের সকরুণ কন্যাস্নেহ গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে।

২৪ বাড়ি নাময় কু'ল গাছটি কু'ল ভদ্‌ভদ্‌ করে গ।
শেষ রা'তে ককিল ডাকে টুসুর মন ভুলাতে গ ॥
ভুল না ভুল না টুসু ভাঙা পাল্‌খি বটে গ।
আয়না-বসা পাল্‌খি দিব দেখ্যে-শুন্যে যাবে গ ॥

বধূজীবনের পরবর্তী স্তরই হল মাতৃত্ব-অর্জন। মাতৃত্ব নারীজীবনের চরম বিকাশ এবং তাতেই তার সার্থকতা। তাই টুসু যতোদিন না সন্তানের জননী হয় ততোদিন তার মায়ের উৎকণ্ঠা যায় না। গহনার দোকানে শিশুদের দুধবালা দেখে দীর্ঘশ্বাসে বুক ভারি হয়ে ওঠে, কারণ টুসুর কোন সন্তান নেই।

২৫ মেদিনপুরে দেখ্যে আল্যাম্‌ ডালায় ডালায় দুধবালা।
আমার টুসুর নাইখ ছেল্যা কাকে দিব দুধবালা ॥

টুসু যাতে সন্তানবতী হয় তার জন্য মানত-মানসিক করতে হয়; সন্তানের জন্ম হলে প্রচুর খরচপত্র করবার অঙ্গীকার করা হয়—

২৬ ইঘর কাদা সেঘর কাদা লুহার পাটা বসাব।
আমার টুসুর বেটা হলে হাজার টাকা উড়াব।

শেষ তক টুসু মাতৃত্ব অর্জন করে। সন্তানের জন্য এবার আগবালা কেনে হাজার টাকা খরচ করে—

২৭ আমার টুসুর একটি ছেল্যা নাম রাখ্যেছি বিমলা।
বিমলাকে কিন্যে দিব হাজার টাকার আগবালা ॥

নিম্নোদ্ধৃত গানগুলোতে টুসুকে বিচিত্র ভূমিকায় স্থাপন করে ঝাড়খণ্ডী নারী তার অজস্র সাধকে পূর্ণতায় রূপায়িত করে তুলেছে। দেবতার এমন অন্তরঙ্গ

চিত্র অন্য কোন গানে সচরাচর দেখা যায না। দেবতাকে সম্মুখে রেখে নিজের খুশিমতো তাকে বিচিত্র সাজে সাজিযে নয়ন ভরে দেখার এমন মনোহর বিস্ময়কর ভাবমূর্তি অন্যত্র সত্যিই দুর্লভ। শাক্ত পদাবলীতে দেবী কন্যা- এবং জননী-রূপে বাঙালীর প্রেমভালোবাসা স্নেহ-অনুরাগ আকর্ষণ করেছেন কিন্তু টুসু গীতে টুসু কন্যা-সহচরী-বধূ জননী রূপের অতিরিক্ত বহু বিচিত্ররূপে ঝাড়খণ্ডীদের স্নেহ-ভালোবাসা আদর-অনুরাগ নিঃশেষে আদায় করে নিয়েছে। টুসু তাই বহুরূপিনী, বিচিত্ররূপিনী। যে-সব কাজে সমাজে নারীর ভূমিকা অস্বীকার করা হয়েছে, টুসুকে দিযে সে-সব কাজও অবলীলায় করিয়ে নেওয়া হযেছে। নারীর শারীরিক গঠনভঙ্গি এবং শক্তিহীনতার জন্য তাদের পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে দেওয়া হয় না। তবু টুসু গীতে টুসু বনে-ডুংরিতে কাঠ কাটে, লাঙল দিয়ে জমি চযে; মাঠে-প্রান্তরে গোচারণে যায়। টুসু যাই করুক না কেন, সর্বত্রই একটি স্নিগ্ধ ছবি তাকে ঘিরে থাকে।

২৮. আমদের টুসুয় কাট কাটে‍্যছে বাঁদরবনীর ডুংরি এ।
এক গাড়ি কাট দু গাড়ি কাট তিন গাড়ি কাট চালাব॥

২৯. আম্‌দের টুসু হাল বাহে ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু।
বাছ্যে বাছ্যে কামিন ক'রব দাঁত কাল কাঁকাল সুরু॥

৩০. আম্‌দের টুসু গাই চরাছে বড় বাঁধের আগালে।
পানবাটা চু'ল খুল্যে দিয়ে বস্যে আছে জল খাবে॥

অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বিতার গানে টুসুর যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। পাড়ায়-পাড়ায় এক বা একাধিক টুসু জাগরণের আসর বসে। বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব থাকে। তাই একদল অন্যদলের টুসুর নিন্দা করে গান করে, কুৎসা, অশ্লীল ইঙ্গিতও এই গানের বিষয় হয়ে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত ঘৃণা সমস্তই নিরাবরণ ভাষায় গানের মাধ্যমে তরল সীসের মতো জ্বালা ছড়ায়। টুসু উপলক্ষ, লক্ষ; নিজেদের বিদ্বেষ-ভাবনাকে গানের রূপ দিয়ে প্রকাশ করা। অন্যের নিন্দা করা, নিজের গুণগান করা নারীসমাজের বিশেষ ধর্ম। তাই নিজের টুসুকে কাঠপুতুলের মতো সুন্দর মনে হয়, কিন্তু অন্যের টুসু শূকর পদতুল্য!

৩১. ই মন্দির উ মন্দির মাঝ মন্দির নিচা।
আমার টুসু ডাঁটাই আছে কাঠপুতুলের পারা॥
ই মন্দির উ মন্দির মাঝ মন্দির ফবা।
তদের টুসু ডাঁটাই আছে ঘুঁসুর ঠেঙের পাবা॥

বলাবাহুল্য, এই লড়াই-এব মূল সুবটিই হচ্ছে নিজেব কৌলীন্য, আত্মগবিমা প্রকাশ করা। এ যেন অনেকটা শ্রেণীসংগ্রাম, একদল নিজেব ধনসম্পদের প্রাচুর্যেব বড়াই কবে অন্যদলকে হাঘবে হ্যাংলা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা কবছে।

৩২. আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝলমল কবে।
তদেব টুসু ছচ্‌বা টুসু আঁচল পাতি মাগে॥

এ ত গেল টুসুকে উপলক্ষ কবে আত্ম-প্রশংসা এবং পবনিন্দাব ব্যাপাব। কিন্তু ও পাড়া থেকে যাবা এ পাড়ায টুসু দেখতে এল তাদেব প্রতিও তীব্র বিষোদ্গাব কবা কবা হয সবাসবিভাবে। ওখান থেকে সরে না গেলে কালো খবিসেব কামড় খেতে হবে, এমন আভাসও দেওয়া হয। গানটি রূপকাশ্রিত হওয়া অসম্ভব নয়।

৩৩. টুসু দে'খতে আলি তবা ধবলি ল চালেব বাতা।
চালে আছে কাল্যা খবিস খাবেক ল তদের মাথা॥

বাইরে-থেকে-আসা দলটি আতিথ্যজ্ঞানহীনতা সম্পর্কে ইঙ্গিত কবে গান ধবে, এমন কি অর্থহীন আত্ম-গবিমায তাদেব সাধারণ শিষ্টাচার এবং সৌজন্যবোধও যে ঢাকা পড়েছে, তাও খোলাখুলি প্রকাশ কবে।

৩৪. তদের ঘবকে ব'সতে গেলি ব'স বলি কেউ বললি না।
তিতা দক্কা পানের খিলি তা-উ তরাকে জু'টল না॥
তদের ঘরকে ব'সতে গেলি ব'স বল্যে আর বললি না।
উঁচু পিটা ময়দা মেলা গববে রা কাঢলি না॥

ঝাড়খণ্ডে গৃহে অতিথি-অভ্যাগত এলে পান-তামাক দিয়ে অভ্যর্থনা জানানোটাই শিষ্টাচাব। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে হৃদয় খুলে অকপটে বার্তালাপ করে থাকে, এর ব্যত্যয় ঘটলে তাকে সৌজন্যজ্ঞানহীনতা এবং অহংকারেব ফল বলেই ধরে নেওয়া হয়।

কুৎসাকারিণীকে প্রহারের ভয় দেখিয়ে সাবধানে পথ চলতে বলা হয়—

৩৫. হাটে বাটে পথ'র ঘাটে বলিস ল আমার কথা।

যেদিন তকে একলা পাব ক'রব ল কাপড কাচা ।।

কুল্‌হির মাঝে চলবি সতরে, পালে লাগি মা'বব ল তব গতবে ।।

শুধু এই নয়, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে গান গাইতে জানে না বলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে শুরু কবে। কখনো গান জানে না, শুধু ঢং জানে বলে বিদ্রূপ করে, কখনো গান শেখাবাব গুরুগিবি করবাব কথা বলে; কখনো গলার সুব গাড়োল ভেড়াব মতো বলে ব্যঙ্গ কবে।

৩৬ ফেলা গাছে হেলা ফেলা কত ভলা ধবেছে।
তাই মাগীবা গীত জানে না কত কলা কবেছে ।।

৩৭ গান গাইতে আলি তবা গানেব নাইখ আগ-গড়া।
আন ল তব দুয়াত কলম লিখ্যে দিব সাত জড়া ।।

৩৮ গাডব ভেড়া ভেবায় যেমন কঁচি কঁচি ঘাঁস বিনে।
তেমনি তবা ভেবাঁই মবিস মিলে নাই তদেব গানে ।।

বলাবাহুল্য, এইসব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক গানে কাব্যোৎকর্ষতা তেমনটা লক্ষ্যগোচব হয় না। এসব গান সাধাবণত তাৎক্ষণিক সৃষ্টি, মুহূর্তমধ্যে লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ কবাই এদেব উদ্দেশ্য। যেহেতু এ গান আক্রমণেব উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয তাই এব তীব্রতা যতো বেশি হবে, প্রতিপক্ষেব জ্বালাও ততো বেশি হবে; তাই এ গানে বিবোদগাবেব তীব্রতা এবং আক্রমণেব সূচিমুখের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধিব দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয। এ-গান যে বীতিমতো প্রাণবন্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। পবিচিত সংসাবেব ঈর্ষ্যাকাতব কুৎসাপবায়ণ মানুষগুলো এই সব গানেব মধ্য দিয়ে নিবাববণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গানগুলো সাহিত্যবসসমৃদ্ধ হোক বা না হোক, টুসু গীতেব বিশিষ্ট গুণ চিত্রধর্মিতা প্রায় সর্বত্রই বক্ষিত হয়েছে। শুধু ছন্দোধর্মে নয়, এই চিত্রধর্মেব দিক দিয়েও টুসু গীত ছড়াব সমগোত্রীয়। ছড়াব আব এক ধর্ম অসংলগ্নতাও টুসু গীতে সবিশেষ লক্ষ্য কবা যায। টুসু গীতেব নামটা মুছে দিলে গীতগুলো গান না ছড়া তার সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। টুসু গীত আসলে ছড়াই, তবে এ ছড়া শিশুদেব জন্য নয়, বয়স্কদেব জন্য, এ ছড়ার বিষয়বস্তু অলৌকিক অবাস্তব জগৎ নয় ববং আমাদের পরিচিত প্রেমভালোবাসা ঈর্ষ্যা-ঘৃণা-দ্বন্দ্বভরা প্রত্যক্ষ সংসাব।

টুসু গীতে ঝাড়খণ্ডের সামগ্রিক জীবন প্রতিফলিত হয়ে থাকে, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ঈর্ষ্যা-

সহানুভূতি, ঘৃণা-ভালোবাসা সব রকমের অনুভূতিই বিচিত্র বর্ণে-রসে সজীব চিত্ররূপ ধারণ করে এবং আমাদেব কল্পনাকে মুগ্ধ করে তোলে। অনবদ্য চিত্র-রস যেমন টুসু গীতেব একটি বিশিষ্ট বৈভব, তেমনি জীবন-বস এর প্রাণৈশ্বর্য। গার্হস্থ্য জীবনসম্পর্কিত গীতগুলো তাই চিত্রেব ব্যঞ্জনায়, অনুভবের তীব্রতায়, অকৃত্রিম অবযবতায়, সহজ ভাষণ রীতিব ঋজুতায় অনুপম কবিতা বিশেষ। গার্হস্থ্য জীবন বাদ দিয়ে নাবীব জীবন কল্পনা করা যায় না; তাই পবিবাবেব বিভিন্ন জনেব সঙ্গে তাব বিভিন্ন বকমেব সম্পর্ক। তাব জীবনে পিত্রালয় এবং শ্বশুবালয় দুটোই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। প্রাক বিবাহ যুগে পিত্রালয়ে তাব মধুব দিনগুলো অতিবাহিত হয কিন্তু বিবাহেব পব মাতৃপিতৃবিযোগ ঘটলে ভ্রাতৃজাযা-শাসিত পিত্রালযে তাব জীবনে আব সুখ থাকে না। ওদিকে শ্বশুবালয় তো কাবাগাব বিশেষ, শাশুড়ী-ননদীব লাঞ্ছনা গঞ্জনা, কখনো কখনো শাবীবিক পীড়ন, তো আছেই, তাব ওপব সপত্নী যন্ত্রণা। শ্বশুবালয়ে বধূব বিভিন্ন জনেব সঙ্গে সংঘর্ষের কথা, তাব বেদনার কথা, তাব চোখেব জল টুসু গীতে মর্মস্পর্শী ভাষায প্রকাশ পেযেছে।

পিত্রালয় থেকে বিদায়েব মুহূর্ত উপস্থিত হযেছে। বাবা বিদায দিতে বাজি, মায়েব কিন্তু ছাড়তে গিযে প্রাণ কাঁদে। বোনেব দু'চোখে জল দেখে ভাইও তাকে ছেড়ে দিতে চায না। জামাই টুঁকি ঝুঁকি মাবতে ছাড়ে না।

৩৯. বাপে বলে ছা'ড়ব ছা'ড়ব মাযে বলে ছা'ড়ব না।
ভাই-এ বলে ঝিউড়ি ছেল্যা কাঁদাযে পাঠাব না॥
পিঠা ঘব ঘুবাছে, জামাই ছানা ভুলুকে হুলুক দিছে॥

জামাইকে তাই ডেকে পবিষ্কাব জানিযে দেওয়া হয, উঁকি ঝুঁকিতে কোন লাভ হবে না, কিছুতেই মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

৪০. আল' ধানেব কাল পিঠা ঝুড়ি কাঠে সিজে না।
কেনে জামাই হুলুক বুলুক বিটি ছাড়্যো দিব না।

কিন্তু কন্যাকে একদিন শ্বশুরবাড়ি যেতেই হয়। তার মনে যেটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি কবে তা হলো পিত্রালয়েব পবিচিত লোকজনেব পরিবর্তে শ্বশুবালয়ের অপরিচিত লোকজনের বিচিত্র সব মনোভাব। আজন্ম বাপের বাড়িতে মানুষ, তাই সবাব সঙ্গে তাব আত্মিক পবিচয়, শ্বশুব বাড়ির অচেনা লোকদেব বুঝতে এবং বোঝাতেই তাব যন্ত্রণার সীমা পরিসীমা থাকে না।

৪১ বাপের ঘরে ছিলম ভাল কাঁখে গাগরা চা'ল ভাজা।
শ্বশুর ঘরের বড় জ্বালা লক বুঝাতেই যায় বেলা ।।

শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, ভাসুর, দেওর আর স্বামী মোটামুটি এই ছ'জন লোকের মুখোমুখি তাকে হতে হয়। সাধারণতঃ পিতৃ- এবং শ্বশুর-প্রসঙ্গ লোকসাহিত্যে একেবারেই পাওয়া যায় না। তাই টুসু গীতে শ্বশুর-সম্পর্কিত গান নেই। কিন্তু শাশুড়ী আছেন। লোকসাহিত্যে শাশুড়ীর ভূমিকা সর্বজন বিদিত। টুসু গীতেও শাশুড়ী তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে গেছেন। বধূর জীবনকে অত্যাচারে-নিপীড়নে জর্জরিত করে তোলাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য। মনোরঞ্জনের জন্য বধূ কিছু করতে বসলেই শাশুড়ীর বিষাক্ত ছোবল অব্যর্থ আঘাতে আছড়ে পড়ে।

৪২ স'রষা ফুলটি থপনা থপনা হল'দ বল্যে বাঁটেচি।
অ শাশুড়ী গা'ল দিহ না পাশা খেলতে বস্যেছি ।।

বধূর অবশ্যই একটু অপরাধ ছিল: হলুদ মনে করে সে থোঁকা-থোঁকা সরষে ফুল বেঁটেছিল। পৌষ পরবে সবাই নীল শাড়ি পরল, কিন্তু বধূর শাশুড়ি এমনি পাপিষ্ঠা যে বধূর সে সাধও মেটান নি।

৪৩ এই বছরের পোস পরবে সবাই পরে লীল শাড়ি।
আমার শাউড়ী ঢুন্যার পাপী নাই দিল গ লীল শাড়ি ।।

কিন্তু শাশুড়ীর অত্যাচার যখন চরমে ওঠে তখন শ্বশুর বাড়ির কোন আকর্ষণই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। শাশুড়ী তাকে পেট ভরে খেতে দেন না, এমন কি তাকে ধরে কিল চড় ঘুঁষি মারতেও বাদ দেন না।

৪৪. মায়ে বলে হঁ গ বিটি এত কেনে শুখালি।
শ্বশুর ঘরের ফপরা মুটি সেহ খাঁয়ে শুখালি ।।
আর যাব না শ্বশুরের বাড়ি, আমকে কিলাঁই দিল শাশুড়ী।

ননদিনীও অত্যাচারে-পীড়নে শাশুড়ীর চেয়ে কম যায় না। তাই ননদীর প্রতি বধূর মনোভাব ক্ষমাহীন ভাষায় প্রকাশ পায়। শাশুড়ী যতোদিন বেঁচে, ততোদিন বধূকে নির্বিকার সহ্য করতে হয় কিন্তু শাশুড়ী মারা গেলে বধূর কর্ত্রীত্বে পাল্টা আঘাত ভোগ করতে হয় ননদীকে।

৪৫. পাহাড়েতে জল পড়ে ননদিনী গান করে।
থাম্ ল ননদ ভা'ঙব গরব যবে তুমার মা মরে ।।

ননদের পীড়ন বধূকে এতোই আঘাত করে যে ননদ-সম্পর্কে কোনরকম

সহানুভূতির লেশমাত্র আর থাকে না। প্রতিশোধ-স্পৃহা তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর করে তোলে। তাই ননদীর মৃত্যুসংবাদ এলে সে মোটেই দুঃখ পায় না, বরং স্বস্তি পায় ; এতোকালের পীড়নের অবসান ঘটে।

৪৬. ভাত বাঁধ্যেছি ডা'ল রাঁধ্যেছি গেলাসে দুধ ঢাল্যেছি।
খাবার বেলা খবর আলা তর ননদ মর্যে গেল ॥
ননদ ম'রল ভাল হল্য পেটের ভাত জিরুন গেল।
ছট বেলা সাঁতাঁই ছিল তাই ইঁতে যমে লে'গল ॥

নিম্নোদ্ধৃত গানটি ননদ-ভাজের মধুর সম্পর্কের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বধূর শ্বশুরালয়ে থেকেপিত্রালয়ে যাবার বিদায়লগ্নে বিচ্ছেদ-কাতর ননদের অশ্রুসজল মূর্তিটি আমাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। ননদ-ভাজের এমন বেদনা-মধুর মিলনের চিত্র লোকসাহিত্যে একান্তই বিরল।

৪৭. ইন্দু বিন্দু সিন্দুর প'রলম বাপের ঘর যাবার লাগ্যে।
গুণের ননদ কাঁ'দতে লা'গল বাস ফুলের ডাল ধর্যে ॥
কাঁদ না কাঁদ না ননদ ফির্যে আ'সব মাঘ মাসে।
দু হাতে দু মিঠাই থালা আন্যে দিব তুমাকে।
লৌতন দেশের লৌতন শাড়ি আন্যে দিব তুমাকে ॥

ভাশুরের সঙ্গে বধূর পরিহাসের সম্পর্ক। টুসু গীত বাস্তবজীবনের নিখুঁত চিত্র বলেই ভাশুর-প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবেই এসেছে। বলাবাহুল্য, প্রায় প্রতিটি গানেই দেখা যায় ভাশুর বড়ো বেশি ভ্রাতৃজায়ার প্রতি কৌতূহল দেখিয়েছে ; কোথাও বধূর সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ হবার প্রয়াসের আভাস, কোথাও বা দেহমিলনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

৪৮. মাছ কা'টলম চাকা চাকা মাছের কাঁটা সিজে না।
ভাশুর হয়েঁ জিগির করে ই জীবন আর রা'খব না ॥

৪৯. বাড়ি নামম্ব রাহেড ব্'নলম রাহেড হল্য চমৎকার।
কলের পুরুষ চাকরি গেল ভাশুর হল্য গলার হার ॥

দেবর-ভাজ সম্পর্কটি কিন্তু ঝাড়খণ্ডে অত্যন্ত রঙ্গ-মধুর। দেবরই যেন শ্বশুরালয়-মরুদেশে একমাত্র সবুজ সজীব পান্থপাদপ। সুখ-দুঃখের কথা বলে দেবরের কাছ থেকেই সান্ত্বনা পেয়ে থাকে বধূ। ঝাড়খণ্ডী সমাজব্যবস্থায় দেবর-ভাজের মধ্যে দেহ-মিলন নিষিদ্ধ নয়।

৫০. সিন্দু বিন্দু সিন্দুর প'রলম বাপের ঘর যাবার লাগ্যে।

গুণের দেঅর কাঁ'দতে লা'গল বাস ফুলের ডাল ধর‍্যে ॥
কাঁদ না কাঁদ না দেঅর আ'সব মাসের সাঁকরা'তে।
দু হাতে দুই সনার ছাতা আন্যে দিব তুমাকে,
লৌতন দেশের লৌতন ধুতি আন্যে দিব তুমাকে ॥

টুসু গীতে স্বামী প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। কোথাও কোথাও আভাস দেওয়া হয়েছে মাত্র; কখনো বলা হয়েছে চাকরীতে গেছে, কখনো বিদেশে গেছে, কখনো-বা স্বামীর পরকীয়া প্রেমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি মাত্র গানে যুবতী নারী বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হয়ে-ও পরম পরিতৃপ্তির কথা সগৌরবে ঘোষণা করেছে এবং বৃদ্ধ স্বামী যে দেহসুখ দানেও সমর্থ, তারও ইঙ্গিত আছে। স্বামী-সম্পর্কে এতোখানি নীরবতার কারণ সুস্পষ্টভাবে বলা মুস্কিল, তবে মনে হয় স্বামীদের নিদারুণ অত্যাচারের জন্যই নারী-সমাজ টুসু গীতে স্বামীদের সম্পর্কে নীরব। বরং অবৈধ প্রেম এবং দেহমিলনের কথায় তারা টুসু গী'তর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভরে তুলেছে।

৫১. আয়না লিলি পায়না লিলি মাথা বাঁধলি রূপসী।
ই রূপটি তর দে'খবে কে ল পুরুষ হল্য বিদেশী ॥

৫২. আধ পয়সার ভাজা মালা আমরা বল্যে পর‍্যেছি।
নিজের পুরুষ পরকে দিয়ে পাষাণে বুক বাঁধ্যেছি ॥

৫৩. লকে বলে বুঢা বুঢা থাকুক ন আমার বুঢা।
বুঢা যদি বাঁচ্যে থাকে দিবেক ল পায়ের তড়া ॥
বুঢা আমার গুণের নাই হলে, আমি ধর কর‍্যে খাই কি কর‍্যে ॥

সপত্নী-যন্ত্রণা বধূর জীবনে তীব্রতম যন্ত্রণা। টুসু গীতে সতীন-সম্পর্কিত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ লাভ করেছে; কোথাও তা এতোই নগ্ন এবং এতোই নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে তা রুচিবানদের রুচিতে প্রবল আঘাত করে। কিন্তু এই নগ্নতা এবং নিষ্ঠুরতাই প্রমাণ করে সতীন-জ্বালা কি মারাত্মক জ্বালা। ঝাড়খণ্ডী নারী তার মনোভাবকে কখনো অপ্রকাশ রাখে নি; তার প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় সরাসরি প্রকাশ করেই সে যেন তৃপ্তি পায়। লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ হল স্পষ্টতা। টুসু গীতের মতো স্পষ্টতা এবং ঋজুতা খুব কম গানেই পাওয়া যায়।
সতীন-সম্পর্কিত গানগুলো তিক্ততম অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রকাশ মাত্র।

৫৪. আয় ল সতীন মারবি ন কি তর কি আমি মা'র খাব।

কালীর থানে খুঁটা গাড্যে তকেই বলিদান দিব ॥

৫৫. একটি চু'লের ফিরকি ঝুঁটি বাঁ'ধব ল যতন করি।
তুঁই ল সতীন মর্যে গেলে কাঁদব ল ছাঁচায় ধরি ॥

৫৬. এক গাড়ি কাঠ দু'গাড়ি কাঠ কাঠে আগুন লাগাব।
যখন আগুন পরগল হবেক সতীনকে ঠেলেঁ দিব ॥

সপত্নী-যন্ত্রণা তীব্রতম তিক্ততম হয় যখন বোন-সতীনের ঘটনা ঘটে। 'সবার ওপর তেঁতো কন্যা বোন-সতীনের ঘর।'

৫৭. তদের পাড়ায় দেখ্যে আল্যম দু বহিনে জঁটাজ টি।
এমন বাপে হুচুক-চরা এক জামাইকে দুবিটি ॥

গার্হস্থ্য-জীবনসম্পর্কিত গানে বধূর জীবন নিঃসন্দেহে বেদনার রঙে চিত্রিত হয়েছে। সে বাপের বাড়ি থেকে ফুল পেড়ে শাড়ি পেলে জাতিকুল খুইয়ে শাড়ি পেয়েছে বলে খোঁটা দেওয়া হয়।

৫৮. বাপের ঘরে কাপড় দিল ধারে ধারে ধাদকী ফুল।
শ্বশুর ঘরের লকে বলে গেল বহুব জাতিকুল ॥

তাই বাপের বাড়ি যাবার জন্য মন উসখুস করে। পৌষ পরব এলে বাপের বাড়ি যাবার সুযোগ আসে কিন্তু অনেক সময়ই মা-বাপ তাকে শ্বশুরবাড়িতে ফেলে রাখে। অভিমানে তার বুক ভারি হয়ে ওঠে। মায়ের প্রতি সে সকরুণ অভিযোগ করে। তার ইচ্ছে করে পাখির মতো উড়ে গিয়ে বাপের বাড়ির কোঠাঘরের ভেতরে গিয়ে বসে পড়ে।

৫৯. তুঁই যে গ মা বেহা দিলি বড় নদীর সে পারে।
এত বড় পোষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে ॥
মনটা কেমন করে, উড়্যে যাঁয়ে ব'সব গ মাঝ্যা ঘরে ॥

কোন গানে মৃতা মায়ের স্মৃতিতে তার দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। পৌষ পরবে বাপের বাড়িতে যাবার জন্য সে ভেতরে-ভেতরে তৈরী হল, অথচ কেউ তাকে নিতে এল না। মা নেই, তাই প্রাণ জুড়াবার মতো কেউ নেই, এক অসহায় কান্নায় সে যেন ভেঙে পড়ে।

৬০. মাথা ঘঁষে রইলম বস্যে প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
আবাল কালে মা মর্যেছে আর আমাদের কে আছে ॥

প্রেম টুসু গীতের-ও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। টুসু গীতের প্রেমবোধে সুকুমার অনুভূতির দর্শন খুব কমই মেলে। দেহ-মিলনের তীব্র বাসনা

প্রেম-বিষয়ক গানগুলোতে সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ ঝাড়খণ্ডের প্রেম-ভাবনা মোটেই মানস-লোকের ব্যাপার নয়, বরং বুভুক্ষু শরীরের তৃপ্তি-সাধনের মধ্য দিয়েই প্রেম এখানে পূর্ণতা এবং পরিণতি লাভ করে। দেহকে বিশ্লিষ্ট করে বিদেহী প্রেমের কথা ঝাড়খণ্ডী সমাজজীবনে কল্পনাও করা যায় না। দেহকে আশ্রয় করেই এখানে যুবকযুবতীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে; দেহকে আশ্রয় করেই তাদের চিত্তলোকে গভীর প্রেমবোধ জন্মলাভ করে। শারীর প্রেমের তপ্ত বাসনামথিত প্রকাশ টুসু গীতের রং-এ সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়। টুসু গীতের মূল পদে বরং দেহ-কামনার একটু আবরণ থাকে, টুসু গীতের রং-এ সেটুকু বাহুল্যবোধেই যেন বর্জিত হয়ে থাকে।

দেহ-প্রেমের কথা টুসু গীতে প্রাধান্য পেলেও গভীর ব্যঞ্জনাশ্রয়ী প্রেম বিষয়ক পদ যে একেবারেই নেই, তা বলা চলে না। মধুর প্রেম-ভাবনা নিচের গানগুলোতে আভাসিত।

৬২ কুথা হতে আলে তুমি কুথায় তুমার ঘরবাড়ি।
গাছতলাতে দাঁড়াও টুকু ডাল ভাঙ্গো বাতাস করি॥

প্রেম-সম্পর্কিত গানে পুকুর ঘাট, নদী ঘাট, অন্য কথায় জলের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এই ধরনের গানগুলোতে প্রেমের সহজ ভাবনা যেমন আছে, তেমনি আছে দেহমিলনের ইঙ্গিত।

৬৩ সখের বাটি সখের ঘটি প'ড়ল গ ঝনাৎ করো।
জলকে যাবার লছনা কর্যো ব'সল্যম গ বাবলা তলে॥

৬৪ বাবুর বাঁধকে নাইতে গেলে বাবুয় দেয় মা হে'ল মারো।
খাঁকের গাগ্‌রা খাঁকেই র'হল হিকিম দিল চ'খ ঠারো॥
আয় রে হিকিম ব'সবে খা'টে পান দিব বাটা ভর্যো।
ঝিঙাফুল্যা গয়না লিব দে রে হিকিম দর কর্যো॥
রাজা দিল আঁচির পাঁচির রাজা দিল তেতালা।
হিকিম দিল ফুলের বাগান হাওয়া খাওয়ার গাছতলা॥

ওপরের গানটিতে রাজার (বাবুর) পুকুরে স্নান করতে গিয়ে যুবতী নারী যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল, তারই অকপট বর্ণনা। যুবতীকে স্নান করতে দেখে রাজা জলে ঢেউ-এর দোলা দিতে লাগল, বিস্ময়-চকিত যুবতীর কাঁখের কলসী কাঁখেই থেকে গেল—সময় বুঝে রাজভ্রাতা (হিকিম)-ও চোখের ইশারা করতে লাগল। তাই হিকিমকে খাতির যত্ন করে বাটা ভরে পান

তুলে দিল সে আর পরিবর্তে হিকিম দিল ঝিঙাফুলিয়া গহনা। রাজা পাঁচির-অলা তেতলা বাড়ি বানিয়ে দিল আর হিকিম করে দিল ফুলের বাগান, হাওয়া খাওয়ার গাছতলা। গানটিতে গয়না-গাঁটি ঘরবাড়ির বিনিময়ে দেহ-দানের ইঙ্গিত আছে।

কিছু গানে রীতিমতো কাব্যিক ব্যঞ্জনার সঙ্গে এই উপহার দ্রব্য প্রসঙ্গটি চিত্রায়িত হয়েছে। ইঙ্গিতধর্মিতা এসব গানের বিশিষ্ট ধর্ম।

৬৫. বাণ আল্য বরষা আল্য ভাঁস্তে আল্য ঢুলুকি।
ঢুল্কির ভিতর লেখা আছে নবীন প্রেমের উলুখী॥

৬৬. ডাকে আল্য কাল ছাতা ধাবে ধাবে নাম লেখা।
আজ ফিরে যাও কাল ছাতা কা'লকে হবেক মুখ দেখা॥

টুসু গীতে যৌন-প্রেমের রূপকাশ্রিত উল্লেখ মেলে যত্র তত্র, তবে রূপকের আবরণটা যথেষ্ট পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

৬৭. অ ল অ ল শিশু ছুঁড়ি যা'স না কঁচি শালবনে।
খুদি বল্লায় বিঁধ্যে দিলে মরবি ল তুঁই জলনে॥

৬৮. আঁধার ঘরে কাল ভমর বিঁধ্যে করল জরাজর।
আর বিঁধ না কাল ভমর তুমার বই আর লই কার॥

টুসু গীতে প্রেমের বিচ্ছেদ প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ যন্ত্রণার গভীরতায় মর্মভেদী নয়। যেহেতু এখানে যে-প্রেমের কথা বলা হয়েছে, তা নিতান্তই দেহ-গত প্রেম, তাই বিচ্ছেদ এলেও তা হৃদয় মথিত করে না। ঝাড়খণ্ডে যৌনতাই প্রেমের চাবিকাঠি। গ্রহণে যেমন আগ্রহ, বর্জনেও তেমনি সহজ নির্লিপ্ততা এখানকার প্রেম-ধর্মের মৌল লক্ষণ। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলোতে প্রেমের আবির্ভাব, বিরহ, প্রতীক্ষা, বিচ্ছেদ, অনুযোগ, নির্বিকার বর্জন ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে।

৬৯. পুরুলিয়ার পুতনী পক' উড্যে গেলে ধ'রব না।
যার সঁগে যার ভালবাসা প্রাণ গেলে ভাব ছা'ড়ব না॥

৭০. অ ল অ ল কাল ছুঁড়ী তর কথার কি সত্ আছে।
আ'সব বলে্য আশা দিলি গামছা বিছাঁই রা'ত গেছে॥

৭১. খড়গপুরের সুরু চাদর উড়ে গেলে কেউ ধরয় না।
যার সঁগে যার ভাব থাকে রে সে ছাড়া কেউ ধরয় না॥

৭২. অ রে অ রে কাল ছঁড়া পানে কেনে চুন দিলি।

এত দিনের ভালবাসা আ'জ কেনে জবাব দিলি ॥

১৩. একটি ডগে দুটি পায়রা জড় ভাঙ্যে বিজড় হল্য।
এবার বঁধু নিঠুর হল্য দেশ ছাড়্যে বিদেশ গেল ॥

১৪. ভালবাসা বল্যেছিল আ'সব মাসের তিন দিনে।
দিনে দিনে মাস ফুরাল্য আল্য না বছর দিনে ॥

১৫. চাকুলিয়ার সুরু চাদর উড়্যে গেলে ধ'রব না।
যার স'গে বিচ্ছেদের কথা প্রাণ গেলেও রা কা'ঢ়ব না ॥

আগেই বলা হয়েছে যে, বহু বিচিত্র বিষয় টুসু গীতের উপজীব্য; সমগ্র ঝাড়খণ্ডকে রূপেরসে গন্ধেবর্ণে কামনায়-বাসনায় পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে টুসু গীত অপরিহার্য। আরো কিছু বিচিত্র বিষয়-সম্পর্কিত গানের আলোচনা করা যেতে পারে। শাড়ি-গহনা-অলংকার ঝাড়খণ্ডী নারীর কাছে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাই বিভিন্ন গানে এসব সম্পর্কে তাদের সাধ-আহ্লাদেব কথা, না-পাওয়ার বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস ঘনীভূত হয়ে আছে।

১৬. আলতা পাঢ়্যা চালতা পাঢ়্যা সকল পাঢ়্যা পর্যেছি।
মনহরা শাড়ির লাগ্যে ডাকে চিঠি ছাড়্যেছি ॥

১৭. চল ল সঙ্গতি সবাই বেলাই চণ্ডীব হাট যাব;
গায়ের গহনা বিকেঁ দিয়েঁ প্রেম-ডুরিয়া শাড়ি লিব ॥

টুসু গীতে অজস্র ইচ্ছার মিছিল। যা কিছু চোখে রঙ ধরায়, তাই গান হয়ে ওঠে; যা কিছু মনে ভাব জাগায় তাই সুর হয়ে ভেসে ওঠে। দু'পঙক্তির গানে একটি মুহূর্ত, একটি দৃশ্য, একটি ভাব অনন্তকালের জন্য ধরা পড়ে। তাই কতো কি তুচ্ছ দৃশ্য, তুচ্ছভাব টুসু গীতে মিছিলের মতো বিচিত্র সাজে রূপায়িত হয়েছে।

কখনো ফুল তুলে বিনি-সুতোয় মালা গাঁথবার বাসনা—

১৮. বাছ্যে বাছ্যে ফুল তু'লব বাছ্যে তু'লব ভাবরি।
বিনা সুতায় হার গাঁথ্যেছি লকে বলে মাদলি ॥

কখনো রাজার বাগানের মল্লিকা ফুলের বাতাসকে গন্ধময় করে তোলার চিত্র—

১৯. রাজা যেমন বাগান তেমন মালী ফুল বই ফুটে না।
আমরা সবাই কিনতে গেলে তিন আনা বই বলে না ॥
কি ফুল ফুট্যেছে বাগানে, ফুলের গন্ধ ছুটে পবনে ॥

এমনি তরো কতো ইচ্ছা, কতো সাধ যে টুসু গীতে চিত্র হয়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, টুসু গীতে রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত গান নেই বললেই চলে। আমাদের সংগৃহীত গানের মধ্যে দু'চারটির বেশি গান নেই। ভনিতাযুক্ত লোককবির মুদ্রিত টুসু সংগীত পুস্তিকায় অবশ্য রাধা-কৃষ্ণ সগৌরবে উপস্থিত আছেন। কিন্তু সে-সব গানকে আমরা আমাদের নিবন্ধে আলোচনার যোগ্য বলে মনে করি না। ঝাড়খণ্ডী নারীসমাজ রচিত টুসু গীতে রাধা-কৃষ্ণের কথাপ্রসঙ্গ থাকবার কথা নয়। বৈষ্ণব প্রভাব পুরুষদের ওপর ভাসা-ভাসা ভাবে পড়লেও অন্দরমহলের নারীসমাজের ওপর যে প্রভাব ফেলতে পারে নি, তা সপ্রমাণ হয় যখন আমরা লক্ষ্য করি ঝাড়খণ্ডী নারীর একান্ত নিজস্ব গান জাওয়া গীত, বিয়ের গান এবং টুসু গীতে রাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ বর্জিত গীত। অন্য কারণ এও হতে পারে যে, টুসু গীতে লৌকিক প্রেম-কথারই প্রাধান্য, রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এখানে একান্ত গৌণ হয়ে পড়েছে; অথবা লৌকিক প্রেমিকযুগলের অন্তরালে রাধাকৃষ্ণ আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

৮০. লহ লহ কলমী লতা দরার মাঝে ডাল ফেঁকে।
এত এত সখী থা'কতে কৃষ্ণ দর্যায় ঝাপ দিছে ॥

৮১. জল কাল যমুনার আর মাথার বেণী কাল।
দে'খতে ভাল অঙ্গ কালার শ্রীরাধিকার নাম ভাল ॥

এবারে 'টুসু গীতের রং' সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, টুসু গীতের মূল পদের সঙ্গে রং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এই সব রং যে পদের অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত হবেই এমন কোন কথা নেই। রং সদর্থেই বর্ণময়, জীবন্ত নব-নারীর তপ্ত রক্তের বিচ্ছুরণে এগানগুলো উত্তপ্ত বক্তিম চিত্রমালার সৃষ্টি করে থাকে। জীবনের এমন প্রাণময় প্রকাশ অন্য কোন গানে পাওয়া যায় না। এতো সহজ নিরাবরণ প্রকাশ, এমন সরাসরি ঋজুভাষণ অন্যত্র দুর্লভ। গানগুলো যেন ঝাড়খণ্ডী মানুষের শব্দচিত্র বিশেষ; শব্দচিত্র হলে-ও তার মধ্যে আমরা ঝাড়খণ্ডী মানুষের হৃদস্পন্দনের মৃদু শব্দটি পর্যন্ত শুনতে পাই। এসব গান আরো অবারিত অনবগুণ্ঠিত হয়ে ওঠে পুকুর ঘাটে, নদী-ঘাটে এবং মেলায়। এগান যেমন অবারিত হৃদয়ের প্রতিলিপি, তেমনি এগান মুক্ত প্রান্তরের

ভাবলিপি। টাঁড় ঝুমুর যেমন ঝাড়খণ্ডের মাঠে-প্রান্তরের আদিম আব-হাওয়ায় স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে, এ-গান ও তেমনি লোকা-লয়ের বাইরে সজীব এবং বর্ণময় হয়ে ওঠে।

বং গীতের বিষয়বস্তুও বিচিত্র উপাদানে গঠিত হয়ে থাকে। প্রেম-ভালোবাসা, ঈর্ষ্যা ঘৃণা মিতালি-কলহ, শাড়ি গহনা সব কিছুই এর অন্তর্গত। মুহূর্তের আবেগে তাৎক্ষণিক সৃষ্টি বলে এগুলোর মধ্যে মণ্ডনের কোন অবকাশ থাকে না অথচ একটি অভিনব চিত্রের আধারে আবেগটি আবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রধানতঃ প্রেমই বং এর উপজীব্য হয়ে থাকে। তবে এ-প্রেম কোনক্রমেই নিষ্কাম হয় না। দেহকে আশ্রয় করেই এ-প্রেম পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করে। অনুভবের কল্পলোকে বিচরণ করে প্রেমাপ্লুত হওয়ার চেয়ে দেহকে আশ্রয় করে রসাপ্লুত হওয়া ঝাড়খণ্ডী জনমানসে শ্রেষ্ঠত্বের অভিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ডঃ ধীরেন্দ্র নাথ সাহা তাঁর 'ঝাড়-খণ্ডী লোকভাষার গান' গ্রন্থে বলেছেন, 'এখানে প্রেমের দেওয়া-নেওয়াকে গোপন করা হয়নি, দেহ অনাবশ্যক অবগুণ্ঠনে অদৃশ্য নয়। হৃদয় থেকেও দেহ যে প্রিয়, মানসী থেকেও দেহী যে লোভনের অনেক পদেই তার প্রকট প্রকাশ অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতেই। দেহকে দেহের সবটো বাস্তবতায় ধরার অধীরতা এখানের প্রতি ছত্রে। এখানে আকাঙ্খা ভাবদিগন্তের পাখি নয়।'

নিছক দেহই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে পূর্ববাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যতক্ষণ না দেহ অধিগত হচ্ছে ততক্ষণ অনুরাগের আবির্ভাবও সম্ভব নয়। তাই প্রেমপ্রার্থী যুবক কখনো তীব্র শ্লেষে-বিদ্রূপে বিদ্ধ করে যুবতীকে তার দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে।

৮২ সিনাঁই লে ল গুবায় জল আছে। তকে দে'খলে ল অকাই পাছে।।

দৈহিক প্রেমের ক্ষেত্রে চোখ বা চোখের চাহনির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। নায়িকার তির্যক দৃষ্টি দেখে নায়ক সরাসরি পশ্চাদনুসরণের জন্য কখনো ডাক দেয়—

৮৩ তুঁই ভালছিস কি আড়ে আড়ে। মন যাছে ত আয় পেছা ধর্যে।।

প্রেমিকাও চোখের ইঙ্গিতে তার মনোভাব বোঝাবার চেষ্টা করে—

৮৪ তুঁই বুঝলি না রে চ'খঠাবা। ক'রব কত হাতের ইশারা।।

কখনো বা প্রিয়জনকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে, প্রার্থিত-জনের নাম সে জানে না, তাই নাম ধরে ডাকতেও পারে না নায়িকা।

৮৫ তুই ডাঁড়ালি অনেক ধুরে। নাম জানি নাই ডা'কব কি কব্যে ॥

ঝাড়খণ্ডে প্রেমের অনুষঙ্গ হিসাবে পানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। মুখ-চেনা, স্বল্প-চেনা কিংবা মেলায় চোখের ইঙ্গিতে মন জানাজানি হয়েছে এমন নরনারী যদি একে অন্যের পান গ্রহণ করে, তবে উভয়পক্ষই যে দেহমিলনে রাজি, একথা উভয়ের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঝাড়খণ্ডে পানের ভেতর মোহিনী দিয়ে বশীভূত করবার তুকতাকে লোকে বিশ্বাস করে। তাই অনিচ্ছুক যুবক যুবতী সহসা পান গ্রহণ করতে রাজি হয় না।

৮৬ কি দিলি রে পান পাতে। মন করে নাই ঘর ঘুর্যে যাতে ॥

৮৭ আমদের যগমহিনী গাছ আছে। ডাকি নাই ল তা উ চলি আসে ॥

একবার প্রেম ঘনীভূত হলে নারী কুলত্যাগ এবং গৃহত্যাগ করে প্রেমিকের হাত ধরে গোপনে পালিয়ে যায়—

৮৮ একটা নাথে দু'টা নাগছাবি। তুঁই থাকবি ন বা'হর্‌হ্য যাবি ॥

তবে ঝাড়খণ্ডে প্রেমিক-যুগল যে লোকনিন্দা কিংবা কলঙ্কের ভয় করে না, তা নয়। তারাও সামাজিক জীব, তাই নিষিদ্ধ বা অসামাজিক প্রেম-লীলা অত্যন্ত গোপনে চালাতে হয়। রাস্তায় পথে-ঘাটে সোচ্চার হয়ে ওঠার অবকাশ পায় না। শুধু চোখের চাহনি আর মুচকি হাসির ঝলকে নিঃশব্দে প্রেমিক-প্রেমিকা পারস্পরিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখে।

৮৯ আমরা বা কাড়ি নাই লকবাদী। মুহেঁ হাঁসি চইখে ভাব রাখি ॥

কিন্তু শেষ তক যে-প্রেমকে একদা মনে হয়েছিল, 'যেমন গেঁতা মাছের হাব গাথা/তর মন আমার পাঁজরায় গাথা,' সে প্রেমেও ভাঙন ধরে, বিচ্ছেদ আসে। তখন পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করে—

৯০ তরা উড়াঁই দিলি জনহা'র গই। ভালবাসা রা'খতে পারলি কই ॥

দুঃখে-বেদনায় তখন প্রেমিকা সিদ্ধান্ত নেয়: একবার প্রেম করেছিলাম, ভুলেও আর করব না, কিন্তু প্রেমের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা সারা জীবনে ভুলব না।

৯১ ভাব করেছি আর ক'রব না। ই জনমে ভু'লব না ॥

কিন্তু সত্যিই কি এ বৈরাগ্যের কোন মূল্য আছে? যে-বিরহজ্বালার কোন অভিজ্ঞতা তার জানা ছিল না, তাও এবার হল। এ-অভিজ্ঞতা তো বেদনা-মধুর স্মৃতিরসে সম্পৃক্ত।

৯২ আমি নাই জানি বির জ্বালা। জানাঁই দিল ডাঁগুয়া খালভরা ॥

প্রেমের ব্যর্থতা এবং বিরহজ্বালা নিঃসন্দেহে সাময়িক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। অতীত-প্রেমের জন্য দীর্ঘশ্বাস যেমন থাকে, তেমনি থাকে স্মৃতির মাধুরী। ভাঙা মনকে জোড়া দেবার ইচ্ছা দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়েই আভাসিত হয়ে থাকে।

৯৩ মন ভাঙোছে মিলন হয়ে কিসে। আমার জড়া ককিল যায় ভাঁস্যে॥

॥ আট ॥

ছো নাচের গান

ঝাড়খণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যসম্পদ 'ছো নাচ'। নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভের পূর্বে গান গেয়ে নৃত্যের বিষয়বস্তু, তাল ইত্যাদি বাঁধা হয়। এই গানগুলোকে ছো নাচের গান বলা হয়ে থাকে। ছো শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে কম মতামত পেশ করা হয় নি। কেউ বলেন সং শব্দ থেকে এর উদ্ভব, কেউ বলেন ছায়া শব্দ থেকে, আবার কেউ বলেন শৌভিক শব্দ থেকে। বলা বাহুল্য, এই নৃত্য ঝাড়খণ্ডের অন্যান্য নৃত্যের মতোই আদিম নৃত্য, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আদিম সমাজে নৃত্যের প্রবর্তন হয়েছিল। নৃত্যের মধ্যে যে ঐন্দ্রজালিক-ভাবনা নিহিত আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে আদিম সমাজের লোকনৃত্য কখনো-কখনো নিছক আনন্দলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হলেও মূলে এগুলো আচার-নৃত্যই ছিল। ছো নাচ তার ব্যতিক্রম ছিল না, তাই কোন্ সুদূর অতীতে এই নাচের প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছিল, তা অনুমান করা কঠিন। অধুনা এই লোকনৃত্যে যথেষ্ট ধ্রুপদী কলাকৌশল যুক্ত হলেও তার ফলে লোকনৃত্যের চরিত্র-গুণ বিনষ্ট হয় নি। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় এই নাচ চিরকালই 'ছ নাচ' নামে পরিচিত, বাংলা উচ্চারণ-রীতিতে বলা যেতে পারে 'ছো,' কিন্তু কদাচ 'ছৌ' নয়। 'ছ' শব্দের অর্থ অঙ্গভঙ্গি সহকারে ঢং করা অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গির মুদ্রার সাহায্যে বিশেষ একটি ঘটনা বা উদ্দেশ্যকে ফুটিয়ে তোলা। ছো নাচে অঙ্গভঙ্গির মুদ্রার সাহায্যে জীবনের কোন ঘটনা কিংবা কোন পৌরাণিক উপাখ্যানকে নৃত্যে রূপায়িত করা হয়।

ছো নাচ সাধারণতঃ চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রায় সারা চৈত্র মাস ধরে সন্ধ্যেবেলা নৃত্যকারীরা নৃত্যচর্চা করে থাকে। কিন্তু অন্য সব দিনের নৃত্য নিতান্তই অনুশীলন মাত্র। চৈত্র সংক্রান্তির আগের রাত্রে অর্থাৎ ভগ্‌তা পরবের প্রাক্কালে, যেখানে চড়ক বা ভগ্‌তা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে সাজসজ্জা, মুখোস ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জনতার সম্মুখে এই নৃত্য প্রদর্শন করা হয়। তার আগে পর্যন্ত সব দলই নিজের নিজের গ্রামের আখড়ায় সাধারণ বেশ বাসে নৃত্যচর্চা করে থাকে। ভগ্‌তার আগের রাত্রে বিভিন্ন গ্রামের দলগুলো যেখানে চড়কপূজা ও মেলা হয়, সেখানে সমবেত হয় এবং প্রতিটি দলই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে। একই আসরে বহু দলের নৃত্য পরিবেষণের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব এসে থাকে। যেহেতু ঝাড়খণ্ডে তেরোই জ্যৈষ্ঠ রোহিন পরবের কিছু আগে পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাই রোহিনের আগে পর্যন্ত অনুষ্ঠি• চড়কের আগের রাত্রে ছো নাচ হয়ে থাকে। তাই সাধারণভাবে আনুষ্ঠানিক ছো নাচের সময়-সীমানা চৈত্রসংক্রান্তি থেকে তেরোই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, ছো নাচ বিশিষ্ট আচার অনুষ্ঠানের মতোই চড়কের আগের রাত্রে অপরিহার্যরূপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাজেই যাঁরা মনে করেন, ছো নাচ নিছক মনোরঞ্জনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাঁদের ধারণা যে ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

খরাপীড়িত ঝাড়খণ্ডে চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে জল-ঢালার ব্যাপারটি ঐন্দ্রজালিক-ভাবনাপুষ্ট, যার লক্ষ্য, বৃষ্টি আনয়ন। ওপর থেকে বৃষ্টি ঝরে-পড়ার সঙ্গে দেবতার মাথায় জল-ঢালার অনুষ্ঠানটির মিল এবং সাযুজ্য সহজেই নজরে পড়ে। ওপর থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়তে দেখেই আদিম মানুষ জল-ঢালা আচারটি পালন করতে শুরু করে এবং ভাবতে শুরু করে এই আচার পালনের ফলে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টি অবশ্যই হবে। ফ্রেজার বলেন, Magic assumes that in nature one event follows another necessarily and invariably without intervention of any spiritual or personal agency. Thus its fundamental conception is identical with that of modern science, underlying the whole system is a faith, implicit but real and firm, in the order and

uniformity of nature[1] জাদুক্রিয়ায় বিশ্বাস করা হয় যে প্রকৃতিতে একটি ঘটনা আর একটি ঘটনাকে সংগতভাবে এবং অনিবার্যভাবে অনুসরণ করে থাকে, দৈব বা ব্যক্তিশক্তি কখনো এর অন্তরায় হয়ে বাধা সৃষ্টি করে না। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমস্ত ভাবনাটির গভীরে এমন একটি বিশ্বাস কাজ করছে যা প্রকৃতিতে শৃঙ্খলা এবং একধর্মিতা দেখার পক্ষপাতী, যদিও এ বিশ্বাস অত্যন্ত গভীরে নিহিত তাহলেও তার ভিত্তি বাস্তব এবং দৃঢ়মূল। এই জাদুক্রিয়ায় আত্মসমর্পণ বা আবেদন-নিবেদন-প্রার্থনা নেই, বরং তুক তাকের সাহায্যে প্রকৃতিকে বাধ্য করে অভীষ্ট সিদ্ধির প্রয়াস আছে। আচার অনুষ্ঠানের সাহায্যে প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায় বলে আদিম মানুষ বিশ্বাস করে। তাই তারা দেবতার পদতলে নতজানু হয়ে থাকে না, বরং বাঞ্ছিত বস্তু দানে দেবতাকে বাধ্য করে থাকে। জেন হ্যারিসন বলেছেন, When a savage wants sun or wind or rain, he does not go to the church and prostrate himself before a false god; he summons his own tribe and dances a sun dance or a wind-dance or a rain dance[2] অর্থাৎ অসভ্য আদিবাসী রৌদ্র, বাতাস বা বৃষ্টির প্রয়োজনে মন্দিরে গিয়ে কৃত্রিম দেবতার পদতলে লুটিয়ে পড়ে না, বরং সে তার গোষ্ঠীর লোকেদের ডেকে সমবেতভাবে প্রয়োজনমতো রৌদ্র নৃত্য কিংবা ঝটিকা-নৃত্য অথবা বর্ষা-নৃত্যের আয়োজন করে। এখানেই ছো নাচের উৎপত্তির ইতিহাস এবং ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ছো নাচের পরিবেশ ঘনঘটাচ্ছন্ন কালবৈশাখীর পরিবেশের নিখুঁত অনুকরণমাত্র, একটু তলিয়ে দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়। ঢোলধমসা এবং সানাই-এর সম্মিলিত গুরুগম্ভীর বাজনার মেঘগর্জনের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির প্রকাশ, অঙ্গভঙ্গিতে রুদ্র এবং বীরত্বের ব্যঞ্জনা, বিক্ষিপ্ত অবিন্যস্ত বেগায় নৃত্যের গতি—সমস্তই কালবৈশাখীর রূপটিকে সুপরিস্ফুট করে থাকে। অন্যান্য ঐন্দ্রজালিক নৃত্য—জাওয়া, করম—বাসনৃত্যের

১ The Golden Bough
২. The Ancient Art and Ritual

মতোই বৃত্তাকার রেখায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ; ছো নাচ বৃত্তাকারভাবে অনুষ্ঠিত হয় না এমন কথা বলি না, কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠান ছো নাচে খুব কমই দেখা যায়। কয়েকজন মিলে যখন অন্য কোন লোককে বেষ্টন করার প্রয়োজন পড়ে,—যেমন সখা-সখী পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ, রাধা কিংবা উভয়ে—তখনই বৃত্ত বা বেষ্টনী রচনার প্রয়োজন পড়ে—এ যেন অনেকটা মেঘের সূর্য বা চন্দ্রকে ঢেকে ফেলার অনুকরণ মাত্র। কালবৈশাখী মেঘ এলোমেলোভাবে আকাশে ছোটাছুটি করে, ফলে বজ্রবিদ্যুতের সৃষ্টি হয়, প্রচণ্ড দাপাদাপি করে সমস্ত পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তোলে, তারপর যখন স্থির হয় তখন বৃষ্টির ফোঁটায় বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করে তোলে। আদিম যুগের আদিম মানুষ তাদের এই লোকনৃত্যের মধ্যে নিখুঁতভাবে কালবৈশাখীকে অনুসরণ করে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টি আনবার চেষ্টা করত। জেন হ্যারিসন ঠিকই বলেছেন, অসভ্য আদিম মানবগোষ্ঠী কোনদিনই দেবতার কৃপা প্রার্থনা করে নি, বরং অলৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে দেবতাকে অভীষ্ট বস্তু দিতে বাধ্য করত। দেবতা যেভাবে কালবৈশাখীর সৃষ্টি করে বৃষ্টি আনয়ন করেন, আদিম মানুষ সেই পদ্ধতিটিকেই ছোনাচের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করে ঐন্দ্রজালিক আচারের সাহায্যে বৃষ্টি-নামানোর সম্ভাবনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত। The central principle of this magic was that by imitating any process which was thought to have desirable results, such results could be brought about.[৩] অর্থাৎ যে-কোন পদ্ধতির নিখুঁত ঐন্দ্রজালিক অনুকৃতির সাহায্যে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা সম্ভব। কালবৈশাখীর রূপ এবং গতি-ভঙ্গিমার ঐন্দ্রজালিক অনুকৃতি ছো নাচ ; উদ্দেশ্য, বৃষ্টি লাভ।

আমাদের এ বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট হবে যখন আমরা ছো নাচের অনুষ্ঠানের কালসীমানার শেষপ্রান্তে দৃষ্টিনিবদ্ধ করব। রোহিনের প্রাক্কাল পর্যন্ত ছো নাচের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। একদা রোহিন নাগাদ বর্ষাকাল শুরু হয়ে যেত বলে মনে হয়। কেননা লোকবিশ্বাস আছে, রোহিনে বৃষ্টি হবেই। প্রবাদে পাওয়া যায়, রোহিন টলে কপাল টলে না অর্থাৎ রোহিনে যে বীজ বপন করা হয়, তা থেকে অনিবার্যতঃ ফসল লাভ করা সম্ভব হয়। এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করে আমরা একটি বক্তব্যই পরিস্ফুট করতে চাইছি : বৃষ্টি নামবার আগে

৩. The Outlines of Mythology : Lewis Spence, P 23

পর্যন্ত খরাপীড়িত দিনগুলোতে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টি নামাবার আচার হিসাবে ছো নাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ছো নাচের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষও বিস্মৃত হয়েছে। আচার সহজে লুপ্ত হয় না, ছো নাচের আচার অনুষ্ঠান এখনো অব্যাহত আছে। তবে বর্তমানে ছো নাচ ঐন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়, পরিবর্তে মনোরঞ্জনের উপায় হিসাবে যত্রতত্র এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ছো নাচের চলনভূমি নিয়ে যতো না তর্কবিতর্ক তার চেয়ে অনেক বেশি তর্কবিতর্ক হয়েছে এর উৎপত্তিস্থল নিয়ে। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার পণ্ডিতবর্গ নিজের নিজের অঞ্চলকেই ছো নাচের উৎপত্তিস্থল হিসাবে প্রমাণ করবার অযথা প্রয়াস পেয়েছেন। আমাদের পক্ষে বঙ্গ বিহার-উড়িষ্যার পণ্ডিতবর্গের কোন দৃষ্টিকোণই সমর্থনযোগ্য মনে হয় নি। ছো নাচ বিহারের ধানবাদ জেলা, রাঁচি জেলার পাঁচ পরগণা এবং সিংভূম জেলার ধলভূম এবং সেরাই কেলা মহকুমায় যেমন প্রচলিত আছে, তেমনি উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝোর আদি অঞ্চলেও প্রচলিত আছে, ছো নাচের সর্বাধিক প্রচলন পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তিনটি প্রদেশেই যদি এ • চের প্রচলন থাকে, তাহলে সংগত দাবিটা কার? আমাদের উত্তর হচ্ছে, কারোই না, অথবা তিনটি প্রদেশেরই। এই আলোচনা-নিবন্ধের ভূমিকায় ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিমবাংলার পরিচয় প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে যে প্রাচীন ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছিল ছোটনাগপুর (পুরুলিয়া সহ) মালভূমি এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝোর আদি রাজ্যগুলো। ছো নাচের চলন-ভূমিও এই অঞ্চলটিই। আমরা যা বলতে চাই, তা হল এই যে ছো নাচ বাংলারও নয়, বিহারেরও নয়, কিংবা উড়িষ্যারও নয়, ছো নাচ ঝাড়খণ্ডের নৃত্যসম্পদ। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্রে ঝাড়খণ্ড লুপ্ত হয়ে গেছে এবং এর বিভিন্ন অংশ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অন্তর্গত হয়ে নামান্তরিত অস্তিত্ব বজায় রেখেছে; এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ছো নাচ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সম্মিলিত নৃত্যসম্পদ। ছো নাচের ধারক এবং বাহক বলতে প্রধানতঃ কুর্মি (মাহাত) ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকেদেরই বোঝায়। উল্লিখিত অঞ্চলের সর্বত্রই এই দু'টি সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তাতে কোন সন্দেহ নেই। দু'টি সম্প্রদায়ই সম্ভবতঃ একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল কোন কালে। আমরা এই দু'টি সম্প্রদায়ের বহু শতাব্দীর লীলাভূমি ঝাড়খণ্ডের

বিশেষ সংস্কারবহ জাতীয় লোকনৃত্য হিসাবে ছো নাচকে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী।

আগেই বলা হয়েছে, ছো নাচ আদিকালে ঐন্দ্রজালিক আচার হিসাবে অনুষ্ঠিত হত। তখন এ নৃত্য ঐন্দ্রজালিক অনুকৃতিমাত্র ছিল। বর্তমানে ছো নাচ মুখোসনৃত্যে পরিণত হলেও সূত্রপাতের সময় যে কোন প্রকার মুখোসের ব্যবহার ছিল না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন খুব সম্ভবতঃ নৃত্যকারীরা নিজেদের শরীর রঙ-বেরঙে চিত্রিত করে নৃত্যের বিষয়বস্তু অনুসারে বীভৎস বা ভয়ংকর করে তুলত। পরবর্তীকালে চরিত্রগুলোকে আরো বেশি বাস্তব রূপময় করে তোলার জন্যই মুখোসের প্রয়োজন পড়ে থাকবে। আদিবাসী জীবনের বিভিন্ন বিষয়বস্তু—যেমন কৃষি, পশুশিকার, মৎস্যশিকার—ছো নাচে দেখা যায়। বর্তমানে ভালুক আদির জন্য মুখোস ব্যবহার বং হলেও শুনতে এর ব্যবহার না থাকারই কথা। বর্তমানে মুখোস বাদ দিয়ে ছো নাচের অনুষ্ঠান হয় না বললেই চলে। বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন এসেছে, রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বর্তমানে ছো নাচের বিষয়বস্তুর প্রধান অংশ অধিকার করে নিয়েছে। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী রূপায়িত করবার জন্য ছো নাচের মুখোসের ব্যবহার তেমনটা লক্ষ্যগোচর হয় না। কারণ রাধাকৃষ্ণের কাহিনী ঝাড়খণ্ডী লোক চেতনায় লৌকিক প্রেম কাহিনী থেকে খুব একটা পৃথক বস্তু হিসাবে বিবেচিত হয় না। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী রূপায়ণে মুখোসের ব্যবহার সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। মুখোসের ব্যবহার প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন: 'মণিপুরবাসীর সুন্দর গৌরবর্ণ দেহাকৃতির জন্য তাহাদের নৃত্যকালীন রাধাকৃষ্ণের মুখোস ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয় নাই একথা সত্য, কিন্তু কৃষ্ণকায় এবং অপেক্ষাকৃত কুৎসিৎ দেহাকৃতির জন্য পৌরাণিক অভিজাত চরিত্রের নৃত্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিবার কালে পুরুলিয়ার সাধারণ জনসমাজে স্বভাবতঃই মুখোসের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। সেইজন্য ছো নাচের মধ্যেও যাহাতে অনভিজাত কিংবা আঞ্চলিক কোন বিষয় প্রকাশ করা হইয়া থাকে, তাহাতে মুখোস ব্যবহৃত হয় না।'[8] ডঃ ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য বিভ্রান্তিকর এবং ঝাড়খণ্ডী জনতার পক্ষে অপমান-জনকও বটে। ঝাড়খণ্ডেও যে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী রূপায়িত করবার সময়

---

৪ বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড

মুখোসের ব্যবহার সাধারণতঃ করা হয় না, একথা আগেই বলা হয়েছে। পৌরাণিক অভিজাত চরিত্র কেন, নিজেদের সম্প্রদায়বহির্ভূত সমস্ত চরিত্র-রূপায়ণের জন্যই মুখোসের ব্যবহার করা হয়, তা জন্তু-জানোয়ার হোক কিংবা রাম-রাবণ সুগ্রীব চরিত্রই হোক অথবা গণেশ দুর্গা-শিব চরিত্রই হোক। মুখোসের ব্যবহার চরিত্রকে অধিকতর বাস্তবানুগ এবং রূপসম্মত করে তোলবার জন্যই যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। পুরুলিয়ার মানুষ কৃষ্ণকায় এবং কুৎসিৎ দেহাকৃতির হওয়ার জন্য মুখোস ব্যবহার করেন, এমন মন্তব্য অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়। স্বদেশী যাত্রায় সাধারণ পোষাকে অভিনয় করা হয় কিন্তু পৌরাণিক যাত্রায় সাজসজ্জা উপকরণের সাহায্যে চরিত্রের রূপসৃষ্টি করে অভিনয় করা হয়। এর কারণ প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, সেই একই ব্যাখ্যা ছো নাচের পৌরাণিক অভিজাত চরিত্রে মুখোস ব্যবহারের কারণ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। এ-ছাড়া আগে রঙ-বেরঙে শরীর চিত্রিত করে নৃত্যাভিনয়ের কথা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে তা'ও স্মরণীয়। বিভিন্ন জীব জন্তু দেবদেবতার চরিত্রে নৃত্যাভিনয়ের জন্য আদিতে বিবিধ রঙে মুখ চিত্রিত করে চরিত্র রূপায়ণ করা হত, বার বার মুখ চিত্রিত করবার বিধাও অনেক, এই অসুবিধা দূর করবার জন্য পাকাপাকি ভাবে মুখোস ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দিয়ে থাকতে পারে।

ছো নাচ যে ঐন্দ্রজালিক নৃত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্য আদিম মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। খাদ্যবস্তু সংগ্রহের সংগ্রামের এক একটি ঘটনাকে নৃত্য নাট্যের মাধ্যমে তারা রূপায়িত করত। তাই ছো নাচ মূলতঃ বৃষ্টি আনবার জাদু-নৃত্য হলেও এর মধ্যে শিকারনৃত্য, মেছুয়ানৃত্য, শবরনৃত্য, ইত্যাদি জীবন-সম্পর্কিত সুপরিচিত ঘটনাবলী-সংবলিত নৃত্যও স্থান লাভ করে। মাত্র দু' এক শতক আগে ছো নাচে রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাবলী অনুপ্রবেশ করেছে। ইতিহাস বলে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ঝাড়খণ্ড বৃটিশ অধিকারে যাবার আগে এখানে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে নি, যার ফলে আঞ্চলিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী জনমানস প্রভাবিত হতে পারে। উঁচুবর্ণের লোকেদের অনুপ্রবেশের ফলে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঝাড়খণ্ডের লোকেদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে তীব্র নাড়া দেয়। তারা হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করে, উঁচুবর্ণের লোকেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনুকরণ করতে প্রয়াসী

হয় ; তারই ফলে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ছো নাচের বিষয়বস্তু হিসাবে সগৌরবে গৃহীত হয়। শিব-দুর্গা-কালী-গণেশ রাম-রাবণ-কৃষ্ণ আদি পৌরাণিক চরিত্রগুলো নৃত্য-নাট্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করল, কিন্তু পরোধর্ম ভয়াবহর মতো এই সব পৌরাণিক চরিত্র তাদের জীবন-চেতনাকে সৃষ্টিশীল করার পরিবর্তে গতানুগতিক কাহিনীর চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখল। এর ফলে স্বাভাবিক বিকাশ শুধু নৃত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যাহত হল। পৌরাণিক কাহিনী ছো নাচে নিত্য নতুন বিষয়বস্তু জুগিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু কোনক্রমেই স্থানীয় অধিবাসীদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারল না। সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটল না, যদিও অনেকেই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কথা বলে থাকেন। দুর্গাপূজা, কালীপূজা কোনদিনই ঝাড়খণ্ডের জনতার পূজা হতে পারে নি। শিব-দুর্গা কালী-গণেশ কোন দেবতাই ঝাড়খণ্ডী মানুষের দেবতা নয়, রামলীলা উৎসব কিংবা কৃষ্ণের দোলোৎসব ঝাড়খণ্ডের মানুষের উৎসবে পরিণত হতে পারে নি। এমন কি গানে রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়-প্রসঙ্গ এলেও তা শুধু নামেই এসেছে। লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকারাই রাধাকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করে আভিজাত্য অর্জনের বৃথা চেষ্টা করেছে।

ছো নাচে প্রধানতঃ কুর্মি-মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কুর্মিরা এই সেদিন অবধি আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন এবং ভূমিজ সম্প্রদায় এখনো আদিবাসী শ্রেণীভুক্তই আছেন। ছো নাচ এই গোষ্ঠীর আদিবাসীদের নৃত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতবর্গ আদিবাসী বলতে শুধুমাত্র সাঁওতাল ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায় বোঝেন না অথবা বুঝতে চান না। সাঁওতালদের মধ্যে ছো নাচ কেন করম নাচও প্রচলিত নেই। কিন্তু আজকাল সাঁওতালরাও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টায় ব্রাহ্মণ্যবাদের শিকারে পরিণত হয়েছেন, আর তাই তাঁরাও ছো নাচ, কাঁঠি নাচ আদি নৃত্য, যাদের বিষয়বস্তু হিন্দু পুরাণ-কথা, অনুশীলন করতে শুরু করেছেন।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ছো নাচের গানের উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ছো-নৃত্যের সঙ্গে যে ঝুমুর-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা আদিবাসী সমাজের প্রভাবজাত।...... ছো নাচে প্রচলিত বাংলা ঝুমুরের প্রভাব তাহাদের উপর গিয়া কিছু কিছু পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের দিক হইতে কোন প্রভাব আসিয়া ছো নাচের

ঝুমুরের উপর পড়িয়াছে, তাহা মনে করা যায় না।'[৪] আদিবাসী সমাজ বলতে তিনি সাঁওতাল সমাজকেই সাধারণতঃ বুঝিয়ে থাকেন। খুব সম্ভবতঃ ছো নাচের গান সাধারণতঃ দু' পঙক্তির হয়ে থাকে বলে স্বল্পায়তনের নিরীখে তিনি এ গানকে আদিবাসী সমাজের প্রভাবজাত বলে উল্লেখ করেছেন। স্বল্পায়তন যদি আদিবাসী সংগীতের প্রভাবের নিরীখ হয় তাহলে ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় রচিত প্রায় সমস্ত গানকেই আদিবাসী প্রভাবজাত বলে উল্লেখ করতে হয়।

ছো নাচের গান হিসাবে যে-সব গান গাওয়া হয় তা যে ছো নাচের মৌলিক গান এমন কথা ভাববার কারণ নেই। কারণ ঝাড়খণ্ডে এক নাচের গান অন্য নাচের গান হিসাবেও গীত হয়ে থাকে।

ছো নাচের গান সাধারণতঃ দু' পঙক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রকাশ-ভঙ্গি অত্যন্ত সহজ সরল এবং অকৃত্রিম। বিষয়বস্তুর মধ্যে পুরাণ-প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে বাস্তবসংসারের সুখ দুঃখ আনন্দবেদনার কথা। পুরাণ-প্রসঙ্গের গানের পরিমাণ সংখ্যায় যেমন কম, তেমনি কাব্য-রস এবং জীবন-রসের বিচারে অনুল্লেখ্যও বটে। পুরাণ প্রসঙ্গের গানগুলো সম্পূর্ণতঃ বক্তব্য-ধর্মী, কবিত্বের ছিঁটে ফোঁটাও এগুলোর মধ্যে নেই। লৌকিক জীবন-সম্পর্কিত গানগুলো, অন্য পক্ষে, কবিত্বের জাদুস্পর্শে সজীব এবং প্রাণবন্ত। ঝাড়খণ্ডের আদিম প্রাণের স্পন্দন এই সব গানের মধ্যে খুব সহজেই মেলে ছো নাচের গানেরও একটি বিশিষ্ট বিষয় হল প্রেম। এ প্রেম লোকজীবন-পুষ্ট, তাই অবারিত উদ্দাম। কিন্তু এ-প্রেম শুধু আনন্দ-উচ্ছ্বসিত নয়, অশ্রু-সজলও বটে।

১. কুল্‌হি কুল্‌হি আ'সবে বঁধু ব'সবে বারুণে।
   তামুক খাবার লছনা কর্যে হে'রবে নয়নে॥

ঝাড়খণ্ডের প্রেমিকা যে লজ্জাবনতা যুবতী নয়, গানটি থেকে তা প্রমাণিত হয়।

২. গুণগুণায়েঁ আ'সলে ভমর ব'সলে কন্ ফুলে।
   লইতন ডালিম ফুল ফুট্যেছে ব'সবে এই বারে॥

গানটি রূপকধর্মী। গানটিতে স্পষ্টতঃ শরীর-প্রেমের ইঙ্গিত রয়েছে। ভ্রমর, ডালিম, ফুল ইত্যাদি প্রতীকগুলো দৈহিক প্রেমের অনুষঙ্গ-বিশেষ।

৪ বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৯৩-১৯৪

৩. ভাব ত জান না বঁধু প্রেম ত জান না।
কন্ ফুলেতে কত মধু তাউ ত জান না॥

দুঃসাহসিকা প্রেমিকা সমাজের রক্তচক্ষুকে বেপরোয়া ঔদ্ধত্যে অবহেলা করে—

৪. চিংড়ি মাছের ভিতর ফরা তাহ ঢাল্যেছি ঘি।
আমরা যদি পিবিত করি তদের গেল কি॥

৫ ঘরের জল বাইরে ফেলাই জল আ'নব বই ত কি।
চুঁয়া শালে নাগর আছে হাঁ'সব বই ত কি॥

ছেলেবেলার স্মৃতি অত্যন্ত মধুর। তাই ছেলেবেলার 'ভালবাসা'কে দেখলে এক মুহূর্তে সুদূর অস্পষ্ট অতীতের এক একটা ঘটনা ছবি হয়ে চোখের সামনে ভাসতে থাকে আর সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর জন্য দীর্ঘশ্বাস ঝরে।

৬ শিশুকালে খেল্যেছিলম এক গলা জলে।
সে সব কথা মনে পড়ে তুমায় দেখিলে॥

প্রেম কখনো গোপন থাকে না। যতোই সে দুঃসাহসিকা হোক, কলঙ্ক তাকেও স্পর্শ করে।

৭ দুধিলতার বন গ সখি দুধিলতার বন।
নাকছাবিতে লা'গল কালি ঘুচাবি কখন॥

এখানে কলঙ্কের কথা অপূর্ব কাব্যব্যঞ্জনায় প্রকাশ করা হয়েছে, চিত্রকল্পটি আমাদের চমকিত করে। 'নাকছাবিতে লা'গল কালি'—নিঃসন্দেহে গভীর ব্যঞ্জনাবহ একটি চিত্র। একদিকে নাকছাবি গহনাটিতে প্রেমিকের দানের স্মৃতি জড়িয়ে আছে; অন্যদিকে নাকছাবি নায়িকার গরিমাময় উজ্জ্বল যৌবনেরও প্রতীক। তাই নাকছাবিতে কালি লাগার অর্থ, একদিকে যেমন গোপন প্রেম জানাজানি হয়ে-যাওয়ার ইঙ্গিত আছে, অন্যদিকে নায়িকার যৌবনধর্মে কলঙ্কের দাগ লাগার সংকেতও আছে।

এসবের পরেও নায়িকার যন্ত্রণার শেষ নেই। নিঃসর্তে এবং নিঃস্বার্থভাবে যে-পুরুষের কাছে সে আত্মদান করেছিল, সে-ও শেষ তক তার সঙ্গে প্রতারণা করে। প্রেমিকের প্রতারণা তাই প্রেমিকার হৃদয়কে চূর্ণ করে ফেলে।

৮ ধন গেলে জীবন গেলে তাউ ত ভাবি নাই।
গুণের বঁধু চল্যে গেলে বল্যে গেলে নাই॥

ভালবাসা যদি ভাল মনে বিদায় নিয়ে যেত, দুঃখ থাকত না; কিন্তু যাবার আগে প্রেমিক যে একটি কথাও বলে গেল না।

৯ ভাব করো্য শ্যাম চল্যে গেলে বল্যে গেলে না।
প্রেমের আগুন জলছে দ্বিগুণ নিম্ঁাই গেলে না॥

তবু তো মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে। প্রেম গেলেও প্রেমের জন্য দীর্ঘশ্বাসে ভরা প্রতীক্ষা থাকে।

১০ আঁধারি-এ ধান সিঝায়েঁ জুসনায় ঘঁাটি ধান।
মাথা বাঁধ্যে দে গ মাসি যদি ফিরে শাম॥

১১ নদী কাঁদে লালা কাঁদে কাঁদে গ মালতিয়া।
লটায়েঁ লটায়েঁ কাঁদে বনের ধাদকিয়া॥

সত্যিকথা বলতে কি ঝাড়খণ্ডের প্রেমের কাহিনী এমনি অশ্রু সজল কাহিনীর মধ্যেই যেন পরিণতি লাভ করে।

বধূ-জীবনের বেদনার কাহিনীও ছো নাচের গানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে। শ্বশুরালয়ে নির্যাতনে-নিপীড়নে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় বধূর জীবন বেদনাবিধুর হয়ে ওঠে। তাই কখনো-কখনো প্রাক্‌বিবাহ যুগের প্রেমের কথা মনে পড়ে। দাম্পত্যজীবন-বহির্ভূত প্রেম কখনো তাকে উন্মন করে।

১২ বাঁধের আড়ায় বা 'জল বাঁশি শু'নতে পার্যেছি।
আর বাজ না প্রেমের বাঁশি শ্বশুর ঘর যাছি॥

শ্বশুরবাড়ির লোক দেখলে তার চোখে জল আসে।

১৩ আষাড় শরাবণ মাসে মুরুণ পাতে জল।
শ্বশুর ঘরের লক দে'খলে চইখে পড়ে লর॥

১৪ আয়না দিলি পাইনা তেল ত দিলি নাই।
শ্বশুর ঘরের মাথা বাঁধা মনকে ধরে নাই॥

তার মনে হয়, মেয়েছেলের জীবন অসার্থক, কারণ সে পরের ঘর আলো করে।

১৫ বনে ফুটে বনতিলাই ফুল বনকে করে আল।
বিটি ছানার মিছাই জনম পরের ঘর আল॥

১৬ মাঠে-মাঠে গঁইঠা কুঢ়া তা-উ বর' ভাল।
শ্বশুর ঘরের হাঁড়ি মাজ্যে গা হল্য কাল॥

একবার সিদ্ধান্ত নিলে তা কার্যকরী করতে ঝাড়খণ্ডী নারী দ্বিধা করত না। শ্বশুরবাড়ি ভাল লাগত না বলে তারা গোপনে বাপের বাড়ি পালিয়ে যেত।

১৭ শ্বশুর ঘর লে পাল্ঁাই আলি বনে লুকালি।
গামছা-পাড়্যা টসর শাড়ি ঘামে ভিজালি॥

যে-সব গান নিয়ে আলোচনা করা হল তার প্রতিটিই নারীর উক্তি তো বটেই, নারীর বিচিত্রজীবনের রস-ধারায় এগুলো পুরোপুরি সাহিত্যের উপাদানেও পরিণত হয়েছে। জীবন-ধর্মিতা এইগুলোকে সাহিত্য-পদবাচ্য করে তুলেছে। এই গানগুলো নিঃসন্দেহে ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের মূল্যবান উপকরণ। খাঁটি লোকগীতির সব গুণ এই গানগুলোতে পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে, এগুলো ছো নাচের গান হলেও একেবারে মৌলিক এমন কথা বলা যায় না। ঝাড়খণ্ডে এক শ্রেণীর গান অন্য শ্রেণীতে যথেচ্ছ যাতায়াত করে থাকে। ছো নাচ পুরুষের নাচ, তাই এ-নাচে নারীজীবন-সম্পর্কিত, সম্ভবতঃ নারী-রচিত, গানের প্রচলন যথেষ্ট বেমানান এবং অসংগত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আচার সংগীত

কিছু কিছু লোকসংগীত আছে, যা সম্পূর্ণতঃ আচার-ভিত্তিক। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আচার উপলক্ষে এই সব গান গাওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে কিছু গান, যেমন বিয়ের গান, পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে গীত হয়ে থাকে, এই গানের একটা ব্যবহারিক দিক থাকায় একে ব্যবহারিক সংগীতও বলা যেতে পারে। এ-গান শুধুমাত্র বিয়ের দিন কয়েক ছাড়া বছরের অন্য কোন সময় গাওয়া হয় না। ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ-গানের তেমন কোন প্রভাব লোকমানসে লক্ষ্যগোচর হয় না। বিয়ের গান সম্পূর্ণতঃ আচার-ভিত্তিক গান। কেউ কেউ বলেন, ঝাড়খণ্ডে বিয়ের গানই বিয়ের একমাত্র আচার; এ-সিদ্ধান্ত সর্বৈব ভ্রান্ত। বিয়ের বিভিন্ন আচারের অনুষঙ্গ হিসাবেই বিভিন্ন ধরনের গান গাওয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি আচারের জন্য বিশেষ গান থাকে; যে-কোন আচারে যে-কোন গান গাওয়া চলে না। বিয়ের গান যেহেতু আচারভিত্তিক, তাই এ-গানে রক্ষণশীলতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। আচার যেমন কখনো পরিবর্তিত হয় না, তেমনি এ গানও। বিয়ের গান নিত্য নূতন রচিত হয় না, আচারের মতো প্রাচীন কালের গান ভাবে-ভাষায়

সংরক্ষিত হয়ে এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই এইগানকে আমরা আচার সংগীত নামে চিহ্নিত করবার পক্ষপাতী।

আচার-মূলক আরো কিছু গান আছে; যেমন, রুমুজ গান, মন্ত্র গান ইত্যাদি। রুমুজ গান ঝুঁপারের (কারো গায়ে দেবতার ভর নামা) সময় দেবতাকে আবাহনের গান। এ-গানও সব সময় গাওয়া হয় না; বছরের যে-কোন সময় ঝুঁপারের অনুষ্ঠান করা হলে শুধুমাত্র সেই অনুষ্ঠানে দেবতার আবির্ভাব কামনা করে আচারের মতো এ গানগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এ-গানও অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত হয়ে বহুকাল ধরে একই ভাবে গীত হয়ে আসছে। এগানের ঝুঁপার অনুষ্ঠানে যে একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনও আছে, তা'ও অস্বীকার করা যায় না। সর্পমন্ত্র, রোগশোক ভূত-প্রেতের ঝাড়নমন্ত্র, মোহিনীমন্ত্র, বশীকরণমন্ত্র আদি মন্ত্রগানের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রের মধ্যে আচারের ধর্ম সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাই এই সমস্ত গানকে আমরা ব্যবহারিক সংগীত না বলে আচার-সংগীত হিসাবে উল্লেখ করেছি।

॥ এক ॥
বেহা গীত

'বেহা গীত' বা বিবাহের গান বিবাহের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গীত হয়ে থাকে। বৎসরের যে-কোন সময় বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে। অন্যকথায়, এ-গান যেমন ঋতুচক্রের উৎসবসংগীতের মতো নির্দিষ্ট সময়-সীমায় আবদ্ধ থাকে না, তেমনি বিবাহ-অনুষ্ঠান ব্যতীত কখনো এ-গান গাওয়া হয় না। ব্যবহারিক প্রয়োজনেই এ-গান গীত হয়ে থাকে। বিবাহের প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে গান রচিত হয়েছে। বিবাহ-সংগীত তাই প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। নিষ্প্রাণ আচারকে যেন বাণীরূপ দিয়ে সজীব প্রাণবন্ত করে তোলে। বিবাহের গানের 'সুনির্দিষ্ট একটি ব্যবহারিক প্রয়োজন' থাকায় এই গানকে ব্যবহারিক সংগীত (functional song) ও বলা হয়ে থাকে।

ঝাড়খণ্ডের ভাষা এবং সংস্কৃতি মূলতঃ কুর্মি-মাহাতদের ভাষা এবং

সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক কারণেই এই নিবন্ধে আলোচিতব্য আচার এবং সংগীত কুর্মি-মাহাত সম্প্রদায় থেকেই গৃহীত হয়েছে। ধানবাদ, পুরুলিয়া, পাঁচ পরগণা, সেরাইকেলা, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বাঁকুড়ার সর্বত্রই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একই ধরনের আচার এবং সংগীত বিবাহ-অনুষ্ঠানে লক্ষ্যগোচর হয়। অবশ্য ঝাড়খণ্ডের কুর্মি ভূমিজ-বাগাল-ভুঞা কামার-কুমোর আদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের আচারে এবং গানে পার্থক্যের পরিমাণ খুবই কম।

বিবাহের গান আচারমূলক। তাই পূজা-মন্ত্রের মতো এই গানেও রক্ষণশীলতা লক্ষ্য করা যায়। বিবাহসংগীত নিত্য নতন রূপে রচিত হয় না। আচার-অনুষ্ঠানকে অনুসরণ করে প্রাচীনকালে যে গান রচিত হয়েছিল, এখনো সেই একই গান গীত হয়ে চলেছে। স্বভাবতঃই গানগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন। বর্তমানে এই ভাষা সরাসরি ব্যবহৃত হয় না। বহু শব্দই অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। গানের ভাষাই প্রমাণ করে গানগুলো যথেষ্ট প্রাচীন।

বেহা গীত একান্তভাবে নারীসমাজের গীত। গানসৃষ্টিতে এবং কণ্ঠদানে তারাই যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। অবশ্য রঙ্গ রসিকতার সময় পুরুষদের কণ্ঠেও এগান শোনা যায়, তবে শুধুমাত্র রঙ্গ-রসিকতার গান। আচার-সম্পর্কিত সমস্ত গানই নারীকণ্ঠে গীত হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডে নারী-সমাজ বিয়ের গানে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। একক-কণ্ঠে এ-গান যে শোনা যায় না, তা নয়, তবে এ গান সম্পূর্ণতঃ যৌথভাবে গেয়। বিবাহ সংগীতে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় না, কিংবা কোন নৃত্যও এই গানের সঙ্গে জড়িত নয়। আসলে বিয়ের গান বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই রচিত। যখন যে আচার-অনুষ্ঠান, তখন সেই সম্পর্কিত গান গাওয়াই রীতি। তবে সব সময় যে এ-নিয়ম মেনে চলা হয়, তাও নয়। তাছাড়া বহু আচার-অনুষ্ঠান বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও গানগুলো অবলুপ্ত হয় নি, সমান আদরে সে-সব গানও গীত হয়ে থাকে।

বিয়ের কথাবার্তার সূত্রপাতের সাথে-সাথেই বিয়ের গান করবার রেওয়াজ ঝাড়খণ্ডে লক্ষ্য করা যায়। বাড়িঘর রঙ করবার সময়, চাল-ডাল-মুড়ি-চিঁড়ে তৈরী করবার সময় নারীকণ্ঠে বিয়ের গান গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। বিয়ের সব অনুষ্ঠান শেষ হলে এবং অতিথি-অভ্যাগতেরা বিদায় নিয়ে যাবার পর বিয়ের গান গাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। বিয়েটা আনন্দের, কিন্তু মজার

কথা এই যে, বিয়ের গান এক আশ্চর্য করুণ সুরে টিমে লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। একমাত্র বঙ্গরসিকতার গানগুলোতে এই সুরটাকে খানিকটা সহজ এবং হাল্কা করে নেওয়া হয়, লয়ও খানিকটা দ্রুত হয়ে পড়ে। বিয়ের পালাগানগুলো এমনি করুণসুরে গাওয়া হয়ে থাকে যে, গায়িকার সুরের অনুরণন, শ্বাসাঘাত এবং আন্তরিক উচ্চারণ-সঞ্জাত পরিবেশে শ্রোতার চোখ সহজেই সজল হয়ে ওঠে।

অতঃপর 'কন্যা' নিরীক্ষণে বেরুবার শুভ মুহূর্ত থেকে বিবাহোত্তর সময় পর্যন্ত বিভিন্ন আচারঅনুষ্ঠান-সম্পর্কিত গানগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যাবে।

১ ছুটুমুটু রঙ্গনী মা ঝবরলি রে ডাল,
শুন যে শুন গ বাবা পরিবার বালার কেউ নাই ॥

সঙ্গে সঙ্গে জনকজননী সচেতন হয়ে ওঠেন। সত্যিই তো, পুত্রের বিবাহই দেওয়া হল না, পুত্রবধূ থাকবার কথাই তো ওঠে না। অতএব যেখানে-যেখানে পাত্রীর সন্ধান আছে, আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে নিয়ে সে-সব স্থানে ছোটাছুটি করতে হয়।

যে-ভাবেই হোক, পাত্রী যেন জেনে যায় তার জীবনের গতিপথ পরিবর্তনের সংকেতটি।

২ 'নদিয়া কা ধারে ধারে কুইলী কা শবদ গ/আস কুইলী বস নীম ডালে গ।
পালঙ্কে বস্তে আছেন মোর যে বাবা গ/শুন বাবা কুইলীর শবদ গ' ॥
'কি-অ শুনিব মা কুইলীর শবদ গ
আঁখি মোর ঢরকিছে, ছাতি মোর বিদুবিছে গ' ॥

পাত্রপক্ষের লোক অবশেষে কন্যাগৃহে এসে উপস্থিত হয়। নানাভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কনে দেখা হয়, পছন্দও হয়। এবার কথাবার্তা পাকাপাকি করা। দরদস্তুর রীতিমতো বিকিকিনি ব্যাপার।

৩ 'বাবার বাড়ি-এ কুঁদুরীর লত্ গ/ফুলে ফলে ঝবরলি ডাল গ।
মাচিলায় বস্তে আছেন মোর যে বাবা গ/বল বাবা ফুলেকেরি দর গ।
সুন্দর সুন্দর ফুল দেখ্যে খ'দ্ধার লাগিল গ/বল বাবা ফুলেকেরি দর গ।'
'যদি ফুলের দর করি দশ কুটুম খুজিংগ
কুটুম থাক্যে দিব গ মুলাই, কন দিনে না করবে বেমান ॥'

আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে শুধুমাত্র বাবার কথাতেই বিয়ে পাকাপাকি হয় না, মায়েব মতামতের ও বিশেষ মূল্য আছে।

৪ 'মালিনীর বাড়ি-এ রুপল বাঁইগন, দশ টাকা দিব মাল্যান লিব বাইগন।'
'নাই লিব দশ টাকা নাই দিব বাইগন, নাই লিব বিশ টাকা নাই দিব বাইগন
গাছের বাইগন তু'ললে গাছ হবেক শুধা, কলেব বাইগন বিকলে কল
হবেক শুধা॥

কোল শূন্য হবে বলে তো মেয়েকে চিবকাল ঘরে বাখা যায় না, তাই আত্মীয়-স্বজন সমাজের লোকেব দববাবে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫ তিলগিলি বুনিলম ধাদাকীধ্রুকী, উঠ তিল ভুঁই মাটি ছাড়িযেঁ।
সুঘরের ঝি হথ্য সুখ বাসিত গ, লিলজ কন্যা দববারে বসাল্য গ।
সুজাতের বিটি তুমি সুজাতেব বিটি, লিলজ কন্যা দববারে বসালি।
বাবা-এ মোব সমুদয় দেশ ডাকিযেঁ গ, মা-এ মোর সমুদয় দেশের পাশে গ।
অন্নবস্তব না হয যেমন জ্বালা গ,
অন্নব জ্বালা পবভু বহুত জ্বালা গ, বস্তব বিনে বড় মানে হীন॥

ওপবের গানটিতে দু'টি ব্যাপাব সুস্পষ্ট। 'দববাবে' বসে মেয়েব বিয়ের বাগদানের ব্যাপাবে কন্যাপক্ষ যেন বেশ হীনমন্যতা বোধ কবে। অন্যদিকে অন্নবস্ত্রেব অনটনের ব্যাপারটায় সহজেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা অনুমান করা যায়। কন্যাপণের অতিবিক্ত পাত্রপক্ষকে এই ভাত-কাপডেব শর্তটাও মেনে নিতে হয়।

বিয়ের কথা পাকা হযে যাবাব পব আনুষ্ঠানিকভাবে দু'পক্ষের লোকই দু'বাড়িতে যাতায়াত কবে। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'দুয়াব মাড়া'। তারপরই শুরু হয় বিয়েব উদ্যোগপর্ব।

প্রথমেই আসে নিমন্ত্রণপ্রসঙ্গ. বিবাহ একক পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়, আত্মীয়স্বজনসহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। গ্রামেব প্রতি ঘরে ঘরে একটি 'হাঁ'ড়কা' (ছোট হাঁড়ি) সহ ঘুরে ঘুরে নিমন্ত্রণ করবার রীতি আছে। বর্তমানে হাতে লেখা বা ছাপানো নিমন্ত্রণপত্রেব চল হলেও হলুদমাখানো গোটা গুয়া বা সুপারী দিয়ে নিমন্ত্রণ কববার বীতিই মৌলিক রীতি। বরপক্ষ কনেপক্ষ পরস্পর পরস্পবকে নিমন্ত্রণ কবে। সম্মান এবং মর্যাদা অনুসারে নিমন্ত্রিতদের একটি বা দুটি সুপারী দিতে হয়। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে 'বহনোই' বা ভগ্নিপতিব সম্মান অত্যন্ত বেশি। ভগ্নিপতিব জন্য দুটি সুপারী দিয়ে নিমন্ত্রণ করতে হয়।

জোড় উভাল দিয়ে, বালা, বহনোই আন, বহনোই-এর বড মান গ।
বিরহি কুখি ঘড়ার দানা, ধর চাবুক ছুটাও ঘড়া গ ॥

এরপর তিনদিন বা একদিন আগে বরপক্ষ থেকে কন্যাগৃহে 'লগণ' পৌছে দেওয়া হয়। 'লগণ' কনেবাড়িতে পৌছালেই বিয়ে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। বরগৃহের 'লগণ'এর তেলহলুদ শাড়ি-গহনা-প্রসাধন দ্রব্যাদির সাহায্যেই কনের 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান পালন করা হয়। 'লগণ' এর দিন থেকে উভয় বাড়িতে বরকনের গায়ে হলুদ মাখানো হয়। গায়ে হলুদের সঙ্গে সঙ্গে বরের হাতে জাঁতি এবং কনের হাতে কাজললতা তুলে দেওয়া হয়। গায়ে হলুদের সময় গাওয়া হয়—

৭ 'কঠাঘরের দুয়ারে কঠাঘরের দুয়ারে, বালার মা, কিসের বাতি জ্বলে ?'
'আমদের বালা হল'দ মাথে ঘি-এর বাতি জ্বলে।'

তারপর আসে বিয়ের দিন, অধিবাসের দিন। ঝাড়খণ্ডে বিয়ের দিন বরকনের উপবাস করবার রীতি নেই, শুধু নিজের বাড়ির অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ। বিবাহিতা বোনেরা, মাসি-পিসি-মামীরা এবং অন্যান্য আত্মীয়ারা তেলহলুদ মাখিয়ে খাবার পরিবেষণ করে। প্রত্যেকের থালা থেকে অন্ততঃ কিছুটা খাবার খেতে হয়। বর-কনে এই অনুষ্ঠানে নগদ দক্ষিণা এবং নূতন বস্ত্র পেয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানের নাম 'আভ্‌ড়া ভাত খাওয়া' (অবু্যঢ়ান্ন)। এই সময়ে গাওয়া হয়—

৮ ডুঁগুরি কা ধারে ধারে কুড়ারি কা শবদ, কে কাটিছে পাঁজনের গাছ।
পাঁজন তরুতলে এই বা'লার জনম, মাগ বালা আভ্‌ড়ার হল'দ ॥

অবশেষে 'বরিয়াত্‌' বা বরযাত্রার সময় এগিয়ে আসে। ক্ষৌরকার এসে ক্ষৌরকর্ম সম্পাদন করে। নাপিত নখ কেটে বরের পায়ে আলতা পরিয়ে দেয়। পুরনারীরা গানে-গানে তিরস্কারে এবং রঙ্গরসিকতায় নাপিতকে বিদ্ধ করে—

৯. এক পইলা চাউলে লাপি'ত ভুলিয়েঁ রহিল।
চাঁদের বরন বহু লাপিত চোরে নিয়েঁ গেল ॥

এরপর স্নানের অনুষ্ঠান। বলাবাহুল্য, গায়ে হলুদ হবার পর থেকে স্নান করা নিষিদ্ধ। নিশ্চিত করে বলা কঠিন, তবে গানের মধ্যে যে-ধরনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাতে নতুন পুকুর কেটে তার জলে স্নান করানোর রীতিই হয়তো একদা প্রচলিত ছিল।

১০.মুদি-এ মাটি তাডে মুইদানে কেলে, লিবি ত লিবি মুদি আনা হাতের ধুতি।.
লিবি ত লিবি মুইদান টসর কা শাড়ি ॥

বর্তমানে অবশ্য নতুন পুকুরের কোন হদিশ মেলে না। 'বহনোই' কোদাল দিয়ে একটা চারকোণা প্রতীক-পুকুব কাটে। একটি জোয়াল অই গণ্ডির ওপর পেতে তার ওপর বরকে দাঁড় করানো হয়। তারপর মাথার ওপর শালপাতাব একটি 'খালি' (পাতা) ধরা হয় এবং বহনোই একটি ঘটি থেকে জল ঢালে। গায়ে ছিঁটেফোঁটা জল পড়ে মাত্র, সবটাই চারপাশে গড়িয়ে পড়ে। ওখানেই বিয়েব সাজসজ্জা নতুন জামাকাপড় পরানো হয়। নতুন চিরুনি দিযে বহনোই ববের চুল আঁচড়ে দিয়ে মাথায় 'মোড' (<মুকুট) পরিয়ে দেয়। অনুষ্ঠানটি যেন যুদ্ধে বেরুবার আগে অনুষ্ঠিত অভিষেক মঙ্গলাচরণ। হাতে জাঁতি অস্ত্রের প্রতীক, ক্ষৌবকর্ম অশুচিতা নাশের প্রতীক, স্নানেব অনুষ্ঠান পবিত্র বারিসিঞ্চনে অভিষেকের প্রতীক এবং মোড় উষ্ণীষেব প্রতীক। স্নানেব পব বরকে হাঁটানোর নিয়ম নেই, তখন থেকে সে ববেব কোলে বা কাঁধে চড়ে স্থানান্তরে যায়। ক্ষৌবকর্মেব সময় বব একবাব আঙিনায় বেরিয়ে এলে ফেব ঘরে ঢোকার নিয়ম নেই। এটা যে যুদ্ধযাত্রার স্মৃতি-অবশেষ, তার ইঙ্গিত বিভিন্ন গানেব মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এ যুদ্ধযাত্রা অতীতের নারীহবণেব সঙ্গেই তুলনীয়। স্বভাবতঃই ববেব মা এবং নিকটাত্মীয়াদেব আচবণে এই আনন্দের দিনেও এক আশ্চর্য চিত্তবেদনাব প্রকাশ লক্ষ্য কবা যায়।

এবপর গ্রামের একটি প্রাচীন আমগাছেব তলায 'আমবেহা' অনুষ্ঠিত হয়। এটিও একটি মেয়েলি আচাব। বব আমগাছটিকে দু'হাত মেলে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে। তার আঙুলসহ গাছটিকে বহনোই নতুন সুতো দিয়ে সাতবার বেড় দেয়। এই 'সাত বেড' সুতো দিয়ে আমগাছের পাতা পেড়ে বরেব ডান হাতে বহনোই 'কাঁকন' (<কঙ্কন) বেঁধে দেয়। এই সময় গান গাওয়া হয়—

১১. আম গাছে আম বকুল ঝবরলি, তাব তলে সাধের বালা গ ॥

আমবেহা একমাত্র 'ফলন্ত' আমগাছের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি বৃক্ষপূজা-সম্পর্কিত হতে পারে। শুভযাত্রায় বেরোবার আগে এই সুপ্রাচীন আম্রবৃক্ষকে বিবাহ করে তাকে আলিঙ্গন করে দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। সাত পাক বাঁধনে বেঁধে গাছটিকে তার আয়ু তার নিরাপত্তাব রক্ষাকর্তা

হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং আশিস চিহ্ন হিসাবে আম্রপল্লবের 'কাঁকন'টি বাঁধা হয়। দ্বিতীয়তঃ, আম্রপল্লব কল্যাণ এবং মঙ্গলময়তার প্রতীক, তাই প্রাক্‌বিবাহ অনুষ্ঠান। তৃতীয়তঃ, আম্রবৃক্ষে প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে। প্রজননক্ষমতা, সন্তানপ্রাপ্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও এই আচার পালন করা হতে পারে।

আমগাছের তলাতেই একটি অদ্ভুত স্ত্রী-আচার দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'আম্‌ল খাওযা'। 'আম্‌ল' শব্দটি 'আমলকী' কিংবা 'আম্‌লোর' কোন্ শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিত বলা দুরূহ। কচি আম পাতা পেড়ে তার বোঁটা অংশগুলো বরকে চিবোতে দেওয়া হয়। তার মুখের সেই অম্লরস হাত পেতে প্রথমে মা, তারপর মাসী-পিসি জ্যেঠি-কাকীরা মুখে দেন এবং বরের মুখে সরাসরি চুম্বন করেন অথবা কখনো কখনো বরের ঠোঁটে হাত ছুঁইয়ে সেই হাত নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ান। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচার, এর জন্য যাঁরা 'আম্‌ল' খান, তাঁদের উপবাস করে থাকতে হয়। বিনিময়ে তাঁরা অবশ্য শাড়ি-কাপড় পেয়ে থাকেন। অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট আবেগ-ধর্মী। মা-মাসিদের চোখে জল পর্যন্ত দেখা যায়, অন্তর্নিহিত চিত্তবেদনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়। এই সময়ের গান—

১২.বরের মা রাজার ঝি আম্‌ল খাইছে, কন্যার মা হাড়ির ঝি নিচিন্তে ঘুমাছে
কে আম্‌ল খায় বলি কে আম্‌ল খায়, যে বরের সদর মাসি সেই আম্‌ল খায়॥

'আম্‌ল' খাওয়ার পর মা ছেলেকে কোলে নিয়ে তিনবার জিজ্ঞেস করেন, 'কুথায় যাছিস বাপ?' উত্তরে ছেলেকে বলতে হয়, 'কামিন আ'নতে যাছি।' তারপর মা ছেলের গায়ে 'পাল্লা' উত্তরীয় তুলে দেন তার এক কোণে সর্ব অশুভনাশন মন্ত্রপূত সরষে বাঁধা থাকে। এইসব লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে কল্যাণ আয়ু এবং অশুভনাশ কামনা করা হয়ে থাকে। চিত্তবৈকল্য দেখা দিলেও এই সময়ের গানগুলো আনন্দবেদনার সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

১৩. 'লোকলস্কর লিয়েঁ বালা কুথাকে সাজিলে, দিয়েঁ রাথ দুধেকেরি ধার।'
'এখন নাই দিব মা দুধেকেরি ধার, গঙ্গা যায়েঁ দিব এক ধার।'
'কুথাকে সাজিলে বালা লোকলস্কর লিয়েঁ?'
'রানী আগ্‌সার করেছে মা গ দেখিবার তরে।'
'যাই লিবি তাই দিব বালা, কি লিবি রে বল?'
'মাথায় বাঁধা সুরু চাদর মুখে পানের খিলি॥'

পুত্র 'রানী' আনতে যাচ্ছে জেনে মা তাকে রণসজ্জায় সজ্জিত করে উৎসাহিত করে বলেন—

১৪. রাম-ঝাড়ের বাঁশ গ বালা সীতা-ঝাড়ের শর
বালা চল্যো যা ন রানী দরশন।
এক কাঁড় বিঁধিবি বালা আদাড়ে বাদাড়ে
দশ কাঁড় বিঁধিবি বালা রানীর বাসঘরে॥

(এখানে রাম-সীতার প্রসঙ্গ লক্ষণীয়।) মা পুত্রকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে বীরত্বপ্রকাশের রীতি-নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছেন এবং বিয়ে করে রানীকে নিয়ে আসবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন—

১৫ 'উঁচ উঁচ পিঁঢা, বালা, গহীর গহীর খুঁটা, তার তলে ভমরার বাঁসা।
যাও, বালা, যাও গ বিভা ক'রতে যাও
বিভা ক'রবে ফুলকুমারী কন্যা গ, বিভা ক'রবে ফুলসুন্দরী কন্যা॥'

মা গামছায় টাকা বেঁধে ছেলের হাতে তুলে দিয়ে সংশয়ে নিরুৎসাহ পুত্রকে ভরসা দিচ্ছেন—

১৬ 'কে জানে মা গ কে জানে বাবা গ, পরের ঝিকে দিবেক ন নাই দিবেক ?'
'গামছার টাকা বালা বিঁচিয়েঁ দিবে, পরের ঝিকে কেনে নাই দিবেক॥'

তাতেও পুত্রকে নিরুৎসাহ দেখে মা নানান উপহার সামগ্রী দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন—

১৭ অই কালা মেঘে অই কালা মেঘে, বালা রে, শেঁয়াল বরন বসে।
ধব ধব ছাতা দিব বালা গ রানীর মহল যাতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দিব বালা গ রানীর মহল যাতে,
কদমফুল্যা মিঠাই দিব বালা গ শালাকে ভুলাতে॥

পুত্র সম্মত হলে রানীকে নিয়ে আসবার জন্য এবার যাত্রার আয়োজন চলে—

১৮ লক্ষ লক্ষ হাতি সাজে লক্ষ লক্ষ ঘড়া সাজে,
রাজা মিথি সেন সাজে মথুরা গ, যাও ন গ রানীর মহলে॥

ক্রমশঃ অপস্রিয়মান বর-বরযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে মায়ের বুক দীর্ঘশ্বাসে ভরে ওঠে—

১৯ ই পথে দেখ্যেছ যাতে ই পথে দেখ্যেছ যাতে গাটি ত হল'দ বরন,
ই পথে দেখ্যেছ যাতে হাতে রে কাঁকন আছে,
ই পথে দেখ্যেছ যাতে কপালে তিলকের ফঁটা॥

বরের ক্ষেত্রে যে সব আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়, কন্যার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। সমধর্মী আচারমূলক গানগুলোও প্রায়শঃ এক। শুধুমাত্র 'বালা'র স্থানে 'ধনি' কিংবা 'কন্যা' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্যগোচর হয়। আভড়া খাওয়া, নাপিতের নখ কাটা, স্নান এবং নূতন বস্ত্রসজ্জা সমস্তই একই ধরনে অনুষ্ঠিত হয়। কনের হাতে কাজললতা যথারীতি থাকে, কিন্তু মাথায় 'মোড়' বা উষ্ণীষ তুলে দেওয়া হয় না। ওটা 'বানী' হবার পর বরপক্ষ থেকেই দেওয়া হয়।

একটি ক্ষেত্রে মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কনের আচার অনুষ্ঠানে 'আম বেহা' নেই, পরিবর্তে 'মহুল বেহা' প্রচলিত। বয়োজ্যেষ্ঠা আত্মীয়ারা কনেকে কোলে তুলে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রাচীন মহুয়া গাছের তলায় নিয়ে যায়। আম গাছের সঙ্গে বরকে যেসব আচার পালন করতে হয়, কনেকেও মহুয়া গাছের সঙ্গে সেই সব আচার পালন করতে হয়। এখানেও তার বহনোই তার বাম হাতে মহুয়া পাতার কাঁকন বেঁধে দেয়। এখানে বহনোইকে তামাসা করে গাওয়া হয়—

২০ বহনোইকে বল্যেছিলি মহুলতল ঝাট্যাতে,
আমাদের সাধের ধনি জবুথায় ডাঁঢাল্য।
হাতের কাঁকন বাঁধি দিহ যত্ন কর্যে, বহনোই মিনতি করি ॥

কনের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়—

২১ মহুলতলে মহুল থঁচে ঝরবলি,
ছিলে ধনি মায়ের ভারি, ছিলে ধনি বাপের ভারি গ ॥

'মহুল বেহা' সম্পর্কে আম বেহার মতোই কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানেও একটি ফলপ্রসূ প্রাচীন মহুয়াবৃক্ষকে নির্বাচিত করা হয়। (অভাবে আম বা মহুয়ার চারা গাছেও কাজ চালানো হয়।) দীর্ঘ জীবন এবং আয়ু, প্রজননক্ষমতা এবং সন্তানপ্রাপ্তি আদি কামনায় যে এই বৃক্ষবন্দনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। আম এবং মহুল দু'টি গাছই বহুপ্রসূ। দু'টি গাছ পৃথকভাবে নির্বাচিত করার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে আম গাছটি পুরুষ এবং পুরুষ যৌনাঙ্গের প্রতীক, এবং মহুয়া গাছটি নারী এবং নারী যৌনাঙ্গের প্রতীক দু'টি বৃক্ষের ফুলফলের ধারাটি লক্ষ্য করলেই এই কথাটি স্বাভাবিকভাবে মনে আসে। তা ছাড়া আম্র এবং মহুয়া বৃক্ষের বল্কলরসও এ-ব্যাপারে বিচার্যবস্তু। ঝাড়খণ্ডে শিশুসন্তানের মৃত্যু হলে তাকে মহুয়া বৃক্ষের তলায়

পুঁতে ফেলা হয়। কারণ, মহুয়ার বল্কলরস এবং পত্রবৃন্তের রস দেখতে মাতৃ-দুগ্ধের মতো; মাতৃস্তন্যের অভাবে শিশু মহুয়ার দুধ খেতে পাবে, এটাই লোক-বিশ্বাস। ঝাড়খণ্ডের লোককথাতেও এই বিশ্বাসটির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

মহুয়াতলায় কনের 'আম্‌ল' খাওয়ার রীতি আছে। কনে মহুয়াপাতার বোঁটা চিবিয়ে তার রসটা মা-মাসি-পিসিদের হাতের তেলোয় দেয়। বর্তমানে এরীতির বদলে মিষ্টান্নের ব্যবহারের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। পুত্রকন্যার কল্যাণ কামনায় অশুভনাশের জন্য যে এই অনুষ্ঠান তাতে সন্দেহ নেই। এর পশ্চাতে কোন লৌকিক জাদুক্রিয়া থাকাও অসম্ভব নয়। অবশ্য প্রাচীনপ্রাচীনাদের কাছ থেকেও এর রহস্য কিংবা মর্মকথা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি, হতে পারে এ-অনুষ্ঠানে মাতৃঋণ বা 'দুধেকেরি ধার' শোধ করা হয়।

অবশেষে লোকলস্কর নিয়ে বর কনের গায়ের কাছাকাছি এসে পৌছলে কনে যেন বাজনার শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে—

২২ 'ডুঁগুরি কা ধারে ধারে কিসের বাজন বাজে?'
'অই দিগের লে আ'সছে ধনি তরি শিরের লক।'
'আমাকে লুকা ন বাবা মহল ভিতরে, তুমি যে থাকিবে বাবা সদর দুয়ারে।'
'কি করো লুকাব মা মহল ভিতরে, দেশমজলিসের পাশে জবাব করেছি॥

কন্যাদানে অঙ্গীকারবদ্ধ পিতার কাছে ভরসা না পেয়ে কনে এবার দাদার শরণাপন্ন হয়—

২৩ ঝাঁটিয়া কাটিকুটি পালহার বেড়ন রে, রাখি দে ন খিড়কি দুয়ার।
খিড়কি দুয়ারে ভাইরে চোর সামাছে, এক বহিন যাছে তর চুরি,
ভাইরে ফুলসুন্দরী বহিন যাছে চুরি॥

সবারই নিরুপায় অবস্থা। ইত্যবসরে বর তার 'লকলস্কর' নিয়ে গ্রামের প্রবেশ মুখে পৌছে যায়। গ্রামের লোকেদের সাথে অতীতে বরপক্ষের লোকেদের গানে-গানে বাদপ্রতিবাদ চলত শোনা যায়। দুর্ভাগ্যবশত: সে সব গান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে এই যে বাদপ্রতিবাদ তা যুদ্ধেরই প্রতীক। বর্তমানেও গ্রামের লোকেরা বরের পতিরোধ করে থাকে; তারপর কিছু পাওনা-গণ্ডা আদায় করে পথ দেখিয়ে কন্যাগৃহে নিয়ে আসে অর্থাৎ যুদ্ধের পর মৈত্রীর মতোই ব্যাপারটা দাঁড়ায়।

বর এসে কন্যাগৃহের দরজায় দাঁড়ায়। কন্যাকর্তা 'গুয়াচন্দন' করে 'বর-বরণ' করেন। এখানেও যুদ্ধের প্রতীক খুঁজে পাওয়া যায়। দু'টি সবৃন্ত আম্র-

পল্লব তিনবার অদলবদল করা হয় এবং শেষে দু'টিই বরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সবৃন্ত আম্রপল্লব দু'টি সুস্পষ্টভাবে অস্ত্রের প্রতীক। বরের হাতে নিজের আম্রপল্লবটি তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কন্যাকর্তার আত্মসমর্পনের ছবিটিই ফুটে ওঠে। এখানেও আবাহন আদির মাধ্যমে মৈত্রীর রূপটি ফুটে ওঠে। ততোক্ষণে বরপক্ষের প্রতি পুরনারীদের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়।

২৪ বরের ভাই-এব এলেং ঝেলেং তেলেং ধুতি, বিরালে মারিল লাথি ॥
পিঁড়্রা শলের কুল্হি আড়ায় সন্‌লা ফুল ফুটোছে,
আমরা বলি ববের ভাই ফুলছড়ি সাজাছে ॥

২৫ পায়বার লাগ্যে ফাঁস আড়্যেছি গ, লাগ্যে গেল বরের সদর বাপ।
ববেব বাপ বল্যে চিনিতে না পারি গ, মার‍্যে দিলি থাঁড়িয়া ফাবড় ॥

ববকে 'ছামড়া (<ছায়ামণ্ডপ) তলে' আনা হলে বর দেখবার জন্য পুরনারীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। বরকে গালাগালি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে গাওয়া হয—

২৬ কিসেব এত দেরি বর কিসের এত দেরি,
আম জাম ডাল দিলি ছাঁহিরা হবেক বলি।
ধাবে পাশে গাছ নাই মহকে আসে বাস,
কুথায় পালি বে বর কিয়া ফুলের বাস ॥

বিবাহ আনন্দের অনুষ্ঠান, স্বভাবতঃই ব্যঙ্গবিদ্রূপ, অপমানকর বাক্যবাণ নিতান্তই বেমানান মনে হতে পারে। তবে বরপক্ষের অভিযানকে নারীহরণ-ঘটিত যুদ্ধ যাত্রার স্মৃতি-অবশেষ ধবে নিলে মোটেই অসংগত মনে হবে না। বিজয়ী বরপক্ষের বাক্যবাণ প্রয়োগের প্রয়োজন থাকে না, অন্যপক্ষে পরাজিত অসহায় বাকসর্বস্ব কন্যাপক্ষের শাণিত বিদ্রূপই শেষ অস্ত্র।

'রানী দরশন'-এর আগে বরকে বোনের শেষ প্রহরী শ্যালকের সম্মুখীন হতে হয়। বর টোপর-মাথায় এবং শ্যালক পাগড়ি-মাথায় নিজের নিজের ভগ্নিপতির কাঁধে চড়ে সবৃন্ত আম্রপল্লব তিনবার অদলবদল করে এবং শেষে শ্যালক নিজের পল্লবটি বরের হাতে তুলে দেয়। টোপর এবং পাগড়ি নিঃসন্দেহে শিরস্ত্রাণের প্রতীক এবং আম্রপল্লব বরের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ যুদ্ধান্তে শ্যালকের পরাজয় স্বীকার। একে অন্যকে মিষ্টান্ন এবং পানের খিলি খাইয়ে দিয়ে মৈত্রী স্থাপন করে; এছাড়াও বর শ্যালককে একটি ধুতি দিয়ে থাকে—তাই এই অনুষ্ঠানের নাম 'শালা ধুতি লুটা'।

এবার কনেকে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। শেষবারের মতো সে যেন বাবা, দাদার কাছে মিনতি করে—

২৭ ই পিঁঢা সে পিঁঢা চালে ছুয়াল্য গ, ধনিব বাবা পাটপণ্ডিত।
বাবাব কলে বসৌ্য করিছে বিনতি গ, দেখ বাবা না দিহ যে দান।। ইত্যাদি

এই বেদনাময় বিষণ্ণ মুহূর্তে পুরনারীদের কণ্ঠে করুণসুরে গান বেজে ওঠে। সবার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। যেখানকার যা সব আছে, ধনসম্পত্তি কিছুই এদিক ওদিক হয় নি. শুধু সাধের কন্যা চুরি যাচ্ছে, পর হয়ে যাচ্ছে এ যে এক মর্মান্তিক অনুভূতি, এদুঃখের যে কোন সান্ত্বনা নেই—

২৮ আঁচিরে পাঁচিরে ঘর তায় সামাল্য চর,
ধনদরিব সক'ল আছে, আমার ধনি চুবি যাছে, আম্‌দেব ধনি চুরি যাছে।
আঁচিরে পাঁচিবে ধর তায় সামাল্য চর
ঘটিবাটি সক'ল আছে, আমাব ধনি চুরি যাছে, আমদেব ধনি চুবি যাছে।
এত বড বাথ'লে ধনি নাই আঁটিল, শাগবাইগনেব মতন ধনিকে বিকিল।।

বরকনে মুখোমুখি হয়ে দু'জনের মাঝখানে ঝোলানো পর্দার তলা দিয়ে দু'টি সবৃন্ত আম্রপল্লব তিনবাব বিনিময় করবাব পর পাতা দু'টি বরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আমাদের মনে হয়, এটিও অতীতেব যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। সেদিন স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে অস্ত্রপবিচালনা করে আত্মবক্ষার শিক্ষা নিত। কন্যা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে বরের কাছে আত্মসমর্পণ করবার পর মাঝখানের পর্দাটা ধীরে ধীরে উঠে যায়, বরকনেব শুভদৃষ্টি হয়। তারপব উপস্থিত আত্মীয় স্বজনের মাঝে বরকনে মালাবদল করে। পুবনারীদের কণ্ঠে তখন আবার গান শোনা যায়—

২৯ কচা বাড়ির ভিতরে গুলা'চ্ ফুলেব গাছ,
ডাল ভাঙি ফুল'তুলে বিদেশী ভমরা।
সেফুলের হাব গাথ্যে দিল ধনিব গলে,
ফুলের মালা গলে দিয়ে গিবহজ্বালা দিলে।
নাই লিব ফুলের মালা নাই লিব জ্বালা,
গিবৃহজ্বালা বডজ্বালা নয়নে বহে ধারা।।

তারপরই বর কনের সারা সিঁথি রাঙা করে দিয়ে সিঁদুর লেপে দেয়। যে-কনে বাবার কাছে তাকে লুকিয়ে রাখবার আবেদন করেছিল, যে তাকে দান না করবার জন্য 'বিনতি' করেছিল, তার মধ্যে পরিবর্তন আসে।

৩০ বাবার বাড়ি-এ লতার জনম গ, তরুলতায় হয়েছে মিলন।
পুববে করেছি সত্য সঁগে রইবার তরে গ, পরাণ গেলে হব ছাড়াছাড়ি।
আঁগার পাঁউশে রহিব জড়ায়ে গ, কুথা যাবে আমারে ছাড়িয়ে ॥

ববাগমনের পর যে বিদ্বেষেব ভাব দেখা যায়, বিয়ের পর আর তা থাকে না। সবাই তখন বরকনে দেখবার জন্য ভিড করে।

৩১ তেঁতলী পাতে ধান ঘাঁটিলম হেলকি হেলকি পড়ে ডাল,
লহকি লহকি পডে ডাল।
ছামডাতলে বাজকুঁয়ব জামাই গ, ছামডাতলে বাজকুঁয়বী কন্যা গ,
হেব্যে হেব্যে প্রাণ গ জুড়ায়, হেব্যে হেব্যে মন গ জুডায় ॥

বাত্রি ভোব হতে না হতেই বিজযী যুদ্ধযাত্রীবা বন্দিনী বাজকন্যাকে নিয়ে ঘবে ফেবার উদ্যোগ কবে।

৩২ 'খুকুডা ডাকি গেল নিশি পুহাল্য গ, উঠ কন্যা পথ বডী ধুর।'
'কেমনে উঠিব পবভু কেমনে বসিব গ, আঁচলেতে সহদব ভাই।'
'খুকুডা ডাকি গেল নিশি পুহাল্য গ, উঠ কন্যা পথ বডী ধুব।'
'ব'স্য ন ব'স্য পরভু তিলেক পলম গ, বাবাকে মোব বধ দিয়ে বাখি।'
'খুকুডা ডাকি গেল নিশি পুহাল্য গ, উঠ কন্যা পথ বডী ধুর।'
'ব'স্য ন ব'স্য পবভু তিলেক পলম গ, মাকে মোর বধ দিয়ে রাখি ॥

এই গানটি থেকে সহজেই কনের যন্ত্রণা-বিক্ষুব্ধ মনের খবর পাওয়া যায়। আজন্ম-পবিচিত এই সংসাব ছেড়ে তাকে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে। সহোদর ভাই বাবা মা সবাই একসাথে তার মনের দোর আটকে যেন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রবোধ দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে তবে তো সে অজানা অচেনা দেশে যাত্রা করবে। তাই মেয়ে মা-বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তার কণ্ঠস্বরে বেশ খানিকটা অভিমানের আভাস পাওয়া যায়—

৩৩ চা'র কুনে চা'র খড ভাবি, ছিলি এদ্দিন বাবার ভারি গ।
এবার বাবা ঘুমাবে নিশ্চিন্তে ঘরে, আমি যাছি শশুরালি গ ॥ ইত্যাদি

মা সোচ্চার কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে কিছু সাংসারিক উপদেশ দেন—

৩৪ রাঙাচাঙা টুপাডালা রইল ধনির শিঁকায় তুলা গ,
আঁধার ঘরে রাঁধিবি মাঝ্যাঘরে বাঁটিবি গ।

দুখ সুখ হলে ধনি কহিয়ে পাঠাবি গ,

বাবা যাবেন দেখিতে খুড়া যাবেন আনিতে জেঠা যাবেন বুঝাইতে গ ॥

মা মেয়েকে কাছেই শ্বশুরবাড়ি বলে সান্ত্বনা দেন আর নানান উপহারে ভোলাবার চেষ্টা করেন—

৩৫ ই পারে হাঁস ঘুরে সে পারে পায়রা ঘুরে মধ্যে ত বরের বাপের ঘর।

ছ মাসের তেল দিব ছ মাসের হল'দ দিব আর দিব পদ্মফুল্যা শাড়ি ॥

এবারে কনে তার ভাইদের কাছে বিদায় নেয়—

৩৬ 'এক মায়ের এক বাপের ভাই অ বহিন, সবরি সবরি দুধ খায়।

তুমি যে যাবে ভাই রাজার দরবার রে, আমি ভাই যাছি পরের ঘর।

পরের ঘরে ভাই গাঞ্জনায় গাঁজিবে রে, আঁচলে ঢরকি পড়ে লব।'

'আমি নাহি লেখি বহিন বিধাতায় লিখেঁছে রে, বিধাতায় লিখেঁছে পরের ঘর

পরের ঘরে বহিন সংসার চালাবে রে, রাখি দিবে বাপভাই-এর নাম ॥'

এই বিদায় মুহূর্তটিতেই তাই অপ্রত্যাশিত হারানোর বেদনা জনকজননীকে আকস্মিকভাবে বিহ্বল করে তোলে। মেয়ের থাকা-খাওয়া ভালোমন্দের কথা ভেবে তাঁরা স্বস্তি পান না। চোখের জল তো সমুদ্রের মতোই উত্তাল। 'বেহাই'কে তাই তাঁরা মেয়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে কাতর মিনতি জানান—

৩৭ মোর ঘরে মোর ধনি সকাল হলে খাতে খুজে

সাঁজ হলে শুতে খুজে, বেহাই বিনতি করি।

মোর ঘরে সকাল হলে ছড়াঝাঁটি, সাঁজ হলে স'নঝ্যা বাতি,

বেহাই বিনতি করি, মোর ঘরে সকাল হলে টুপায় মুঢ়ি ॥

মেয়ে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে দূরে, আরো দূরে। মা এক বিশাল শূন্যতা-বোধ নিয়ে শুধুই নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন। তিনি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। সারা মন জুড়ে কবে কোন্ দিন মেয়ের ওপর খারাপ ব্যবহার করেছিলেন, তার কথা মনে পড়ছে। মেয়ের সেই অভিমান-ক্ষুব্ধ কথা তাঁকে তীব্র অসহ্য কষ্ট দিচ্ছে: 'এবার মা ঘুমাবে নিশ্চিন্তে ঘরে, আমি যাছি শশুরালি গ।' কিন্তু সেই 'শশুরালি'তে মেয়ে কি ভাবে দিন কাটাবে, তা ভাবতে গিয়ে বুক ফেটে যাচ্ছে।

৩৮ জ'ড় পাতটি লড়েচড়ে মায়ের মন কেমন করে,

এবে মা গ কাতর হলে, কাতর হয়েঁ দিলে পরের ঘরে।
জ'ড় পাতটি লড়ে চড়ে মায়ের মনে পড়ে,
কেমনে রহিবে শ্বশুর ঘরে মা গ কেমনে রহিবে শ্বশুর ঘরে॥

মা যেন শোকে কাতর হয়ে পাষাণ হয়ে যান; তাঁর চোখে আর জল নেই, অথচ এ শোক ভোলবার জন্য কান্নার প্রয়োজন। তাই পুরনারীরা তাঁকে কাঁদাবার চেষ্টা করে—

৩৯ মেঘ আঁধার রাতি হাতে কাজল বাতি
কন্যার মা-এর কঠিন পাষাণ হিয়া, নয়নে নাই বহে ধারা গ॥

ওদিকে বর তার 'রানী'কে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তার মা বরকনেকে সাদরে বরণ করবার জন্য এগিয়ে আসেন—

৪০ 'শ্বশুরাল গেলে বালা কি কি পাওন পালে রে?'
'হাতিশালে হাতি পালাম ঘড়াশালে ঘড়া, আর পাল্যাম মেজুরের ঝুঁটি॥

বধূর সঙ্গে কয়েকজন 'লগদিন' থাকে। সম্ভবতঃ অতীতে বধূর সঙ্গে তার প্রিয় সখি অথবা দাসীচাকরানী পাঠাবার একটি রীতি ছিল। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য মেয়ের সঙ্গে ঝি-চাকরানী দেবার ক্ষমতা অনেকেরই থাকে না। বর্তমানে রীতিটি লুপ্ত হয়ে গেলেও প্রতীকগতভাবে বধূর সঙ্গে ঠাকুমা, দিদিমাদের 'লগদিন' হিসাবে পাঠানো হয়ে থাকে। ঠাকুমা-দিদিমারা তাই বরকে রসিকতা করে প্রশ্ন করে, এতগুলো রমণীর কোনটি তার 'কামিনী' অর্থাৎ বধূ।

৪১ 'তিনটি যে লক রে ধন কনটি কামিনী?'
'বাঁ দিগে ডাঁটাই আছে সেই ত কামিনী।'
'ই ত সম্পত্তি লিতে আল্য ধনদরির গাতে আল্য বিষয় উড়াতে আল্য।
তিনটি যে লক ধন কন রে কামিনী?'
'যার সীঁতে সিঁদুর আছে সেই ত কামিনী বটে,
যার পায়ে আলতা আছে সেই ত কামিনী বটে॥'

বরের মায়ের মন কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল। বধূর বাবামার বেদনার কথা তিনি নিজেও অনুভব করতে পারছেন। তাই ছেলে শ্বশুর-শাশুড়ীকে কিভাবে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে, তা একে একে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন—

৪২ 'তরি যে শুনি বালা সাত শ্বশুর রে, সাত শ্বশুরকে কি দিয়েঁ বধালি?'
'সাত শ্বশুরকে সাত শালা কলে দিলি, আহ্লাদিনীকে নিয়েঁ আলি।'

'তরি যে শুনি বালা সাত শাশুড়ী রে, সাত শাশুড়ীকে কিবা বদল দিলি ?'
'সাত শাশুড়ীকে সাত ঘরে বাতি দিলি, আল্লাদিনীকে নিয়েঁ আলি।'
'বালা রে আল্লাদিনীর দিদি আছে, দিদিকে কি দিয়েঁ বধালি ?'
'কাড়া মেলায় কাড়া-পাঘায় বাঁধিলি, আল্লাদিনীকে নিয়েঁ আলি।
কাড়া-পাঘা ছিটাঁই করি পেছু পেছু দৌড়্যে আল্য
আস্তে মা মাঝ্যাঘরে ডাঁড়াল্য,
মা গ মাঝ্যাঘরে খাতে দিবি আঁধার ঘরে শুতে দিবি
ই ত বটে দুদিনের কুটুম ॥'

'দিদি' অর্থে 'ঠাকুরদিদি, মামাদিদি' বা ঠাকুমা-দিদিমার প্রসঙ্গই এখানে রয়েছে। স্বভাবতঃই বর তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটু চটুল রসিকতাপূর্ণ জবাব দিয়েছে।

বরের মা বরবধূকে বরণ করে 'ছামডাতলে' তোলেন। বর-বধূ দেখে পুরনারীরা গেয়ে ওঠে—

৪৩ আঁকদুয়ারের পিঁপ'ল গাছ করে লহলহ গ / লহসি লহসি মেলে ডাল।
ছামড়ার তলে রাজপুত্র-কন্যা গ,
হের্যে হের্যে মন গ জুড়ায়, হের্যে হের্যে প্রাণ গ জুড়ায় ॥

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামে। এবার শোবার প্রশ্ন: 'বালা' যেন 'ফুলের বিছনা'র জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। সেই নিরিবিলি নির্জনতা, যেখানে থাকবে শুধু সে আর তার রানী।

৪৪ দুয়ারের ছামডা রুনুরে ঝুনু, মাঝ্যাঘরে বোল ফুলের বিছনা গ,
সেহ দেখ্যেঁ সাধেব বালা খুজে বিছনা গ।
দিব যে দিব বালা ফুলের বিছনা গ, কেনে বালার আকুল জীবন ॥

এবং তারপরই শুরু হয় দাম্পত্যজীবন।

॥ দুই ॥

রুমুজ গান

দেবতা ডাকানো মন্ত্রকে ঝাড়খণ্ডে, বিশেষভাবে ধলভূমে' রুমুজ গান বলা হয়। পটমদা আদি এলাকায় এই গানকে 'ভাউ' বলা হয়। রুমুজ গান

'ঝুঁপাব' নামক একটি অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে। মন্ত্র শেখাবার জন্য ওঝারা তেরোই জ্যৈষ্ঠ থেকে 'চেলা বসায়' বা শিষ্য নিয়োগ করে। এই আখড়ায় শুধু যে তুকতাক ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রই শিক্ষা দেওয়া হয়, তা নয়। 'ঝুঁপাব' এই আখড়াব অন্যতম আকর্ষণ। ঝুঁপার হচ্ছে কোন দেবতাব কোন মিডিয়ামের শবীবে ভব কবাব বাপার। বোগ শোক দুর্ভিক্ষ বৃষ্টি চুরি বাহাজানি সর্বক্ষেত্রেই এব প্রয়োগ লক্ষ্য কবা যায়। মিডিয়ামের মারফৎ জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলোব উত্তব পাওয়া যায়। সব সময় যে তা সত্যি হয়, তা'ও না। জবাবগুলো বেশিব ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। কিন্তু তা সত্বেও ঝাড়খণ্ডী আদিম মানুষ ঝুঁপারেব 'দৈববাণী'তে অত্যন্ত আস্থাশীল। আমাদেব মনে হয়, এব পেছনে আদিম মানুষের সেই চিন্তাটি কাজ কবছে যে, দেবতা মানুষেব শবীরে ভব কবেন এবং তাকে দিয়ে তাঁর উদ্দিষ্ট কাজ কবিয়ে নন। ঝাড়খণ্ডী জনতা বিশ্বাস কবে, দেবতাকে আকুলভাবে আহ্বান জানালে তাঁরা না এসে পারেন না এবং যখন আসেন তখন কোন ভক্তেব শরীবে আশ্রয় গ্রহণ কবেই নিজেব স্বরূপ প্রকাশ কবেন। তাই এবা নিজেদিগকে দেবতার বাহন বা ঘাড়া হিসাবে কল্পনা কবে থাকে। দেবতা আগুন খেতে পারেন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মিশ্রিত ছাই গায়ে মাখতে পারেন, শিমুল কণ্টকেব ওপর বসতে পাবেন, শাঁখা পবেন, তাই এবাও ঝুঁপারেব সময় নিজেবা দেবতা সেজে এইসব অনুষ্ঠান পালন কবে এবং শাঁখার বদলে সাবুই ঘাস দিয়ে পাকানো 'কড়্‌রা'র (শক্ত দড়ি) আঘাতেব জন্য হাত এবং পা এগিয়ে দেয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠান রিচুয়ালস ছাড়া কিছু নয়: দেবতাদেব কর্মকাণ্ডের বিশ্বস্ত অনুকবণমাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা মনসা প্রথম আবির্ভূতা হন, তাবপর আঞ্চলিক এবং আদিম লৌকিক দেবতাবা।

অবশ্য প্রত্যেকদিন ঝুঁপাবেব অনুষ্ঠান হয় না। বোহিনের দিন আখড়াব প্রথম পূজার দিন থেকে শুরু কবে সাধারণতঃ সাপ্তাহিক পূজাব দিন মঙ্গলবারে ঝুঁপার হয়। এছাড়া বিশেষ কারণে, যেমন কোন পরিবারে কোন অকল্যাণ দেখা দিলে, চুরি হলে, দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে, ঝুঁপাবের আয়োজন কবা হয়। দেবতার মুখ থেকে ভালোমন্দ খবরাখবব জানবাব জন্য তাঁদের আখড়ায় আসবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। দেবতা ওঝা কিংবা কোন চেলাকে আশ্রয় কবে আবির্ভূত হতে পাবেন। একে বলা হয় 'ভরন'। অন্য কারো শবীরে 'ভবন' আনতে হলে দেবতাব ভব-নামা লোকটিব সামনে

তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়, তার স্পর্শ লাগলেই 'ভরন' সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তবে দেবতাকে নামাবো বললেই হয় না, অনেক তুকতাক সাধ্যি-সাধনা করতে হয়। উবু হয়ে বসে এক পা তুলে রাখা, শিলের ওপর বসা, একগাছি লাঠি ধরে খুবই আলতোভাবে বসে-থাকা—'ভরনের' এগুলো কয়েকটি পদ্ধতি মাত্র। রুমুজ গান সম্মিলিত কণ্ঠের গান ; দেবতার ভরের প্রতীক্ষায় আখড়ার সামনে বসে-থাকা চেলারা রুমুজ গান গেয়ে দেবতাকে নেমে আসবার জন্য আহ্বান জানায়। দেবতাকে নামানোর এই পদ্ধতিটি সারা ঝাড়খণ্ড জুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়। দেবতাব ভর হলে লোকটির মাথা প্রথমে দুলতে শুরু করে, তারপর সারাদেহ থরথর করে কাঁপতে আবম্ভ করে এবং লোকটি 'সোহা' (<সোহং ?) বলে চীৎকার করে মাটি কাঁপিয়ে হাত পা আছড়ে দাপাদাপি করতে থাকে।

দেবতা সহজে আখড়ায় আসেন না। অনেক সময় দীর্ঘকাল ধরে সমবেত রুমুজ গান করে দেবতাকে আহ্বান জানাতে হয়। রুমুজ গানেব একটি বিশিষ্ট সুর আছে, বিলম্বিত লয়ে টানা সুবে এই গান গাওয়া হয়। মন্ত্রেব মতো রুমুজ গান কবিত্ব-বর্জিত নয়। এর মধ্যে লোককবির কল্পনার ব্যাপ্তি, সৌন্দর্যবোধ এবং চিত্রকল্পসৃষ্টিব প্রয়াস কখনো কখনো দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণতঃ দেবতাদেব জাগাবাব গান দিয়েই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করা হয়। লোকবিশ্বাস এই যে, দেবতারা নিদ্রিত থাকেন, গান গেয়ে তাঁদেব ঘুম ভাঙাতে হয়। তাই রুমুজ গানে একের পর এক দেবতার নাম করে গান গেয়ে দেবতাদের জাগাতে হয়।

১ আখড়া জাগাওঁ পিঁঢ়া জাগাওঁ জাগাওঁ সবগের দেবতা।
আগে জাগাওঁ বাসুকী বস্‌মাতা পেছু জাগাওঁ চেলা ॥

দেবতাদের ঘুম ভাঙানোর গানে একের পব এক বিভিন্ন দেবতাব নাম আসতে থাকে : ধরম, গরাম, মনসা, সন্ন্যাসী, ভৈরব, হনুমান, বাঘুৎ, সাত বহনী আদি লৌকিক দেবতাদের একে একে ডাক পড়তে থাকে।

নিজেকে দেবতার ঘোড়া কল্পনা করে দেবতাকে তাঁর ঘোড়ার পিঠে চাপবার জন্য কাতর অনুনয় করা হয়।

নামিয়েঁ আইস গাঁয়ের গরাম দেবতা গ,
তুমার ঘড়া র'হল বাঁধা আঁগিনাতে গ ॥

শুধু ঘোড়া বেঁধে রেখে আবাহন জানালেই দেবতা আসেন না। তাঁর জন্য

প্রদীপ জ্বেলে আরতিও জানাতে হয়।

৩ সাঁজ দিলম স'ন্ঝ্যা দিলম সগ্‌গে দিলম বাতি।
গটাশিলা আ'সবেন বলি গুরু জ্বালিছেন বাতি ॥

তা সত্ত্বেও দেবতার আসন যদি না টলে, তাহলে একলব্যের মতো অঙ্গুলিচ্ছেদন করে দেবতার মনস্তুষ্টি করবার চেষ্টা করা করা হয়।

৪ কঁড়ি আঁগুল কাটিয়ে আ'জ ত সলিতা জ্বালিব গ,
অ গ গটাশিলা আ'সবেন বলি গ ॥

দেবতার জন্য ভোগাদ্রব্যেরও আয়োজন করতে হয়। তাই আতপ চাল আর কাঁচা দুধ সাজিয়ে গুরুশিষ্য মিলে কমুজ গান গেয়ে দেবতাকে আবাহন জানায়।

৫ আওয়া চা'ল আর কাঁচা দুধ কার নামে দিব।
যদি আসেন মা মনসা তাঁর নামে দিব ॥

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন: একই গান গেয়েই বিভিন্ন দেবতাকে আবাহন জানানো হয়, শুধু এক দেবতার নাম বদলে অন্য দেবতার নাম বসিয়ে দিলেই হল।

৬ টিলহাতে গরজে টিল্‌হার সাপ আগড়ায় গরজে গুরুগুসাঁই,
হাড় কাটি কাটি চাঁওরা ক'রলম রকত ক'রলম পানী ॥

ঝাড়খণ্ডের দেবতা মানেই তো বন-পাহাড়ের দেবতা। তাই ভক্তের ডাকে দেবতারা উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসবে এসে উপস্থিত হন।

৭ মেঘ বরষে বিজলী চমকে দেব্‌তাকে ভুলায় রে,
সাত শিম'ল পব্বতের উপর দেব্‌তা চলি আয় রে ॥

মেঘাচ্ছন্ন নিকষ অন্ধকারে বিদ্যুতের আলোকে পথ দেখে-দেখে দেবতা নেমে আসেন, এটি আদিম মানুষের নিতান্ত কল্পনা হলেও এর মধ্যে রবিত্ব এবং কিছুটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও মিলে আছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

৮ ঝিমির ঝিমির পানী বরষে ভিজি গেল'য় বাতি,
কন্‌ দেবতা নাচ লাগায় নিশাভর রাতি ॥

দেবতাদের নৃত্যানুষ্ঠান নিতান্ত ভাব-কল্পনা নয়। মানুষ তার নিজের আধারেই দেবতার কল্পনা করেছে। তাই দেবতারাও যে নাচেন, স্বাভাবিকভাবেই এই বিশ্বাসটি তাদের মধ্যে এসেছে। যাঁরা ঝুঁপার অনুষ্ঠান দেখেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন 'সাত বহনী' দেবতারা একসঙ্গে বৃত্তাকারে নৃত্য করেন, কণ্ঠে থাকে 'আম্‌লা মেথি চুয়াচন্দন ঘামে ভিজি গেল্‌' আদি গান এবং অন্য একজন

দেবাশ্রয়ী ব্যক্তিমাদল বাজাবার অভিনয় করে মুখে বাজনার তাল ধরে থাকে। এই সাত বোন দেবতা বন-পাহাড়ের দেবী। সাত বহনী ঝাড়খণ্ডের সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেবতা হিসাবে আরতি পেয়ে থাকেন। সাতটি বোন যেন ফুলের মতো। এই সাত বহনীকে সাতটি ফুলের ওপর নেচে নেচে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়—

৯ নদীর ধারে সুরগুঁজা ফুল ফুটে লালে লাল।
হিলতে আয়রে তুলতে আয় রে সাত বহিন সাত ফুলে আয়॥

এত করেও যদি দেবতার আবির্ভাব না ঘটে, তখন মনসার দোহাই পাড়া হয়, মনসার দোহাই দিলে দেবতা না এসে পারেন না।

১০ কাঁচ টুঁ'কতে কাঁসা বাজে, কন কন দেবতা খেলি খেলি আসে।
আয়রে দেব্‌তা, মনসার দোহাই॥

একবার একজন দেবতা এসে গেলেই হল, তারপর একে একে সবার গায়ে 'ভরন' আরম্ভ হয়, সব দেবতাই নিজের নিজের 'ঘোড়ায়' চড়ে আগড়ায় আসেন। তারপর কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদঃ গাঁয়ের শুভাশুভ, বৃষ্টি-বাদল সম্পর্কে পূর্বাভাস, চুরি-রাহাজানির হদিস দেবতাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তারপর যাঁর যা প্রিয় নৈবেদ্য তাঁকে তা দিলেই তিনি খুশিমনে বিদায় নিয়ে চলে যান। মা মনসা ধুপধুনো পেলেই খুশি (যদিও অন্যত্র মনসাপূজায় ধুপধুনো চলে না, ঝাড়খণ্ডে এটি অপরিহার্য উপকরণ), নরসিংবীর কড়বার আঘাত পেলে খুশি, সন্ন্যাসী দেবতার প্রয়োজন বসবার জন্য সকণ্টক শিমুল দণ্ড, বিভূতির জন্য আগুনের ফুলকি মেশানো ছাই, আর এক কলকে গাঁজা; বাঘুৎ দেবতার জন্য চাই কাঁচা রক্ত, একটি জ্যান্ত মুরগী যার ঘাড় ভেঙে বাঘুৎবীর তাজা গরম রক্ত খান। দেবতা বিদায় নিলেই ঝুঁপারের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

॥ তিন ॥

মন্ত্র গান

মন্ত্রকেও আমরা গান হিসাবে উল্লেখ করবার পক্ষপাতী। একটি বিশিষ্ট সুরে কখনো বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই, কখনো বা ঢাকী কিংবা ডম্বরুর তালে তালে,

মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়ে থাকে। তবে ঝাড়ফুঁক করবার সময় ঢাকীর ব্যবহার হয় না। এগুলোকে গান হিসাবে স্বীকার কর হোক বা না হোক এগুলো যে লোকসাহিত্যের উপকরণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এগুলোর যে তেমন কিছু সাহিত্য মূল্য নেই, তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। কাব্যরস কিংবা জীবন-রসের দর্শনলাভ মন্ত্রতন্ত্রে একেবারে বিরল বলা যেতে পারে। মন্ত্র ঝাড়ফুঁক হিসাবেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অসুখ বিসুখ, কু-নজর, মারণ-উচাটন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ থাকলেও সর্পদংশনের চিকিৎসার ক্ষেত্রেই এর মুখ্য প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

তেরোই জ্যৈষ্ঠ রোহিনের দিনে মনসার পূজা করে ঝাঁপবৈদ্য বা ওঝারা 'চেলা বসায়' বা শিষ্য নিয়োগ করে। প্রতি সন্ধ্যায় মন্ত্র শেখানো হয়, প্রতি মঙ্গলবার পূজা করা হয়। ওঝাদের ঝাড়গণেও 'গুণী' বলা হয়। এই গুণীদের ক্ষমতা অসীমিত বলে জন মানসে সম্ভ্রম এবং আতঙ্ক দুটোই তারা সৃষ্টি করে থাকে। গুণী উপযুক্ত শিষ্যকে মন্ত্রদান করে থাকে। শিষ্য তার গুরুর অনুমতি না পেলে ভবিষ্যতে গুরুগিরি করতে পারে না। গুরু শিষ্যদের প্রতি সন্ধ্যায় আখড়ায় তুলসীমঞ্চের সামনে উবু হয়ে বসে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র আদি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এইসব মন্ত্রের মধ্যে সর্পমন্ত্রের পরিমাণই সর্বাধিক। সর্পমন্ত্র ছাড়া ডাকিনী যোগিনী মন্ত্র, গা-বাঁধা, জ্বর ঝাড়া, কুনজর ঝাড়া, ধুলো পড়া, নুন পড়া, বাটি চালা, তেল দেখা, চালন কাটা আদি অসংখ্য ধরনের মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। এ-ছাড়াও নানান তুকতাক, ভোজবাজি, ওষুধপত্রও শেখানো হয়। ঝাড়ফুঁক করবার ধরন-ধারণ, রোগীর রোগনির্ণয় আদি টোটকাও শেখানো হয়।

মন্ত্রগুলো কখনো মনে হয় অর্থহীন প্রলাপ, কখনো মনে হয় নিছক পদ্যের পদ মাত্র। ছড়ার সঙ্গে মন্ত্রের, অন্ততঃ বহিরঙ্গে, যথেষ্ট মিল দেখা যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই মন্ত্রগুলো ছড়ার ছন্দে রচিত হয়েছে। ছড়ার মতোই মন্ত্রগুলো সংগতিহীন, চিত্রের পর চিত্র মন্ত্রকেও চিত্রময় করে তুলেছে। ছড়া শিশুদের জন্যই মূলতঃ রচিত কিন্তু মন্ত্র এক শ্রেণীর বয়োপ্রাপ্ত লোকের জন্য রচিত। ছড়া নিছক মনোরঞ্জন বা নিদ্রাকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে; মন্ত্রের ব্যবহার কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে—রোগ-শোক, সর্পদংশন আদি দুঃখকষ্ট নিরাময়ের জন্যই মন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। মন্ত্রের নায়ক-নায়িকা সাধারণতঃ কখনো লৌকিক কখনো বা পৌরাণিক দেবতা, এ ছাড়া ডাকিনী-যোগিনী

ভূত-প্রেতও সগৌরবে স্থান পেয়ে থাকে, কিন্তু ছড়ার নায়ক সব সময়েই শিশু বললে অত্যুক্তি করা হয় না—লৌকিক প্রাণীই তার উপজীব্য হয়ে থাকে। ছড়ার সাথে মন্ত্রের মৌল পার্থক্য এই যে, মন্ত্র আচার-ধর্মী রচনা, মৌখিক ধারায় প্রচার এবং শ্রুতি স্মৃতিতে এর শিক্ষা এবং সংরক্ষণ, একটি শব্দও এর পরিবর্তন করা চলে না; মন্ত্র প্রতিনিয়ত রচিত হয় না—আদ্যি-কালের রচনাই আবহমানকাল ধরে চলে আসছে; মন্ত্রের গোপনীয়তা একটি প্রধান ধর্ম; মন্ত্রের প্রতি কেমন একটা সম্ভ্রদ্ধ ভয় লক্ষ্য করা যায়, মন্ত্রকে লিপিবদ্ধ করার কথা অভাবনীয় ব্যাপার, তাতে গোপনীয়তা নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে—মন্ত্রের গোপনীয়তা নষ্ট হলে তার কার্যকারিতাও নষ্ট হয়, যেমনটা হয় মন্ত্রের শব্দ পরিবর্তিত হলে, তবে একান্তই যদি লিপিবদ্ধ করতে হয়, তবে তা লাল কালিতে লিখতে হবে এবং সংগোপনে রক্ষা করতে হবে। ছড়া কিন্তু আদৌ আচার-ধর্মী রচনা নয়; অপরিবর্তনীয়তা কিংবা গোপনীয়তা ছড়ার ধর্ম নয়, বরং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়েই ছড়ার প্রাণময়তা প্রকাশ পায় এবং সশব্দ উচ্চারণে তার সজীবতাই মূর্ত হয়ে ওঠে, মন্ত্রের মতো ছড়ার কোন তুকতাক কার্যকারিতা থাকে না, ছড়ার রচনা কোন কালে সীমাবদ্ধ থাকে না, ছড়া সব সময়ই রচিত হয়, তাই ছড়ার ভাষায় রক্ষণশীলতা মোটেই দেখা যায় না, যা মন্ত্রের একটা অপরিহার্য ধর্ম।

মন্ত্রগুলোর মধ্যে পৌরাণিক দেবতার প্রসঙ্গকথা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। রামলক্ষ্মণ-শিব-কৃষ্ণ মনসা-কামরূপ-কামাখ্যা সবার প্রসঙ্গই আছে। কিন্তু কোন প্রসঙ্গে কোন দেবতার স্মরণ নেওয়া দরকার তা এই মন্ত্রস্রষ্টাদের যে ভালোভাবেই জানা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার সীমান্ত অঞ্চল-গুলোতে এবং ঝাড়খণ্ডে একই ধরনের মন্ত্রগান প্রচলিত। সীমান্ত অঞ্চল-গুলোতেই এখনো আদিম জীবনের স্পন্দন পাওয়া যায়। অলৌকিকতার প্রতি আকর্ষণ, কুসংস্কারের মধ্যে জীবনের উপলব্ধি এখনো অনগ্রসর আদিম সমাজের মধ্যেই লক্ষ্যগোচর হয়। মন্ত্রের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অস্তিত্বের বিশ্বাসে তাই ঝাড়খণ্ডী জনমানস এখনো পরিপ্লুত হয়ে আছে।

প্রথমে গা বাঁধার একটি মন্ত্র। এই মন্ত্র আউড়ে 'গা বাঁধলে' ভূত-ডাইনী-অপদেবতার নজর লাগে না, সাপে কামড়ায় না।

১ আয়া বন্দি মায়া বন্দি, সগ্‌গে পাতালে ব্রহ্মা বন্দি। ফলস্তি নজর বন্দি, ফলস্তি মুখ বন্দি। এক থাড় চৌরাশি বাণ, মা ভবানী মড্ডা পান। কে

গা বাঁধে? গুরু বাঁধে। গুরুর আজ্ঞায় আমি বাঁধি। কার আজ্ঞায়? সীতা শিরামের আজ্ঞায় শিগ্‌গি লাগ॥

মন্ত্রটির ধারাবাহিক অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন। নিছক শব্দের পর শব্দ, পঙক্তির পর পঙক্তি যেন বহতা ধারায় সাজানো হয়েছে। ছন্দ আছে, ছন্দ মিল আছে—কিন্তু অর্থের কোন সংগতি নেই। লক্ষণীয়, মন্ত্রটিতে সীতা শ্রীরামের দোহাই দেওয়া হয়েছে। নিচের কু নজর ঝাড়বার 'কু-কাটা' মন্ত্রটি মুসলমানী মন্ত্র, মুসলমানের আল্লা বা খোদার দোহাই দিয়ে মন্ত্র পড়লে হিন্দুর কু-নজর নাকি তক্ষুনি নষ্ট হয়ে যায়।

২ মুসলমান কাটে সুতা উপরে উঠে খি। তোর তলে বসে পেঁচুয়া করুস কি॥ আন রে ঝাটার গাছি পৃষ্ঠে করি পার। ছাড় বেটা চোরা পাঁচু হুকুম আল্লার। খোদার দোহাই তোকে ছাড় এইবার॥

মন্ত্রাচারের প্রধানতম বিষয় সর্পমন্ত্র। সর্পদংশন নিবারণ করবার জন্য সাপের মুখবন্ধনের মন্ত্র আছে, দংশনে উদ্যত সাপ এই মন্ত্রোচ্চারণের ফলে নিশ্চল হয়, দাঁতে দাঁত লেগে তার মুখবন্ধ হয় বলে লোকবিশ্বাস আছে।

৩ টিল্‌হার মাটি দেবীর বাট, লাগ সাপাকে ঠটে ঠটে দাঁত। আর গায় না ফুটে দাঁত, হাত বাড়াইছে শিবশঙ্কর নাথ। হাত বাবং লুহা জাবং, সাপ-সাপিনীকে অধীন করং। কি খাবি রে সাপা? হাতে আছে দেবী ধর্মের পা। জিব্‌ভা তোর হোক অসাড়, দোহাই রাজা গোবিন চাঁদ। মুখে আশি বঁদ আর বঁদ বিষের ললী। হা হা কর্যে খা'স না মুখে, রাজা বঙ্কের দুহাই তকে। থাক সাপা নিশ্চলে, মুখ বান্ধ্যেছি লুহার শিকলে। কার আজ্ঞায়? মা মনসার আজ্ঞায়॥

মন্ত্রটিতে অনুস্বারের প্রয়োগে সংস্কৃত-গন্ধ এনে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষণীয়। মন্ত্রের সাহায্যে সাপের ঠোঁটে ঠোঁটে দাঁত লাগানো, দংশনেও দাঁত না-ফোটা, সাপের জিহ্বা অসাড় করে দেওয়া এবং তাকে নিশ্চল করে দেওয়া এর আসল উদ্দেশ্য। সর্পমন্ত্রে মনসার দোহাই দেওয়া বা আজ্ঞা পাড়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে রাজা গোবিন চাঁদ এবং রাজা বঙ্কের দোহাই দেওয়া হয়েছে—এই দুই রাজা কারা? মন্ত্রের মধ্যে লৌকিক বা পৌরাণিক যে-সব দেবতার দোহাই দেওয়া হয়ে থাকে—তার মধ্যে এই দু'টি নাম বিরল-দর্শন বললেও চলে। সর্পদংশনের পর নানা ধরনের সর্পমন্ত্র আওড়ে বিষমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। 'উড়ান মন্ত্র' আউড়ে ফুঁ দিলে বিষ নাকি উড়ে যায়।

৪ বায়বরনী ইন্দ্রে বরিষয়ে জল, একখানি ঘরে বিষ আছে থরথর। আস্তে বসিলে যার কাছে, সকল গুনের বিষ উড়িল বাতাসে। আস্ত বলে আমি কিছুই না জানি, কন ঘরে বিষ তুমার কন্ ঘরে পানী। আস্ত বসিল যার কাছে। সকল গুনেব বিষ উড়িল বাতাসে। চন্দ্রিমা পুর্ণিমা ষোল কলায় সম্পূর্ণ, হর হর বিষ তুই কুইলী বর্ণ। বসিতে ছপ্পর বিষ ডম্বুব বায়, শিমুলের তুলা যেন পবনে উড়ায়। উড়িল বিষ পড়িল বাঁয়, চাণ্ডিঞি বিষ নাই অমকার গায়। সবাই বল হরি হরি সে মুণ্ডল, বিষ কবি কুণ্ডল। বসন্ত বিষ করি ধারা, অবে বিষ তুই হবি শব্দে ভণ্ড কুশলা হরি হবি সবাই বল মুখে, হরি শব্দে বিষ নাই এ তিন ভুবনে॥

সর্পদংশনের বিষ ঝাড়বাব মন্ত্রের সংখ্যা অসীমিত। যে কোন পৌবাণিক চবিত্র যে-কোন সময় এইসব মন্ত্রে আবির্ভূত হতে পাবে। নিচের মন্ত্রগুলোতে সখীসহ রাধাব প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে গরুড, গোবিন্দ আদিব উল্লেখও।

৫ সাত শিম'লেব আগে বাঙ্কা, তাহ বস্তেছে গড়ুব পাঙ্খা। যখন গড়ুব লম্ফে ঝম্পে, অষ্টাঙ্গেব বিষ থবহবি কম্পে। আয বিষ তুঁহ উচ হতে, নাম, বিষ তুঁহ নিচ হতে। কাব আজ্ঞায়? গড়ুব গবিন্দেব আজ্ঞায॥

৬ বিনদিনী বাই, পুর্ণমাসী বঙ্গে নয়ে সুযপূজা যাই। সুযেব মন্দিবে তুমবা বস পুণমাসী, সখী সঙ্গে নানা সঙ্গে পুষ্প তুলে আসি। হাঁসিতে খেলিতে গেল যমুনাব জলে, জলে ছিল কাল সাপ দংশিল চবণে। ঢলিয়ে পড়িল বাধে নাইখ চেতনে। তখনি যে ললিতা কন বুদ্ধি করিল. হাঁসিতে হাঁসিতে বিষ বাউ-এ উড়াইল। কাব আজ্ঞায়? মা মনসাব আজ্ঞায়॥

এতোক্ষণ পযন্ত যে-সব মন্ত্র উদ্ধৃত করা হল, সেগুলোতে জীবন সম্পর্কিত কোন প্রসঙ্গ নেই। শুধু তাই নয়, এ-গুলোব মধ্যে কবিত্বরসও দুর্নিরীক্ষ্য বললে অত্যুক্তি করা হয় না। স্বভাবতঃই এগুলো সাহিত্যগুণবিবর্জিত। মন্ত্র আচাবধর্মী হওয়ায় কিছুটা বক্ষণশীলতা বজায় থাকে। তাই ভাষা-তত্ত্বের দিক দিয়ে মন্ত্রেব গুরুত্ব আছে। মন্ত্রেব মধ্যে বামসার, কৃষ্ণসার, শিব চিয়ান আদি মন্ত্রগুলো অত্যন্ত বিখ্যাত। খ্যাতিমান এবং সিদ্ধ ওঝাদেব অধিকারেই সাধারণতঃ এই সব মন্ত্র আত্মগোপন করে থাকে, বলতে গেলে এগুলোই তাদের অলৌকিক ক্ষমতার চাবিকাঠি। এই সব মন্ত্র অনেকটা পালার মতো হয়ে থাকে এবং এগুলো সাথী গান হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এখানে 'শিব চিয়ান' মন্ত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

ভূমস্তকে বিষ মাহাদেব মথন করিল, অকুটা কলাব পাত আনিয়া বিষ রাখিল। অতি যতন কব্যে বিষ চা'র ভাগ কবিল, এক ভাগ বিষ মাহাদেব নাগগণকে দিল। একভাগ বিষ মাহাদেব খড়ি পিঁপড়িকে দিল, একভাগ বিষ মাহাদেব গরু মানুষকে দিল। একভাগ বিষ মাহাদেব বাঁচায়ে রাখিল। হাঁসিয়ে খেলিয়ে মাহাদেব স্নান কবিতে গেল খিরাই নদীব কূলে। জয়বিজয় দুটি ঢাক বাজিতে লাগিল, বিষকে অমৃত বলে মাহাদেব ভক্ষণ কবিল। কি কব কি কব মামী নিশ্চিতে বসিয়ে, মামা শিবশঙ্কব নাথ ঢলে পড়েছে গবল বিষ খেয়ে। বঙ্গ না কর ভাগিনা না কব তামাসি। তোব মুণ্ড খাই গো মামী গণেশেব মুণ্ড হাত, সত্য ঢলেছেন মামা শিবশঙ্কব নাথ। ডান হাতে অমৃতের ডালা বাঁ হাতে সিঁদুবেব কাঁটি, হাঁসিয়ে খেলিয়ে দুর্গা পোহাইল বাতি। বাত্রি পোহাইল দুর্গাব পড়ে গেল মনে, উঠ উঠ নাবদ ভাগিনা ঘুমে অচেতনে। তোমবা তিন ভাগিনা সিজুযাকে যাও, সিজুয়ায় আছে কে, পদুমা কুমাবী। অহোডং চিয়াও চা, যেই চিয়ানে চিয়ায়েছে বালা লখিন্দব। সেই চিয়ানে চিয়াও অমকাব কাল ঘুম। কাল বেকাল চক্ষর চাঁদ, নামে দিশ বিষ দেখুক জগৎ সংসাব। বড় ঘবেব বউ জলকে যায় কাঁখে কুম্ভ কবি, অমাকব দেব কালকূটেব বিষ হলা গঙ্গাব পানী॥

বলাবাহুল্য, সর্পদংশনেব বিষ ঝাড়াব শেষ মন্ত্র এই চিয়ান মন্ত্র। মৃত লখিন্দর একদা এই চিয়ান মন্ত্রেই নাকি পুনর্জীবন লাভ করেছিল। তাই এই চিয়ান মন্ত্র ব্যর্থ হলে বোগীব জীবনেব আশা ছেড়ে দিতে হয়।

॥ চার ॥

সাথী গান

সাথী গান আসলে মন্ত্রই। প্রধানতঃ ঝাঁপান জলেব ঘাটে বয়ে নিয়ে যাবার সময় এবং ফেরার সময় এই সাথী গান গাওয়া হয়ে থাকে। সাথী গান ঝাঁপানেব সঙ্গে জড়িত বলে সংক্ষেপে ঝাঁপান সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। ঝাঁপান শব্দটি সংস্কৃত 'যাপ্যযান' থেকে উদ্ভূত। অর্থ, মনুষ্যবাহিত

যান। শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসাপূজার সময় এবং আশ্বিন সংক্রান্তি বা ডাক সংক্রান্তির সময় ঝাড়খণ্ডে ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয়। গুণী ঝাঁপানের ওপর বসে এবং শিষ্য বা চেলারা তাকে ঝাঁপানসহ পুকুর ঘাটে বয়ে নিয়ে যায় এবং স্নানপর্ব শেষ হলে আবার গুণীর গৃহে তাকে বয়ে নিয়ে ফিরে আসে। ঝাড়খণ্ডের বহুস্থানেই এখনো ঝাঁপানের আদি রূপটি টিঁকে আছে। কোথাও কোথাও গরুর গাড়ির ওপর ছই-এর কাঠামোর মতো করে ঝাঁপানের ব্যবস্থা করা হয়। শিষ্যেরা গাড়িটি টেনে থাকে। সাধারণতঃ বেদে এবং ঘুনিয়া সম্প্রদায়ের গুণীরাই ঝাঁপানে চড়ে থাকে। তবে ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। ঝাঁপান বাঁশ দিয়ে তৈরী করা হয়, অনেকটা গরুর গাড়ির 'খাঁচা' বা ছই-এর মতো এর গড়ন। গুণী এই ঝাঁপানের ওপর দু'পাশে দু'টি পা ঝুলিয়ে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ার মতো চড়ে থাকে। চেলারা চার কোণে কাঁধ দিয়ে পালকির মতো করে গুণীকে তার বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে জলাশয়ে যায়। গুণীর মাথায় সাপ, কাঁধে সাপ, উপবীতের মতো করে জড়ানো বুকের ওপর সাপ। বলা বাহুল্য, সবি খরিস সাপ। তেরোই জ্যৈষ্ঠ রোহিনের দিন জমি থেকে তুলে-আনা ধুলো মাটি মন্ত্রপূত করে বাকি চেলারা ওঝার গায়ে ছুঁড়ে মারে, ওঝার গা ধুলোয় ছেয়ে যায়। তাই বলে বিষধর সাপগুলো ছোবল মারে না, এমন কথা নেই। ওঝারা এ-ব্যাপারে অত্যন্ত হুঁসিয়ার। ঝাঁপানের দিন সকাল বেলা সাপগুলোর বিষদাঁত ভেঙে ফেলা হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে, বিষের জ্বালায় ওঝাকে ঢলে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু ঝাঁপান বন্ধ রাখা হয় না। ওরা বলে, 'চলুক ঝাঁপান, বাজুক ঢাক।' ঢাক আরো গুরু গম্ভীর আওয়াজ তুলে বাজতে থাকে, 'পাট চেলা' (প্রধান শিষ্য) ওঝার জায়গায় গিয়ে উঠে বসে। দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে ওরা বিশ্বাস করে যে অন্য কোন গুণী বা ওঝা 'চালন' করেছে অর্থাৎ মন্ত্র আউড়ে সাপগুলোকে উত্তেজিত করেছে। চতুর্দিক শিষ্যদের কণ্ঠোচ্চারিত সর্পমন্ত্রের সম্মিলিত ধ্বনিতে শব্দিত হয়ে ওঠে। লুকিয়ে-থাকা গুণীকে বাইরে বেরিয়ে এসে মন্ত্র-শক্তির পরীক্ষার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানানো হয়। অনেক সময় অশ্লীল এবং খেউড় মন্ত্র আউড়ে প্রতিপক্ষ গুণীকে অপমানিত করে সরাসরি মন্ত্র-যুদ্ধে ডাক দেওয়া হয়। জলাশয়ে যাতায়াতের পথে এই মন্ত্রই গান করে থাকে শিষ্যেরা, মনসা-মঙ্গল গানের জাতের মতো এর সঙ্গেও যোগ করা হয় ধ্রুবপদ বা ধুয়ো।

এই গুলোকেই সাথী গান বলা হয়। অনেক সময় দু'পক্ষের গুণীর মধ্যে ঘোর মন্ত্র-যুদ্ধ লেগে যায়। প্রতিপক্ষের প্রশ্নের জবাব গুণীকে দিতেই হয়, না দিতে পারলে পূজার ঘট নেবার কোন অধিকার তার থাকে না। এই প্রশ্নোত্তরের মন্ত্রগুলোও সাথী গান। শুধু তাই-বা কেন, মনসামঙ্গল গানের ফাঁকে-ফাঁকে 'ঢাকী' বাজিয়ে তালে তালে সুরে-সুরে যে-মন্ত্র আওড়ানো হয় তাকেও সাথী গান বলা হয়। মনসাপূজার সময় দর্শকদের এই সাথী গান গেয়েই সাপের খেলা দেখানো হয়ে থাকে। এমন কি জীবিকার উদ্দেশ্যে বেদেরা গৃহস্থের ঘরে-ঘরে সাপের খেলা দেখাবার সময় মনসা-সংক্রান্ত গান কিংবা সর্প-মন্ত্র গেয়ে থাকে। ওগুলোকে সাপ-খেলানোর গান বলা যেতে পারে। আসলে কিন্তু ওগুলোও সাথীগান ছাড়া কিছু নয়। মন্ত্র সাধারণতঃ সরবে উচ্চারিত হয় না; মন্ত্র যখন সরবে উচ্চারিত হয়, তখন তাকেই সাথী গান বলা হয়। মন্ত্রের মতো ওগুলোতেও কাব্যরস তেমন দানা বাঁধবার অবকাশ পায় না।

নিচের সাথী গানটি 'ধানসার' শ্রেণীর একটি সর্পমন্ত্র। এর বিষয়বস্তু হল, নীলকণ্ঠ মহাদেবকে বিষের করালগ্রাস থেকে মনসা কর্তৃক উদ্ধারের কাহিনী। প্রসঙ্গক্রমে মনসার ক্ষুব্ধ উক্তি থেকে তাঁর এবং দুর্গার মধ্যে ঘোর বিরোধের আভাসও মেলে।

১ বিষ খেয়ে মাহাদেব হলেন অচেতন। বেড়ি যত দেবগণ করেন রোদন ॥ ব্রহ্মা কান্দে বিষ্ণু কান্দে কান্দে যোগতিথি। নন্দীভৃঙ্গী কান্দে আর লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ ক্রন্দন শুনিয়া ব্রহ্মার বুদ্ধি উপজিল। নারদ মুনিকে তখন স্মরণ করিল ॥ ধ্যানেতে বসিয়াছিল নারদ মহাঋষি। ব্রহ্মার নিকটে মুনি উত্তরিল আসি॥ ব্রহ্মা বলেন শুনহ নারদ তপোধন। সিজুয়া পর্বতে শীঘ্র করহ গমন ॥ সিজুয়া পর্বতে আছেন জয় বিষহরি। তিনি আইলে সদাশিবে জিয়াইতে পারি ॥ এতেক শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন। সিজুয়া পর্বতে শীঘ্র করিলেন গমন ॥ সিজুয়া পর্বতে আছেন জয় বিষহরি। তথায় গেলেন মুনি অতি ত্বরা করি।। কি কর কি কর দিদি নিশ্চিন্তে বসিয়ে। বিষ খেয়ে মাহাদেব পড়েছেন ঢলিয়ে ।। অমৃত মথনে কাল গরল উঠিল। সৃষ্টিরক্ষা করিবারে দেব গরল ভক্ষিল। ঝঁট করি চল দিদি উঠি ত্বরা করি। এত শুনি রুষিলেন জয় বিষহরি ॥ না যাব তথায় আমি শুন মুনিবরে। হেমন্ত ঋষির কন্যা আছে তথাকারে ॥ হেমন্ত ঋষির কন্যা বড়ই অহঙ্কারী। সদাই বলিয়া থাকে বাপ-ভাতারী ॥

বাপের নাহিক দোষ কিদোষিব তায়। অবশ্য যাইব আমি দেবের সভায় ॥ এত বলি চলিলেন আস্তিকের মাতা। বিষ খেয়ে মাহাদেব ঢলিয়াছেন যথা।। শুভ্র বরণ ধান দেবী হাতে করি নিলা।...ধানের ঘায় বাপ চিয়াও বলে দস্তবাণী। কালকূট সাপের বিষ ধানের ঘায় পানী ॥ মাংস গলিত করে হাডে করে বাসা। খেদাড়িয়ে দাও বিষ বলেন মনসা।।

পরবর্তী সাখী গানটির বিষয়বস্তু সমুদ্রমন্থন।

২ দুর্বাসার শাঁপে লক্ষ্মী হইল চঞ্চলা। সাগর প্রবেশে লক্ষ্মী ইন্দ্র হৈল ভলা।। হত লক্ষ্মী স্বর্গপুরে ভাবয়ে যাদব। মন্ত্রণা করয়ে স্বর্গে লইয়া কেশব ॥ সাগর প্রবেশে লক্ষ্মী আছয়ে বিস্ময়। সাগর মন্থিবে লক্ষ্মী জানিহ নিশ্চয় ॥ এত বলি অনন্তকে ডাকি চক্রপাণি। মন্থহ সাগর আজি কৈল দৈববাণী ॥ তেত্রিশ কোটি দেবতা যার বচন পুবন্দর। সাগরমন্থনে তারা হইল তৎপর।। মন্দার পর্বত আনে দেবগণ ঋষি। পবত চালনে বিষ ভূমে পডে খসি।। পঞ্চাশ যোজন গিবি নডিতে না পাবে। শ্রমভবে অনন্ত লাগ গবল উদ্গারে॥ বিষভবে ধূম উঠিল আকাশে। জলজন্তু মবে কত মন্থনেব ত্রাসে ॥ কুয়াশে ঢাকিল মহী হৈল অন্ধকাব। ঐবাবত হস্তী উঠে পর্বত আকার ॥ বাবণ দেখিয়া ইন্দ্র আনন্দিত হইল। পাবিজাতসহ ইন্দ্র হস্তী যে পাইল। আদ্যি মন্থন শুন বিস তোমাব জনম। মডাব অঙ্গ ছাড়্যে কাল কবহ গমন ॥

চঞ্চলা লক্ষ্মী দুর্বাসার শাপে সাগবে প্রবেশ করলে ইন্দ্র আদি দেবগণ লক্ষ্মী-হীন হয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পডেন। বিষ্ণুর সঙ্গে পবামর্শ করে অনন্তনাগকে মন্থনরজ্জু কবে মন্দার পর্বতেব সাহায্যে সমুদ্রমন্থন করা হয়। ফলে অনন্ত নাগেব মুখনিঃসৃত বিষের মেঘে আকাশ অন্ধকার হয়। এই সমুদ্রমন্থনে বিষ এবং অমৃত দুই-ই উঠেছিল। এই সমুদ্রমন্থন থেকে ইন্দ্র ঐরাবত হস্তী এবং পাবিজাত পুষ্প লাভ কবে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, অন্য দিকে পৃথিবীর একটি বিবাট ক্ষতিও হয়েছিল। যে-পৃথিবী বিষহীন ছিল, সেই পৃথিবী এই সমুদ্রমন্থনের ফলে বিষগ্রস্ত হয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীটি এই ভাবে মন্ত্র বা সাখী গান হিসাবে পদবদ্ধ হলেও কোথাও কাহিনীর রস ব্যাহত হয়নি।

পরবর্তী সাখী গানটি 'রামসার' নামক বিখ্যাত সর্পমন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। রামচন্দ্রের জীবনকাহিনী ধারাবাহিকভাবে এখানে বিবৃত করা হয়েছে।

৩ জন্মিলেন শ্রীরামচন্দ্র দশরথের ঘরে। উর্দ্ধবাহু করে নিত্য করে পুরন্দরে॥ গন্ধর্বে গায় গীত নাচয়ে অপ্‌ছরী। যত ছিল বড়াব বিষ হয়ে গেল পানী॥ যে-কালেতে রামচন্দ্রের মিথিলায় গমন। পাষাণ হয়েছিল অহল্যা বনের ভিতর॥ পাষাণ হয়েছিল অহল্যা ছিল দৈবদোষে। মুক্তি পদ পেল রামের চরণ পৌরশে॥ ইহা শুনি যদি বিষ না নামিবে তুমি। মিথিলার গণ্ডি ভাঙা শুনাইব আমি॥ ভাঙ্গিল হরের গণ্ডী শ্রীরাম ধানুকী। পণরক্ষা করে বিজয় করিল জানকী॥ বিবাহ করিল রাম জনকনন্দিনী। শ্রীরামেব আজ্ঞায় বিষ নামিল এখনি॥ রাজা হবেন রামচন্দ্র মনে ছিল আশ। আচম্বিতে শুনি রাম কি যাবেন বনবাস॥ কাঁদেন কৌশল্যারাণী রামের জননী। শ্রীরামের আজ্ঞায় বিষ নামিল এখনি॥ মিথিলার প্রজাগণ করে হায় হায়। রাজ্যপাট ছেড়ে রাম কি বনবাসে যায়॥ বনবাসে যায় রাম অযুধ্যা ছাড়িয়ে। যত ছিল বড়ার বিষ যায় পালাইয়ে॥ চিত্রকূট পর্বতে রাম বাঁধলেন কুঁড়ে-খানি। কাল হয়ে এল রাম কি সনার হরিণী॥ মৃগ মারতে রামচন্দ্র করিল গমন। বৃক্ষ আড়ে লুকায় মৃগ নইয়ে জীবন॥ মায়া মোহ বাণ প্রভু পুরিল সন্ধান। বাণ খেয়ে মৃগ ডাকে কুথা রে লক্ষ্মণ। সেই বাক্য সীতাদেবী শুনিবারে পেল। লক্ষ্মণে ডাকিয়ে কিছু কহিতে লাগিল॥ শুন শুন শুন ওহে দেবর লক্ষ্মণ। বিপত্তো পড়িয়ে তোমায় ডাকেন নারায়ণ॥ তোমাদের মায়া প্রভু বুঝিতে না পারি। ভরত নিল রাজ্যখণ্ড তুমি নিবে নারী॥ সেই বাক্য শুনে লক্ষ্মণ কর্ণে দিল হাত। কটুকথা কহে গেদে সাক্ষী থাক রঘুনাথ। রাম কুণ্ডলী দিয়ে লক্ষ্মণ কহে পুনর্বার। কদাচিৎ সীতাদেবী না হইবে পার॥ যদি পার হবে সীতা আপনার গুণে। অবশেষে দোষ কিছু না দিবে লক্ষ্মণে॥ রাম অন্বেষণে লক্ষ্মণে করিল গমন। যত ছিল বড়ার বিষ নামিল এখন॥ রাম রাবণে যখন ঘোর মহারণ। শক্তিশেলে পড়েছিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ॥ কুথা আছ হনুমান পবননন্দন। গন্ধমাদনে আছে বিশল্যকরণ॥ গন্ধমাদন আনল্য বীর হনুমান। সুশঙ্কর অঝারে ঔষধ কল্ল প্রাণ॥ রাম বলে ঘরে চল ঠাকুর লক্ষ্মণ। শ্রীরামের আজ্ঞায় বিষ নামিল এখন। রাম রাবণে যখন ঘোর মহারণ। লক্ষ্মণ করিল তখন অমৃত বরিষণ॥ হনুমান জ্বালিয়ে দিল পবনের আগুনি। দিবাকর আরশি দিল জগৎমোহিনী॥ অনলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশিল সীতা। এসে বিভীষণ তখন জোড় করিলেন হাত। ই কি আশ্চর্য প্রভু দেখি রঘুনাথ॥ শুন

রে পাপিষ্ঠ নাগ সীতার পরীক্ষার কাহিনী। যত ছিল বড়ার বিষ হল্য গঙ্গার পানী ॥

রামায়ণের মোটামুটি কাহিনীটুকু আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে স্বল্পপরিসরের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। আবো দু'চার কলি পদ লুপ্ত হয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়, কাহিনীটি তাই কিছুটা অসম্পূর্ণ মনে হয়। তবে রামায়ণের প্রধান ঘটনাগুলো স্বল্পায়তনের মধ্যেও স্থান পেয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-কথা, পাষাণী অহল্যা উদ্ধার, মিথিলায় হরধনুভঙ্গ এবং সীতাকে বিবাহ, রাজ্যাভিষেকের প্রাক্কালে রামচন্দ্রের বনবাস, স্বর্ণমৃগকথা ও সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রামরাবণের যুদ্ধ, সীতাউদ্ধার ও সীতার অগ্নিপরীক্ষা সমস্ত উপাখ্যানই এই 'রামসার' মন্ত্রটির অন্তর্গত হয়ে আছে। রামায়ণের কাহিনীর রস এর ফলে মোটেই বিকৃত হয় নি, বরং দু'চার কথায় যে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে এই কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে, তা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

পরিশেষে 'কৃষ্ণসার' মহামন্ত্রের সাথী পান।

৪ সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ট জমুনার তীরে। নানান কৌতুকে কানু বনে বনে ফিরে॥ ব্রজবালক সঙ্গে যত সিদাম সুদাম। কহ কৃষ্ট মহাবল ভেয়া বলরাম॥ উর্জ্জল ককিলার জল শ্রীমধুমঙ্গল। কৃষ্টের স্মরণে বিষ যায় রসাতল॥ বনে-বনে সখা সনে করেন গোচারণ। এক কথা আচম্বিতে হইল স্মরণ॥ কানাই ডাকিয়া বলে শুন অরে ভাই। তৃষ্টাতে আকুল চল জল খাইতে যাই॥ পলস্বারির বচনে পলায় সব পাল। যায়রে কালকূটের বিষ সপ্ত পাতাল॥ কানু গেলেন ধেনু নয়ে কালিদহের কূলে। কমল দেখিয়া সব পড়ে গেল ভুলে॥ তবে হাঁসন চান কৃষ্ট বলরামের পানে। কৃষ্টের মনের কথা বলরাম জানে॥ কানাই ডাকিয়া বলে দাদা রে বলাই। তুমি আজ্ঞা দেঅ পুষ্প তুলিবারে যাই॥ কৃষ্টের বচনে পলস্বারি দিল সায়। কমল তুলিতে কৃষ্ট সাজিলেন ত্বরায়॥ কালিদহের কূলে রে কদম্ব শিশুগণ। তার ডালে উঠিলেন শ্রীনন্দের নন্দন॥ ঝাঁপ দিয়ে পড়েন কৃষ্ট কালিদহের জলে। কৃষ্টকে বেড়িল যত নাগিনী সকলে॥ দমফয়ে নাগিনী সব কৃষ্টের শরীরে। কৃষ্টের স্মরণে বিষ অন্তরীক্ষে উড়ে॥ কালিদহে ডুবিলেন নন্দের নন্দন। তা দেবে আকুল হল সব শিশুগণ॥ আর কে করিবে রক্ষা দাবা অগ্নি হতে। আর কেবা খুদা পেলে এনে দিবে খেতে॥

এবোল বলিয়া শিশু ধূলিতে নটায়। কৃষ্টের স্মরণে বিষ বাউ-এ উড়ে যায়॥ বলরাম ডেকে বলে শুন অরে ভাই। ত্বরা করি কহ গিয়া জননীর ঠাঁই॥ এবোল বলিয়া শিশু উদ্ধমুখে ধায়। নয়নের জলে পথ দেখিতে না পায়॥ হেথা যশোমতি দেবী ব্যাকুল অন্তরে। কেঁদে কেঁদে এসে শিশু দেখে কত দুরে॥ নিকটে আসিল তখন রোহিনীনন্দন। মরের কালকূটের বিষ ফুঁয়ে করি জল॥ কেঁদে কেঁদে বলে শিশু শুন অগ মা। কালিদহে ডুবিলেন প্রাণের কানাই॥ হেথা যশোমতি দেবী উদ্ধমুখে ধায়। কুথা ছেড়ে গেলে বাছা অভাগিনী মায়॥ ললিতা বিশাখা রাধা করে হায় হায়। কৃষ্টের স্মরণে বিষ বায় উড়ে যায়॥ মনে বিচারিল তখন রোহিনীনন্দন। কশ্যপতনয় গড়ুরে করিল স্মরণ॥ গড়ুব গড়ুর বলে ডাকিতে লাগিল। কুশদ্বীপে গড়ুব বীরের আসন টলিল॥ আসন টলিল বীর ভাবে মনে মনে। সংকটে পড়িয়া মোরে কে করে স্মরণে॥ এ বোল বলিয়া বীর বসিল ধিয়ানে। ধিয়ানে জানিল বীর সব বিবরণে॥ কালিদহে ডুবেছেন নন্দের নন্দন। তেকারণে আমারে ডাকেন সংকেত্তান॥ কৃষ্টকে দংশিল কালী এত অহংকার। আজ যে করিব চূর্ণ কালীর অহংকার॥ এবোল বলিয়া বীর ধায় মহারোড়ে। মেঘ থান থান হয় নিঃশ্বাসের ঝড়ে॥ দাণ্ডাল গড়ুব বীর কালিদহে আসি। অচেতনে পড়ে সব যত ব্রজবাসী॥ ললিতা বিশাখা তারা যত ব্রজবাসী। উৰ্চ্চস্বরে কান্দে তারা কালিদহে আসি॥ যশোমতি বলে কুথা গেল নীলমণি। উঠ বাছা খাওয়াতে এসেছি ক্ষীর ননী॥ ললিতা বিশাখা রাধা করে হায় হায়। কৃষ্টের স্মরণে বিষ বায় উড়ে যায়॥ মনে-মনে ভাবে বীর কি করি উপায়। কালিদহের জল পরশিতে না জুয়ায়॥ এ বোল বলিয়া বীর পাকসাট মারে। কালিদহের জল সব উড়াইল ঝড়ে॥ ভয়ে ত্রাসে লিল কালী কৃষ্টের স্মরণ। গড়ুর বলিয়া কৃষ্ট দিলেন আলিঙ্গন॥ প্রাণ দান দেও বাছা এ কালনাগিনী। আজ হতে তুমার নামে বিষ হবে পানী॥ চেতন পাইল যদি নন্দেরি নন্দন। চেতন পাইয়া উঠে সব শিশুগণ॥ বাহু পসারিয়া রানী পুত্র নইল কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে॥ কৃষ্টকে দেখিয়া সবার আনন্দিত মন। কৃষ্টের স্মরণে বিষ যায় রসাতল॥

কালীয়দমন এই সাথী গানের বিষয়বস্তু হলেও প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে এর

অসামঞ্জস্য সহজেই নজরে পড়ে। প্রচলিত কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কালী নাগের দমনকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ নাগের দংশনে বিষের জ্বালায় অচৈতন্য হয়ে জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিলেন ; নিরুপায় বলরাম গরুড়ের স্মরণ করলে গরুড় এসে শ্রীকৃষ্ণকে জলের তলা থেকে উদ্ধার করে বিষমুক্ত করে।

সাথী গানে বিধৃত কাহিনীটি এই : শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গিয়েছিলেন। তখন তাঁরা সবাই নিতান্ত শিশু ছিলেন। যমুনার তীরে খেলাধুলো করে ক্লান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। তখন দাদা বলরামের কথামতো সবাই জল খাবার জন্য কালিদহের কূলে উপস্থিত হল। কালিদহে পদ্মফুল ফুটে থাকতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণার কথা ভুলে গেলেন। বলরামের অনুমতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ফুল তুলতে গেলেন। তীরবর্তী কদম্ববৃক্ষের ডালে উঠে শ্রীকৃষ্ণ জলে লাফিয়ে পড়লেন। অমনি চারপাশ থেকে নাগিনীরা তাঁকে ঘিরে ধরে দংশন করতে লাগল। বিষের জ্বালায় শ্রীকৃষ্ণ অচৈতন্য হয়ে কালিদহে ডুবে গেলেন। শিশুদের মধ্যে শোকের সাগর ভেঙে পড়ল। বলরাম যশোদাকে খবর দেবার জন্য গোকুলে দৌড়ে গেল। খবর শুনে যশোদার প্রাণ উড়ে গেল। ললিতা বিশাখা রাধা হাহুতাশ করতে লাগলেন। এমনি সময় বলরামের হঠাৎ গরুড়ের কথা মনে পড়ল। গরুড়ের আসন দুলে উঠল, কৃষ্ণকে দংশন করার জন্য উদ্যত কালিনাগকে সায়েস্তা করবার শপথ নিল সে। প্রাণের কানাই শ্রীকৃষ্ণের শোকে শিশুগণসহ সমস্ত ব্রজবাসী তখন অচেতন হয়ে পড়েছেন। গরুড় কালিদহের জল না ছুঁয়ে পাখার ঝাপটে সব জল উড়িয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধার করল ; তারপর যেই সে কালীনাগকে মারতে উদ্যত হল অমনি শ্রীকৃষ্ণ ওকে বাধা দিলেন। গরুড়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণ কালীনাগকে ক্ষমা করতে অনুরোধ করলেন, বললেন, 'আজ হতে তোমার নামে বিষ হবে পানী।' শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেতনা ফিরে পেল। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে লক্ষ লক্ষ চুম্বনে তাকে ভরে তুলল। এই কথাবস্তুর মধ্যে নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব আছে। ঘটনার পরিকল্পনায়, কাহিনী-বয়নে যথেষ্ট দক্ষতা লক্ষ্যগোচর হয়। মন্ত্র হলেও আশ্চর্য মানবিকতার স্পর্শে এই সাথী গান সাহিত্যরসসম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। করুণ বেদনা-রসে এই সুদীর্ঘ সাথী গানটি এমনি সিক্ত হয়ে আছে যে তা আমাদের বেদনা-

প্লুত করে। প্রাণের কানাই যে ব্রজবাসীব কতোখানি, তা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাদেব সবাব হতচেতন হয়ে পড়াব মধ্যে সুস্পষ্ট। শিশুদের শোকার্ত মুহূর্তের চিন্তা—'আর কে করিবে রক্ষা দাবা অগ্নি হতে / আর কেবা খুদা পেলে এনে দিবে খেতে'—কি-গভীব বেদনাব অন্তর্গূঢ় উপলব্ধি, তা আবো ঘনীভূত হয 'নয়নেব জলে পথ দেখিতে না পায়' পদটিতে এসে। পুত্র শোকাতুবা জননী যশোদার আর্তনাদ 'কুথা ছেড়ে গেলে বাছা অভাগিনী মায়' যে কোন বাস্তব মায়ের আর্তনাদেব চেয়ে কম হৃদয়বিদারক নয়। জীবনবসসমৃদ্ধ এই কাহিনী যে কোন লোকের হৃদয়স্পর্শ কবতে সক্ষম। এইখানেই এই সাথী গানটিব চরম সার্থকতা॥

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্মাচার-সম্পর্কিত গান

এই অধ্যায়ে মাহবা গীত এবং চুয়া গান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মাহরা গীত ধবম পূজাব পূর্ববাত্রে জাগবণ গান হিসাবে সাবাবাত্রি গীত হয়ে থাকে। এই গানেব মধ্যে ধর্মীয় কোন গূঢ় বহস্য সংগুপ্ত থাকে না, অন্যপক্ষে চুয়া গানে দেহতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিকতাব জটিল তত্ত্বকথা বিশেষভাবে স্থান পেয়ে থাকে। অনেকে তত্ত্বাশ্রয়ী গানকে লোকসংগীত হিসাবে গণনা করতে চান না, কাবণ তত্ত্বসংগীত কখনো সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি কবতে পারে না; ফলে তত্ত্বসংগীত মুষ্টিমেয় লোকেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তা সত্ত্বেও আমরা চুয়া গানকে লোকসংগীতেব উপকবণ হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। চুয়া গানের লৌকিক সুর সর্বজনমানসে অবশ্যই আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষও তাদের নিজস্ব বোধশক্তিব সাহায্যে যতোখানি সম্ভব, কথাবস্তুব রস উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে চুয়া গানকে লোকসাহিত্যেব উপকরণ হিসাবে গণনা না করে পারা যায় না।

॥ এক ॥

মাহুরা গীত

পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত ধর্ম ঠাকুর ও পূজা নিয়ে তর্কবিতর্কের অন্ত নেই। ধর্ম ঠাকুরকে অবলম্বন করে যেমন ধর্মমঙ্গলের কাব্যকাহিনী গড়ে উঠেছে, তেমনি ধর্ম ঠাকুর ও তাঁর পূজাকে কেন্দ্র করে আলোচনা-গবেষণার বিপুল দলিলপত্রও রচিত হয়েছে। আমরা কোন রকম তর্কের মধ্যে না গিয়ে ঝাড়খণ্ডের ধরম ঠাকুর সম্পর্কে স্বল্প কথায় আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। বলাবাহুল্য, রাঢ়ের ধর্ম ঠাকুর এবং ঝাড়খণ্ডের ধরমঠাকুরের মধ্যে নামের মিল থাকলেও অমিলটাই সর্বাধিক। আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-বিধি সব দিক দিয়েই অমিলটা সুপ্রকট। ঝাড়খণ্ডের ধরম পূজায় গান করবার রীতি আছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী থেকে এর কাহিনী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ধরম পূজা ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের পূজানুষ্ঠান হলেও কুর্মিদের মধ্যে এর একটি বিশিষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়। করম ধরম দুটি দেবতাই কুর্মিদের বিশিষ্ট দেবতা। ধরম পুরোপুরি সূর্য দেবতা, তাই ধর্মের পূজা সূর্য পূজা ছাড়া কিছু নয়। করমের পূজাতেও সূর্য পূজার আভাস আছে। করম পূজার দিন সন্ধ্যাবেলা বিদায়ী সূর্যের জন্য পুকুর ঘাটে উপচার সাজানো হয় এবং পরের দিন সকালবেলা একইভাবে প্রভাতী সূর্যের জন্য উপচার সাজানো হয়ে থাকে। সূর্য কৃষিনির্ভর উপজাতিদের বিভিন্ন পূজানুষ্ঠানে বিভিন্ন বেশে উপস্থিত থাকেন।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'ধর্ম' শব্দটি 'কূর্ম' বাচক আর্যেতর অস্ট্রীক শব্দের সংস্কৃত রূপ। রাঢ়ে ধর্মঠাকুর কূর্ম বা কচ্ছপের প্রতীকে পূজিত হন। কুর্মি সম্প্রদায় কূর্ম-টোটেমজাত উপজাতি। কোথাও কুরুম বা কুড়ুম নামেও এই সম্প্রদায়টি পরিচিত। কূর্ম বা কচ্ছপ যে এদের কুলকেতু তাতে সন্দেহ নেই; এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কচ্ছপ হত্যা করা বা তার মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ—এমন জনশ্রুতি আছে। কারো কারো মতে কূর্ম টোটেমের উপজাতিদের দেবতা হলেন ধরম ঠাকুর। আমরাও এই কথায় বিশ্বাস করি। কারণ কুর্মিদের কাছে ধরম দেবতা সবার ওপরে। 'ধরম সাক্ষী' কিংবা 'ধরম ডাক' শব্দের ধরম নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ দেবতা ঈশ্বর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ধরম ঈশ্বর বা ভগবান; তিনিই এই পৃথিবী এবং জীব-

জগতের স্রষ্টা। আদিম মানুষের চেতনায় সূর্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত রূপ ছিলেন। আদিম মানুষের কাছে তাই সূর্য এবং 'বসুমাতা' পৃথিবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন দেবতাই ছিলেন না। তারা বিশ্বাস করত সূর্য আর পৃথিবীর মিলনের ফলেই সমগ্র সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়েছে। আমরা এর পূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে কোমবদ্ধ আদিম মানুষ শুধুমাত্র শস্যকামনা এবং সন্তানকামনায় তাদের সমস্ত পূজা-উপাসনা, আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠান করত। শিশুসন্তানের নিরাপত্তার জন্য তাই আদিম মানুষ বিশেষভাবে ধরম এবং 'বসুমাতা'র শরণাপন্ন হত। শিশুপুত্রের কল্যাণ-কামনায় এখনো ঝাড়খণ্ডের সর্বত্র ধরম দেবতার শরণ নিয়ে তাঁর পূজা-অর্চনা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুর কূর্ম বা কচ্ছপের প্রতীকে পূজিত হলেও ঝাড়খণ্ডে ধরমঠাকুরের কোন মূর্তি নেই, বলা যেতে পারে ঝাড়খণ্ডে ধরমঠাকুর শূন্যমূর্তি। সূর্য স্বয়ং জ্যোতিষ্মান শূন্যবিন্দুমাত্র। আদিবাসী মননে তার শূন্যমূর্তিই যে স্বাভাবিকভাবে কল্পিত হবে, তাতে আর সন্দেহ কি। করমঠাকুরও যে ছদ্মবেশী সূর্য তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। ঝাড়খণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা গরাম। গরাম আসলে গ্রামদেবতা, সমগ্র জনপদের দেবতা। করমের যেমন কোন মূর্তি নেই, তেমনি গরামেরও মূর্তি নেই। এই দেবতারাও শূন্যমূর্তি। আসলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী চেতনায় মূর্তির কোন স্থান নেই। একমাত্র টুসুর মূর্তি চল আছে ধলভূমে ঝাড়গ্রামে; এ-মূর্তিও যে বঙ্গজন-পূজিত ভাদুর অনুকরণে নির্মিত হয়ে থাকে, তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করে দেখিয়েছি। ধরম, করম, গরাম—তিনটি দেবতাই শূন্যমূর্তি। শুধু তাই নয়, তিন দেবতাই যে সূর্যেরই বিভিন্ন নামান্তর তাতেও সন্দেহ নেই। তিনটি পূজানুষ্ঠানই কোমবদ্ধ মানুষের সামূহিক পূজানুষ্ঠান। ব্যক্তিগত মানত-মানসিক উপলক্ষেও যে পূজানুষ্ঠান হয় তাতে আত্মীয়কুটুম্ব এবং কোম বা গোত্রের প্রত্যেকটি সদস্যের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন, 'শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত সম্পাদিত গিলগিট পুঁথিতে ধর্মরাজ নামের সূত্র ও গ্রাম দেবত্বের ইঙ্গিত রয়েছে ঋক্‌বেদের একছত্রে। ধর্ম হয়েছেন গ্রামবাসীর রাজা। ধর্মাভুবদ্‌ বৃজনস্য রাজা।'[১] দেখা যাচ্ছে ঋক্‌বেদের যুগ থেকেই ধরম দেবতা গরাম দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। শিশুর কল্যাণ

১ ভূমিকা—রূপরামের ধর্মমঙ্গল, পৃ-৪

কামনায় প্রধানতঃ ধরম ঠাকুরের শরণ নেওয়া হয়ে থাকে ; কিন্তু গরাম দেবতার ওপর ন্যস্ত থাকে আবালবৃদ্ধবনিতার শুভাশুভ এবং সমগ্র জনপদের সবরকম কল্যাণ-অকল্যাণের দায়িত্ব। অবশ্য ধরম ঠাকুরও কোম বা গোত্রের শুভাশুভের দায়দায়িত্ব বহন করে থাকেন। ধরম ঠাকুর গোত্রের প্রতিটি মানুষের জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা। সূর্য যেমন পার্থিবজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রত্যক্ষ কারণ, তেমনি ধরম ঠাকুরও জনপদের প্রতিটি মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। তাই ঋকবেদে মৃত্যুর অধিপতি যমকে যে ধর্মরাজ বলা হয়েছে তা কোনক্রমেই অসংগত বা অস্বাভাবিক নয়। ঝাড়খণ্ডে ধরম যে স্বয়ং সূর্য তা আগেই বলা হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রমতে সূর্য-পুত্র যম ধর্মরাজ, যম-পুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ। ঝাড়খণ্ডে ধরম পূজার কোন বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় না। করম এবং গরামের বার্ষিক পূজানুষ্ঠান থাকলেও, ধরমের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। ধরমঠাকুর সূর্যের পূজা করম এবং গরাম পূজার মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস। ঝাড়খণ্ডে ধরমঠাকুর প্রধানতঃ শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট দেবতা বললে ভুল হয় না। সন্তানকামনায় ধরমঠাকুরের মানত করা হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করবার পর শিশুর শুভাশুভের জন্য ঝাড়খণ্ডী মানুষেরা ধরমঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। মানতের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ধরমপূজা করতে হয়। তবে ঝাড়খণ্ডের একটি বিশিষ্ট নিয়ম (যা কুর্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়) হল এই যে, পরিবারের প্রথম পুত্রসন্তানের জন্মকে উপলক্ষ করে ধর্মের মানত শোধ করতে হয়। জন্মকাল থেকেই শিশুর মাথার চুল রেখে দেওয়া হয় ; ধরমপূজার আগে প্রথমবার তার মস্তকমুণ্ডন করা হয়। তবে অনেক সময়ই এই নিয়মের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হয়। ধরমপূজার একটি বিশিষ্ট নিয়ম হল এই যে, যে বৎসর গোত্রের কোন রমণী অন্তঃস্বত্বা থাকে না, একমাত্র সেই বৎসরই ধরমপূজার অনুষ্ঠান সম্ভব। গোত্রের লোকসংখ্যা বেশি হলে প্রত্যক বৎসরই কোন না কোন রমণী গর্ভবতী থাকেই, তাই ধরমপূজার অনুষ্ঠানও বিলম্বিত হয়ে থাকে। তাই অনেক সময় ছেলের মাথায় জন্মজাত চুলের একটি 'চুট্‌কি' বা শিখা রেখে বাকি চুল ছেঁটে ফেলা হয়। ধরমপূজা প্রতি 'পিঢ়ি' (generation)তে একবার হয় এবং বারো বছর ব্যবধানে এক একটি পূজানুষ্ঠান হয়। আমরা আগেই বলেছি, পূজার কোন নির্দিষ্ট দিন থাকে না ; বৎসরের যে শনিবারে (মতান্তরে শুক্রবারে) পূর্ণিমা তিথি পড়ে, সেই দিন এই পূজার অনুষ্ঠান করা যায়। ধরমপূজা গোষ্ঠীপূজা, তাই পূজার আগে পরিবারের

প্রতিটি লোকের তো বটেই গোত্রের প্রতিটি আত্মীয়স্বজনের উপস্থিত থেকে উপবাস করতে হয়। পূজার আগের রাত্রিটি জাগরণের রাত্রি। সারা রাত ধরে 'মাহরা' (<মাহারায়< মহারাজ) গীত গাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। পরিবারের সমস্ত সদস্যদের ভোরে সূর্যোদয়ের আগেই স্নান করবার অনিবার্য নিয়ম আছে। সূর্যোদয়েব লগ্নে পূজা শুরু করা হয়। এই পূজায় কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকে না। কোন মন্ত্রও এই পূজায় উচ্চারিত হয় না। গৃহকর্তা স্বয়ং এই পূজার পুরোহিত। ঝাড়খণ্ডে আর দশটি পূজাব মতো তুলসীতলাতেই এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তুলসীপাতা, আতপচাল, মিষ্টান্ন, ফল দুধ ইত্যাদি সহযোগে পূজা দেবার পর পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। এই পাঁঠাটি মানত কবার সময় থেকে পালিত হয়ে থাকে। পূজার সময় পাঁঠাটিকে ধরমঠাকুবের বলি হিসাবে উৎসর্গ করবার পর পাঁঠাটি যদি পূজার 'ফুলে' না 'চরে' অর্থাৎ পূজার পত্রপল্লব ভক্ষণ না করে, তাহলে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করা হয়; তাই তখন সেই পাঁঠাটিকেই দেবতাজ্ঞানে পত্রপল্লবেব অর্ঘ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ কবা হয়। ধবমপূজার ভোজও গোষ্ঠীভোজ। গোত্রের প্রত্যেক সদস্যকে একত্র পঙক্তিভোজনে অংশ গ্রহণ করতে হয়। ভোজ আরম্ভ হবার আগে গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি গাঁয়েব পথে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলে, ভোজ আরম্ভ হচ্ছে, গোষ্ঠীর-গোত্রের যে যেখানে আছো চলে এসো, যে আসবে না তাকে আজ থেকে গোত্র থেকে বাদ দেওয়া হবে। এই ডাককেই 'ধরম ডাক' বলা বলা হয়। গোত্রচ্যুত হবাব আশঙ্কা থাকায় সকলেই এই ভোজ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে। ধরম যে কুর্মিদের সম্প্রদায়গত জীবনে কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছেন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ধরম কুর্মিদের কুলদেবতা, গোত্রদেবতা। কুর্মবাচক ধরম তাই কুর্মিদের টোটেম বা কুলকেতু'ও বটে।

এই ধরমপূজা উপলক্ষে মাহরা গীত গাওয়া হয়ে থাকে। পূজার আগের রাত্রে সারারাত্রি জাগরণ উপলক্ষে এই গীত গাইবার রীতি। ধর্মপূজাকে কেন্দ্র করে যেমন ধর্মমঙ্গলের কাব্যকাহিনী প্রচলিত আছে, তেমনি ঝাড়খণ্ডের ধরমপূজাকে কেন্দ্র করে কাব্যকাহিনী না থাকলেও উপাখ্যানমূলক গীতিকাহিনী প্রচলিত আছে। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

গঙ্গামাহী রাজার একমাত্র কন্যা চান্দাধনী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীরকেস্বামীরূপে পাবার জন্য বার বছর ধরে ধরমের তপস্যা করে। রাজা মেয়ের বিবাহের

জন্য চারদিকে গাজু নাপিত মারফৎ খবর পাঠায়। রাজার পাটহস্তীর ওপর শ্রেষ্ঠবীর নির্বাচনের ভার পড়ে।

চার ভাই গোয়ালা ছিল। ছোট ভাই ছিল পিঠাতি গোয়ালা। তার কোন ছেলেপিলে ছিল না, সবাই তাকে আঁটকুড়া বলে গালাগালি করত। মনের দুঃখে স্বামি-স্ত্রী দু'জনে মিলে অন্য দেশে চলে গেল, সেখানে গোচারণের জীবিকা গ্রহণ করে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু ওখানেও তারা শান্তি পেল না; আঁটকুড়া অপবাদে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অন্ত ছিল না। তখন পিঠাতি গোয়ালা লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য স্ত্রীর পেটের ওপর কাপড়ের পুঁটলি বেঁধে তাকে গর্ভবতী সাজালো। সংযোগবশতঃ এই সময় তারা গোষ্ঠমাঠে দু'টি সদ্যোজাত শিশুকে অসহায় অবস্থায় কুড়িয়ে পায়। তখন পিঠাতি গোয়ালা চারপাশে প্রচার করে দিল যে সখী গোয়ালিনী যমজ সন্তান প্রসব করেছে। দু'টি ছেলের নাম রাখা হল সাঁউরু আর ধাঁউরু। তারা দুজনই অত্যন্ত বলবান, বীর এবং সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। যথাসময়ে তারাও রাজকন্যা চান্দাধনির স্বয়ংবরসভার খবর পায় এবং দুই ভাই সেই সভায় গিয়ে উপস্থিত হয়।

পাটহস্তী সাঁউরুর গলায় মালা পরিয়ে তাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে নির্বাচন করে। চান্দাধনীও তাকে পতিরূপে স্বীকার করে তার গলায় বরমাল্য দান করে। রাজার এক ভাইঝির সঙ্গে ধাঁউরুর বিয়ে হয়।

রাজার মৃত্যুর পর সাঁউরু সেই দেশের রাজা হয় এবং ধরমপুজার প্রচার করে।[২]'

মাহরা গীতের কিছু বৈশিষ্ট্য সহজেই নজরে পড়ে। উপাখ্যানের আদি অন্ত সর্বত্র রাম নামের গুণগান করা হয়েছে। গীতের প্রতিটি কলির শুরুতে রাম নাম জপ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কাব্যরচনার রীতিতে যেমন সরস্বতী আদি দেবতার শরণ নেবার রেওয়াজ আছে, তেমনি মাহরাগীতের গাইয়েও ভবানী সরস্বতীর শরণ নিয়ে থাকে, সে বিশ্বাস করে এর ফলে পূর্বাপর গীতিকাহিনী তার ঠিক মতো মনে পড়বে, কণ্ঠস্বর কাংস্যধ্বনির মতো হবে, জিহ্বা কলমের মতো নির্ভুল দ্রুতগতি হবে। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত উপাখ্যানটি গীতবদ্ধ হলেও সমিল ছন্দোবদ্ধ গীত নয়। আদিম সমাজের গীতধারায় মিল রক্ষা করে গীতরচনার তেমন ঝোঁক আদিকালে ছিল না। যেহেতু মাহরা গীত

২ উপকরণ —শ্রীমনসারাম মাহাত (ধর্মপুজা)

আচারগীতের মতোই রক্ষণশীল, তাই নতুন করে ছন্দোমিল দিযে গীতরচনার তাগিদ কেউকোনদিন অনুভব করে নি। তবে আধুনিকতার ছাপ যে এই গীতে নেই তা বলা যায় না। মাহরা গীত নিতান্তই মুখের গদ্যভাষায় রচিত। সুরের স্পর্শে এগুলো গীতে পরিণত হয়। মাহরা গীত সরাসরি গদ্যে রচিত বক্তব্যধর্মী গীত তাই এই গীতে কবিত্বের প্রকাশ নেই বললেই চলে। সমগ্র উপাখ্যানটি বিপুলাকার বলে মাহরা। গীতের অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হল।

রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম। রামকেরা নাম ভাই রে সন্ঝ্যা কা বিহানে, পাপ যায় দূরে রে ধরম বহি যায়, দেহিয়া এত নিরমালা রে—রাম॥ কারণ পে শরণ মাই গ দেবী গ ভবানী, আগুর কথা আগু মাই গ দিবে স্মরণ করি, পেছুর কথা পেছু মাই গ দিবে স্মরণ করি। বাহা যে ফেঁকবে মাই গ কাঁসাকে সমান, জিব্ভা চালাবে মাই গ কলম সমান, সরসতী ভরা মুখে দিহ রে রাম নাম॥ গঙ্গামাহী রাজার বিটি বাগান করিল, বার বার বছর ভালা তপ যে করিল। তপে ধনি জানিতে পারিল, তপে উহার সিদ্ধি ভালা হইলহইল, তখনযে চান্দাধনি ঘরে চলি আইল॥ রাজার বিটি চান্দাধনি আসরে আসিল, বাসরঘরে আসি ভালা কপাট বিঁড়া দিল॥ তখন যে রানী ভালা জিগ্গাস্ করিল, 'কি জন্যে তুঁই ভালা কপাট-বিঁড়া দিলি, মনের কথা না বলিলে কেমনে জানিব॥' তখন যে চান্দাধনি বলিতে লাগিল, 'আমার সঁগে সত্য যদি করবে করবে, তাহলে আমি যে মনের কথা বলিব বলিব, না হলে ই জীবন আর না রাখিব॥' তখন যে রানী ভালা বলিতে লাগিল, 'সত্যায় বন্দী আমি ভালা হইনু হইনু।' এতেক শুনি চান্দাধনি বলিতে লাগিল, 'আমারি বিহা ভালা দিবে রে জগায়েঁ, ইচ্ছামতন আমি বিহা হইব হইব। যাকে ফুলের মালা দিব যে পর্হাই, সেইটি যে তর জামাই হইবে হইবে॥' তখন যে রানী ভালাবলিতেলাগিল, 'শুনশুন শুন কামিন শুন রে বচন, রাজাকে যে এখন ভালা আস রে ডাকিয়া, আমারকথা চান্দার কথা আসিবি বলিয়া॥' তখন যে কামিন ভালা গেল যে চলিয়া, কামিন ভালা চঁহরি মেলায় ডাঁটায়েঁ বলিল, 'শুন শুন শুন রাজা শুন হে বচন, তুমাকে এখনি যে মহলে ডাকিছে, মহলে তুমি আ'সবে ভালা আ'সবে যে চলিযেঁ॥' তখন যে রাজা ভালা বলিতে লাগিল, শুন শুন শুন মন্ত্রিরি বিচাঁর চালাবে। আমি যাছি মহল ভিতরে॥' তখন যে রাজা ভালা আল্য যে চলিয়ে,

মহলে আসি ভালা জিগ্‌গাস করিল, 'বার বার বছর গেল কবু না ডাকল, আ'জ ভালা কেনে যে ডাকল ॥' তখন যে রানী ভালা বলিতে লাগিল, 'মনের কথা তকে আমি দিব যে বলিয়ে, সত্যায় যদি বন্দী হবে তাহলে মনের কথা বলিব, না হলে ই জীবন আর না রাখিব ॥' তখন যে রাজা-ভালা সত্যায় বন্দী হইল, 'মনের কথা তুমি ভালা দিবে যে বলিয়ে।' এতেক শুনি রানী ভালা বলিতে লাগিল, 'চান্দাধনি বার বছর বাগানে রহিল, চান্দাধনির বিহা দিবে যে জগায়েঁ, ইচ্ছামতন গেহ বিহা হইবে হইবে। যাকে ফুলের মালা দিবে যে পরহায়েঁ, সেইটি তর জামাই হইবে হইবে ॥' তখনযে 'রাজা ভালা বলিতে লাগিল, 'শুন শুন শুন গাঙ্গু শুনবে বচন, চান্দাধনির বিহা ভালা দিব যে জগায়েঁ, দেশে দেশে নিমন্তন যে দিবে, চান্দাধনির বিহা ভালা দিব যে জগায়েঁ ॥' তখন যে গাঙ্গু ভালা বলিতেলাগিল, 'ছয়মাস সময় যদি আমাকে যে দিহ, তাহলে দেশে দেশে নিমন্তন দিব যে জগায়েঁ, না হলে আমি নাই যে পারিব ॥' তখন যে রাজা ভালা ছয়মাস সময় দিল যে বলিয়েঁ। ই দেখি গাঙ্গু লাপিত বলিতেলাগিল, 'দিন ধায় দিবে রে বলিয়েঁ, ছয়মাসের বাদে ভালা আসব করবে ॥' দেশে দেশে নিমন্তন দিল যে জগায়েঁ, রাজাকে যে আসি ভালা দিল যে বলিয়েঁ। চিয়ার বেঞ্চি ভালা দিল যে সাজায়েঁ, চঁংরি মেলায় রাজা দিল যে বসায়েঁ ॥...'শুন শুন শুন হাতী শুনরে বচন, বীরকে যে তুমি ভালা মালা যে পর্‌হাবে ॥' শুণমণি হাতী ভালা শুম দিয়ে রহিল ডাঁঢ়ায়েঁ, একঘণ্টা বাদে ভালা মাথা নাড়া দিয়েঁ দিল যে বলিয়েঁ, 'ফুলের মালা আমি দিব যে পর্‌হায়েঁ তখন ভালা চান্দাধনি গেল যে বাগানে ॥...

॥ দুই ॥

টুস্থা গান

শ্রীচৈতন্য মথুরা যাবার পথে ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার এই অরণ্যভূমিতে তখন থেকেই শুরু হয়েছে, ধরা যেতে পারে।

ঝাড়খণ্ডের 'ভীল্ল প্রায় পরম পাষণ্ড' আদিবাসীদের চৈতন্যদেব কৃষ্ণনামে উন্মত্ত করেছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। সর্বশ্রেণীর জনতার মধ্যে ব্যাপকভাবে এই ধর্মের প্রচার না হলেও কিছু সংখ্যক মানুষ যে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৈষ্ণবধর্মের জাতপাতহীন সমাজের শ্রেণীসমতার প্রতি ঝাড়খণ্ডী জনতার আকৃষ্ট হয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। কুর্মি ভূমিজ-কামার কুমোর-বাগাল আদি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করবার ফলে ধর্মীয় সাধনমার্গও ঝাড়খণ্ডীদের আয়ত্তে আসে। কিছু লোক সাধনমার্গের দীক্ষা নিয়ে 'সাধু' হয়ে যায়, সাধনমার্গের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ যে-গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তাকে ঝাড়খণ্ডে ঢুয়া গান বলা হয়। এই গানের বিষয়বস্তু তাই রাধাকৃষ্ণ, নিমাই-চৈতন্য এবং আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ব। বাংলার-বাউল গানের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের ঢুয়া গান আত্মিক-সম্পর্কযুক্ত। বলাবাহুল্য, ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্বসম্পর্কিত গানগুলো 'উজ্জ্বল নীলমণি'র অনুশাসনের বহির্ভূত নয়।

'ঢুয়া' শব্দটি 'ধুয়া' (ধ্রুবপদ) শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু এই গান শুধু মাত্র ধুয়ো সর্বস্ব নয়। ঢুয়া গান পূর্ণ দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। এ গানে বেশ কয়েকটি 'কলি' থাকে, গানের প্রথম কলির শেষে সাধারণতঃ ধুয়া বা ধ্রুবপদটির স্থান থাকে, তারপর প্রতিটি কলির শেষে ধ্রুবপদটির পুনরাবৃত্তি করা হয়। ঢুয়া গানের কবি সাধারণতঃ সাধনমার্গের সাধু-বাউল বা গৃহী-সাধকেরাই হয়ে থাকেন। প্রতিটি গানের শেষে ভণিতায় রচয়িতার নামোল্লেখ থাকে। গানগুলো পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যায় যে রচয়িতারা ধর্মশাস্ত্র-পুরাণকাহিনী আদির সঙ্গে সুপরিচিত, শুধু তাই নয়, প্রচুর ধর্মগ্রন্থপাঠের ফলে তাদের মধ্যে লোকমানসের উপযোগী একটা মার্জিত শিক্ষিত-মনও আত্মপ্রকাশ করে। তাই ঢুয়া গানগুলো ভাষা এবং রচনা শৈলীর দিক দিয়ে বাংলার বৈষ্ণব রচনাবলীর উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কি শব্দচয়নে, কি ছন্দোকর্মে, কি অলংকারে সবদিক দিয়েই উচ্চসাহিত্যের আস্বাদ এই ঢুয়া গানে মেলে। তাই ঢুয়া গানে এবং বাউল গানের মধ্যে নামের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য লক্ষ্যগোচর হয় না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশের যশোহর জেলার পাগলা কানাই-এর বাউল গানগুলো 'ধুয়া' বা 'শব্দগান' নামেই পরিচিত।

ঢুমা গানের বিষয়বস্তু, আগেই বলা হয়েছে, রাধাকৃষ্ণ, নিতাইচৈতন্য এবং আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ব। একমাত্র দেহতত্ত্ব-সম্পর্কিত নামগুলোই জটিল রূপকের মোড়কে রচিত হয়েছে। উজ্জ্বলনীলমণি-নির্দেশিত তত্ত্বকথা যেমন এ-গানের অবলম্বন, তেমনি লোচনদাসের বৃহৎ নিগম গ্রন্থের সাধনতত্ত্বও এ-গানের প্রাণবস্তু। দেহতত্ত্ব সম্পর্কিত গানগুলো নিঃসন্দেহে তত্ত্বসংগীত সাধনমার্গের লোক ছাড়া এ গানের অর্থ কিংবা রসগ্রহণ অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানেই তত্ত্বগীতি লোকগীতি কি না এ প্রশ্ন ওঠে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'তত্ত্বগীতির সর্বদাই একটি নিগূঢ়ার্থ থাকে—এই নিগূঢ়ার্থ সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলে বিশ্লেষণ করিতে পারে না, ইহা গুরু কর্তৃক বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। সেই জন্য তত্ত্বগীতি লোকগীতির মর্যাদা দাবী করিতে পারে না।'[১] একমাত্র দেহতত্ত্বের গানেই এই জটিল নিগূঢ়ার্থ থাকে। রূপকের দুরূহ ব্যবহার এগানকে সাধারণ মানুষের উপলব্ধির সীমানা থেকে দূরে নির্বাসিত করে রাখে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে এর সুর, গায়নরীতি, আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি লোকসংগীতের বিশিষ্ট পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। যে-কোন সাহিত্য-কর্মের কথাবস্তুর একাধিক অর্থ থাকে; তাছাড়া অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ দুটি স্তরও থাকে। রসগ্রহণের পক্ষে সব সময় যে অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গের পরিপূর্ণ উপলব্ধির প্রয়োজন, তা'ও সম্ভবতঃ ঠিক নয়। দেহতত্ত্বের গানের তত্ত্বকথা 'উজ্জ্বলনীল-মণি' কিংবা 'বৃহৎ নিগম গ্রন্থ' অনুসারে সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারলেও নিজের সীমিত বোধ এবং বোধির সাহায্যে সে একটা অর্থ অবশ্যই খাড়া করে। তার এই উপলব্ধিটি ঢুয়াগানকে লোকগীতির মর্যাদা দিয়ে থাকে।

বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বহু ঢুমা গান রচিত হয়েছে। চৈতন্যদেব স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার; দ্বাপরে যিনি কৃষ্ণ, কলিকালে তিনিই শ্রীচৈতন্য। দ্বাপরে যিনি পীতবসন, বনমালী, বংশীধারী, কলিকালে তিনিই গৈরিক কৌপীনধারী, হরিনাম-মালাকর।

১ কে কাঙাল সাজাল্য ওরে তুই জগতের চিন্তামণি,/ক'রল নেড়া সৃষ্টিছাড়া পরাল্য ডোর কৌপিনী। কইরে বনফুলমালা গলে হরিনামের মালা,/বাঁশি নয় রে নামের ঝোলা দিতেছ হরিধ্বনি। বেশ দেখ্যে বেশ বুঝ্যেছি হে এবেশ তোমার কিসের লাগ্যে,/খেপা বলে যাবার তরে দে রে চরণ দুখানি ॥

---

[১] বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ ২১৪-১৫

২ কার ভাবে হয়ে বিভোর নদীয়ায় হয়েছো গৌউর,/ব্রজপুরে গোপের ঘরে কিসের অভাব ছিল তোর। বনমালা নাই হে গলে তুলসীর মালা গলে দোলে. দু'নয়নে বহে লোর।/নাই হে শিরে শিখী পাখা নেড়ামুণ্ড যায় যে দেখা/ঢাকালে কি যায় হে ঢাকা নয়ন বাঁকা স্বভাব তোর। রাধা নামের সাধা বাঁশি রাধা নামে বাজত দিবানিশি / সে বাঁশি তোর কিসের দোষী অধর ছাড়া হল তোর। কার ভাবে হযে মগন কালরূপ করেছ গোপন/যে ধরাল সোনার বরন বেণী কয তার কঠিন জোর ॥

এই গৌউরহরি ভবজ্বালা-নিবারণের একমাত্র কাণ্ডারী। তাঁর দেওয়া হরিনাম ভবযন্ত্রণার একমাত্র মহৌষধ। হরিনাম উচ্চারণ করলে পাপতাপজ্বালা সব দূরে চলে যায়। কিন্তু সংসারাসক্ত মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে থাকে, হরিনাম উচ্চারণ করতে সে কার্পণ্য করে। তাই যখন জীবনের দিনগুলো ফুরিয়ে আসে, তখন অসহায় বেদনায় আর্তনাদ তোলে।

৩ কে জানে প্রভুর লীলা সংসারে অপার খেলা হে/অপারে পার হবি কিসে হল না চেতন হে, / জেনে কি জান না মন, যে দিন ধরিবে শমন হে।/ কারো না মিলে অন্নভোগ কারো কত ঘটে রোগ হে/কার স্বর্ণথালে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন হে। কারো না মিলে ছিঁড়া চেটা কার বা মশারী খাটা হে/ কার লেপবিছানা বাবুয়ানা কার সিংহাসন হে। বিষ্টু কয় দেখ দেখি ধরবে যেদিন হিসাব বাকি হে/তারে দিতে নারবে ফাঁকি করবে বন্ধন হে ॥

মানবজন্ম বহু পুণ্যফলেই সম্ভব। অথচ মানুষ অবহেলায় এই দুর্লভ জন্মকে বিফল করে, ধনযৌবন নিয়ে অকারণে অহঙ্কার করে। জীবনের সাধনা করলেই যে আসল সুখ এবং প্রেমের দর্শনলাভ সম্ভব তা মানুষ ভুলে থাকে।

৪ বহুত পুণ্যেরই ফলে পেয়েছ জন্ম মহীতলে রে/দেখরে মন বিফলে এ জনম যেন যায় না রে। মনরসনা, এই বেলা করে লও সাধনা। জীবনযৌবন ধন এই না রবে রে চিরদিন / তার ভরসা কর কেন এ জনম আর হবে না রে। ভাব করিবে সুজন জান্যে জয় করে লও তিন গুণে রে / প্রেমের উদয় হবে দিনে দিনে সময় গেলে হবে না রে। বিষ্টু অনাথে ভণে পড়ে গুরুর শ্রীচরণে রে, / তাই ত ভাবে মনে মনে আমারে কি ঘটবে না রে ॥

দুর্লভ জন্মের ফলে যে মানবদেহ, পরবর্তী গানে সেই মানবদেহকে জমিরূপকে প্রকাশ করা হয়েছে। ভক্তিরূপ কোদালের সাহায্যে পাপরূপী ঘাস বিনাশ করে

গুরুদত্ত মহামন্ত্রের বীজ রোপণ করতে পারলে তবেই মানবজন্ম ফুলে-ফলে ভরে উঠতে পারে।

৫ মনরসনা, মানবজমিন আবাদ করলি না,/ হলে সন আখেরী মালগুজারী দিতে হবে জান না। আশি লক্ষ বার ঘুরে কত কষ্ট ভোগ করে / চৌদ্দ পোয়া জমিন পেলি দেখ মনে করে, / এমন সাধের জমিন রাখলি পতিত চাষ দিলে ফলত সোনা। ও মন শুন তোরে বলি ধর ভক্তি-কোদালী / পাপরূপী ঘাস কর বিনাশ দাও তুলে ফেলি, / গুরুদত্ত মহামন্ত্র রে বীজ রোপণ তায় করলি না। তোর সঙ্গে ছ'জনা কিছুই করতে দেবে না, তারাই খায় তোমায় মজায় তা'ও কি জান না, / ছাড় তাদের সঙ্গ রে গৌরহরির চরণ কর সাধনা ॥

হরিনামের মাধ্যমে শ্রীহরির ভজনা এবং চরণসাধনা করলে তবেই সংসার সাগরে উত্তরণ সম্ভব। অনন্ত বাউল লুচির রূপকে হরিনামের গুণকীর্তন করেছেন গানটিতে।

৬ হরিনাম গরম লুচি রে তুই গরম গরম খেয়ে লে না রে / যাবে তোর সংসারক্ষুধা এমন জিনিস খেতে সুধা এমন সুধা আর পাবি না রে। রসনা পাতা পেতে বস না খেতে এক গ্রাসেতে খাল খানা / ছত্রিশ জাতি একত্রে বসে খাবে রে এ খানাতে জাত যাবে না রে। হরিনাম সোনার লুচি যদি ছুঁয়ে মুচি তবু অশুচি হবে না / নামে যার হয় রুচি কাল না বাছে শুচি ও অশুচি বাদে না রে। অনুরাগ ছানার ডালে মিশায়ে খেলে আর ত ভুলতে পারবি না। সর্প [illegible] সঙ্গ করবি যদি তোর পূর্ণ হবে মনবাসনা রে। আনন্দময় হরির রসে মিলবে শেষে রসগোল্লা আর মিহিদানা / পাঁচভাবের মণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা ঠাণ্ডা হবে তোর মন রসনা রে। কলিতে ধন্য ধন্য জীব তরিবার জন্য শ্রীচৈতন্যের গণ্ডবাগান (?) / বিলাচ্ছেন গাম্ভার দাস সম্বর দরে গৌড়ের নিতাই ভাই দু'জনা রে। হরিনাম খাজের বাজা ঘৃতে ভাজা আর ত পেটে সইবে না / অনন্ত তুমি মুড়ি খেয়ে বুড়িয়ে গেলে লুচির আস্বাদ জানলি না রে ॥

কিন্তু শুধু হরিনাম উচ্চারণ করলেই কি গৌরাঙ্গলাভ সম্ভব, কিংবা মুক্তি করায়ত্ত হবে? লোক দেখানো তিলকমালা গৌরাঙ্গ লাভের উপায় নয়, অনুরাগী গুরুর কাছে প্রেমের সাধনার পথ জেনে নিতে পারলে গৌরাঙ্গের প্রতি প্রেম-অনুরাগ জন্মাবে—তখন সংসারের বাঁধন একে-একে কেটে যাবে।

৭ এমনিই গোউর পাব কিসে গোউর পাবার মন আলাদা তোর মনে না মিশে। লোকদেখান তিলকমালা কোন্ কাজেতে আসে। যেমন ডুব দিয়ে জল খেলে পরে কি করিলে একাদশীর উপবাসে। বাহিরে কোঁচার পত্তন ছুঁচার কীর্তন বাসে। কেন দেখিলে না চক্ষু মেলে মায়া-মদ খেয়ে রয়েছ বেহুঁসে। অনুরাগ নইলে না পাই গোউর বলেছিলেন গোউর দাসে। আগে রাগের ঘরে শিক্ষা কর অনুরাগী গুরুর পাশে। গোউর প্রেম অনুরাগ যার জন্মেছে সে কি থাকে ছার গৃহবাসে। চিতে চিন্তামণি গোউর পদ সাধুসঙ্গ মিশে। খেপা বলে ভজনসাধন কিছুই না আসে। জগাইমাধাই তরে গেছে আমি সেই ভরসায় আছি বসে॥

তাই বৈষ্ণবসাধকদের কাছে 'রাগের ঘরে শিক্ষা', কাম এবং প্রেমের স্বরূপ শিক্ষাই আসল সাধনা। যতোক্ষণ না সমর্থা রতির উদ্ভব হচ্ছে অর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছাহীন হয়ে কৃষ্ণসুখের জন্য ব্রজগোপীদের প্রেমের মতো সম্ভোগ-কামনায় কৃষ্ণের আত্মার সঙ্গে একাত্মীভূত হচ্ছে, ততোক্ষণ এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়।

৮ শ্রীরাধিকার শ্যাম পিরিতি সেই ত পিরিতির রীতি। পিরিতি করিতে জানে ভাল হয়। বেদের উপরে পিরিতি সর্বশাস্ত্রে কয়। পিরিতি সামান্য নয় পিরিতি বড় রঙ্গে হয়। কুলশীল ত্যাগিয়ে পিরিতে মন মজাইয়ে তবে পিরিত করা ভাল হয়। গোপনে করিলে পিরিত সেও ত সদর হয়। পিরিতের নাই আগাগোড়া বেদ-বিধি দুই ছাড়া কিন্তু নিয়ত ভাণ্ডমধ্যে রয়। ঐ পিরিতে যে মজেছে তার সফল জন্ম হয়। কৃষ্ণ পতি কৃষ্ণ পতি বেণী মনে করেন স্থিতি সাধন বলে যদি সিদ্ধ হয়। আমি ছাড়ব না তোমার পিরিতি কৃষ্ণ দয়াময়॥

মানবদেহ রহস্যের আকরবিশেষ। এই দেহের মধ্যেই আছে কাম আর প্রেম, আছে পরমরতন অমূল্যধন; আছেন অধরা অরূপরতন পরশমণি স্বয়ং জগৎপতি। কিন্তু সেই মনের মানুষ, সহজ মানুষকে পেতে গেলে গুরুর কৃপা ছাড়া তা সম্ভব নয়; গুরুসেবা এবং সাধুসঙ্গ ছাড়া সেই রূপাতীতকে উপলব্ধি করা যায় না।

৯ আসা-যাওয়া যেই পথে ভজনসাধন তাথে মিলে না তা সাধুসঙ্গ বিনে। বুঝ মনে, অরসিকে রসের মরম কিবা জানে। সাত সমুদ্রে থাকে জল ফুটে শতদল কমল নিকটেতে ভেক তা না জানে। নিকুঞ্জ কাননে ঘর

সেখানে থাকে ভ্রমর সুগন্ধেতে আসে মধুপানে। বিষ্টু অনাথে ভণে পড়ে গুরুর শ্রীচরণে দয়া বুঝি হল না অধীনে ॥

১০ গুরুসেবা বিনা কেবা পেয়েছে দরশন | ঘরে রইল ধন, চিনতে নারিলি রে মন। খুঁজে বুল হাটে মাঠে তার কি বে মন বিষয় খাটে মনের বাসনা না মিটে | মনের মূলে সে ধন মিলে করিলে অন্বেষণ। সে-ঘবের দশ দরজা মালিক রাজা পাবে মজা জানে তার হয় না খুঁজা | ঐ ঘরের ঈশান কোণে যেজন জানে লাভ করে অমূল্য রতন। এমনি মন অবোধ হলে সাত কুপথে চলে বারণ করি তায় না শুনিলে | বিষ্টু বলে গোলেমালে এ জন্ম গেল অকারণ ॥

১১ রতনমণি বিরাজ করে এই ঘরে, কে চিনতে পারে | (তারে) চিনতে পারলে যাবি তরে ভয় রবে না এ সংসারে। সেই যে পরমরতন তারে কর রে যতন, যতনে রতন মিলে হে শাস্ত্রেরই বচন | ওবে কি করিবে শমন দমন আপনি পালায় ঘুরে। সে ত ঘরের মত ঘর, দেখ তার বাহির ভিতর, স্থানে স্থানে বসেছে হে বত্রিশ অক্ষর | ওহে ষোলকলা করছে খেলা সতত নিরন্তরে।…বিষ্টু অনাথেতে কয় সহজে পাবার নয়, সাধনে সাধ্য করলে অবশ্য তা হয় | আকারে ওঙ্কারে আছে দেখ বেদের সেই পারে ॥

রতনমণি বিরাজ করে যে ঘরে, সেই মানবদেহগঠনের আশ্চর্য কারিগরি সাধকদের বিস্মিত করছে। যে কারিগর এমন ঘর তৈরী করেছিল, তাকে বলিহারি দিতে হয়। চৌদ্দ পোয়া দেহের ভেতর কতো বিচিত্র ধরনের ঘর, কতো বর্ণের ঘর। কোথাও বা মণিময় কোঠা; কোথাও-বা রতনদীপ মাণিক জ্বলে, কোথাও বা চন্দ্রসূর্যের অনির্বাণ আলো। এর ভেতরে কোথাও নদী কোথাও বা সুড়ঙ্গ; কোথাও হংস-হংসিনী খেলা করে বেড়াচ্ছে, কোথাও অম্লান শতদল ফুটে আছে যুগ যুগ ধরে। আর এরই মধ্যে রয়েছে সেই পরমপুরুষ অরূপরতন।

১২ ধন্য কারিকর, ও যে গড়েছিল এমন ঘর | সে কারিকুরি বলিহারি সে মিস্ত্রির কোথায় ঘর। ঘরের দরজা নয় খান, ও তার সকলই প্রমাণ | অসংখ্য জানালা আছে কে করে অনুমান | ঘরের মাথা চৌদ্দ পোয়া চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর। ঘরের প্রাচীর সপ্তপুর, সাধু-সন্ন্যাসী যেতে পারে অন্যের পক্ষে দুর | সেথা লাগে ধাঁদা চাকাচাঁদা প্রবেশ করা কষ্টকর।

ঘরের মুল তিন খুঁটি বেশ পরিপাটি/দড়াদড়ি বাঁধাকষা সাড়ে তিন কোটি/আছে পাঁচবরনের পাঁচবরনের পাঁচকুঠরি মনোহর। ঘরের ছয়তালা কোঠা বেশ আঁটাসাঁটা/সবার উপর আর একতালা মণিময় কোঠা/সেথা দিবানিশি মাণিক জ্বলে কর্তা বসে তার উপর। ধন্য মিস্ত্রির কৌশল ও তার ধন্য বুদ্ধিবল | এঘর কলে চললে এমনি চলে তেমনি ধারা কল | ওরে কখন ঘরের কি অবস্থা কভু স্থাবর কভু অস্থাবর। একথা মিথ্যা নয় ঘরের মানুষ যথা যায় | জলে অনলে এক মিশালে একত্রেতে রয় | আছে সাধু-চোরে রাক্ষস-নরে বিষ-অমৃতে একত্তর। ও নিতাই ভেবেছিলেন তাই, ঘরের অন্ত কিসে পাই | ঘরে থেকে কর্তার সঙ্গে আলাপ হল নাই | আমি দেশ-বিদেশে খুঁজে বেড়াই না জানি ঘরের খবর

১৩ এমন সুডঙ্গ আছে তরুলতা আছে / লতার শিকড় নাই আচ্ছা ফুল ফুটে আছে, পণ্ডিত বুঝ পাছে কত শত যুগ গেছে ফুল ফুটে আছে / এমন ফুলের ভাগ্য শুকায়ে না পড়িছে ॥ (অধম কিনু)

১৪ চৌদ্দ ভুবন মাঝে একটি নদী আছে ... নদ নদী ... সভুর পাকার/বান না ছাড়লে নাইক পারাপার। একদিন ... সাতদিন ... স্থল নাই তার অগাধ সাঁতার লাড়া নৌকা ... ঘাটে ... ছুটে ইচ্ছামতে হুঁসিয়ারে নামবে জলে দেখ খবরদার ॥ (ভুগারাম দাস)

১৫ মহাশূন্য একগাছে হংস-হংসিনী আছে তারা কি ... ভাব বানছে / কোন সুখে আছে তারা বিরূপে দাঁড়িয়ে | হে পণ্ডিতজন দেই বিচার বয়ে।...সেই হংস ... ছলে মাথা ডুবায়ে জলে পাখর ... উপরে ... সবার উপরে। হেন গোবিন্দের উক্তি কি জানি হংসের স্থিত সংসারে জন্মিয়ে / জ্বলিছে রতনদীপ জলেতে থাকিয়ে ॥

সাধনতত্ত্ব এবং দেহতত্ত্বসম্পর্কিত গানগুলো জটিল এবং দুরূহ রূপকের মাধ্যমে রচিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ গানের অর্থভেদ করা সত্যই অসম্ভব ব্যাপার। গুরু সাধারণতঃ শিষ্যদের মধ্যে এ গানের অর্থ বিশ্লেষণ করে থাকেন। যেহেতু এ-সমস্ত গান সাধন ভজনের গোপন করণ কারণ, তাই সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য এবং দুরধিগম্য করেই এসব গান রচনা করা হয়েছে। চর্যাপদের ক্ষেত্রে যেমন প্রহেলিকাময় ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তেমনি টুয়া গানেও এক সব ক্ষেত্রে প্রহেলিকার ব্যবহার করা হয়েছে। বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বে যাঁদের অধিকার আছে একমাত্র তাঁরাই এসব গানের অর্থ এবং রস উপলব্ধি করতে

পারেন। অনেক গান তো পরিপূর্ণতঃ ধাঁধারই মতো। ধাঁধার সঙ্গে মূল পার্থক্য এই যে টুয়ার রূপক ধাঁধার রূপকথেকেঅনেক বেশি জটিল এবংদুর্বোধ্য, ধাঁধার উত্তরটি জনশ্রুতিমূলক, কিন্তু টুয়া গানের প্রহেলিকার উত্তর বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব-মূলক।

১৬ ভাবি কথা হে, এ ভেদ অর্থ ভাব পণ্ডিতভ্রাতা। ভুলে জন্ম পিতামাতার না হয় পিতামহ কোলে নাতির উদয় / ভবে এ শুনেছ কোথা, / গাভী বিবহিনী না হতে গর্ভিনী বাছুরেতে খাচ্ছে পাতা হে। ভিতরে তরীর সমুদ্র ডুবে ভিজে না বসন সলিলে কবে / ভিজা কাষ্ঠে অগ্নি কোথা, / ভ্রমর ছাওয়ালে পদ্মমধু ভুলে ভেকে ফণী গিলে কোথা হে। ভয়ে কাঁপে সিংহ শশক মুখ হেবে, উভি পোকা হয়ে ভল্লুকে সংহারে / ভুল নহে শাস্ত্রকথা, / ভূগোলেতে কহে গাভী ঘর ছাহে বাঘে ধবে আছে ছাতা হে। ভর্তাগৃহী মবে পরলোকে যান ভার্যাসতী না হন বিধবা বিধান/ভক্তেতে না দোষে কথা,—ভণ্ড বিষ্ণু ভণে পাষণ্ড অজ্ঞানে ভক্তিপদে রাখি মাথা হে॥

সবশেষে আমরা একটি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক টুয়া গান পরিবেষণ করছি। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর গানগুলো গৃহী বৈষ্ণবেরা গেয়ে থাকেন। খুরমাদল বাজিয়ে এই শ্রেণীর টুয়া গান গেয়ে বৈষ্ণবেরা গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষা করে বেড়ান। সাধনতত্ত্ব এবং দেহতত্ত্ব সম্পর্কিত গানের মতো এগুলো মোটেই জটিল বা দুর্বোধ্য নয়। অন্যান্য গানের মতো এইসব গান সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে, রসগ্রহণও করতে পারে। ঝুমুরের সঙ্গে এগানের বিষয়বস্তু কিংবা রচনারীতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধুমাত্র সুরে এবং অনুষঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে।

১৭ নূতন রাজা হে, শ্যামাপাখি চুরি গিয়েছে, | শ্যামা শ্যামা বলে পাখি শ্যাম-বরন ধরেছে। রাই আমাদের চন্দ্রমুখী পুষেছিলেন শ্যামাপাখি | শিকলি কেটে শ্যামাপাখি রাধায় ফাঁকি দিয়েছে। পাখির গায়ে পাখির চিহ্ন হস্ত-পদ রক্তবর্ণ | ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছে। পাখির উপর পাখির পাখা জোড়াভুরু নয়ন বাঁকা | চলিতে চরণ বাঁকা বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে। পাখি খুঁজলাম দেশবিদেশে পাখির সন্ধান পেলাম শেষে | মথুরাতে আছে পাখি কুব্জায় ধরে রেখেছে। ভরত গোসাঁই-এর সাজা উচিৎ বিচার করবেন রাজা | মনোমত দিবেন সাজা যেমন কর্ম করেছে॥

চতুর্থ অধ্যায়
বারোমেসে প্রেমসংগীত

ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট লোকগীতি ঝুমুরকে সাধারণতঃ বারমাস্যা বা বারোমেসে গান বলা হয়ে থাকে, কারণ ঝুমুর কোন বিশেষ ঋতু, মাস বা সময় সীমানার মধ্যে গীত হয় না। ঝুমুর সারা বছর ধরে গাওয়া হয়, সময়-অসময় বিধি-নিষেধ ঝুমুরের ক্ষেত্রে নেই। ঝুমুরের বিষয়বস্তু মূলতঃ প্রেম, কখনো এই প্রেম দেহবলয়মুক্ত, কখনো বা দেহকেন্দ্রিক। তাই ঝুমুরকে প্রেমগীতি বলা যায় নির্দ্বিধায়; তবে ঝুমুরের বিষয় শুধুই প্রেম, এমন কথা বলা যায় না। প্রেমের অতিরিক্ত নানান চিন্তা-ভাবনাও ঝুমুরের বিষয় হয়ে থাকে। ঝুমুর মূলতঃ প্রেমনির্ভর বলে এবং প্রেম-গীতি সারা বছর ধরে গাওয়া হয় বলে আমরা এই অধ্যায়টিকে বারোমেসে প্রেমসংগীত নামে অভিহিত করেছি। তবে ঝুমুর নামে অভিহিত করলেও ভুল হয় না।

জাওয়া এবং কাঁঠি নাচের গানকে বাদ দিলে করম নাচের গান, ছৌনাচের গান এবং নাচনী নাচের গানকে ঝুমুর বলা হয়। আসলে নাচের গানই ঝুমুর। সুদূর অতীতে ঝুমুরের রূপ করম নাচের গানের মতোই ছিল বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পড়লে স্বল্পশিক্ষিত লোক-কবির রচিত গানগুলো ভণিতায় ব্যক্তিনামাঙ্কিত হয়ে ঝুমুর পদাবলী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু নাচের গানমাত্রই ঝুমুর হলেও বর্তমানে ব্যক্তি-কবি রচিত দীর্ঘাবয়বের গানগুলোই ঝুমুর নামে পরিচিত। তবে সব সময়ই যে ব্যক্তিকবির নামাঙ্কিত গানগুলোই ঝুমুর নামে পরিচিতি লাভ করে তা নয়, উদয়া বা টাঁড় ঝুমুর ব্যক্তি-কবি রচিত নয়, এগান সামূহিক সৃষ্টি।

বারোমেসে প্রেম সংগীতকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ঝুমুর, (২) ভাদরিয়া ঝুমুর, (৩) ঝুমুরের রং, (৪) রং ঝুমুর এবং (৫) উদয়া বা টাঁড় ঝুমুর। ঝুমুর, ভাদরিয়া এবং রং ঝুমুর ব্যক্তি-লোককবির রচিত গান এবং ঝুমুরের রং ও উদয়া গান সম্প্রদায়ের সৃষ্ট অপৌরুষেয় গান। অনেকে নাচনী নাচের ঝুমুর নামে আর একটি শ্রেণীর কথা বলেন; আমরা তা বলি না, কারণ ঝুমুর, ভাদরিয়া ঝুমুর, ঝুমুরের রং এমন কি কিছু-কিছু প্রহেলিকা-জাতীয় টুয়া গানও নাচনী নাচের গান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই অধ্যায়ে যে সব গানের আলোচনা করা হবে, সেগুলো প্রধানতঃ

প্রেমবিষয়ক। নর-নারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলে যে বেদনামধুর ভাবরাশি তাদের মানসলোকে আলোছায়ার সৃষ্টি করে, সেই সব ভাবরাশিই এই গানগুলোর উপজীব্য। এই বেদনা-মধুর ভাবরাশির মধ্য দিয়েই নর-নারীর প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ পায়। প্রেম বিশ্বজনীন; অরণ্যে গিরিগুহায় যেসব অসভ্য আদিবাসী বাস করে তাদের হৃদয়ে যে প্রেমের দোলা দেখা দেয় তা সুসভ্য নাগরিক জন-চিত্তের প্রেমের দোলা থেকে পৃথক নয়। পার্থক্য শুধু প্রকাশ-ক্ষমতায় এবং ভঙ্গিতে; অসভ্য আদিবাসীরা ভাষাসম্পদ এবং শিক্ষা ও মননশীলতার অভাবে সভ্য শিক্ষিতজনের মতো সুন্দর মার্জিত রূপে নিজেদের অন্তর-ভাবনা প্রকাশ করতে পারে না, স্বভাবতঃই তাদের প্রকাশভঙ্গিতেও আদিমতা এবং গ্রাম্যতা থেকে যায়। বলাবাহুল্য, আদি-বাসীদের প্রেম-বিষয়ক গানগুলো স্থূল-ভাবনায় ভরপুর থাকে, শিক্ষা এবং মননশীলতার অভাবে গীতরচনায় দক্ষতা এবং অনুভূতির ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু প্রেমের স্থূল দিকটিই প্রধানতঃ তাদের গানে রূপলাভ করে, তাই এগুলোকে অনেকে প্রেমসংগীত হিসাবে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। আমরা এইসব গানকেও প্রেমসংগীত বলে মনে করি। দেশবিদেশে প্রেমের রীতিরেওয়াজ, ভঙ্গি এবং অনুভূতির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও প্রেমের মৌল উপলব্ধি সর্বত্রই এক; এবং এই উপলব্ধি যে-গানের উপজীব্য তা নিঃসন্দেহে প্রেমসংগীত। নরনারীর পরস্পরের প্রতি জৈব-আকর্ষণ থেকেই প্রেমের উদ্ভব হয়; তাই প্রেমের অনুভূতির ক্ষেত্রে যে স্থূলতা, তা যদি গানেও দেখা যায়, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহলে সেই গান যে প্রেমগীতিই তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না।

জনৈক লোকসাহিত্যবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলেন, যথার্থ প্রেমগীতিতে অশ্লীলতা কিংবা গ্রাম্যতা নাকি থাকা সম্ভব নয়, কারণ এগুলো প্রেমের নিতান্ত বাহ্য, স্থূল প্রকাশ; প্রেমগীতির উদ্ভব হৃদয়ের গভীর অনুভূতি থেকে ঘটে থাকে। এপ্রসঙ্গে একটি কথাই বলা যেতে পারে যে সমতল বাংলার জনতার হৃদয়ানুভূতি এবং ঝাড়খণ্ডের আদিম জনতার অনুভূতি একই ভাষায়, একই রীতিতে প্রকাশ লাভ করবে, এটা ভাবা ঠিক নয়। সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজব্যবস্থা এবং রীতিরেওয়াজের ওপর নির্ভরশীল। সমতল বাংলা এবং ঝাড়খণ্ডের সমাজব্যবস্থা এবং রীতিরেওয়াজ এক নয়, তাই প্রেমগীতির রূপও এক হতে পারে না। ঝাড়খণ্ডের আদিম জনতার প্রেম-

গীতিতে স্বাভাবিকভাবেই স্থূলতা এবং গ্রাম্যতা আসবে, তাতে সন্দেহ কি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ঝাড়খণ্ডের প্রেমসংগীত ঝুমুরকে আঞ্চলিক গান হিসাবে উল্লেখ করেছেন, কারণ এগান বাংলার সর্বত্র শোনা যায় না। তিনি বাংলার প্রেমসংগীত বলতে প্রধানতঃ ভাটিয়ালি গানকে বুঝে থাকেন, কিন্তু ভাটিয়ালি গান তো পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বাঁকুড়ায় শোনা যায়না, তাহলে তা বাংলার সার্বজনীন প্রেমসংগীত কোন গুণে হয়ে ওঠে আমরা বুঝতে পারি না, অবশ্য বাংলার পশ্চিমাঞ্চলকে যদি বাংলার অংশ না মনে করা হয়, তবে বলার কিছু থাকে না। অথচ তিনি ঝাড়খণ্ডের আঞ্চলিক নৃত্য ছো নাচকে বাংলার বিশিষ্ট নৃত্য-সম্পদ হিসাবে দাবি করেন এবং গৌরব বোধ করেন, যদিও এই নৃত্য তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে একান্তই আঞ্চলিক নৃত্য হওয়া সংগত।

॥ এক ॥

ঝুমুর

ঝুমুর ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট প্রেমসংগীত। আগেই বলা হয়েছে, করম নাচের গান, ছো নাচের গান, নাচনী নাচের গানও ঝুমুর নামে পরিচিত। তবে সাধারণতঃ দীর্ঘায়তনের প্রেমসংগীতগুলো, যা নাচনী নাচে যেমন গীত হয়, তেমনি এককভাবেও গীত হয়, ঝুমুর নামে পরিচিত। অতি প্রাচীনকালে ঝুমুর ছো নাচের গান বা করম নাচের গানের মতোই স্বল্পায়তনের হত। পরবর্তীকালে ঝাড়খণ্ডী জনগণ যখন বিস্তারিতভাবে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা অর্জন করে, তখনই ঝুমুর বর্তমানের পূর্ণাবয়ব লাভ করে। করম নাচের গান ও ছো নাচের গানে প্রেমের প্রকাশ থাকলেও নির্ভেজাল প্রেমসংগীত নয়। কিন্তু ঝুমুর মূলতঃ প্রেমসংগীত। বৈষ্ণবপ্রভাবের ফলে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাও ঝুমুরের অঙ্গীভূত হয়, বলা যেতে পারে লৌকিক প্রেমের চেয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমই শেষতক ঝুমুরের শ্রেষ্ঠ অংশ অধিকার করে ফেলে। তাছাড়া পৌরাণিক ঘটনা এবং সামাজিক বিষয়ও এর উপজীব্য হয়ে পড়ে।

ঝুমুর সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীরকুমার করণ আদি অনেকেই তাঁদের বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। পণ্ডিতদের আলোচনায় দেখা গেছে, তাঁরাও এই গানকে প্রেমসংগীত হিসাবে স্বীকার করেন। ষোড়শ শতকের গ্রন্থ সঙ্গীতদামোদরে ঝুমুর শৃঙ্গাররসাত্মক একটি রাগিণী হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। কেউ বা বলেন, নৃত্যের সময় পায়ের নূপুর বা ঘুঙুরের ঝুম ঝুম শব্দ থেকে শব্দটির উৎপত্তি, অন্য কথায় তাঁরা বলতে চান যে ঝুমুর গান ও নৃত্য-সম্পর্কিত। নাচনী নাচের গান হিসাবে ঝুমুরের ব্যবহারের কথা স্মরণে রাখলে এযুক্তি অসম্ভব মনে হয় না। বিভিন্ন গানেও ঝুমুর খেলার কথা আছে, এবং এই ঝুমুর খেলা যে আসলে ঝুমুর নাচই তা'ও গান থেকেই প্রকাশ পায়। আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট করবার জন্য নিচে কয়েকটি করম নাচের গান উদ্ধৃত করা হল।

আ'জকের রাতিয়া বড়ই রে জল করলি
জান পলই হাতে ডাটম ধরলি।
জড়লি রে জুড়লি, মধনে ঝুম'র জুড়লি ॥
আখড়া বন্দনা করি আগড়াতে ঝুরো মরি
আখড়া বন্দনা রেজনারী, মগনে ঝুম'র লাগে ভারি ॥
আগেতে বন্দনা করি গাঁয়ের গরাম হরি
তা পরে বন্দনা রেজনারী, ইঙ্গিতে ঝুম'র লাগে ভারি ॥
আস্ত মা সরসতী কণ্ঠে দাও ভর গ,
তবে আমি খে'লব ঝুম'র ॥
আস গ নাচনীরা | নাচ জুড়িয়ে খেলা করি ॥

গানগুলো থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথম গানটিতে মাছ ধরতে গিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে 'ঝুমুর জুড়বার' কথা আছে। অর্থাৎ ঝুমুর নৃত্যনিরপেক্ষ বিধিনিষেধহীন স্বাধীন সংগীত বটে। পরবর্তী দু'টি গানে 'ঝুমুর লাগবার' কথা আছে। এই ঝুমুর লাগা কথাটির অর্থ গান বা নাচ অথবা উভয়েই জমে ওঠা। চতুর্থ গানে 'ঝুমুর খেলা' পাওয়া যাচ্ছে; খেলা অর্থে গান এবং নাচ যে-কোনটি হতে পারে, অথবা দুটোই হতে পারে, তবে খেলা অর্থে নাচের দাবিটাই সংগত বলে মনে হয়। শেষ গানটিতে 'খেলা' শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট হয়েছে, এখানে নাচ জুড়ে খেলার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ঝুমুর খেলা বা শুধু খেলার অর্থ যে নাচ তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। তাছাড়া করম নাচের গানও যে ঝুমুর, তা'ও বোঝা যায়।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বিশদ আলোচনার সাহায্যে ঝুমুর গানকে 'সাঁওতাল জাতির মৌলিক প্রেরণা-জাত' গান হিসাবে প্রমাণ করবার প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে ঝুমুর গান সাঁওতাল পরগণা জেলার মুণ্ডাভাষী (?) সাঁওতাল জাতির মধ্যেই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে কষ্টকল্পিত এবং ভিত্তিহীন তা ডঃ সুধীর কুমার করণ তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার লোকযানে' প্রদর্শন করেছেন। এটা অবিসংবাদিত সত্য যে সাঁওতালদের মধ্যে ঝুমুর নামের কোন সুর কিংবা গান প্রচলিত নেই। ডঃ ভট্টাচার্য ঝাড়খণ্ডী উপভাষা যেখানেই বুঝতে অসমর্থ হয়েছেন, সেখানেই সাঁওতালি ভাষা বা অন্য কোন ভাষার মিশ্রণের উল্লেখ করেছেন। 'সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর' কথাটি 'সোনার পাথরবাটি'র মতোই অসম্ভব বস্তু ছাড়া কিছু নয়। সাঁওতালদের মধ্যে যদি কিছু ঝুমুর গান অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে, তবে তা মাহাত-ভূমিজ কামার-কুমোর বাগালের প্রতিবেশী হিসাবে বাস করবার ফলেই ঘটেছে। আমরা অস্বীকার করি না যে, ঝুমুর আদিবাসীদের মৌলিক প্রেরণাজাত গান, কিন্তু সাঁওতাল উপজাতি এই আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য ডঃ ভট্টাচার্য আদিবাসী বলতে সাঁওতাল ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের কথা সহজে ভাবতে চান না। তিনি ঝুমুর প্রসঙ্গে ওরাঁও জাতির ঝুমুরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু ওরাঁও মুণ্ডাদের গানের বিশ্লেষণ না করে অস্ট্রিকভাষী সাঁওতালগোষ্ঠী বর্তৃক গৃহীত কুর্মি-ভূমিজের গান বিশ্লেষণ করে ঝুমুরের উৎস সন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন। কুর্মি-ভূমিজ কামার-কুমোর বাগাল আদিদের মধ্যেই ঝুমুরের ব্যাপক প্রচার। রাঁচি জেলার ওরাঁও মুণ্ডাদের ঝুমুর গানের গায়নরীতি, সুর এবং বাজনা আলোচ্য ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ঝুমুরের সঙ্গে মেলে। আসলে ঝুমুর দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গান, এই সব সম্প্রদায় সাধারণতঃ ভারতীয় আর্যভাষার কোন উপভাষা কিংবা বিভাষায় কথা বলে এবং গানও রচনা করে। ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষায় যারা কথা বলে থাকে, তাদের অধিকাংশই মূলতঃ আদিবাসী, যদিও অনেক সম্প্রদায়ই বর্তমানে হিন্দুত্বলাভের চেষ্টা করছে। সমতল বাংলার বাঙালীরা, কোনদিনই ঝুমুরকে আপন গীতসম্পদ হিসাবে আত্মস্থ করে নি, ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী কিছু বাঙালী লোককবি নিতান্ত নাচনী নাচের আকর্ষণে ঝুমুর গান সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছিল। বৈষ্ণবপ্রভাবের ফলে ঝুমুরে রাধাকৃষ্ণের অনুপ্রবেশ ঘটে। ডঃ ভট্টাচার্যের মতে

বাঙালীরা রাধাকৃষ্ণের নাম যোগ করে আদিবাসীর সাংস্কৃতিক উপাদান ঝুমুরকে নিজের লোকসংস্কৃতির স্বাঙ্গীকৃত করে নেয়। অর্থাৎ লৌকিক প্রেম-বিষয়ক ঝুমুরগুলো বাঙালীসংস্কৃতির অঙ্গীভূত হতে পারে নি। ঝুমুর কোনদিনই বাঙালীর সাংস্কৃতিক উপাদান হয় নি। সত্যিই ঝুমুর ঝাড়খণ্ডের নিজস্ব প্রেমসংগীত' বাঙালীর দৃষ্টিকোণ থেকে একান্তই আঞ্চলিক সংগীত।

ঝুমুর ঝাড়খণ্ডের স্বল্পশিক্ষিত লোককবিদের সচেতনভাবে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াসের ফল। এই সব লোককবিদের সম্মুখে আদর্শ হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলী ছিল। লৌকিক প্রেমরসের চেয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে তাদের রুচি এবং আসক্তি বাড়বার ফলে ঝুমুরে লৌকিক প্রেমগীতির পারবর্তে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম-গীতি রচিত হতে লাগল। পদাবলীর অনুকরণে লোককবির তাদের রচিত ঝুমুরে নিজেদের নামাঙ্কিত করতে লাগল। আসলে তারা যা রচনা করে, তা পল্লীসাহিত্য ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু উচ্চসাহিত্য সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না, লোকসাহিত্যের ধরন-ধারণ সম্পর্কেই তারা ওয়াকিবহাল ছিল। তাই পদাবলী সৃষ্টি করতে গিয়ে তারা লোকগীতিই সৃষ্টি করতে লাগল। জনতা তাদের রচিত ঝুমুর সানন্দে গ্রহণ করল, কিন্তু লোকগীতির ধর্ম অনুসারেই গানের একটি লিখিত রূপ থাকাসত্ত্বেও তা বিবর্তিত হতে লাগল, ভণিতায় আসল স্রষ্টার নামের বদলে বিভিন্ন গায়ক বিভিন্ন নামের উল্লেখ করতে লাগল ঝুমুরটি তখন আর ব্যক্তিকবির রচনা থাকল না, তা সমাজের যৌথসৃষ্টিতে পরিণত হল। এইভাবেই ঝুমুর লোকসাহিত্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তবে পদাবলীর অনুকরণে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ঝুমুর রচনা করা হলেও 'উজ্জ্বল নীলমণি'র কোন নির্দেশ বা অনুশাসন ঝুমুরে রক্ষা করা হয় নি। লৌকিক প্রেমের গানের প্রথাসিদ্ধ রচনাশৈলী, প্রেমের ভাব অনুভাবকে অবলম্বন করেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ঝুমুর রচিত হয়েছে। তার ফলে এই সব গানে রাধাকৃষ্ণের উপস্থিতি, বলতে গেলে, নিতান্তই নামমাত্র, বস্তুতঃ এ গানেরও নায়ক-নায়িকা লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকারাই।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ঝুমুরকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়: ১) লৌকিক প্রেমবিষয়ক, ২) রাধাকৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক, ৩) পৌরাণিক, ৪) সামাজিক, এবং ৫) প্রহেলিকা-মূলক।

ঝুমুর যৌথসংগীত নয়; তাই লৌকিক প্রেম-বিষয়ক ঝুমুরও একক কণ্ঠে গীত হয়। কখনো ঝাড়খণ্ডী যুবকযুবতী এককভাবে নির্জনে অবসর সময়ে

গান করে, কখনো-বা নাচনী যুবতী তার নৃত্য সহ একক কণ্ঠে গীত পরিবেষণ করে। প্রেমের বিভিন্ন স্তর এই শ্রেণীর গানের উপজীব্য, বিরহ বেদনা প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি, তাই ঝুমুরের সর্বাধিক গান বেদনা মধুর বিরহ সংগীত। সংগীতে বেদনার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে; বেদনাই যে-কোন মহৎ সৃষ্টির পশ্চাতে প্রেরণার কাজ করে থাকে। বেদনাজাত গানে তাই অনুভূতির গভীরতা বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। ঝুমুর এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রথমে ঝাড়খণ্ডী লোককবির প্রেম সম্পর্কিত উপলব্ধির গান উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

১ প্রেমের কথা বলতে নাই প্রেমের কথা কইতে নাই | প্রেমের কথা বলতে গেলে তারা হয় ত সাধুজন। প্রেম কর না রে মন, প্রেমে জাতিকুল যায় আর যায় জীবন ॥ বং ॥ প্রেমরসকে খাথ জলে তাথে কমল ফুল ফলে | ঐ ফলে হাত বাড়ালে সংশয় জীবন ॥ এ প্রেমোর এমিনারা বহিছে নদী স্রোতের পারা | ঐ সাররে ঝাপ দিলে আমার নিশ্চয় মরণ ॥ হাঁড়ি রামের শেষ বাণী শুন গে রাই কমলিনী | এবুল একুল দুকুল যাবে শেষে হারাবে জীবন ॥

২ এমনি পিরিতির গুণ যেমন কাঁচা আমে মেশে নুন গো। | আমে নুনে মেশা-মেশি হয় বৈশাখ মাসে। ও ভাব করে যে ভাব রাখতে নারে সেজন যায় গো নরকে ॥ বং ॥ এমনি পিরিতের লেঠা যেমন কাঁঠালের আঠা গো | ফল ধরে না ফুল ধরছে ধনি অভাগ্যার দোষে ॥ টিয়া ভাব্যে হয় গো জবা মণিহারা ফণির পারা গো | এই ভাবের আশায় যে না থাকে তাকে বিশ্বাস করে কে ॥

৩ লাল শালুকের ফুল ফুটে আধা রাতে, যার সাথে যার ভাব থাকে মরিলে কি ছুটে। বঁধু এত রাত কিসে, শ্যাম এত রাত কিসে | পথে ঘাটে বিপদ হলে জানব কেমনে ॥ বং ॥ একে ত ভাদর আঁধার রাতি বিজুলি চমকে | এহেন সংকটে বঁধু এলে কেমন করে ॥ ভাল হল এলে বঁধু বস পালঙ্কেতে | পা ধুয়াব নয়ন জলে মুছাইব কেশে ॥ দ্বিজ গদাধরে বলে আনন্দিত চিতে | অভাগিনী জেগে আছে তোমারই আশাতে ॥

প্রেমিকের জন্য এতো উৎকণ্ঠা, এতো অনুযোগ, প্রেমের এমন আনন্দমধুর গভীর পূর্ণতাও কিন্তু একদিন ব্যর্থ হয়ে যায়। যার সাথে যার ভাব থাকে মরিলে কি ছুটে—এমন বিশ্বাসভরা অকপট উচ্চারণ একদিন মিথ্যা প্রমাণিত

হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতারণা, প্রত্যাখ্যান, সুদূর প্রবাস বা যে-কোনভাবে বিচ্ছেদ অনিবার্যতঃ ঘটে থাকে। বিরহের কাল শুরু হয় আর বিরহের যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বেদনা-মধুর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তারা। তাদের এই বেদনাই সংগীতের উৎসমুখ শতধারায় খুলে দেয়। বলি হয় মধুর মর্ম বেদনার গান বিরহসংগীত।

৪ আয়ল বরষা ঋতু পিয়া পরদেশ গে। রাতিয়া বিতল জাগি ভাবি গুণ শেষ গে ॥ চপলা চমকে ঘন তাহারই উদ্দেশ গে। ঝরে ঝরিছে বুঁদা জমি ভিজি গেল গে ॥ হিয়া বাঁধি পালঙ্কেতে দিয়া আছি ঠেস গে। এমন সময়ে আমার পিয়া পরদেশ গে ॥ রাতি আঁধারি ঘোর নাহি সুজে লেশ গে। এমন সময়ে আমার পিয়া ছাড়ি গেল গে ॥ দ্বিজ হরিপদ কহে কহিছে নিঃশেষ গে। জীবনমরণে একা একাই থাকা শেষ গে ॥

৫ প্রেম কি সহজে হয় লাগাম দিগাম ভাবিলে হয় | জুড়া প্রেম লাগিলে কিসে ছাড়ব গে, লোকে আমি না বাসি পর গো, খুলে কথা গোচরে বল্ গো ॥ রং ॥ তোমার রূপের প্রেমমাধুরী আমি না ভুলিতে পারি। খনে খনে মনে পড়ে তোর মুখের স্বর গো ॥ আগে তুমি দিয়ে আশা এবে কেনে নৈরাশা গো | পায়ে ধরি বিনয় করি বাসিও না পর গো ॥ এ হেন হাড়িরামে বলে ভাঙা প্রেম কি জুড় চলে | মনে ভাব ছিটা দুধে বসে না সর গো ॥

৬ নিতান্ত কাঁদালে আমারে তুমি এ দুঃখ জানাব কাহারে আমি | বড় শেল দিলে গো অন্তরে। শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে আমি ভুলিতে না পারি তোমারে | যারে যাও ধনি মনে রাখবে গো আমারে ॥ রং ॥ নয়নের তারা তোমার অদর্শনে পুড়ে মরি আমি বিরহ আগুনে বল প্রাণ জুড়াই কেমনে | দারুণ মদন দিতেছে যাতন সে যাতনায় হিয়া বিদরে। নিশ্চয় কহিলাম বচনসার তুমি গেলে প্রাণ না রাখিব আর মুখে নাহি বাক্য সরে | মণিহারা ফণী যেন ভুজঙ্গিনী ছাড় ছাড় প্রাণ কাতরে ॥ কুলমান ধন সকলি সঁপিলাম আমি তবু ত আমার হলে না তুমি | নরোত্তম ভণে আমায় এতদিনে ভাসাইলে অকূল পাথারে ॥

প্রেম-ভাবনার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে লৌকিক প্রেমের এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক

ঝুমুরগুলো লৌকিক প্রেমের ঝুমুর থেকে রচনাশৈলীর নিরীখে অবশ্যই পৃথক। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ঝুমুর পদাবলীর আদর্শে রচিত। ঝুমুরকারেরা পদকারদের রচনা অন্ধ অনুকরণ করেছে বললে ভুল বলা হয় না। কোথাও কোথাও রচনার দিক দিয়ে পদগুলোকে ভেঙে সামান্য হেরফের করে ঝুমুর রচনা করা হয়েছে, ফলে গানগুলো নিষ্প্রাণ এবং আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। লৌকিক প্রেমের ঝুমুরে হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ঝুমুরের বহুক্ষেত্রেই তা দ্বিধাগ্রস্ত। পদাবলীতে অনুসৃত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন স্তর ঝুমুরেও রূপায়িত হয়েছে। তবে পূর্বরাগ, অভিসার, মান, খণ্ডিতা সুদূর প্রবাস বা মাথুর ইত্যাদি প্রেম স্তরগুলোই ঝুমুরকারদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কোন কোন কবি অবশ্য ঝুমুর রচনায় বিশেষ রকমের সাফল্য অর্জন করেছে, ছন্দে-উপমায় অলংকারে বহু ঝুমুর উচ্চ কবিত্বসম্পন্ন রচনায় উন্নীত হয়েছে। পদাবলীর বৈষ্ণব অনুরাগ-রস ঝুমুরে সঞ্চারিত হলেও সর্বত্র বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অনুশাসন না মানার ফলে এগুলো লৌকিকতার স্পর্শে মধুর প্রেমসংগীতে পরিণত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের জনমানসকে ঝুমুর যতোখানি অভিভূত করে রেখেছে, ততোখানি অন্য গানে প্রভাবিত করতে পারে নি। ঝুমুরের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ প্রেম, তাই সাধারণ মানুষ এই প্রেমসংগীতের মধ্য দিয়ে তাদের দুঃখবেদনা, হতাশা দীর্ঘশ্বাস ভোলবার অনুপ্রেরণা লাভ করে। প্রেমসংগীত ঝুমুর ঝাড়খণ্ডীদের অন্তরের সম্পদ। প্রেম, তা সে লৌকিক হোক কিংবা রাধাকৃষ্ণঘটিত, তাদের অন্তরলোককে রঞ্জিত করে তোলে। এখানেই প্রেমসংগীত হিসাবে ঝুমুর গানের চরম সার্থকতা।

১ চরণে যাবক করেছে আলোক পাটলি সুখ চায় রে, | তাহাতে নূপুর বাজিছে মধুর দেখি রতি মূরছায় রে। দেখ ও সুবল ভাই রে, রূপের তুলনা দিব কি কায় রে ॥ ধুং ॥ পদাঙ্গুলে যার নখর সুন্দর কি শোভা সাজেছে তায় রে | অগ্রে সুবিমল কোকনদদল মতি যেন বসে তায় রে। রামরম্ভা তরু জিনি যুগ্ম উরু আছে বসনে ঢাকায় রে, | গমন মন্থর হেরি করীবর দেখি মনে লাজ পায় রে। কটিদেশ জিনি শোভিত কিংকিনী হেরি কেশরী পালায় রে, | জঘন সুন্দর অতনুর ঘর উপমা দিবার নাই রে। পয়োধরশোভা অতি মনোলোভা সরল তরল বায় রে, | কুচে দেখি [illegible] কমলকালিকা দেখ জলেতে লুকায় রে। ভুজযুগ তার অতি চমৎকার দালনী মাধুরী তায় রে, | বলয়ারঞ্জিত মধুর সংগীত শুনি অলি লাজ পায় রে। নীলমণি শাড়ি

অতি উজিয়ারী আছে শোভা করি অধিকার রে, | কনকেরি লতে মণিময়-
কতে জড়িয়ে রেখেছে তায় রে। গজমোতি হার কিবা শোভা তার মাতঙ্গ-
গমনী তায় রে, | কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু ভণে দীন চৈতনায় রে ॥

ঝুমুরটিতে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণের ফলে কিছুটা আড়ষ্টতা দেখা দিলেও সাফল্য যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয় তা বোঝা যায়। রাধার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রেমিক কৃষ্ণের মনে কি অভূতপূর্ব আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, তা উপমার প্রয়োগের ফলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাসম্পর্কিত গানগুলোর মধ্যেও যেমন পদাবলীর অনুকরণ লক্ষ্য করা যাবে, তেমনি ঝুমুরকারদের নিজস্ব প্রেম-ভাবনার পরিমণ্ডলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আকাশকে ছোঁয়ার প্রয়াসও দেখা যাবে। পূর্বরাগ অনুরাগে পরিণত হলে সংকেত, অভিসার, মিলন, মান, কলহ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরগুলো যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তেমনি লৌকিক প্রেমেও এই সব স্তর অনিবার্যতঃ এসে থাকে।

৮ একদিন নিকুঞ্জবনে রাধারে পড়িল মনে ব্যাকুল হইল শ্যামরায় | দোসর নাহিক সাথে কেবল বাঁশরী হাতে কে আনিয়ে রাধারে মিলায়। এই চিন্তা করি হরি বলেন রে বাঁশরী যাও রাধা আছেন যেথায় / বাঁশি বলে বংশীধারী আমি কি যাইতে পারি আমার চরণ দুটি নাই। কৃষ্ণ বলেন বাঁশি তবে কিসে প্রাণ জুড়াইবে রাধা বই নাই উপায় রে | ও বাঁশি রাধা বল জুড়াক জীবন রে ॥ রং ॥ জান নাকি বাঁশি তুমি রাধাতে বিক্রীত আমি রাধা আমার জীবনের জীবন / রাধা মন্ত্র রাধা তন্ত্র রাধা আমার মূলমন্ত্র রাধা বিনে সাধন অকারণ রে ॥ রাধা নাম শুনিবার জন্য বৃন্দাবনে অবতীর্ণ বনে থাকি করি গোচারণ | এম্নি প্রেমময়ী রাধা যার জন্যে নন্দের বাধা আজ মাথে করেছি বহন রে ।। কহে ব্রজরাম দাস শুন ওহে শ্রীনিবাস বাঁশিরে দোষ দেওয়া অকারণ | যা বলাবে কালশশী তাই ত বলিবে বাঁশি বাঁশি বল কি জানে মরম ।।

৯ যমুনাতটে নীপনিকুঞ্জ প্রস্ফুটিত তথা প্রসূনপুঞ্জ গুঞ্জরে অলি মাতিয়া | সেখানে মুরারী বাজাছেন বাঁশরী রাধা রাধা রাধা বলিয়া। চলে যায় গো রাধে চলিলেন রাধে দামিনীগতি জিনিয়া | ধনির চঞ্চলচিত্ত অঞ্চল পড়ে খসিয়া ।। রং ।। একে ত ভাদর রাতি আঁধারি তাহে একাকিনী চলে রাজকুমারী, ধনি, ক্ষণে পথ যায় ভুলিয়া, | সংকেতে মদন দেখান

তখন বিজুলি আলো জ্বালিয়া।। রসে দুরু দুরু কাঁপিছে হৃদয় পলকে বিলম্ব প্রাণে নাহি সয়, মনে মনে যায় উড়িয়া। ভাবে শ্যামতনু দহিছে অতনু তনু যায় যেন জ্বলিয়া।। শুনিয়ে সঘনে মুরলীর তান চমকি চমকি উঠে ত পরাণ, ধনির চরণ যাইছে টলিয়া, ভবপ্রীতা অতি চঞ্চলমতি মাধবদর্শন লাগিয়া।।

ঝুমুরে বিরহের গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। রসঘন অনুভূতির প্রকাশ ঘটে বিরহসংগীতে। বিরহ-পর্যায়ের ঝুমুর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের হয়ে থাকে। ঘন বেদনায় অনুভূতি এবং ভাষাও বুঝি বা ঘন হয়ে উঠে। আর তাই স্বল্প কথার মধ্য দিয়ে বিরহের গানে বিস্তৃত গভীর ভাবনাও বিধৃত হয়।

১০ কি বোল ব'লয়ে গেল কি আগুন জ্বেলে দিল হায়রে, জনমে না নিভিল। বড় প্রাণে দাগা দিল, না জানি সে কোন্ দেশে গেল।। রং।। নবঘন মেঘ হেরি চাতকিনীর আশাবারি শেষে বারিবিন্দু না পড়িল। আমি ভাবি যার জন্যে সে কেন ভাবে না মনে ভেবে-ভেবে পাঁজর খসিল। গোলাপ পলাশ ছেড়ে এসে বসলে শ্রীমলে রামকৃষ্ণের আশা না মিটিল।।

১১ কিরা করে গেছে ফিরে কাল আসিব বলে। কাল নয়ন হৈল অন্ধ আশা পথ চেয়ে। বাঁকা গেল কেমনে ছাড়িয়ে, শরমভরম হরে নিয়ে গো।। রং।। সমাজেতে হলাম দোষী যাহার লাগিয়ে। বেঁধেছিলাম সহচরী পাষাণেতে হিয়ে।। দ্বিজ গদাধরে বলে কি হবে ভাবিয়ে। কাঁদাইতে ভালবাসা নিঠুর কালিয়ে।।

১২ নিশিতে স্বপনে রাই মাধবসন্ধানে যায় কত আনন্দ হিয়ায়। ভাঙিল ঘুমের ঘোর বিরহজ্বালায়, রে দিল্ ধরা নাহি যায়॥ রং॥ সখীগণে বলে প্যারী স্বপনে নাগর হরি আমারে বসায়। আপনার বস্ত্র লয়ে চরণ পুঁছায় রে।। কুচযুগে ধরি জোরে রমণ করিবার তরে ও সে আমারে জাগায়। হারু বলে এ জনমে পাবে না কানাই।।

১৩ আঁধার ভাদর রাতি দেখিয়ে তড়পে ছাতি পতি নাই পালঙ্ক উপরে। সখি রে প্রাণ দহে মদনের শরে, কেমনে রহিব শূন্যঘরে।। রং।। একে ত অবলা বালা দোসরে যৌবনজ্বালা কেমনে রহিব শূন্যঘরে। বিনা সেই শ্যামধন না রাখিব এ জীবন ভবপ্রীতা হরিপদ ধরে।।

ঝুমুরে বারমাসী সংগীতেরও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বারমাসী সংগীত বিরহ-সংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত। ঝুমুর এই শ্রেণীর গানের মধ্য দিয়ে ঋতুচক্রে পরিবর্তন-

শীল প্রকৃতির পটভূমিকায় বিরহিনী নারীর মনোবিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়। কোন গানে প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য প্রাধান্য পায়, কোথাও বা নারীমনের ভাবনাগুলো প্রাধান্য পায়।

১৪ মাঘ-ফাল্গুন বসন্তকালে ফুলে ফলে সখি ভরত ডালে | নানাফুল হেরি মনে পড়ে হরি আমি একেলা কুঞ্জেতে রইতে নারি | আজও কুঞ্জে নাই এলেন বনমালী, চিত চঞ্চল দেহ ভার ॥ রং ॥ চৈত্রে চাতকী বৈশাখে খরা প্রিয় বিনে সখি জীয়ন্তে মরা | এনে শ্যামরায় মিলাও গো আমায় আমি একেলা কুঞ্জেতে রইতে নারি॥ জ্যৈষ্ঠে যমুনায় বহত বারি আষাঢ়ে নবীন নব সঞ্চারি | কাল মেঘ হেরি মনে পড়ে হরি আমি ঝাঁপ দিয়ে তবে মরি ॥ শ্রাবণ মাসেতে বরিষা ভারি ডুরু ডুরু করে শ্যামের দাদুরী | পড়িলে ভাদর অতি সে বাদর কামিনীদের মন চুরি ॥ আশ্বিনে অম্বিকা দেবীর পূজা। কার্তিকে কানাকে করেন রাজা | আয়েসের সঙ্গে কানাই পড়ে রঙ্গে যত গোপীগণ মিলি ॥ অগ্রহায়ণ পৌষ দু'মাস হেরি বার মাসে কুঞ্জে না এলেন হরি | উহু মরি মরি ধৈর্য হতে নারি দে গো গলায় ছুরি দিয়ে মরি ॥ দ্বিজ গঙ্গারামে গাথে ঝুমুরী বার মাসে কুঞ্জে না এলেন হরি | সব সখী মিলে দে গো আগুন জ্বেলে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরি ॥

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী পৌরাণিক ঝুমুরের উপজীব্য। কখনো ঝুমুরকারেরা এক একটি উপাখ্যান অবলম্বন করে বেশ কয়েকটি ঝুমুরের একটি পালা রচনা করে। রামায়ণের উপাখ্যানের মধ্যে রামচন্দ্রের বনবাস, সীতাহরণ, ভরত-মিলন, রাবণ বধ এবং মহাভারতের উপাখ্যানের মধ্যে পাশা খেলা, অজ্ঞাতবাস, ভীষ্মের উপাখ্যান, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আদি সবিশেষ জনপ্রিয়। লোককবিগণ নাটকীয় মুহূর্তগুলো ঝুমুরে গীতবদ্ধ করে কখনো-কখনো যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতের কাহিনীই ঝুমুরকারদের আদর্শ, তাই কাহিনীগ্রন্থনে তাদের তেমন কোন স্বকীয়তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

১৫ অযোধ্যা নগরে ঘর নাম বটে রঘুবর সঙ্গেতে লক্ষ্মণ সহোদর রে, | ভরতেরে রাজ্য দিয়ে মোরে বনে পাঠাইয়ে আনন্দিত হয়েছেন তারা রে, | সীতাকে করেছি হারা রে, আমরা দু'ভাই বুলি পাগলের পারা রে ॥ রং ॥ যেদিন হতে গেছে সীতা দুই ভায়ের নাই দিশা ফলজল কিছুই খাই নাই রে | সীতা প্রাণের বেণু দাহিছে মোদের তনু কে দেখেছ সীতা বল না তোমরা

রে ॥ যে দেখাবে মোরে সীতা তাহারে ক'রব রাজ শুন বলি বানর বিবরণ রে। সীতা প্রাণের রেণু দাহিছে আমাদের তনু অধম রহিম কাঁদে দিশাহারা রে ॥

১৬ কৃষ্ণ অর্জুন দুইজন রথে করি আরোহণ উপনীত সমর মাঝারে। হেরিয়া ফাল্গুনী কয় শুন প্রভু দয়াময় এ ছার রাজ্যে নাই প্রয়োজন, শুন শুন শ্রীমধুসূদন ॥ রং ॥ ধনুকবাণ ত্যজ্য করি রাসলোন রণোপার হে মুরারী করি নিবেদন। আর না করিব রণ পুনঃ ফিরে যাব বন বলি তোমায় স্বরূপ বচন ॥ দ্রোণগুরু অশ্বত্থামা কৃপাচার্য শল্য মামা পিতামহ গঙ্গারি নন্দন। কেমনে করিব হত বল প্রভু জগন্নাথ অনাথ হইব পঙ্কজন ॥ একলক্ষ রাজাগণ শতভ্রাতা দুর্যোধন কেমনে করিব বিনাশন। শোকেতে গান্ধারী মাতা ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ পিতা কাঁদিবেক শত বধূগণ ॥ টান হে হস্তের দড়া ফিরাও হে রথের ঘোড়া শিবিরেতে করিব গমন। রাধা কয় কর জুড়ি যদি না ফিরাবেন হরি পদব্রজে করিব গমন ॥

ঝুমুরের মধ্যে সামাজিক ঝুমুরই সর্বাধিক জীবনসম্পৃক্ত [illegible], দাম্পত্য-জীবন, আধুনিকা নারী ও বধূ, সামাজিক রীতিরে [illegible], সামাজিক দুর্নীতি ও ব্যভিচার লোককবির মনে কবিত্বের সঞ্চার করে, এগুলোর উপর তির্যক দৃষ্টি ফেলে ঝুমুরকারেরা রঙ্গরস উপভোগ করেন এবং অম্লমধুর ভাষায় শ্লেষ বিদ্রূপ সহযোগে ঝুমুর পরিবেশন করেন—ফলে এই শ্রেণীর ঝুমুরগুলো অত্যন্ত সরস হয়ে ওঠে। সামাজিক ঝুমুরের মূল রসটিই হল রঙ্গরস, এর সঙ্গে প্রয়োজন-মতো শ্লেষ বা বিদ্রূপের ফোড়ন দেওয়া হয়ে থাকে মাত্র। ঝাড়খণ্ডের প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন নিখুঁত এবং নির্ভেজালভাবে চিত্রিত হয়ে থাকে এই শ্রেণীর ঝুমুরে।

১৭ বাঁক্যে গেল মীনার মায়ের মন, যেমন কুকুরের লেজের মতন। রাজা মাহাজনের দেনা মীনার মা কিছুই জানে না আবই খুঁজে বসনভূষণ। পার বল্যে ছিল আশা মীনার মায়ের ভালবাসা এটা কেবল নিশির স্বপন। যদি দিথম পয়সাকড়ি খাত্তে পাত্যম ভাতমুড়ি ইটা কেবল উপরি যতন। দ্বিজ গদাধরে বলে মীনার মায়ের কথায় চল্যে এখন আমার নিকটে মরণ ॥

১৮ কলিযুগের দেখ রীতি পুরুষের পালটেছে মতি। বউ-এর কথায় চলে পতি বউ-এর আঁচল ধরুকে। লাজে মরি লাজে মরি দেখে কলির ঘোরকে ॥ রং ॥ স্বামী স্ত্রী কোথাও গেলে স্ত্রী ফরুকে ফরুকে চলে। ছেলে কোলে

স্বামী চলে বউ চলে ছলরকে॥ বৌ শুয়ে থাকে বিছনাতে পুরুষ যায় রাঁধনশালেতে। বৌকে কিছু বললে দেয় গাল শরম ভরম কাড়কে। বউ-এর হুকুম তামিল করা এই হয়েছে কলির ধারা। বিপিন হল দিশাহারা ফেলে আঁখির লোরকে ॥

১৯ ধরম করম সব ঘুচালি, তুঁই, ভাই-এ ভাই-এ লাগাঁই দিলি। বাপে-বেটায় মারামারি পিটাপিটি করালি রে করালি ; । ধন্য ধন্য ওরে কলি, সবাইকে তুঁই নিজের বশে ঘুরালি রে ঘুরালি ॥ রং ॥ তোর যুগের এম্নি ধারা ভাইবোনে হয় ইশারা। তুঁহেঁই যে রে পথে-ঘাটে পিরিত করা শিখালি রে শিখালি। তোমার কথায় নরনারী করে জুয়া-ডাকা-চুরি। রাঁড়ীরাকে কেনে রে তুঁই রঁগীন শাড়ি পরালি রে পরালি। তোর কথায় নারীগণ ছাড়ে নিজ পতিধন। পরপুরুষের সঙ্গে তাদের তালে তালে নাচালি রে নাচালি। ছলচাতুরি মদখোরী প্রবঞ্চনা দালালগিরি বেশ্যাগিরি চোরডাকাতে দেশটাকে তুঁই ডুবালি রে ডুবালি। ওরে কলি তোমার বোলে সতীশ চিপায় আঁপের কলে। জবরজস্তি কেনে রে তার সাধুয়ালি ছাড়ালি রে ছাড়ালি ॥

সবশেষে প্রহেলিকা-মূলক ঝুমুর। এই শ্রেণীর গানে সোজাসুজি মনোভাব ব্যক্ত না করে ধাঁধা বা প্রহেলিকার আকারে গানের অংশবিশেষ প্রকাশ করা হয়। প্রহেলিকাটুকুর অর্থ উদ্ধার করতে না পারলে ঝুমুরের সুরও উপলব্ধি করা যায় না। এই জাতীয় ঝুমুরের আসল আকর্ষণ অই প্রহেলিকার মধ্যে নিহিত থাকে। সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবিষয়ক ঝুমুরে এবং দেহতত্ত্বের গানে প্রহেলিকার প্রয়োগ করা হয়। বলাবাহুল্য, ঝুমুরে প্রহেলিকার ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত।

২০ অম্বর শিবাক্ষে সমর্পণ করি তাহাতে আবার রামগুণ ধরি শচন্দ্র হরিয়া পরে। এই মাত্র বাণী কহি নীলমণি চলি গেল মধুপুরে। ত্যজিল মোরে লম্পট নটবরে॥ রং ॥ পরার্থে আছে যাহার বাস তার প্রাণবন্ধুবরে আশ। যক্ষেশ আশায় প্রকাশিত তায় পুনঃ সে না এল ফিরে। পিতা-সুত-যান রথধ্বজে যার সেই সদা প্রাণ দহে গো আমার নিকটে না হেরি তাহারে। কোকিল কুহরে শ্রবণ বিদরে আর বাঁচিব কি করে। শুন প্রাণসখি স্বরূপ বচন রবিসুত-ঋত করিব সেবন এ দুঃখ নিবারণ তরে। ভবপ্রীতা ভণে ভজ নারায়ণে লক্ষ পুর দরবারে ॥

২১ এক তরুবর তিনটি শাখা পঞ্চ বক্রে তার পত্রলেখা তিনপুর ছায়া ব্যাপিয়া। বিনা ফুলে ফল ধরিয়াছে দু'টি বিনা রসে রস ভরিয়া। সাধুজন লও চিনিয়া, ওহে গুরুজন লও চিনিয়া॥ রং॥ অই, ফলমধ্যে এক সুখের বসতি বিনা খেয়ে রস আস্বাদয়ে নিতি, তার, স্থিতি নাই থাকে বসিয়া। সে পুরুষ জাতি না হয় যুবতী পঞ্চ ডিম্ব গেছে পাড়িয়া। সেই, পঞ্চ ডিম্বে ছেলে একটি রেখা নিজে উড়ে কিন্তু বাপেরই পাখা জানে নাই পিতা বলিয়া, পুত্রেরই গর্ভেতে মায়ের জনম এদের কেবা স্বামী লও চিনিয়া। এ তত্ত্বের সার বেদে না পাইবে গুরু চক্ষুদান দিলে সে চিনিবে দীনা কয় গুরু সেবিয়া। কাষ্ঠের ভিতর আছয়ে অনল, অগ্নি, যতনে পাইবে ঘষিয়া॥

॥ দুই ॥

ভাদরিয়া ঝুমুর

ভাদরিয়া বা ভাদুরিয়া ঝুমুরকে কেউ কেউ করম নাচের গান বা পাঁতাশালিয়া গীতের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। কেউ বা বলেন, ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত গীতের নাম ভাদরিয়া ঝুমুর। অস্বীকার করবার উপায় নেই, কোথাও কোথাও ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত করম নাচের গানকে ভাদর্য বা ভাদরিয়া গীত বলা হয়। আমরা স্বীকার করি, উল্লেখিত ব্যাখ্যাগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তবু আমরা ভাদরিয়া ঝুমুর নামটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। সাধারণ ঝুমুর এবং ভাদরিয়া ঝুমুরের মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। লৌকিক প্রেম এবং রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়লীলা উভয় শ্রেণীর ঝুমুরেরই বিষয়বস্তু। এই দুই শ্রেণীর ঝুমুরের মধ্যে মূল পার্থক্য গানের রচনাশৈলী বা গঠনভঙ্গিতে এবং সুরে। আসলে ঝুমুরের একটি বিশিষ্ট সুরের নাম ভাদরিয়া, যেমন তামাড় অঞ্চলে প্রচলিত সুরের নাম তামাড়িয়া এবং সেই সুরের ঝুমুরকে কেউ কেউ তামাড়িয়া ঝুমুর বলবার পক্ষপাতী। ভাদরিয়া ঝুমুরের সুর দ্রুত এবং উচ্ছল হয়ে থাকে; এ সুরকে 'রঙিন' বলা হয় এই কারণেই। করম নাচের গানের সুরের উন্নত রূপ এই ভাদরিয়া সুর। তাছাড়া রচনাশৈলীর দিকে দিয়ে এগান ক্ষুদ্রতর পদের সাহায্যে গঠিত হয় এবং সাধারণ ঝুমুর থেকে আয়তনেও ছোট হয়ে থাকে। গঠনরীতিতে যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল প্রতি কলির দ্বিতীয়

পঙক্তি। এই দ্বিতীয় পঙক্তির গোড়ায় সাধারণতঃ চার অক্ষরের পরে একটি যতি বা স্বল্পবিরতি থাকে, গায়নরীতির দিক দিয়ে একে 'শম' বলা যেতে পারে। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলো লক্ষ্য করে দেখলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যাবে।

১ ঘনঘটা রাতিয়া চমকে বিজলিয়া | থাকি থাকি, জলে বিরহ আগুনিয়া।
কোথা আছ প্রিয়তম দেখ না আসিয়া | অদর্শনে, আছি মরমে মরিয়া।
অঙ্গ কাঁপে থরথর হানে রতিপতিয়া | বিফলেতে, গেল যৌবন বহিয়া।
ভরতকিশোরে বলে থাক ধৈর্য ধরিয়া | পূরাইব, আশা বদন চুমিয়া॥

২ সারা নিশি রইলাম বসি বকুলতলায় গো | কমলিনী, ধনি তোমার আশায় গ। | শীতলী বাতাস বহে শীতে কাঁপে গা গো | সাড়া নাহি, সে ত ডাকে ইশারায় গো। | আর কি বিশ্বাস হয় তোমারি কথায় গো | নরোত্তমায়, ও বাদ সাধিলে আমায় গো।।

৩ পিয়া পিয়া বলিয়া কাঁদত বিনোদিয়া | শূনা ভেল, মোর গোকুল নগরিয়া।
আসিব বলিয়া পিয়া গেল ছাড়িয়া | দিবানিশি, ধনি রহল নিরখিয়া।
অবলা জাতিয়া কেইসে ধরত হিয়া | মনে পড়ে, কালার নবীনপিরিতিয়া।
বিষ্টু অনাথে ভণে মনে মনে খুঁজিয়া | প্রাণনাথ, মম প্রাণ গেল হরিয়া॥

৪ শীতলানিল হিল্লোলে তরুকোলে লতা দোলে | মেঘকোলে, দোলে সোহাগে চপলা গো। | নীরদঘটা নিরখি নাচিছে শিখিনী-শিখী | সেহ দেখি, বাড়ে বিরহের জ্বালা গো। | আমি শ্যাম বিরহিনী কাঁদি দিবসরজনী | একাকিনী, ভুলি বিরহের খেলা গো। | ললিতা কয় রাধায় দ্বিজ ভবপ্রীতা গায় | পাবে শ্যাম, রাই হয়ো না উতলা গো॥

৫ কোকিলার ডাক শুনি নিজমনে ভাবি গুণি | আমার কলপি-কলপি উঠে ছাতি রে, | ওরে পাখি, কেন ডাক নিশিভোর রাতি। | দিবানিশি কেঁদে মরি না আসিল বংশীধারী | আমার ঝর ঝর ঝরে দু'টি আঁখি রে। | নিশি হল অবসান না আসিল বাঁকা শ্যাম | শ্যাম আমায় দিয়ে গেল প্রেমে ফাঁকি রে। | সুন্দর বলে শুন গো রাধা তুমি যে প্রাণের আধা ! শ্যাম এসে মুছাবে দু'টি আঁখি রে॥

।। তিন ।।

ঝুমুর গানের রং

ঝুমুর গানের জনপ্রিয়তার মূলে নাচনী নাচের বিশিষ্ট ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সত্যি কথা বলতে কি ঝুমুর গান নাচনী নাচের লক্ষ্যেই রচিত হয়ে থাকে। ঝুমুরকারেরা প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে নাচনী নাচের দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা আছেন। ঝাড়খণ্ডের প্রেমসম্পর্কিত সব গানই কোন না কোন নাচের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যাঁরা বলেন নূপুর বা ঘুঙুরের ঝম ঝম শব্দ থেকে ঝুমুর শব্দটির উদ্ভব, নাচনী নাচের কথা মনে রাখলে তাঁদের এ বক্তব্য সত্য বলেই মনে হবে। নৃত্যরতা নাচনীর পায়ে নূপুর বা ঘুঙুর বাঁধা থাকে, যার ফলে ঝম ঝম শব্দ ওঠাই স্বাভাবিক।

নাচনী নাচে পূর্ণাঙ্গ ঝুমুর গান তো গাওয়া হয়ই, তার ওপর প্রতিটি গানের শেষে 'রং' গীত গাওয়া হয়ে থাকে। ঝুমুরের রং গীতগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের হয়। রং গীতের সাহায্যে নাচকে হাল্কা এবং উচ্ছল করে তোলা হয়। কেউ কেউ ঝুমুরের রংকে নাচনী ঝুমুরের রং নামে অভিহিত করে থাকেন। আমরা এগুলোকে ঝুমুরের রং বলবার পক্ষপাতী। আমরা আগেই বলেছি, ঝুমুর যৌথসংগীত নয়, ঝুমুর এককভাবে গীত হয়। ঝুমুর প্রধানতঃ নাচনী নাচের সঙ্গেই জড়িত। যেহেতু এ-গান পুরোপুরি প্রেমের গান, তাই সারা বছর ধরে একক কণ্ঠে এ-গান গাওয়া চলে কিন্তু ঝুমুরের পরিপূর্ণ স্বাদ পেতে হলে নাচনী নাচ ভিন্ন অন্যত্র খোঁজ করলে আমাদের হতাশ হতেই হবে। তাছাড়া নাচনী নাচের ক্ষেত্র ছাড়া ঝুমুরে কখনো রং ব্যবহার করা হয় না। তাই এই রং গীতগুলোকে নাচনী ঝুমুরের রং না বলে ঝুমুরের রং বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি। তাছাড়া ঝুমুরকে সাধারণ ঝুমুর, নাচনী নাচের ঝুমুর ইত্যাদি নামে বিভক্ত করারও কোন যৌক্তিকতা নেই; তার ফলে ঝুমুরের রসাস্বাদে অকারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। যে ঝুমুর কোন প্রেমিক বা প্রেমিকা নির্জনে একককণ্ঠে গুনগুন করে বা গলা ছেড়ে গেয়ে আনন্দলাভ করে, সেই ঝুমুরই নাচনী নাচের সময় গেয়ে দর্শকমনে অধিকতর আনন্দের সঞ্চার করা সম্ভব হয়। নাচনী নাচের-ঝুমুর বলে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত কোন ঝুমুর গান নেই। একই ঝুমুর অবসর সময়ে একককণ্ঠে যেমন গাওয়া হয়, তেমনি সেই ঝুমুরই পাঁতা নাচের গান বা নাচনী নাচের গান

হিসাবেও গাওয়া হয়। ঝুমুর মূলতঃ প্রেমসংগীত. তাই ঝুমুরের রং গীতগুলো ও প্রেমসম্পর্কিত। প্রথম দর্শনেই প্রেমের জন্ম হয়, তার ওপর প্রেমিক যদি নয়নবাণ হানে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা প্রেমিকার থাকে না :

১ দাঁতে মিশি চখে কাজল আগমুখে তার ছাঁচি পান
মারয না ভাই মারয না নয়নবাণ | প্রেমের নদী বইছে কূল উজান ॥

তাই প্রেমিককে দেখলে বুকের মধ্যে রক্তস্রোত উজান হয়, মন চঞ্চল হয় জাতি-কুল তো যায়ই, তার ওপর প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে।

২ বঁধুযাকে দেখলে আমার হৃদকে উঠে মন
পিরিত করয না রে মন | পিরিতিতে যায় জাতিকুল আর যায় জীবন ॥

একবার প্রেমের অনুভূতি জেগে উঠলে সাজসজ্জায় বাহার এনে নায়িকা নায়ককে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু নায়ক যখন তার গলার মালা খুলে নেয়, তখন কপট ক্রোধে গায়ে হাত দেবার অভিযোগে নায়ককে অভিযুক্ত করে এবং বলে, এতোই যদি বাসনা, তবে নায়ক কেন নায়িকার গৃহে অভিসারে যায় না।

৩ লোটন পাথরের আড়ায় ভাজা মালার গাঁথনি।
সাধ কর্যে পরিল মালা খুল্যে লিল নীলমণি।
খুল্যে লিল ভাল ক'রল গায়ে কেনে হাত দিল।
অতই যদি বাঞ্ছা ছিল ঘরে কেনে নাই আল্য ॥
দে মালা দে দে গ তরা দে গ ব্রজনন্দিনী।
টুসাক-দিয়া ভাজা মালা সুরু সুতার গাঁথনি,
দে মালা দে কিনি আমি প'রব গলায় জানি জানি ॥

কিন্তু প্রেমের আনন্দরস আকণ্ঠ উপভোগ করবার আগেই বেদনাময় পরিণতি এসে যায়। কখনো প্রিয়জনের প্রবাস-জনিত বিচ্ছেদবেদনা, কখনো অবহেলার বেদনা, কখনো কলঙ্ক বা প্রত্যাখ্যানের বেদনা নারীমনকে শতধা বিদীর্ণ করে তোলে। বিরহ বা বিচ্ছেদই প্রেমের সবচেয়ে মধুর অনুভূতি; তাই প্রেমের গানে বেদনার পরিমাণ সর্বাধিক, বলা যেতে পারে, প্রেমের গানের অর্থই হল বিরহের গান, বেদনার গান।

৪ আমার যৌবনকালে বিনা তেলে রূপ জ্বলে
মরি তাই ত ভাবি মনে মনে, আমার নব যৌবন গেল অকারণে ॥

৫ যার লাগি মোর শিনা সিঁদুর, গো আমার সে ধন রইল বিদেশে।
যেন তারা খোলায় খই ফুটে তায় খই ফুটে,

থেকে থেকে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে ॥

৬ শিশুকালে ছিলাম ভাল পিরিতি করো অঙ্গ কাল

তুমি কাঁদাবে বল্যে স'াতাবে বল্যে মনে জানি নাই, আমি কানে শুনি নাই ॥

৭ কপাল মাঝে উলকি আমার সে কি ধুলে ধুয়া যায়।

শ্যাম কলঙ্কের ডালি আমার রইল মাথায় ॥

৮ রঙ্গ তামাশায় ভুল্যে গেল, পানসুপারি গাঁইঠে বাঁধা রইল।

পানটি চুনটি শুক্যে গেল, সুপারি খয়েরটি ভালই ছিল ॥

প্রেম গেলেও প্রেমের স্মৃতি থাকে; সুখ গেলেও সুখের জন্য দীর্ঘশ্বাস থাকে। বিরহ বা বিচ্ছেদবেদনা স্মৃতিসুধাসার ছাড়া কিছু নয়, তাই প্রেমগীতিতে বিরহের স্থান সবার ওপরে।

॥ চার ॥

রং ঝুমুর

স্ত্রীপুরুষের দ্বৈত গীতিসংলাপে এক ধরনের ঝুমুর গান গাওয়া হয়ে থাকে। ঝুমুরকার বিপিন মুখী এই গানকে 'পয়ার ছন্দে প্রেমের গান' বলে উল্লেখ করেছেন। গানগুলো প্রেমগীতি বলতে যা বোঝায় তা যেমন নয়, তেমনি রচনারীতির দিক দিয়েও পয়ার ছন্দে রচিত হয় না। গানে দু'টি মাত্র চরিত্র স্ত্রী এবং পুরুষ, বলাবাহুল্য, এই স্ত্রী পুরুষ চরিত্র দু'টি সর্বত্রই স্বামী স্ত্রী। এ গানের আসল উদ্দেশ্য রঙ্গ তামাসার পরিবেশ সৃষ্টি করা। বিষয়বস্তু সাধারণতঃ লঘু হয়ে থাকে; স্বামী-স্ত্রীর ঘরগেরস্থালির সমস্যা, দাম্পত্য জীবনের সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যথেষ্ট কৌতুক এবং রঙ্গরসের সঙ্গে গানগুলো রচনা করা হয়। এসব গানের মধ্যে উচ্চস্তরের কবিত্ব থাকে না, তবে জীবনরসের অভাব থাকে না বলে লোকসাহিত্য হিসাবে এগুলোরও বিশিষ্ট স্থান আছে। এই ধরনের ঝুমুর গানকে রং ঝুমুর বলা যেতে পারে। এ গান সাধারণতঃ কুর্মালি এবং ঝাড়খণ্ডী-মিশ্রিত ভাষায় রচিত হয়ে থাকে; ঝাড়খণ্ডী জনতা খুব সহজেই এই ভাষা থেকে রসগ্রহণ করতে পারে। ঝা. ১৮

একটি রং ঝুমুর উদ্ধৃত করা হল। দুর্মূল্যের দিনে বিপর্যস্ত স্বামী জমিতে ফসল উৎপাদন করতে না পেরে শহরে গিয়ে উদরান্ন-সংগ্রহের চেষ্টার কথা স্ত্রীকে বলে ; স্ত্রী কিন্তু গাঁয়ের ভিটে ছেড়ে যেতে রাজি হয় না। কোনক্রমে স্বামীকে বোঝাতে না পেরে সে মোক্ষম অস্ত্রের প্রয়োগ করে : শহরে গেলে তার কুলমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তখন স্বামী আর তাকে ফিরে পাবে না।

পুরুষ : টাকায় হল্য দুপুয়া চা'ল আমি হলি অসামাল
ঘর করা হল্য বড় ভার,
চা"ল চিনি কেরোসিন নাহি মিলে দিনেদ্দিন
আঁধার ঘরে গাঁদাবগুঁড়ুর সার।
শিঁকায় টাঁগা রহুক হাঁড়ি যাব হামে গেরাম ছাড়ি
যাব হামে শহর মুল্লুকে,
ঘটি বাটি শিলালঢ়া বাঁধ গ ধনি ধড়াচুড়া
খাটব সাহেব ঠিকাদারকে।
(রং) পেট তা"বড়া দিয়েঁ ধান ব'হব কতদিন।
এমন সুন্দর জোবন ভেল যে মলিন॥
স্ত্রী : তবে বলি প্রাণনাথ কাহে লেবে হামে সাথ
বাত্ তব হামে না শুনিব,
শ্বশুরে কা ভিটামাটি র'হব হামে মাটি চাটি
তবু হামে বাজারে না যাব।
যদি যাই বাজারেতে পড়ব হাম নজরেতে
বাজারে কা লক ভয়ংকর,
পয়সা দেখায় কত ছলে আঁখি ঠারে সুকৌশলে
লুটি লেবই এ জোবন সুন্দর।
(রং) বাজারে কা লক বাবু বড়ী বদমাস।
নেহি যাবই বাজারেতে র'হব উপাস॥
পুরুষ : এ বছর হয় নি ধান তাই হয়েঁছে অনেক টান
মাহাজনের ধান দিব কিসে,
বীজধান ছিল যত সব করেঁছি উদরসাৎ-অ
আগত্ বছর কা লাগাম চাযে।
লাঁগল গরু ছাগল ভেড়া বিকাঁই গেল কাড়াজড়া

তাই ত সুবদনী কাহে কবিস মনমানী
পঁটলাপুঁটলী বাঁধ গে তাডাহুডা,
যাব হামে শহববাজার টাকা কবম ব'জগাব।
ছুটমট ঘব বসাব একটা কিন্যে দিব আলতা ফিতা,
মাথাবাঁধা আব জবিজুতা, পাযেব মল আব পানেব বাটা।
(বং) কাহে ধনি অভিমানী ভাঁগলে চুডি।
বাজাবে চল কিন্যে দিব শাঁকা আব শাডি॥
স্ত্রী : কাহে কহিস এমন কথা পাজবে মোব লাগে ব্যথা
বডী রে আসঠা লাগে মনে,
পুযেকে না পাববে যদি কাহে তবে কবনে শাদী
গাছে তুল্যে মূলে কাট কেনে।
কলিযুগেব বলিহাবি দাগাবাজি জুগাচুবি
বাজাবেতে আছে বড বেশি,
চোব আসে সাধুব বেশে গলায় ছুবি দিবে শেষে
যাবে চলি কুলমান নাশি।
(বং) তাই ত বাজাবে হামি নেহি যাঅব ভাই।
ডব লাগে পাছে বঁধু তুমাকে হারাই॥

॥ পাঁচ ॥

উদয়া গান বা টাঁ'ড় ঝুমুর

ঝাডখণ্ডে নর-নাবীর দেহ-মিলনের সম্পর্কটা অন্যান্য সভ্য অঞ্চলেব মতো এখনো শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে ওঠে নি। যৌনতাই ঝাডখণ্ডেব পাবিবাবিক জীবনের দৃঢ় ভিত্তিভূমি রচনা কবে থাকে। এখানকাব আদিম মানুষেবা নিছক ভাবানুভূতিব জগতেব যে প্রেম তাব ওপর মোটেই আস্থাশীল নয়। প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব দেহ-মিলনঘটিত প্রেম তাদের মনোজীবনে এবং সমাজ-জীবন গঠনে সবিশেষ সাহায্য করে থাকে। তাই ঝাডখণ্ডের লোকসংগীতেও

যৌনপ্রেমের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন ধরনের লোকগীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে-সব প্রেমগীতি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি, সেগুলোর মধ্যে ভাবানুভূতি থাকলেও দেহজ প্রেমের তীব্রতাও সহজেই অনুভব করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রেমানুভূতির সঙ্গে ঐ সব গানের একটা আত্মিক স্পর্শ আছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে দেহজ প্রেম নিরক্ত ভাবজ প্রেমে পরিণত হয়েছে। তাই ঝুমুরে পদাবলীর অনুকরণ যেখানেই ঘটেছে, সেখানেই ঝুমুরের প্রেমবোধ নিরক্ত উত্তাপহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু যেখানে ঝুমুরকার রাধাকৃষ্ণ নাম দু'টি গৌণভাবে ব্যবহার করে বৈষ্ণব রীতি-বন্ধনকে অস্বীকার করে প্রেমের স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দ রূপ দিয়েছে, সেখানেই ঝাড়খণ্ডের ঝুমুরকরেরা প্রাচীনকার ঐতিহ্যাশ্রয়ী দেহ-মিলনঘটিত প্রেমসংগীতেরই অনুসরণ করেছে। বলাবাহুল্য, সে-সব গান রাধাকৃষ্ণের উপস্থিতিসত্ত্বেও যে কোন গোঁড়া বৈষ্ণবের মনে তীব্র বিরক্তি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। আসলে ঝাড়খণ্ডের প্রেমগীত দেহমিলনের তীব্র অনুভূতির বাণীরূপ মাত্র। তবে এযাবৎ আলোচিত প্রেমগীতিগুলো একেবারে নিরাবরণ নয়, রূপকের সাহায্যে দেহমিলনের ভাবনাকে গীতবদ্ধ করা হয়েছে—যদিও আবরণটি প্রায়-স্বচ্ছ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

ঝাড়খণ্ডে কিছু কিছু গান প্রচলিত আছে, যা সম্পূর্ণতঃ দেহমিলনকে আশ্রয় করেই রচিত এবং গীত হয়ে থাকে। স্বভাবতঃই এই সব গান লোকালয়ের সীমানার মধ্যে গীত না হয়ে মাঠে প্রান্তরে অরণ্যে গীত হয়। এই গানগুলোই উদয়া বা টাঁড় ঝুমুর বলে পরিচিত। কোন কোন অঞ্চলে উদয়া গান 'কবি গীত' এবং 'বাগালগীত' নামেও পরিচিত। বাগালেরা বনে-অরণ্যে উদয় গীত গেয়ে যুবতীনারীদের দেহমিলনে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে থাকে বলে সম্ভবতঃ বাগালগীত নামেও এ গান পরিচিতি লাভ করেছে।

উদয়া জাতীয় প্রেমসংগীত সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'আদিম জাতির লোকগীতির যে অংশ যুবক-যুবতীর মিলন-প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া রচিত, তাহার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি আদিম সমাজেও দুর্নীতির পরিচায়ক বিবেচিত হয় বলিয়া তাহা প্রায় সর্বদাই কতগুলি সাধারণ রূপকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে। . ইহাদিগকে যথার্থ প্রেম-সঙ্গীত বলা যায়না। ইংরেজিতে ইহাদিগকে Courting song বলে। আদিম জাতির এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মধ্যে যে রূপকের ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সূক্ষ্ম শিল্পবোধে

পরিচায়ক নহে। বরং স্থূল বস্তুরসবোধের পরিচায়ক।'[১] অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দেহপ্রেমের গান রূপকের ভিতর দিয়েই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এগান লোকালয়ের মধ্যে গাওয়া নিষিদ্ধ, উদয়া গানই শুধু নয়. কোথাও কোথাও স্থূল প্রেমনির্ভর ঝুমুরও লোকালয়ের মধ্যে গাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে এই গানগুলোকে কেন প্রেমসংগীত বলা যায় না, বোঝা গেল না। দেহকে বাদ দিয়ে আজ পর্যন্ত কোন প্রেমসংগীত রচিত হয়েছে কি না আমাদের জানা নেই। যে-কোন একজন দেহীকে আশ্রয় করেই যেমন আমাদের মধ্যে প্রেমবোধ জাগরিত হয়, তেমনি সেই দেহীকে অবলম্বন করেই আমাদের প্রেমানুভূতি গীত হিসাবে প্রকাশ পায়। অনুভূতিকে যতো সূক্ষ্ম পর্যায়েই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, প্রেম কোন স্থূলদেহকে কেন্দ্র করেই অঙ্কুরিত হয়। দার্শনিক ভাবনায় নিষ্কাম প্রেমের গুরুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ জীবনে নিরক্ত নিষ্কাম প্রেমের কোন ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। তাই আমাদের মতে, মিলন প্রসঙ্গের গানও সংগতকারণেই প্রেমসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে একদা দেহমিলনের প্রয়োজনেই প্রেম-গীত রচিত হয়েছিল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি জৈব আকর্ষণ অনুভব করলে এই গীতের মাধ্যমে নর-নারী নিজের কামনার কথা অবারিতভাবে প্রকাশ করত।

উদয়া বা টাঁড় ঝুমুর কোন উৎসবকেন্দ্রিক গান নয়, কিংবা কোন বিশেষ ঋতু বা সময়-সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। সারা বছর ধরে বনে-অরণ্যে এ গান গীত হয়ে থাকে। উদয়া যৌথসংগীত নয়, একক নিঃসঙ্গ নর বা নারীর কণ্ঠে এ গান গীত হয়। কেউ কেউ বলেন, আদিবাসীদের প্রেম সংগীতের যে গানে পুরুষের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, তা পুরুষে গেয়ে থাকে এবং নারীর অনুভূতি-সম্পর্কিত প্রেমসংগীত নারী স্বয়ং গেয়ে থাকে। কথাটি যে ঠিক নয়, তা আমরা করম নাচের গান, ছো নাচের গান, ঝুমুর আদি প্রসঙ্গে দেখিয়েছি। নারীর প্রেমানুভূতির গানগুলোও পুরুষকণ্ঠে গীত হয়ে থাকে। উদয়ার গানগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে উদয়া গানে নরনারীর বিশিষ্ট ভূমিকা সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে বলে বিষয়বস্তু অনুসারে নর এবং নারীর গান পৃথক হয়ে থাকে।

---

১ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ ১১৭

নরনারীর অবৈধ মিলন ঝাড়খণ্ডেও নিন্দনীয়। তাই অবৈধ প্রণয় সব সময় গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলোতে বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে দেহপ্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশ আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

১ দেখ্যে বাঢালি তকে তুঁই না দিলে আমাকে
বুকের মাঝে শিম-ল বঁটি দলকে, সেই দেখ্যে মন ললকে ॥

২ ডালিমের গাছটি ভারি টেঁডা দিয়েঁ ডালিম পাড়ি
অই ডালিম রাখ মাঝ্যাঘরে, খিদা পালে খাব অন্ধকারে ॥

৩ বঁধুর বাড়ি-এ পাকেঁ আছে বারমাস্যা বে'লরে,
সেই বে'ল তু'লতে গেলে বুকে মারে শে'ল রে ॥

উদয়া গানে নারীর অনুভূতি-সংবলিত গানের সংখ্যাই বেশি। অবশ্য করম নাচের গান, টুসু গান, ছো নাচের গান, ঝুমুর আদি সব ধরনের গানের প্রেমগীতিগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রেমানুভূতিকে আশ্রয় করেই রূপ লাভ করেছে।

৪ এত যদি ছিল মনে আগে না বলিলি কেনে
ঘুমের ঘোরে, ছুঁড়া খেঁচরাঁই উঠালি মোরে, ঘুমের ঘোরে ॥

৫ দিব দিব পারুল তেল দিব বল্যেছিলে,
এত শ্যামের কররবি হে ঘরে গেলে মনে পড়ে না।
দিব দিব বল্যেছিলে ঘি-এর মিঠাই দিব বল্যে,
আমড়া পাকায় মন ভুলালে বঁধু ছা'ড়বে বল্যে।
দিব দিব বল্যেছিলে ফুলাম শাড়ি দিব বল্যে,
আলত' পাইড়ে মন ভুলালে বঁধু ছা'ড়বে বল্যে ॥

৬ যখন ডালিম কু'লমুজির পাবা, তখন ডালিম বিকাল্য টাকায় তিন থলা।
ডালিম খাঁয়ে লে রে খালভরা, পাকা ডালিম রসেতে ভরা ॥

৭ যখন ছিলি মা-বাপের ঘরে, লুকলুকানি খে'লতেছিলি একগলা জলে।
যেমন শোল মাছে উফাল মারে, ঢরবা শিম'ল ডাল ভাঙ্যে পড়ে ॥

বাগালদের কেন্দ্র করে ঝাড়খণ্ডের রমণীমন প্রেমভাবনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে, একথা আমরা অন্যত্র বলেছি। উদয়া গানেও বাগাল-সম্পর্কিত কামনা-বাসনা বিচিত্র রূপলাভ করেছে। বাগা'লেরা অরণ্যে গোচারণ করে থাকে, তাই এই সব অরণ্যগীতের নায়ক যে তারাই হবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

৮ আমার বঁধু ম'ষ বাগালি যায়, হাতে বাঁশি কাঁধে লাঠি নয়ান ধারে যায়।
ছুকরী হেব্যে লে ল চাঁদবদন, ঘু'রবার বেলা শুনবি বাঁশির গান॥

৯ যখন বেলা তালগাছের আড়ে, লুকলুকানি খে'লতেছিলম এক গলা জলে।
অ তুঁই ভাবিস কি ল অন্তরে, কাড়াবাগাল আ'সছে ডহরে॥

১০ মাছপড়া পাখাল ভাত বাগাল বাবুর তরে,
সাঁঝা করি বলবি বাগাল গঠ কত ধুরে।
বাগাল্যা রে বাগাল্যা গঠ গেল বহুৎ ধুর।
শাড়ির ভারে চ'লতে নারি মাথায় তুল্যে ধর।
বাগাল পার করো দে, দারুন্ত কাঠের বঝা মাথায় তুল্যে দে॥

কোন-কোন গানে রূপোপজীবিনী নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—

১১ ছুকরার মায়া রূপসুন্দরী, রা'তসংসারে র'জগার করে পাঁচসিকা করি।
আমার হোক বরং বদনামী, তাউ কি ছা'ড়ব ব্রাহ্মণভাতারী॥

১২ একটুক্ খাঁয়েছিলি দশটাকা নিয়েঁ আলি
যদি তর মতন সুন্দরী হ'থ্যাম ল, তিরিশ টাকায় বঁধু কিন্যে লিথম॥

কোন-কোন গানে পুরুষনারীর দ্বৈত কণ্ঠস্বরও শুনতে পাওয়া যায়—

১৩ 'আড়ায় আড়ায় যাও হে রাজা আড়ায় আড়ায় যাও,
বুকের মাঝে মাণিক জ্বলে ফিরে কেন্ নাই চাও।'
'জ্বলুক মাণিক পুড়ুক তেল তাই ঢা'লব ঘি,
ঘরে আছে কনকচাঁপা ধুত্‌রা ফুলের কি॥'

পঞ্চম অধ্যায়
জীবিকাশ্রয়ী গান

ঝাড়খণ্ডে কিছু কিছু গান প্রচলিত আছে, যা সম্পূর্ণতঃ বৃত্তিনির্ভর। আমরা এগুলোকে জীবিকাশ্রয়ী গান নামে চিহ্নিত করেছি। এদের মধ্যে পাটি গীত বা পট গান, বাঁদর নাচের গান, সাপ খেলানোর গান এবং পুতুল নাচের গান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এ-গান জীবিকা-সংশ্লিষ্ট, তাই বিশেষ বিশেষ জীবিকার ক্ষেত্র ছাড়া এ গানের

স্বাধীন কোন ব্যবহার নেই; পট বাদ দিলে পট গানের স্বাধীন কোন অস্তিত্বই থাকে না। বৃত্তিনির্ভর গান হওয়ায় অন্য পেশা বা সম্প্রদায়ের লোকেরা এগান কখনো গায় না; তাতে জাতিচ্যুত হবার আশঙ্কা থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে এ গান সীমিত থাকলেও এর আবেদন ঝাড়খণ্ডী জনমানসে প্রভাব ফেলে থাকে। পটগানের বিষয়বস্তু পৌরাণিক হয়ে থাকে; অন্যান্য জীবিকাশ্রয়ী গানে লৌকিক জীবনের কথাবস্তু স্থান পেয়ে থাকে এবং তা সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হয়। বর্তমান অধ্যায়ে পটগান এবং বাঁদর নাচের গান— এই দু'শ্রেণীর গান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

॥ এক ॥

পাটি গীত বা পট গান

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে পটকে 'পাটি' এবং পটুয়াদের 'পাটিকার' বলা হয়। স্বভাবতঃই পটগান এখানে 'পাটি গীত' নামে পরিচিত। পাটিকাররা একটি বিচিত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এরা পটের বিষয়বস্তু হিন্দুপুরাণ আদি থেকে নির্বাচিত করলেও এবং দৈনন্দিন জীবনধারায় হিন্দুয়ানি বজায় রাখলেও এদের বিবাহসম্বন্ধ মুসলমান সমাজের সঙ্গে স্থাপিত হয়ে থাকে। এরা বৈষ্ণবদের মতো গলায় তুলসীমালা ধারণ করে এবং তিলক ফোঁটা কাটে। এদের কণ্ঠে বৈষ্ণব পদাবলী প্রতিনিয়ত গুঞ্জরিত হয়, পদাবলী কীর্তনে ঝাড়খণ্ডে এরা বিশেষ পারদর্শী। বলতে গেলে গানই পেশা, কখনো করতাল বাজিয়ে, কখনো টুংটুঙ্গী (একতারা) বাজিয়ে, কখনো মুরমাদল বা খোল সহযোগে, গৃহস্থবাড়িতে পদাবলী গান শুনিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। বৈষ্ণব-ধর্মই যেন এদের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবার ছাড়পত্র দিয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের করুণা এখনো অর্জন করতে পারেনি।

পাটিকারদের আদি পেশা অবশ্যই পাটি দেখিয়ে ভিক্ষা করা। এই পাটি বা পটগুলো একান্তভাবে গীতনির্ভর। গীতের বিষয়বস্তুকে পটে চিত্ররূপ দেওয়া হয়ে থাকে। তাই পট বাদ দিলে এই গীতগুলোর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পট বাদ দিয়ে এ গীত কখনো গাওয়া হয়

না। বিষয়বস্তুর নির্বাচন সব সময়ই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ আদি থেকে করা হয়ে থাকে। পাটি গীতগুলো নিঃসন্দেহে লোকগীতি এবং পাটিগুলো লোকশিল্প। পৌরাণিক কাহিনীও গীতে লৌকিক রূপ পেয়ে থাকে। এরা কাহিনীচয়নে কখনো পুরাণকথাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে না। এদিক দিয়ে বিচার করলে গীত-রচনায় এদের স্বকীয়তা এবং কিছুটা মৌলিকতা স্বীকার করতেই হয়। সাধারণতঃ এরা পুরাণ থেকে উল্লেখযোগ্য খণ্ডিত উপাখ্যানগুলোকে বেছে নিয়ে গীতবদ্ধ করে এবং এই গীতের অনুসরণে পট আঁকে। কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, নহুষ রাজা, দাতা কর্ণ, হরিশচন্দ্র, সিন্ধুমুনি বধ, মনসামঙ্গল, জগন্নাথ দর্শন, দুর্গাকালি আদি পালা পাটিকারদের অত্যন্ত প্রিয়।

১ মনসামঙ্গল

জয় মা মনসা দেবী জয় বিষহরি। পদ্মপাতে জন্ম মায়ের মনসা সুন্দরী॥ নাগের হল্য খা'ট পালঙ্ক নাগের সিংহাসন। মঙ্গলা বড়ার পিঠে দেবীর আসন॥ দেবী বলে শুন বেন্যা মোর বাক্যি ধর। ডা'ন হাতে ফুলে জলে মনসা পূজা কর॥ যদি না পূজিবি বেন্যা মনসার ঘটবারি। ছয় পুত্র খাব রে ছয় বধূ ক'রব রাঁড়ি॥ আড়চক্ষে চেয়ে বেন্যা মচড়ায় দাড়ি। কাঁধেতে তুলিয়া নাচে হিঁতালের বাড়ি॥ বলে চেংমুড়ি কানীর নাগাল যদি পাই। মারিয়া হিঁতালে বেটির কমর চুবাই॥ যদি না পূজিল বেন্যা মনসার ঘটবারি। ছ বেটা খেল্য বেন্যার ছ বধূ ক'রল রাঁড়ি। তবু নয় বাদ ছাড়ে চাঁদ অধিকারী। চাঁদের ভার্যা সনকা পূজেন বিষহরি। মিছাই পূজিলি গ সনার গন্ধেশ্বরী॥ তিন দিন গায় গীত মধু সরবাণী। সদাই সুঁয়ারে বলে জয় ব্রহ্মাণী॥ বেন্যার ছিল এক পুত্র বালা লখিন্দর। তার বিভা দিতে গেল নিছনি নগর॥ নিছনি নগরে আছে অমলা বেন্যানী। তার ঘরে বাড়ে কন্যা বেহুলা নাচনী॥ একদিন আস্তে ছিল দনার্দন বুঢ়া। সমন্ধ ঘটাযে গেল সেই আঁটকুড়া॥ সাজ কুটি সাজ মুটি বিভা আরম্ভিল। নিজে পুরোহিত হয়ে বাক্য পড়াইল॥ বিভা করি লখিন্দর পালখিতে চাপিল। জয় ঢুলি ঢাকের বাদ্য বাজিতে লাগিল॥ সাঁতালি পর্বত মূলে লহার বাসঘর। তায় শুয়ে নিদ্রা গেল বেহুলা লখিন্দর॥... বেহুলা বলেন কে দাদা আইসে গো। এতদিনে জানিলাম বাপের আছে পো॥ রাত্রিদিন

কেঁদে মরি না দেখিয়া ঘরে। অভাগিনী বন্দী আছি লহার বাসঘরে ॥ অমির্তাদ খিবি খাও বলি যে তুমারে। সুখে নিদ্রা যাও তুমি হাঁড়িরি ভিতরে ॥ বুদ্ধি বল নেত গো উপায় বল মোবে। বেহুলা নাচনী মোর লাগে বন্দী কবে ॥...উড়িল অঙ্গারের গুঁড়ি কালিব নিশ্বাসে। জয় জয় বলি কালি বাসরে প্রবেশে ॥ সুতাব সঞ্চাবে কালি বাসবে সামাল্য। এতদিনে লখিন্দবেব বিধি বাম হল্য ॥ বেহুলা নখার কোলে যেন কলানিধি। যেমন কন্যা তেমনি বব মিলাইল বিধি ॥ এমন সুন্দর নখাব কনখানে খাব। দেবী জিগ্‌গাসিলে তাবে কি বোল বলিব ॥ বিষম আবতি দেবী কেন দিল মোবে। লখিন্দবে খেতে মোব শক্তি নাহি সবে ॥ ঘুমেব আলিসে নখা দিল পাশমুডা। অবঘাতে বাজে কালির দ্বন্দেব পয়বা ॥ হে বে ধর্ম চন্দ্র সূর্য তুমরা থাক সাক্ষী। জা'তে গন্ধ বেন্যাব ছাওয়াল দ্বন্দে মাইল লাথি ॥ চাঁদসুজ্জুকে সাক্ষী বাখি হানিল কামড। জ্বালায জ্বলিয়া কান্দে বালা লখিন্দব ॥ উঠ না গো উঠ কন্যা সায় বেন্যাব ঝি। তোরে আইল কাল-নিদ্রা মোরে খাইল কি ॥ সবাঙ্গ থাকিতে বিষ ধবে আগচুলে। বিষেব জ্বালায় নখা হরি হবি বলে ॥ উঁচকপালী বেহুলা চিরুণবরণ দাঁতী। বাসরে খাইলি পতি না পুহালি রাতি ॥ ভাল হল্য চাঁদ শ্বশুব মোর দোষ হল্য। আব যে তুমাব ছটি পুত্র কি দোষে মরিল ॥ পুত্রের মরণ শুন্যে চাঁদ আনন্দিত হল্য। হেঁতালেব বাড়ি লয়ে নাচিতে লাগিল ॥ ভাল হল্য পুত্র মৈল কি ভাব বিষাদ। চেংমুড়ি কানী সহ ঘুচিল বিবাদ ॥ তিনখানি কলাব গাছকে একুশতে কাটিল। নাপিয়া জাপিযা বেহুলা মান্দাশ বনাল্য ॥ মান্দাশ বনায়ে বেহুলা যায় আঁটি আঁটি। মান্দাশ ভাঁসায়ে দিল গাঙুড়িব ঘাটি ॥ যেই ঘাটে কাপড কাচে নেতাই ধোপানী। সেই ঘাটে গেলে মডা উজান বাইটানি ॥ কাপড কাচিয়ে নেতাই বান্ধিলেন বঝা। আপনার পুত্র মেবে আপনি হলেন অঝা ॥ নেতাই-এব সঙ্গে বেহুলা দেবীপুবে গেল। মনসার কাছে গিযে নাচিতে লাগিল ॥ নাচ বাছা বেহুলা বাছিয়ে মাগ বব। কি বব মাগিব মা গো কাঞ্চন সুন্দব ॥ দিলাম গো বেহুলা আমি দিলাম তোবে বব। ছয ভাশুব স্বামী লইয়া যাও নিজ ঘব ॥ ছ ভাশুব স্বামী বাঁচালেন মনেব হরিষে। সাত ডিঙ্গা নয়ে ফিবে আপনার দেশে ॥ ছ ভাশুব স্বামী জিযাইযা বেহুলা এল ঘব। হেথা মনসাব পূজা কবে চাঁদ সদাগব ॥

মনসামঙ্গল পালাটিতে মনসামঙ্গলের কাহিনীটি স্বল্প পরিসরে দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও গায়কের স্মৃতিভ্রংশতার জন্য অংশ বিশেষ লুপ্ত হয়ে গেছে, কোথাও বা সামঞ্জস্য বজায় থাকে নি। তা সত্ত্বেও মনসা মঙ্গলের মোটামুটি কাহিনীটি এর মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। চাঁদ সদাগরের একগুঁয়েমি, পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূর প্রতি দোষারোপ, পুত্রের মৃত্যুসংবাদে চাঁদের উল্লাস এবং হেঁতালের বাড়ি কাঁধে নিয়ে নৃত্য নিঃসন্দেহে পটগানটিকে অভিনবত্ব দিয়েছে। অন্য দিকে বেহুলা নাচনীকে স্বামীর সর্পাঘাতে মৃত্যুর কারণ হিসাবে অপবাদ বহন করতে হয়েছে। উঁচকপালী চিরুণদাঁতী অলক্ষুণে বধূ বলে চাঁদ সদাগর দোষারোপ করেছে। বেহুলা এই অপবাদ স্বীকার করে নিয়েও মুখরার মতো পাল্টা আক্রমণ করেছে এই বলে— 'আর যে তুমার ছ'টি পুত্র কি দোষে মরিল।' বলাবাহুল্য, এ-অঞ্চলে প্রচলিত কেতকাদাসের মনসামঙ্গলের বেহুলার চরিত্রের সঙ্গে পটের এই বেহুলার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বেহুলা এখানে যেন ঝাড়খণ্ড জনপদের বধূদের চরিত্রটিই লাভ করেছে। এইটুকু বাদ দিলে বেহুলা চরিত্রটি মনসামঙ্গলের কাহিনীর অনুসরণেই চিত্রিত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে কেতকাদাসের মনসামঙ্গল অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। মনসা পূজার সময় গ্রামে-গ্রামে এই পুঁথি গীত হয়ে থাকে। মনসার পূজা ঘরে-ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই মনসামঙ্গলের গান এখানে এতো বেশি জনপ্রিয়। পটের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মনসামঙ্গল পালাটিই সর্বাধিক জনপ্রিয় পালা।

২ জগন্নাথ দর্শন ॥

অপূর্ব কৌতুক কথা শুন সর্বজনে। নীলাচলে অবতার অমৃত কথনে ॥
এড়াবে শমন দায় চিত্ত দেহ যদি। কলিযুগে তরিবে নিস্তার ভবনদী ॥
বরণ চিকনকালা নবঘন শ্যাম। অহর্নিশি অহর্নিশি দেখ কালাচাঁদ ॥
কপালে মাণিক জ্বলে সুবর্ণ মুকুট। ডগমগ কুণ্ডলে ঝলকে কর্ণফুল ॥
বিচিত্র বসন অঙ্গে কনক বরণ। সুভদ্রা ভগিনী মধ্যে ভুবনমোহন ॥
ডাইনে প্রভু বলরাম মধ্যেতে ভগিনী। তার বামে কালাচাঁদ আছেন আপনি ॥ কে চিনিতে পারে প্রভুর অদ্ভুত লীলা। বাইশাটি চাপিয়ে বসিল সপ্তশিলা ॥ বারবাটি কুম্বেড়া প্রাচীর মেঘলাল। সিংহদ্বারে বাজে জয় ঢোলেরি বিমান ॥ প্রথম গড়ুর স্তম্ভে যেবা দেই কোল।

আনন্দেতে ভক্তগণ বলে হরি বোল ।। সন্ধ্যার আরতি প্রভুর ঝলমল করে। রতন প্রদীপ জ্বলে প্রভুর গোচরে ।। রতন প্রদীপ জ্বলে জয় ঘণ্টারি বাজনা। ধ্বনি শুন্যে হল্য দুর দারুণ যন্ত্রণা ।। রহনে কুণ্ডেতে কাগ ত্যজিল জীবন। চতুর্ভুজ হয়ে কাগা যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ।। চতুর্মুখ ব্রহ্মা যে তার পাছে গড়াইয়া। বদন ছাড়ি অন্ন ঘাম ছাড়াইয়া ।। ছি ছি করিয়া গৌরী না কাড়িলেন কর। কুকুরের উচ্ছিষ্ট খান দিগম্বর ।। আধখানি কৈবল্য হর ফেলাইলেন মুখে। আধখানি কৈবল্য হর রাখেন মস্তকে ।। হরসঙ্গ করে গৌরী গৌরীমণি রথী। জগবন্ধু বিশ্বমায়া দেখা দেন পথি ।। দেখিতে না পান গৌরী বস্তাণ্ড ঈশ্বরে। জটা হতে সেই অন্ন দিলেন তাহারে ।। অন্নের বাজারে বিচার বিয়াল্লিশে বাজনা। সুবর্ন রাজ কুবির করে বিকা কিনা ।। ভাত বিকায় পিঠা বিকায় আরো ভোগ লাড়ু। মধুরুচি ব্যঞ্জন তরাহ গাড়ু গাড়ু ।। শূদ্দুরে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মনেতে খায়। নীলাচলে দেখুন প্রভু জা'ত নাহি যায় ।। কড়ি দিয়ে কিনে খায় কেউ হাড়ির ঝাঁটার বাড়ি। কনকচুর বালির মধ্যে যান গড়াগড়ি ।। কনকচুর বালির মধ্যে খায় মাংস শুঁড়ি। বিমানে চাপিয়া বংশ যান সগ্গপুরী ।। রাজা ছিলেন ইন্দ্রদবন উড়িষ্যা ভিতর। তারে আনিতে গেলেন ব্রহ্মা ষাট সহস্র বৎসর ।। মাগ রাজা ইন্দ্রদবন বেছে মাগ বর। কি বর মাগিব প্রভু তুমা বরাবর ।। আঠারটি পুত্র আছে পৃথিবী ভিতর। সকলগুলি কর নিপাত এই যে মাগি বর ।। কেন রাজা ইন্দ্রদবন এবর মাগিলে। আঠারটি পুত্র কেন নিপাত করিবে ।। বাপ যে সুপুত্র হলে বেটাবে পড়ায়। বেটা যে সুপুত্র হলে গয়ার সাগর যায় ।। গয়ার সাগরে পুত্র হাতে নিবে কুশ। এক বাক্যে উদ্ধারিবে শতেক পুরুষ ।। সুপুত্র হইলে পরে নাম যে রাখিবে। কুপুত্র হইলে কত গালি খাওয়াইবে ।। এই না কারণে প্রভু এই না মাগি বর। তথাস্তু দিলেন বর যাহ নরবর ।।

জগন্নাথ দর্শন পালাটিতে বৈষ্ণব ধর্মভাবনা প্রচার করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে অন্য সব দেবতারা খুব বেশি স্বীকৃতি না পেলেও পুরীর জগন্নাথের ওপর এদের অসীম বিশ্বাস। হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র অনীহা থাকলেও এখানকার আদিম বাসিন্দাদের—কুর্মি, ভূমিজ আদি সম্প্রদায়ের জনজীবনে আচার অনুষ্ঠানে, লোকসাহিত্য-সংস্কৃতিতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব খুব তীব্র আকারে না হলেও সহজেই অনুভব করা যায়।

জগন্নাথদর্শন পালাটিতে খুব সম্ভবতঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যানও এসে মিশে গেছে। প্রথমার্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধের একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা সহজেই নজরে পড়ে। ঠিক একই ধরনের সংমিশ্রণ পরবর্তী দুর্গাকালি পালাটিতেও ঘটেছে মনে হয়। পালাটির শেষ চার পঙক্তিতে যমের পুরীর কথা আছে, যা পালাটির সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিহীন। সম্ভবতঃ এটি একটি পঞ্চকল্যাণী পট।

৩ দুর্গাকালি পালা ॥

ভাবিনী ভৈরবী মাতা দুঃখ বিনাশিনী। এক মেঘে চলে মা দসব মেঘে পানী॥ তুমি যারে দয়া কর মা তার কিবা দুখ। সুমের উঠ্যে দিতে পারে হেলাইয়া বুক॥ দুর্গা দুর্গা বল্যে আমার দগ্ধ হ'ল কায়া। একবার দে গো মোরে চরণেরি ছায়া॥ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে রাখিলে নারায়ণী। রাখিলে বণিক সুতে দক্ষিণ মশানী॥ কৃষ্ণেরে সদয় হয়ে মা কংসে হলে বাম। শ্বেতপদ্মে তুমায় পূজে সীতা পেল রাম॥ ভদ্রকালী কপালিনী করাল বদনী। মুখ হতে বেরায় কালীর চৌষট্টি ডাকিনী। চৌষট্টি ডাকিনী কালীর সথে চৌদ্দ চেলা। হাতে ধরে ক্ষেত্রী খপ্পর গলে মুণ্ডমালা॥ বাম হাতে কাতান কালীর ডান হাতে খপ্পর। রক্তধারা বহে কালীর মুখের উপর॥ রণে ভঙ্গ কর্যে কালী মত্ত্যপানে চায়। সদাশিবের বুকে পদ দেখিবারে পায়॥ আধা জিব কাড়ি কালী কৈলাস পালান।

কৈলাসে পালান শিব বসেন যোগাসনে। হেনকালে পড়্যে গেল নারদেরে মনে॥ মনেতে ভেবেছ মন এম্নি দিন কি যাবে। গুরু না ভজিলে সে গোবিন্দ কোথা পাবে। হেথ কর দানপুণ্য সেথা গেলে পাই। নিদারুণ যমের পুরী ধার উধার নাই॥

ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতিতে দুর্গাপূজা কিংবা কালিপূজার কোন ভূমিকা নেই। ঝাড়খণ্ডের অধিবাসীরা আদিম কালীর পূজা অবশ্য করে। কিন্তু তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ থাকে না, একটি নির্দিষ্ট বারে বছরের যে-কোন সময়ঃ তারা কালিপূজা করে থাকে। ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতিতে এদের অনুপ্রবেশ বহিরাগতদের কল্যাণেই ঘটেছে। পালাটিতে স্বল্প কথায় দুর্গাকালির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে, যা খুব সহজেই সরল ঝাড়খণ্ডীদের মনকে প্রভাবিত করে তুলতে পারে॥

॥ দুই ॥

বাঁদর নাচের গান

ঝাড়খণ্ডের বীরহোড উপজাতি বানর শিকারে অত্যন্ত পটু। বানর মাংসও এদের অত্যন্ত প্রিয় খাবার। এদেরই একটি শাখা যাযাবর জীবন ছেড়ে কোথাও কোথাও কুঁড়ে বেঁধে বাস করতে শুরু করেছে এবং 'বা'জকার' (<বাজিকর) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এরা বানরের খেলা দেখিয়ে গৃহস্থবাড়ি থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে জীবিকানির্বাহ করে থাকে। বানর নাচাবার সময় তারা কিছু গানও গেয়ে থাকে ; এই গানগুলো বাঁদর নাচের গান নামে পরিচিত। হাতের লাঠি মাটিতে ঠুঁকে ঠুঁকে তালরক্ষা করে গানগুলো গাওয়া হয় বলে এ গান সাধারণতঃ ছড়ার ছন্দে রচিত হয় ; তবে ছড়ার মধ্যে যে অসংগতি এবং অর্থহীনতা লক্ষ্য করা যায়, এই গান তা থেকে মুক্ত। বাঁদর নাচের গানের বিষয়বস্তু সর্বাংশে লোকজীবনসম্পর্কিত ; প্রায় সময়ই লোকজীবনের কৌতুককর দিকগুলো এর উপজীব্য হয়ে থাকে। জীবনরসধর্মিতা এই গানের প্রধান লক্ষণ। জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখে গীতবদ্ধ করার ফলে গানগুলোতে কৌতুকের আবহ যেমন রচিত হয়, তেমনি সহজ স্বচ্ছ হাস্যরসধারার উৎসমুখও অবারিত হয়ে থাকে। ভাবে-ভাষায় ভঙ্গিতে-মেজাজে এগুলো ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের যোগ্য উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। বাঁদর নাচের গানের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। অনেক সময়ই পাঁতাশালিয়া গানের পদও বাঁদর নাচের গান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে বাঁদর নাচের গানের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রায় প্রতিটি গানেই কোন না কোন রকমের খাদ্যপ্রসঙ্গ থাকে।

১ আঘন-কুঁটা ছাঁটা চ'াল ফাগুন মাসে বিহা।
চ'ৎ মাসে বাউ প'ড়ল নাই হল্য বিহা ॥

২ আল ধানের মাড র'াধ্যেছি কানা শাগের বেসাতি।
সাঁজের বেলা দেঅর শালা লুচকাঁই খায় বেসাতি ॥

৩ থালে থালে চা'ল ভিজাবি গালে-গালে খাবি।
কাছে আছে শ্বশুরবাড়ি কন্ গাড়িটায় যাবি ॥

৪ আস্না পাতের দাস্না করল্যা পাতের দনা।
দনায় দনায় মদ পরশে হিলে কানের সনা ॥

৫ উড়কি ধানের মুড়কি বাদাম ধানের খই।
বদ্ধমানে দেখ্যে আল্যম গামছা-বাঁধা দই ॥

৬ আম ফলে থঁকা থঁকা তেঁত'ল ফলে বাঙ্কা।
নামাল দেশে দেখ্যে আল্যম রাঁড়ির হাতে শাঙ্কা ॥

৭ নাগপুর কা ছাঁটা চা'ল বুচাডাঁড়ির পানী।
বৈঠল বৈঠল ভাত রাঁধছে কেঁউঝর কা রানী ॥

৮ চাঁইবাসার সুরু চিড়া শিশিবে নাই ভিজে চিড়া।
পানীর বড় টানাটানি অহ জিহলখানার পানী ॥

৯ বাঁগা বাঁগা খেজাড়ি কাকাড়চাং পিঠা।
ঝাঁট বিদাই দে আমার ঘর কাঁইরাকচা ॥

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়

ছড়া

লোকসাহিত্যরসিক পণ্ডিতদের মতে, ছড়া শুধু লোকসাহিত্যেরই আদিম শাখা নয়, ছড়া সাহিত্যমাত্রেরই আদিম শাখা। কারণ ছড়ার বিষয়বস্তু হল শিশু, আর কে না জানে শিশুর চেয়ে চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন বিষয়বস্তু আর কিছু হতে পারে না। আশি বছরের-ও আগে রবীন্দ্রনাথ ছড়াকে প্রথম অন্ধকার থেকে আলোতে এনে তার অননুকরণীয় ভাবাভঙ্গিতে অনবদ্য আলোচনা করেছিলেন। শিশু এবং নারীর একান্ত নিজস্ব সম্পদ ছড়া রবীন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টি লাভ না করলে হয়তো শিক্ষাভিমানী বাঙালির কাছে বড়ো দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত তুচ্ছ বস্তু হিসাবেই অনাদরে অন্ধকারে পড়ে থাকত। শিশুবেলায় শোনা ছড়ার টুকরো অংশগুলো 'মোহমন্ত্রের মত' পরবর্তীকালেও তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তিনি বলেছেন, 'আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী।' ছড়ার পরিবর্তন থাকতে পারে কিন্তু তার বিনাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'এই সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।' কারণ ছড়ার বিষয়বস্তু যেমন শিশু, তেমনি শিশু মনই যেন ছড়ার রূপ ধারণ করেছে। শিশু সহজ সরল, সাংসারিক জটিল প্যাঁচ-বর্জিত, শিশু যেন প্রকৃতিরই রূপান্তর এবং নামান্তর, একই ভাবে বলা যেতে পারে, ছড়াগুলি-ও প্রকৃতিজ, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই যেন ছড়ার রূপ পরিগ্রহ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই বলেছেন, 'তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।'

ডঃ সুকুমার সেন ছড়াকে 'শিশু-বেদ' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে রচনা কোন ব্যক্তিবিশেষের তৈরি বলে নির্দিষ্ট করা যায় না, যা কোন এক মানবগোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধরে জন্মে-কর্মে-চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে তাকে যদি বেদ নাম দিয়ে থাকি তবে অপৌরুষেয়

ছেলেমি ছড়া-গান গল্পকে শিশু-বেদ বললে বোধ করি অসঙ্গত হয় না। শিশু-বেদ ধ্রুব অথচ অধ্রুব, তা দৃঢ়মূল ও সজীব—অক্ষয়বটের মতো, যার বীজ বেদের-ও অগোচর কালের ....।'[১] ডঃ সেনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেদ যেমন কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, অথচ তা একটি বিপুল মানবগোষ্ঠীর জীবনকে সর্বস্তরে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, ছড়া বা শিশু বেদ ও তদ্রূপ। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছড়া-ও কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়, সামগ্রিক সৃষ্টি। ছড়া বহু পরিবর্তন স্বীকার করে ও অবিনশ্বর হয়ে আছে, কেননা এর মূল শিশু মনের গভীরে যেখানে রসের কখনো অভাব হয় না, তাই ছড়ায় কখনো সরসতা এবং সজীবতার দুর্দিন আসে নি। সেই অনাদিকাল থেকে ছড়া রসধারায় শিশু মনকে সিক্ত করে এসেছে, যেদিন মানবজীবনে না ছিল বেদ না ছিল পুরাণ শাস্ত্র, না ছিল সাহিত্য। এই ছড়াই মানুষের সাহিত্যপ্রয়াসের প্রথম নিদর্শন। তাই ছড়া শিশুর মতোই চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন। আদিম মানুষের অসংলগ্ন অস্ফুট চিন্তারাশি আজো ছড়ার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। 'আদিম মানব কথা বলবার চেষ্টায় যা করত তাকে বলতে পারি শব্দের লোফালুফি খেলা, আবোল-তাবোল কথা খেলাখেলি। সেই খেলার বশেই একদিকে বুদ্ধির অভিষেকে হিংটিং ছটের, মন্ত্রতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল অপরদিকে স্নেহধারায় নির্ঝর বইয়েছিল ছেলেমি ছড়া গানে।'[২]

শিশুরা যা কিছু দেখে সব কল্পনার রঙে রঞ্জিত, যা কিছু ভাবে সব কল্পনার ভাষায় রচিত। তাদের চিন্তাজগতে সংগত-অসংগত স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক প্রাকৃত অপ্রাকৃত বলে কোন জিনিষ থাকে না। প্রকৃতির রাজ্যে অসংলগ্নতা, অস্বাভাবিকতাই যেন তার মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে থাকে। ছড়ার মধ্যে শিশুর ভাবজগতের এই সব কল্পনাই উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শিশুমন কোনটি কৃত্রিম আর কোনটি অকৃত্রিম তার কোন সীমারেখা টানায় আগ্রহী নয়। সব কিছুই তার কাছে অকৃত্রিম, তাই ছড়াতেও সেই সব বিষয়বস্তু অকৃত্রিম, অকপট রূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন, 'স্নেহবিবশা জননী যখন গৃহ-কোণের অন্ধকার

---

১ 'শিশুবেদ'—ভূমিকা, শ্রীভবতারণ দত্তের 'বাংলা দেশের ছড়া'।

২ প্রাগুক্ত—'শিশুবেদ'

মধ্যে, লোক নয়নের অন্তরালে অস্ফুট বাক্ অস্ফুটবুদ্ধি অপত্যের মুখের পানে চাহিয়া আপনার আত্মারনিগূঢ়তম প্রদেশ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, তখন তাহার বাক্যভঙ্গি কার্যভঙ্গি কোন কোন সামাজিক কৃত্রিম প্রথার বা প্রণালীর কোন ধার ধারিতে চাহে না। তখন স্বাভাবিক মানব চরিত্র কৃত্রিমতার পর্দার অন্তরাল সরাইয়া ফেলিয়া আপনার নগ্নমূর্তি আবিষ্কার করে।'[৩]

বন্ধনহীন শৃঙ্খলহীন শিশুমন জগতের মধ্যে বিপর্যয়, নিয়মহীনতা কিংবা শৃঙ্খলাহীনতা দেখলে শঙ্কিত বোধ করে না, বরং উল্লসিত হয়। কোন কিছুই তার কাছে জটিল নিয়মজালে বাঁধা স্থিরচিত্র নয়। তার মন সর্বদা চঞ্চল এবং অস্থির, স্বভাবতঃই দ্রুত পরিবর্তনশীল। ছড়ার জগৎটাও এই একই উপকরণে গঠিত। তাই সব সময় ছড়ার মধ্যে কোন বিশিষ্ট অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ছড়ার মূলধনই হল সংহতি এবং সংগতির বেড়া ভেঙে চকিত চরণে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, অর্থ থেকে নিরর্থে পরিক্রমণ। আশ্চর্য চমক, অলৌকিকতা, অর্থহীনতা, শব্দের ব্যঞ্জনা এবং সংগীতময়তা, ছন্দের বিহ্বল দোলা এবং ধ্বনির গভীর হার্দিক সুর ছড়াকে অন্যান্য ছন্দোবদ্ধ সাহিত্যকর্ম থেকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা দিতে পেরেছে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করা যেতে পারে: 'আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল। বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। —দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক।'

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে দ্রুত সঞ্চরণশীলতা দেখে মনে হবে এই সব ছড়া মনুষ্যরচিত নয়, যেন—'ইহারা আপনি জন্মিয়াছে': অন্য কথায় স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাসদৃশ। মানুষের চিন্তা এত দ্রুত শব্দ থেকে শব্দান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সংগতিহীন অবস্থায় পরিক্রমা করতে পারে ভাবা যায় না। যেহেতু মানুষ চিন্তাশীল, তাই সে যুক্তিতর্কের অবতারণা না করে এমন সাবলীল পরিক্রমা করতে গিয়ে পদে-পদে বিব্রত বোধ করে। কিন্তু ছড়ার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। সেখানে সে আপনাতে আপনি বিকশি ওঠে। লজিককে তুয়ো দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। ছড়ার জগৎ শিশুর ভাব-জগতের প্রতিলিপি, বয়স্ক মানুষের সুচিন্তিত দলিল নয়।

আসল কথা, ছড়ার রচনা যাদের মানসলোকে ঘটেছে, তারা কোনদিন

৩ ভূমিকা—'খুকুমণির ছড়া'—যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত।

লজিক নিয়ে মাথা ঘামায় নি। একটি সূত্র পেলেই হল; একটু গতি সৃষ্টি করতে পারলে তখন আর সূত্রান্তরে যাবার কোন অসুবিধে থাকে না। কথাবস্তু অসংলগ্ন মনে হতে পারে, কিন্তু ছড়াগুলো একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে এক একটি ছড়া যেন চলমান চিত্রের মিছিল। রীলের পর রীল দ্রুত সঞ্চরমান চিত্র আমাদের চোখে এবং মনে আভাসিত হয়েই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিটি ছড়ার মধ্যে একটি আভ্যন্তরীন গতি আছে, যা বিভিন্ন ভিন্নধর্মী বস্তুর মধ্যে একটা গতি বা মোমেণ্টাম দেবার ক্ষমতা রাখে, ফলে অজস্র অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সাবলীল প্রবহমানতা সম্ভব হয়। শেষতক এইসব বিচিত্র চিত্রময় অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সামঞ্জস্য আভাসিত হয় এবং তা শিশুমনের ওপর তীব্র কৌতূহল এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

ছড়া চমক, শব্দের ব্যঞ্জনা এবং সংগীতময়তা, ছন্দের এবং ধ্বনির অলৌকিক মেল বন্ধনে গড়ে ওঠে। ছড়ার এই সব সাধারণ ধর্মের সঙ্গে কখনো কখনো অর্থহীনতা এমন নিবিড় ভাব জমায় যে তখন তার অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। শব্দ, ছন্দ এবং ধ্বনি যৌথবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি সংগীতময় পরিবেশ রচনা করে যেখানে উদ্ভট কথার সঙ্গে অর্থহীনতা একই পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো পাশাপাশি বাস করবার সুযোগ পায়। চিত্রধর্মিতা ছড়ার একটি সাধারণ ধর্ম। চিত্রের যেমন ভাষা আছে, তেমনি অর্থও আছে। ননসেন্স ভার্সে বা অর্থহীন ছড়ায় কিন্তু কোন সুস্পষ্ট চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাই বলে ছড়া একেবারে অর্থহীন, তালগোল পাকানো চিত্রের সমষ্টি এমন কথা ভাবা ঠিক নয়। ছড়ার মধ্যেও সার্থক জীবনধর্মী বিষয়বস্তু আছে, উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা সার্থক চিত্রও আছে। ছড়াগুলো বিশ্লেষণ করতে পারলে অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে পারে। ছড়ার মধ্যে কোন গভীর 'আধ্যাত্মিক তত্ত্ব' নিহিত না থাকলেও 'ঐতিহাসিক তত্ত্ব' বা সামাজিক তত্ত্বের' ছিঁটেফোঁটা থাকতে পারে। ছড়ার মধ্যে মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের বীজ নিহিত আছে। শিশুজীবনের অনেক গভীরগোপন দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই ছড়ার আশ্রয়ে লুক্কায়িত আছে; সমাজজীবনের বহু আনন্দবেদনার চূর্ণ স্মৃতিলিপির সন্ধান ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য: 'অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার

মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কোন পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না।'

অধিকাংশ ছড়াকে স্বয়ংজাত বা স্বয়ম্ভু মনে হলেও বহু ছড়াই কিন্তু বিশেষ নিয়ম অনুসারে গড়ে উঠেছে। বহুক্ষেত্রেই ভাবনা চিন্তা এবং বিষয়বস্তুর বন্ধনে আবদ্ধ ছড়া সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। সাধারণ ছড়া বা ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে ভাববীজ, বস্তুবীজ এবং সাহিত্যবীজের ত্র্যহস্পর্শ সহজেই নজরে পড়ে। সে তুলনায় খেলাধুলোর ছড়ার মধ্যে সাহিত্যবীজের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তার প্রধান কারণ সাধারণ ছড়া বা ছেলেভুলানো ছড়া বয়স্ক মা-মাসীদের রচিত; কিন্তু খেলাধুলোর ছড়া শিশুরা নিজস্ব প্রয়োজনমতো রচনা করে থাকে।

ছড়া একান্তভাবে সুর তাল এবং ছন্দ-প্রধান। পৃথিবীর সব দেশে সব মানবসমাজেই ছড়ার একটি বিশিষ্ট সুর থাকে। ছড়ার এই ধর্ম সম্পর্কে যাঁরা বিশেষভাবে অবহিত তারা যে কোন ভাষার ছড়া উচ্চারিত হতে শুনলেই সেটি যে ছড়া তা সহজেই বুঝতে পারেন। ছড়ার মধ্যে স্নেহরস এতো বেশি পরিমাণে থাকে যে তা সহজেই আমাদের স্পর্শ করে।

ছড়ার প্রধানতম উপজীব্য হল শিশু। শিশুই ছড়ার সর্বাধিক অংশ অধিকার করে আছে। তাছাড়া নারীও তার ঘরকন্না, রান্নাবাড়া নিয়ে বহু ছড়ায় উপস্থিত। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যেমন নারীর জীবনের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়ে থাকে, এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। নারীজীবনের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার কথাও তাই ছড়াকে সাহিত্য-রসঘন করে রেখেছে। শিশু এবং নারীর পাশাপাশি ছড়ার মধ্যে জীবজন্তু পশুপাখি রোদবৃষ্টি তুকতাক সব কিছুই আশ্রয় নিয়েছে।

ছড়া আসলে কবিতা, কবিতাছত্র বা কবিতাছত্রাংশ ছাড়া আর কিছু নয়। কবিতাছত্র বা ছন্দ থেকেই ছড়ার উদ্ভব বলে মনে হয়। ছড়া শব্দটির ব্যবহার খুব প্রাচীন নয়। ঝাড়খণ্ডে ছড়া শব্দের কোন ব্যবহার নেই। যে অর্থে আমরা এখানে ছড়া শব্দটির আলোচনা করছি সে অর্থে ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় ছড়া নামের কোন শব্দ নেই। ঝাড়খণ্ডে ছড়াকে 'ছানাভুলান গান' বলা হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডের ছড়া বা 'ছানাভুলান্যা গান' চরিত্রগত দিক দিয়ে অনেকাংশে বাংলার ছড়ার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলেও এবং বৈচিত্র্য থাকলেও সেগুলোকে অজস্র উপবিভাগে বিভক্ত করে আলোচনার কোন

সুযোগ নেই। তাই ঝাড়খণ্ডের ছড়াকে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করবার পক্ষপাতী :

১ ঘুম-পাড়ানি ছড়া, ২ ছেলে-ভুলানো ছড়া, ৩ খেলাধুলার ছড়া, ৪ সাধারণ জীবনসম্পর্কিত ছড়া, ৫ কাহিনীবিষয়ক ছড়া, ৬ ঐন্দ্রজালিক ছড়া।

ঘুমপাড়ানি ছড়া : ঘুমপাড়ানি ছড়ার মধ্যে তেমন কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় না। ঝাড়খণ্ডে ছড়াকে 'গান'ও বলা হয়ে থাকে। তাই ঘুমপাডানি ছড়াও গানের মতোই বিশেষ সুর ও তাল নির্ভর। সুব বাদ দিয়ে ছড়ার অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না। ঘুমপাডানি ছড়ার বিষয়বস্তুও শিশু নিজে। প্রাণচঞ্চল শিশুকে ঘুম পাড়াবার জন্য সুরে-সুরে ছড়া আউড়ে তালে-তালে তাকে চাপড়াতে হয়। ছড়ার কথায় ছন্দের দোলা যেমন থাকে, তেমনি থাকে অনুপ্রাস ; এর সঙ্গে যুক্ত হয় সুর এবং তাল। স্বভাবতঃই সুব করে আওড়ানো ছড়া শিশু মনকে ধীরে-ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলে ; তখন শিশুব ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হয় না। ঝাড়খণ্ডের ঘুমপাডানি গানে মাসি-পিসির দর্শন পাওয়া যায় না, পরিবর্তে 'ঘুম-কয়া' নামক একটি কাল্পনিক জীবের দর্শন মেলে। কখনো 'নিদ্‌চড়'য়া' বা নিদ্রাপাখি, কখনো 'বনচড়'য়া' বা বুনোপাখি, আবার কখনো বা টিয়ে পাখিকে ডাক দিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করা হয়।

১ আয়রে ঘুম-করা। তকে দিব ডিম পডা॥

২ ছানা ঘুমা ঘুমা রে তর বাপ ঘুমাল্য।
ছানা ঘুমায় নাই ছানার প্রাণ হারাল্য॥

৩ আয় রে নিদ্‌চড়'য়া নিতোই পাপা খায়।
কন্ চড়'য়া পাখি মারে পাপা রুটি খায়॥

৪ আয় রে বনচড়'য়া বনে বনে যাই।
খঁকার মা পান খাঁয়েছে শাউড়ী বাঁধা দিয়া।

৫ আয় রে টিয়া লাফঝাঁপ দিয়া।
খঁকা আমাদের পান খাঁয়েছে শাউড়ী বাঁধা দিয়া॥

৬। আয় রে পাখি ব'স রে ডালে। ভাত দিব রে সনার থালে॥
খাবি দাবি গান করবি। আম্‌দের খঁকাকে ঘুম করাবি॥

এই ধরনের ছড়া আউড়ে যখন শিশুকে ঘুম পাড়ানো সম্ভব হয় না, তখন বাধ্য হয়েই শিশুকে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়—তখন ভালুককে ডাকতে হয়।

৭ আয় রে ভালুক আঁদাড়ে পিঁদাড়ে থাক।
থঁকার মা জলকে গেলে থঁকার কান খা॥

৮ আয় ঘুমানি আয়, ভালুকে তেঁত'ল কুড়াঁই খায়।
ভালুকে নুন কুথায় পায়, ভালুকে তেল কুথায় পায়,
আন্‌লা মান্‌লা থাঁয়ে ভালুক বন্‌কে পালাঁই যায়॥

ছেলে-ভুলানো ছড়া : ছেলে-ভুলানো ছড়ারও উপজীব্য শিশু নিজে। রসবিচারের দিক দিয়ে ঘুমপাড়ানি ছড়ার সাথে এর কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। দু' শ্রেণীর ছড়াই বয়স্কা নারীর রচিত। পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় সুরে-ছন্দে-তালে। ঘুমপাডানি ছড়ার সুর বিলম্বিত, শব্দযোজনায় দীর্ঘস্বরের প্রয়োগ এবং ছন্দ-তালও অত্যন্ত শ্লথগতির ; শিশুকে ঘুম পাডানোই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার উদ্দেশ্য জাগ্রত শিশুর মনোরঞ্জন। কখনো খাদ্যবিমুখ শিশুকে অন্যমনস্ক করে খাদ্যগ্রহণ করানো, কখনো ক্রন্দনরত শিশুর ক্রন্দন থামানো, কখনো-বা শিশুকে মজার হাসির খোরাক জোগানোই ছেলেভুলানো ছড়ার উদ্দেশ্য। স্বভাবতঃই এর সুর যেমন দ্রুত হয়, তেমনি ছন্দ-তালও। তাই এই জাতীয় ছড়া লঘুমাত্রার শব্দসমন্বয়ে রচিত হয়ে থাকে।

৯ থঁকা থঁকা ডাক পাড়ি। থঁকা যায় রে কার বাড়ি ?
শিঁকায় ডা'ল বাটায় পান। আম্‌দের থঁকাকে ডাকি আন॥
আম্‌দের থঁকা খায় না ভাত। কুথায় পাব ম্যাগুর মাছ ?
কা'ল যাব কপ্‌পাড়ার হাট। কিন্যে আ'নব মাগুর মাছ॥
আম্‌দের থঁকার মন ঠাণ্ডা। একবেলা খায় দুধ মণ্ডা একবেলা খায় রম্ভা॥

১০ চের চের পটাস। ঘুগুচ্‌চু পাঁড়ুচ্‌চু॥
চড়্‌খুসলী ভাঁদা যায়। আম্‌দের থঁকা মাস ভাত খায়॥
থঁকার মা খায় কজ্জি আম্‌ঠা। থঁকার বাপ খায় চের চের পটাস্॥

'চের চের পটাস' ছড়াটির আদিতে এবং শেষে ব্যবহার করা হয়েছে ; এর অর্থ কি, ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু এই কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের উল্লাসে ভরে উঠতে দেখা যায়। 'ঘুগুচ্চু পাঁড়ুচ্চু' ছেলেদের ভোলাবার একটা উপায়কে বলা হয়ে থাকে। উঁচু খাটের ওপর বসে পা ঝুলিয়ে পায়ের পাতার ওপর শিশুকে বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে তার দুটো হাত ধরে 'ঘুগুচ্চু পাঁড়ুচ্চু' বলে দোলা দিতে দেখা যায়।

ছোট ছোট শিশুদের তেল মাখাবার সময় একটু আধটু ব্যায়াম করানো

হয়। নিচের ছড়াটি টেনে-টেনে দু'টি দু'টি শব্দে ভাগ করে আউড়ে শিশুর হাত ও পায়ের কসরৎ করানো হয়।

১১ কাঠ বাঁধ পাত বাঁধ বাবুকে বাঁধ / বাবু বাড়ে কর'ল বাঁশ ॥

শিশুকে নিজে থেকে উঠে দাঁড়াবার জন্য ছড়া আউড়ে প্রলুব্ধ করা হয়—

১২ অলগ ডিডি পাপা খায়। মামা ঘরকে দৌড়্যে যায় ॥

'অলগ ডিডি' শব্দটির অর্থ নিজে থেকে দাঁড়ানো; 'ডিডি' মানে দাঁড়ানো। একে আমরা শিশুভাষা বলতে পারি। এর আগে পাপা (পিঠে), হাবু (স্নান) শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করেছি, যা শিশুভাষার শব্দকোষের অন্তর্গত। এই সব শব্দে মাতৃস্নেহ লুকিয়ে আছে, স্নেহের ভাষাই এখানে শিশুভাষার রূপ নিয়েছে।

অনিচ্ছুক শিশুকে ছড়া বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে স্নান করানো হয়—

১৩ খুকু সিনাছেন গা দুলাছেন হাতে তেলের বাটি।
নুঁয়ে নুঁয়ে চু'ল ঝা'ড়ছেন হিলছে সনার কাঁঠি ॥

শিশুর স্নান-ভোজন যেমন ছড়ার বিষয়বস্তু, তেমনি তার কান্নাও। শিশু কেন যে কাঁদে, সবসময় তার কোন হদিস মেলে না। শিশু কারণে কাঁদে, শিশু অকারণে কাঁদে। কারণ, শিশুর কান্নাই বল। কান্না থামাবার জন্যও তাই ছড়া রচনা করতে হয়েছে। ছড়ায় কান্না-থামানোর জন্য যেমন প্রলোভনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি শাস্তিরও।

১৪ ধন কেনে রে কাঁদে শ্বশুরঘর যাতে ?
চিড়া মুড়ি গাঁঠ্যাই দিব রাস্তায় জল খাতে,
লাল কাপড়ের ছাতা দিব জুড়াই জুড়াই যাতে ॥

১৫ এত রাইতে কাহার ছাল্যা কাঁদে। ঘুগুচু পাঁড়ুচু পা'খ ডাকে ॥

১৬ চুপ দে ন চুপ দে ন বিলাই আ'সছে।
বাবুর মতন ছাল্যা গিলা গটাই গিলছে ॥

১৭ কাঁক কঁক বশের টাঁক। কাড়া হালটি কতকের ?
হোক ন আমার যতকের। আন ছুরি কাট পেট ॥

ঝাড়খণ্ডে জননীরা-স্নেহে আদরে কতো নামে যে ডেকে থাকেন তার ইয়ত্তা নেই। জননী যেন বিভিন্ন নামে সন্তানকে ডেকেও তৃপ্তি প্যান না। বাবু, সনা, টাকার গর‍্যা, ধন, মুনু, মুনা—কতো না ডাকে তাই এখানকার শিশুরা স্নেহসিঞ্চিত হয়ে থাকে। কিন্তু সোনা কিংবা ধন কিংবা টাকার গাগরী

বলে ডাকলেই কি জননীর অন্তরের গভীর আনন্দানুভূতি এবং গৌরবের সবখানি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ? এর মধ্যে 'ধন' শব্দটি ছড়ায় সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধন শুধু সন্তান-সম্পদ নয়, তারো অতিরিক্ত অনেক কিছু।

১৮ ধন ধন ধন, হল'দ বাড়ির বন, (ক. লট্যা খাড়ার বন)
অই ধনকে যে দে'খতে নারে পুড়ুক তাহার মন ॥
এই ধন যার ঘরে নাই (তারা) কিসের গরম করে,
তারা পুড়্যে কেন্ নাই মরে।
ধন ধন ধন, হল'দ ফুলের বন
অই ধনকে যে গা'ল দিয়েঁছে পুড়ুক তাহার মন ॥

১৯ ধন গেছে রে কনখানে, বাসফুলের বন যে'ানে।
সেখানে ধন কি করে। ডাল ভাঙে আব ফুল পাড়ে ॥

২০ ধন ধন ধন, যাই না বে বন,
ঘবে বসি বনাঁই দিব বতন সিংহাসন ॥

ছেলেভুলানো ছড়ায় নৃত্যের প্রসঙ্গও পাওয়া যায়—

২১ তা থই থই থুবা, ভা'ঙল খা'টের খুবা,
ডাঁঢ়াঁই নাচে সুন্দরী বঁউ বস্তে বাজায় বুঢ়া ॥

২২ মালকুঁড়ির হাটে ভালুক নাচে বাটে
মা'রের চটে, ভালুক গেল বাটে বাটে ॥

মাছ ধরতে বেরিয়ে-পড়ার কথাও এজাতীয় ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়—

২৩ আস্ রে ছানাপনারা মাছ ধ'রতে যাব,
মাছের কাঁটা পায়ে লা'গলে দলায় চাপ্যে যাব।
দলায় আছে ছ পণ কড়ি গুণ্যে গুণ্যে যাব,
একটি কড়ি বেশি হলে লাড়ু কিন্যে খাব ॥

খেলাধুলার ছড়া: ঘুমপাড়ানি এবং ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে খেলাধুলার ছড়ার মৌল পার্থক্য এই যে, প্রথম দু' শ্রেণীর ছড়া বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়স্বজন, বিশেষভাবে মা-মাসিরা, আবৃত্তি করে শিশুকে ঘুম পাড়ান অথবা তার মনোরঞ্জন করে থাকেন, স্বভাবতঃই ছড়াগুলোও তাঁদেরই রচনা, অন্যপক্ষে, খেলাধুলাব ছড়াগুলো শিশুদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়ে থাকে, তারাই বিশেষ বিশেষ খেলার প্রয়োজনে এই সব ছড়া রচনা করে থাকে। বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ মানসজাত বলে প্রথম দু'শ্রেণীর ছড়ায় কল্পনার ব্যাপ্তি,

রসঘনতা, কবিত্ব, বাস্তববোধ এবং সৌন্দর্যচেতনা উজ্জ্বলরেখায় ফুটে উঠেছে ; খেলাধূলার ছড়া নিতান্ত শিশুমনজাত বলে এইসব গুণবর্জিত নিছক ছন্দ এবং ধ্বনিসর্বস্ব ছড়ায় অনেক সময় পর্যবসিত হয়েছে। বহুক্ষেত্রেই এই সব ছড়া অসংলগ্ন, অস্পষ্ট এবং নিরর্থ চিত্রের সমষ্টিমাত্র। সুরের এবং তাল-মানের বিচারেও বিশেষ পার্থক্য ধরা পড়ে। ঘুমপাড়ানি এবং ছেলেভুলানোর ছড়া বিলম্বিত সুরে এবং ঢিমে তালে আবৃত্তি করা হয়, কিন্তু খেলার ছড়া দ্রুত লয়ের সুরে এবং তালে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে—বিভিন্ন খেলার চরিত্র যেন ছড়ার আবৃত্তির ভঙ্গি থেকেই ফুটে ওঠে। খেলার ছড়াও গানের মতোই সুর করে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে, তাই এই শ্রেণীর ছড়ার ইংরাজি নাম game song বা খেলার গান সংগত মনে হয়।

খেলার মধ্যে অঙ্গসঞ্চালন জড়িত থাকে, যা ঘুমপাড়ানি বা ছেলেভুলানো ছড়ায় থাকে না। মুখে ছড়া আবৃত্তি করে অঙ্গসঞ্চালন করে খেলতে হয়, অনেকটা অভিনয়ের মতোই, তাই অনেকেই ছড়া-নির্ভর খেলা এবং খেলার গানকে লোকনাট্যের উৎস মনে করেন। খেলার ছড়ায় যেমন কবিত্বের দর্শন মেলে না, তেমনি রসঘনতাও লক্ষ্যগোচর হয় না। সুরের চেয়েও তালের প্রাধান্য এছড়ায় বেশি ; অঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়াই যেখানে মুখ্যস্থান অধিকার করে থাকে, সেখানে যে সুরের চেয়ে তালের প্রাধান্যই থাকবে তাতে সন্দেহ কি ? এইসব ছড়ায় সংগতিরক্ষারও কোন আগ্রহ থাকে না। ছড়ার অন্যতম প্রধান লক্ষণ চিত্রধর্মিতা ; একটি চিত্র স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠবার আগেই আর একটি চিত্র এসে তার স্থান দখল করে নেয়। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে দ্রুত সঞ্চরণশীলতা খেলাধুলার ছড়াতেই বিশেষভাবে নজর পড়ে। আসলে তাল যেখানে লক্ষ্য, সেখানে বিষয়বস্তুর দিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজনই থাকে না ; তাই তালরক্ষা করে নিত্যনতুন বিষয়বস্তুর সমাবেশ করার ঝোঁক খেলার ছড়ায় দেখা যায়। বিশেষ ধরনের খেলায় বিশেষ তাল থাকে, আর তারই জন্য বিশেষ ধরনের ছড়ার প্রয়োজন পড়ে। স্বভাবতঃই প্রতিটি খেলার ছড়া স্বতন্ত্র হয় এবং খেলাটিকে বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট ছড়ার আর কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন থাকে না। বলা যেতে পারে খেলার ছড়াকে খেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার স্বাধীন কোন অস্তিত্বই থাকে না।

ঝাড়খণ্ডেও ছেলেমেয়েদের শ্রেণীগত এবং সম্মিলিত অজস্র ধরনের খেলা

প্রচলিত আছে। অধিকাংশ খেলাতেই ছড়ার ব্যবহার হয়। চরিত্রগত দিক দিয়ে বাংলার খেলার ছড়ার সঙ্গে এদের খুব একটা পার্থক্য নজরে পড়ে না। বস্তুতঃ বিশ্ব-শিশুমন সর্বত্রই খেলা এবং ছড়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের মানসিক ঐক্যের পরিচয় প্রকাশ করে থাকে। ঝাড়খণ্ডের বহু খেলার সঙ্গেই ছড়ার ব্যবহার থাকলেও সব সময় একটি বিশেষ নামে খেলাগুলোকে চিহ্নিত করা হয় না। প্রায় সময়ই ছড়ার প্রথম শব্দ বা শব্দযুগলের সাহায্যে খেলার নামকরণ করা হয়ে থাকে। ডু-ডু, ইকিড মিকিড, কদ'ল মাজা-মাজা, আঁতড়া-পাতড়া, শাঁক ল সবা, কুহুলুকা (লুকোচুরি) ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত ছড়া-নির্ভর খেলার কয়েকটি উদাহরণ। এর মধ্যে ডুডু (হাডুডু) খেলায় বিচিত্র রসের বিচিত্র গঠনের ছড়ার ব্যবহার সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়। হাডুডু খেলা প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'সমাজতত্ত্ববিদগণ যথার্থই অনুমান করিয়া থাকেন যে, পুরুষদিগের মধ্যে প্রচলিত খেলামাত্রই আদিম সমাজের গোষ্ঠীসংগ্রামের অবশেষ মাত্র। ইহাদের মধ্যে আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের যে সকল পদ্ধতি দেখা যায় তাহা যুদ্ধনীতিসম্মত। বাংলার হাডুডু খেলাও তাহাই।'[8] খেলাটির মধ্য দিয়ে যথার্থই পৌরুষ প্রকাশ পেয়ে থাকে। খেলাটি যে সংগ্রামেরই নিখুঁত অভিনয়, তা খেলাটির ধারা এবং ছড়ার কথাবস্তু অনুধাবন করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই খেলায় দু'পক্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আক্রোশ এবং শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। খেলাটি পৌরুষমণ্ডিত হওয়ায় ছড়াগুলো খুব একটা ভাবগর্ভ কিংবা সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হয় না, কিন্তু ছড়াগুলোর মধ্যে যে তীব্র গতিশীলতা এবং দ্রুতলয়ের ছন্দ ফুটে ওঠে তা কারো দৃষ্টি এড়ায় না। এ ছড়া পুরুষের খেলার জন্য পুরুষেরই রচিত, অন্যান্য ধরনের ছড়ার তুলনায় খেলার ছড়ায় কবিত্বগুণ মোটেই থাকে না, প্রায়শঃই অর্থহীন হয়ে থাকে, তীব্রগতিপ্রবাহে চিত্রগুলোও যথাযথভাবে ফুটে উঠতে পারে না—শুধু ছন্দাঘাত এবং পৌরুষের দিকটি সম্পর্কে আমাদের সচকিত করে তোলে।

২৪ একুড দোকুড তেকুড নালা / লাডকাই লুডকুই বাঁশের চালা।
চাঁইচুঁই চডুই ডিম / লাঙল মাথা গরুর শিং।
তাতা চুড়ি উনিশ কুড়ি ॥

৪ বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড।

২৫ অকল বকল টকল ঠিয়া | ধমসা নাগরা বাজে হিয়া।
ইস বিষ করম ঠিস | ঠারে ঠুরে উনিশ বিশ ॥

২৬ উড়কুল তুড়কুল নলের বাঁশি | নল করেছে একাদশী।
হলুদ মানে তলুদ ফুল | টাকা মানে টগর ফুল ॥

২৭ আগডুম বাগডুম ঘড়াডুম সাজে | ঝাঁয় ঝটপট মুগুর বাজে।
মুগুর শাল পঞ্চমাল | কে কে যাবে কামার শাল।
কামার শালের বাঁয় পুয়াতি | বনের লে বা'হবাল্য কপ্‌তী ॥

২৮ অড়গাছ বড়গাছ | তার তলে জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি | সুরু চা''ল কাঢ়ি।
কা'ঢ়তে কা'ঢ়তে হল্য ভাত | উঠ বুঢ়া জগন্নাথ ॥

ওপরের ছড়াগুলো কোন না কোনভাবে বাংলার ছড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলো হাডুডু খেলায় ব্যবহৃত হলেও হাডুডু শব্দের প্রয়োগ যেমন নেই, তেমনি শত্রুতা এবং আক্রোশও অনুপস্থিত। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলো যে হাডু-ডু খেলার বিশুদ্ধ ছড়া তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২৯ হাডু-ডু খেলিয়ে | বাঘ মারি চালিয়ে,
বাঘের তেলে | পদ্দীপ জ্বলে,
জ্বলুক পদ্দীপ উড়ুক ধুঁয়া | চলি আয়রে ছুঁচামুহা ॥

৩০ একান দুকান তিকান ঠিয়া | নাক ডেডেন পেচামুহা।
পেচার উপর বা'জল ঢোল | অই শালা মাহাচোর।

৩১ আম পাত্‌ জড়া জড়া | মা'রব চাবুক ছা'ড়ব ঘড়া।
অ রে পেচা সর‍্যাই ডাঁঢ়া | আ'সছে আমার খেপা ঘড়া ॥

অন্যান্য ধরনের কিছু খেলার ছড়া নিচে উদ্ধৃত করা হল। এগুলোর মধ্যেও খেলাধূলার ছড়ার চরিত্রধর্ম সহজেই নজরে পড়ে। কোন কোন ছড়ায় কল্পনার ব্যাপ্তি, কবিত্বের স্পর্শ এবং অসংলগ্ন চিত্রাবলীর শৃঙ্খলাবদ্ধতাও দেখতে পাওয়া যায়। খেলাধূলার বিশদ বিবরণ অপ্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হল।

৩২ **ইকিড় মিকিড় :** ইকিড় মিকিড় দাঁত কিড়কিড় | লহালতি বে'লপাত
বাড়ি-এ আছে নিমগাছটি নিম ঝরঝর করে | সদাগরের
বেটাবিটি | নিত্‌ লিয়াই লাগে। থাঁড়ড়া ন কুঁচ্যা ॥

৩৩ **কদ'ল মাজামাজা :** কদ'ল মাজামাজা | ঘি মউটি রাজা।
রাজাঘরের লক আস্যেছে | একটি কদ'ল ঠিং যা ॥

৩৪ কদ'ল মাজামাজা—হিংবতী রাজা।
আঙ্কা দিব বাঙ্কা দিব কানে দিব কড়ি
বেহার বেলা দে'খতে যাব ঘি চপ্‌চপ্‌ দাড়ি।
দাড়ি নাই ছুড়ি নাই টসর কাপড়ি
টসর করে খসরমসর বিল্লি করে মাঁও।
একটি কদ'ল ঠিং যাও ॥

৩৫ **আঁতড়া পাঁতড়া :** আঁতডা বে পাঁতডা | মাহ্‌তা'ন গেছে হাট।
আগুন নাই পানী নাই | দে পরশন ভাত ॥

৩৬ **শাঁক ল সরা :** শাঁক ল সরা পদ্মপাতের ঘডা,
যে নাই ছুঁটে তার মা চিডা কুটে ডুম ডুম ডুম ॥
একটা চাঁদ দুটা চাঁদ | টান্যেটুন্যে কাপড বাঁধ।
চল নানী জলকে যাব,
জলের ভিতর ফুল ফুট্যেছে ফুলের বড কলি।
শাগ ল লট্যা ল করমের ডালি ॥

৩৮ **কুহুলুকা :** আমার খেড়ী খুজ্যে দে | নাই ত মুড়ি ভাজ্যে দে ॥
আমার খেড়ী খুজ্যে দে। না'হলে নেট্টী চিম্‌টা দে ॥

৩৯ **একেড় গেজা :** একেড় গেজা। ডুমকি রাজা ॥
তিনেক তেতা। চারে চুগ'ল ॥
পাঁচে পাঁঠি। ছয়ে ডাঁঠি ॥
সাতে সুত'ল। আঠে গুটি ॥
নয়ে নইচি। দশে ঘুগি ॥

মাঝে-মাঝে ছেলেমেয়েরা প্রশ্নোত্তরবাচক খেলাতেও মেতে ওঠে। এই খেলায় শরীরচর্চার চেয়ে বুদ্ধির চর্চাই প্রধান। এ খেলা কথাসর্বস্ব। প্রশ্নোত্তরের কথাগুলো ছন্দমিলের জন্য ছড়ার আকার ধারণ করে। যেমন—

৪০ একটা কথা শুন্‌।
কি কথা? বেঙলতা। | কি বেঙ? টুরি বেঙ।
কি টুরি? বাম্‌হন বুড়ি। | কি বাম্‌হন? চণ্ডী বাম্‌হন।
কি চণ্ডী? পিঠা খণ্ডী। | কি পিঠা? তাল পিঠা।
কি তাল? খেজুর তাল। | কি খেজুর? পেঁক মেজুর।
কি পেঁক? সনা পেঁক। | কি সনা? আমি হাগি তুঁই গু খা না ॥

তথাকথিত রুচিশীল শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকেদের কাছে শেষ পঙ্‌ক্তিটি আপত্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু যাঁরা গ্রাম্যসাহিত্য-লোকসাহিত্যের চর্চা করেন কিংবা সমাজতত্ত্বের, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের শব্দ এড়িয়ে যাওয়াটা কতোদূর সংগত, তা বিতর্কিত ব্যাপার। যে-কোন সমাজের লোকজীবনের স্বরূপ, রীতিরেওয়াজ ইত্যাদি সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞানলাভের জন্য কোন কিছুই পরিত্যাজ্য নয়। কোন শব্দ অন্য সমাজের লোকের রুচিতে আঘাত করলেও সেই শব্দটি যে-সমাজে প্রচলিত সেখানে আর দশটি শব্দের মতোই স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দব্যবহারের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ মানুষের কিংবা কোন বিশেষ সমাজের মানুষের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ডী জনমানস যে-কোন মনোভাবকেই সরাসরি পরিচিত শব্দ দিয়েই প্রকাশ করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছড়া সংগ্রহকালে 'ভাতার-খাকী' শব্দ বদলে 'স্বামী-খাকী' করেছিলেন, ফলে রুচিশীল পাঠকের রুচি রক্ষা করা গেলেও শব্দটি ব্যবহারের তীব্রতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই ধরনের পরিবর্তন সাধন যে সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর, তা স্বীকার করেছেন। অথচ তিনিও এই প্রশ্নোত্তরবাচক ছড়ার গ্রাম্যশব্দটি ব্যবহার না করে খুব সম্ভবতঃ দু'এক জায়গায় গোবর শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তাঁর মন্তব্য স্মর্তব্য: 'কোন কোন ছড়ায় গোবর অপেক্ষাও এক অখাদ্যবস্তু খাইবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা এত অখাদ্য যে তাহার নামও এখানে উচ্চারণ করা যাইতেছে না।' আমরা এতোখানি প্রগতিশীল এবং রুচিবাগীশ না হয়ে রক্ষণশীলতা এবং গ্রাম্যরুচির সমর্থক হিসাবে মাঝে মাঝে এক আধটা গ্রাম্য-শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। রুচিশীল পাঠককে এই অংশটি দ্রুত পার হয়ে যাবার নিবেদন জানানো ছাড়া আমাদের করণীয় কিছু নেই।

সাধারণ জীবন-বিষয়ক ছড়া: বাস্তব সংসারের সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনার কাহিনী সাধারণতঃ এই সব ছড়ার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। ছেলে ভুলানো গান, ঘুমপাড়ানি এবং খেলাধূলার ছড়ার সঙ্গে এই জাতীয় ছড়ার মৌলিক পার্থক্য এই খানেই। এগুলোকে সাধারণ ছড়া বা বাস্তব জীবন-বিষয়ক ছড়া-ও বলা চলে। ঘুমপাড়ানি এবং ছেলেভুলানো ছড়ার মতো এগুলোও বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্না বর্ষিয়সী রমণীর, প্রধানতঃ মা-মাসিদের, রচনা। এগুলোতে বাস্তব জীবন-রসের যতোখানি আধিক্য দেখা যায়, ততোখানি

শিশুদের ছড়ায় দেখা যায় না। এই জীবনধর্মিতার জন্যই এই ছড়া বহুলাংশে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ কামনাবাসনাই এই সব ছড়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এই সব জীবন-কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র মুখ্যত: নারী হয়ে থাকে। নারীর কন্যা- এবং বধূজীবন এই ছড়ার বিষয়বস্তু ; নারীর অন্যান্য ভূমিকা এবং পারিবারিক জীবনও এর উপজীব্য হয়ে থাকে।

এই জাতীয় ছড়া ঘুমপাড়ানি কিংবা ছেলেভুলানো কিংবা খেলাধুলো— কোন কাজেই ব্যবহার করা হয় না। এই ছড়া বয়স্কা নারী-রচিত হলেও এগুলো প্রধানতঃ ছেলেমেয়েরা অবসর সময়ে নিজেদেব চিত্তবিনোদনের জন্য আবৃত্তি করে থাকে। নিছক আনন্দলাভই যে এই ছড়া আবৃত্তির আসল উদ্দেশ্য তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

আমরা প্রথমে কন্যার বিবাহবিষয়ক ছড়াগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

৪১ জাঁগুর জাঁগুর ঘাটে রে ভাই জাঁগুর জাঁগুর ঘাটে,
কি করো জানিব ভাই রে খুকুর বিভা হছে।
হাই শুন গ খুকুর মা বসুন গ মা ডালে
ডালপাত ভাঙো দুটি যবুনার থালে।
সেই থালে বস্তে কন্যার বাপ পাখুড়া কন্যা দান করে।
কন্যা দান ক'রতে ক'রতে চইখে পড়ে লর
আন রে গামছা মুছাইব লর।

এই সব ছড়ায় পিতার ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য ; যেটুকু আছে তাতেও পিতার বিরুদ্ধে অপযশ, অভিযোগের কথাই দেখা যায়। উদ্ধৃত ছড়াটিতেও পিতাকে 'পাখুড়া' বা পাষণ্ড বলা হয়েছে। কন্যাপণ নিয়ে ঝাড়খণ্ডে কন্যার বিবাহ দেবার রীতি আছে। আর দশটি জিনিষের মতো কন্যাকে বিক্রয় করে পিতা অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই পিতাকে পাষণ্ড বলা হয়েছে ; তাছাড়া কন্যাদানের অধিকার তো পিতারই, তাই শ্বশুরালয়ের সমস্ত দুঃখ-বেদনার জন্যও পিতাকে দায়ী করা হয়ে থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু পিতাকে পাষণ্ড বলা হলেও তাঁরও যে একটি সুকোমল পিতৃ-হৃদয় আছে,—যেখানে সুখেদুঃখে লালিতা কন্যার জন্য প্রচুর স্নেহরস সঞ্চিত হয়ে থাকে, তা আমরা ওপরের ছড়াটি থেকেই বুঝতে পারি। কন্যাদানরত দরঅশ্রু-বিগলিত পিতার চিত্রটি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

কন্যার বিয়ে দেওয়া মানেই নতুন জামাই-এর আবির্ভাব। জামাই আদর বড় আদর, কন্যার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে জামাই-এর ভালোমানুষি এবং সুবুদ্ধির ওপর। জামাই যদি রুষ্ট হয় তবে মেয়ের অদৃষ্ট অন্ধকার হতে সময় লাগে না। তাই তার সম্মান রক্ষা করা, তার যোগ্য আদর করা একান্ত দরকার। ঝাড়খণ্ডের প্রবাদে পাওয়া যায়, 'ঝি-জামাই বাঁকা কাঠ'। বক্র কাষ্ঠখণ্ড যেমন সহজে সোজা করা যায় না, তেমনি জামাই একবার বেঁকে বসলে শত সাধ্য-সাধনাতেও তুষ্ট করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই আদর-যত্ন ভালো ভালো খাবার দিয়ে জামাই বাবাজীবনকে তুষ্ট রাখতে হয়।

৮২ রম্‌হা বাড়ি-এ কে রে ভাই গাঁদার গুঁড়ুব করে,
রম্‌হা শাগ ভাজেঁ্য দিব ঘি-মউরা দিয়েঁ।
ঘি-মউরার বাসে, জামাই গেল রুষ্যেঁ।
জামাইকে ঘুরাঁই আ'নব জড় ধুতি দিয়েঁ,
বিটিকে ঘুরাঁই আ'নব দুয়াই শাঁখা দিয়েঁ।
আ'জ থাক রে বরকন্যারা একটি মেজুব খাঁয়ে।
কা'ল যাবে রে বরকন্যারা সংসার কাঁদায়েঁ।
আগু কাঁদে মাসিপিসি পেছু কাঁদে পব,
পব দেব্‌তা লাগাঁই দিব যাবি পরের ঘব।
বাপে দিবেক শাড়ি শাঁখা মায়ে দিবেক তৈল,
অই শাড়ি পর‍্যেঁ যাবি বাবুয়ার ঘর।
'বাবু, বাবু' ডাক পড়্যেছে বাবু নাইখ ঘবে,
হালের বাড়ি ফালে দিয়েঁ মাছধরানি গেছে।
তৈল দাও হলুদ দাও শুদ্ধ হয়েঁ আসি
পান দাও সুপারি দাও ঠাকুর পূজায় বসি।

এই ছড়াটির অন্য কথান্তর রূপটি-ও এই প্রসঙ্গে বিচার্য।

৮৩ কে রে ছলা বাড়ি-এ গাঁদারগুঁড়ুব করে।
হিঙের বাসে জামাই গেল রুষ্যে।
জামাইকে নিয়েঁ আন জড় ধুতি দিয়েঁ।
বিটিকে নিয়েঁ আন দুয়াই শাঁখা দিয়েঁ।
আ'জ থাক রে বরকন্যারা পেঁক মেজুর খাঁয়ে।
কা'ল যাবে রে বরকন্যারা সংসার কাঁদায়েঁ।

আগে কাঁদে মাসিপিসি তারপর কাঁদে পর,
পরদেব্ তা লিখেঁ দিলে যাবি পরের ঘর।
পরের বেটা মারেঁ্য দিল ধায়েঁ আল্য বাপের ঘর।
বাপে দিল সুরু শাঁখা মায়ে দিল গিলাপ,
সেই গিলাপ পড়েঁ্য গেল সীতা রাম রাম ॥

প্রথম পাঠটিতে সম্ভবতঃ শেষের দিকে অন্য কোন ছড়ার অংশবিশেষ এসে মিশে গেছে। দু'টি ছড়ার মধ্যে দৈর্ঘ্যে এবং বিষয়বস্তুর বিস্তৃতিতে যথেষ্ট অমিল থাকলেও মিলটাও সহজেই নজরে পড়ে। ঝাড়খণ্ডে জামাই-এর মর্যাদা অত্যন্ত বেশি। তার সম্মানবোধ বড়োই স্পর্শকাতর। তাকে খুশি রাখবার জন্য শাশুড়ির সাধ্যসাধনার অন্ত থাকে না। পুরুষশাসিত সমাজে কন্যার ভালোমন্দ জামাই-এর ওপর নির্ভর করে থাকে। জামাই রুষ্ট হলে কন্যাকে শুধু যে শাঁখা-সিঁদুর ফেলে বাপের বাড়িতে চলে আসতে হয় তাই নয়, শরীরে নিপীড়নের চিহ্নও বয়ে আসতে হয়। ওপরের ছড়াটিতে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

কন্যাবিদায়ের সময়ের আর একটি ছড়া উদ্ধৃত করা হল—

৪৪ উড়কি ধানের মুড়কি কলম্ব ধানের খই,
গাছপাকা কলাপাকা গামছা-বাঁধা দই।
অ কিয়া ফুল অ কিয়া ফুল মাকে দেখ হে।
মা বড় কুবুদ্ধ্যা আমার কাঁন্থে কাট্যে মরে,
সংসার বুঝিয়ে দেখ মা কার ঘর করে।
আগু যায় মা ধব ঘড়া পেছু যায় মা ঝারি,
ঝারির চলনে আমরা চলিতে না পারি।
হাতের শাঁখায় লেপ লাগ্যেছে,
গলার গজমোতি রক্ত ফুট্যেছে ॥

কাহিনী-বিষয়ক ছড়া : এই শ্রেণীর ছড়ার ভেতরেই কাহিনীর বীজ লুকানো থাকে। এক একটি ছড়া বিশ্লেষণ করলে এক একটি পূর্ণাবয়ব কাহিনী গড়ে ওঠে। কথা-কাহিনী এককালে পদ্যে রচিত হত বলে অনেকের ধারণা। বিভিন্ন লোককথার মধ্যে-মধ্যে ছড়ার প্রয়োগ যেমন করা হয়, তেমনি বিভিন্ন বিষয়বীজ হিসাবে কাহিনীর সূত্রপাতেই সংশ্লিষ্ট ছড়ারও আবৃত্তি করা হয়।

বর্তমানে বহু কাহিনীবিষয়ক ছড়াই কাহিনী থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনমূলক ছড়াতে পরিণত হয়েছে। ছড়ার সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি বহুক্ষেত্রেই হারিয়ে গিয়েছে।

কাহিনী-বিষয়ক কিছু ছড়া ধাঁধা এবং রূপকথা প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করা যাবে। এখানে আমরা মূলতঃ লৌকিক জীবনসম্পর্কিত কাহিনী-বিষয়ক ছড়া নিয়ে আলোচনা করব। বলাবাহুল্য, এইসব ছড়ার বিষয়বস্তু লৌকিক জীবন হওয়ায় বাস্তবজগতের পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে।

৪৫ দশ পস্থ রাবণ ভায়া কন্ পন্থে গেল ?

শিলাগড পর্ বতে চড়ো চালতারসে মিশে গেল ॥

একবার একজন লোক বেশ কিছু কাঁকড়া ধরে এনে রান্নাবান্নার জন্যে অন্দর-মহলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। দুপুর হয়ে গেল, তবু লোকজনের ভিড় কমল না। এদিকে কাঁকড়াগুলোর কি সদগতি করা হল, তা জানবার জন্যও খুবই ইচ্ছে করছে। তাই শেষতক ধাঁধার মতো করে অন্দরমহলের উদ্দেশ্যে বলল, 'দশপস্থ রাবণ ভায়া কন্ পন্থে গেল ?' কাঁকড়ার দশটি পা, রাবণের দশটি মাথা, দুটোকে মিলিয়ে তালগোল পাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কাঁকড়াগুলোর কি ব্যবস্থা করা হল ?' অন্দরমহল থেকে জবাব এল, 'শিলনোড়া দিয়ে কাঁকড়াগুলোকে পিষে চালতারসের সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করা হয়েছে।'

৪৬ 'সাত থাঁই থাঁই আঠে পা কন্যার মা গ হের।'

'বরেউ থাঁইছে তের।' 'তবে মোর বাছাউ গেল।'

বরকনের 'সাঙা'র রাত। কনের মা খুব খুশি, কেন না মেয়ে সাত সাতবার বিধবা হয়েছে। কাজেই এহেন কুলক্ষণা মেয়ের আবার সাঙা হবে ভাবতেই পারেন নি। কিন্তু এ-আনন্দ বেশিক্ষণ থাকল না। কে যেন সেই মারাত্মক খবরটা তার কানে পৌঁছে দিল : বরেউ থাঁইছে তের।' তেরটি বউ গতায়ু হবার পর বর এবার চৌদ্দ বার বিয়ে করতে এসেছে। কথাটা শুনে কনের মা আর্তনাদ করে উঠেছেন : 'তবে মোর বাছাউ গেল।' বুঝতে পারলেন. মেয়ের চেয়ে জামাই আরো কুলক্ষণক। এতোকাল মেয়ে তবু জামাই মরলেও প্রাণটা নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে, এবারে দাঁড়ি-পাল্লার ভারটা জামাই-এর দিকে। কাহিনীর কৌতুকরস যেমন উপভোগ্য। তেমনি দুই ভাগ্যহত স্বামীস্ত্রীর সংশয়াচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ আমাদের বেদনার্তও করে।

ঐন্দ্রজালিক ছড়া : কিছু কিছু ছড়ার মধ্যে জাদু, তুকতাক লুকিয়ে আছে বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে। বিভিন্ন আচারঅনুষ্ঠানের সাহায্যে যেমন প্রকৃতিক জগৎকে বশীভূত করা যায় বলে এরা বিশ্বাস করে, তেমনি জাদু-মন্ত্রের সাহায্যেও প্রাকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার কথায় এদের অটুট বিশ্বাস দেখা যায়। এই ধরনের ছড়াকে ঐন্দ্রজালিক ছড়া বলা হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডের মানুষের জীবনে খরা এবং বৃষ্টি দুটোরই বিশেষ ভূমিকা আছে। সাধারণতঃ খরা এবং অনাবৃষ্টিই এখানে মুখ্য ভূমিকা অধিকার করে আছে। তাই বৃষ্টির জন্য নানা রকমের তুকতাক করতে হয়। বৃষ্টি নামাবার ছড়া আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। বর্ষাবারক এবং 'রোদ দে' জাতীয় দু'একটি টুকরো ছড়া আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। একথা অনস্বীকার্য যে একদা এইসব ছড়া বয়স্ক লোকদের মধ্যে জাদুমন্ত্র হিসাবেই প্রচলিত ছিল, বর্তমানে এগুলো ছেলেদের মুখেই শোনা যায়। বলাবাহুল্য, বৃষ্টি থেমে যাবে এমনি একটি গভীর বিশ্বাসে ছেলেরা এইসব ছড়া আউড়ে থাকে; বয়স্কদের মধ্যে এর ব্যবহারিক মূল্য লুপ্ত হলেও এখনো ছোটদের মধ্যে যোল আনাই বজায় আছে। নিচে বৃষ্টি থামাবার ছড়া উদ্ধৃত করা হল।

৪৭ এক পইলা মুটি / যায় বর্ষা উড়ি। জল যায় উড়ি ॥

৪৮ কলাপাতের বিঁড়ি / যায় বর্ষা ছিঁড়ি ॥

৪৯ রোদ দিছে জল হছে / বাঁড়্যা শিয়ালের বেহা হছে ॥

অবিরাম বৃষ্টিবাদল হলে এক ঝলক রৌদ্র দেখবার জন্য আমরা সবাই আগ্রহী হই। যখন রৌদ্রের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না, তখন রৌদ্রকে আবাহন জানানো ছাড়া উপায় থাকে না।

৫০ চড়চড়্যা রোদ দে / মড়মড়্যা খাসি দিব ॥

আদিম মানুষের পক্ষে আগুন জ্বালানো কঠিন সমস্যা ছিল। দু'টি কাষ্ঠখণ্ডকে ঘর্ষণ করে তখনকার দিনে অগ্ন্যুৎপাদন করা হত। সবসময় কাজটা সহজ-সাধ্যও ছিল না। তাই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াসৃষ্টির জন্য তারা ছড়াও আবৃত্তি করত।

৫১ ধর্ ধর্ পরবতের আগুন / ধরা মারা কামার পুরুষ ॥

কাষ্ঠখণ্ড থেকে অগ্ন্যুৎপাদন সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরাই জানেন দু'টি ভিন্ন জাতীয় কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া অগ্ন্যুদগার সম্ভব হয় হয় না; দু'টি কাষ্ঠখণ্ডের একটি পুরুষ অন্যটি নারী হয়ে থাকে। ছড়াটিতেও একই কারণে দুই ভিন্ন

সম্প্রদায়ের পুরুষ-নারীর কথা বলে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে অগ্নুৎপাদন ক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ফিরে দেওয়া এবং ফিরে কাটার ছড়াগুলোও ঐন্দ্রজালিক ছড়ার অন্তর্গত। ছড়া কেটে ফিরে দিলে ছেলেমেয়েরা বিশ্বাস করে যে জাদুমন্ত্রের মতোই তা কাজ করে। ঝাড়খণ্ডে ফিরে দেওয়াকে 'অড়া' দেওয়াও বলা হয়ে থাকে। ফিরে দেওয়া হলে অঘটন ঘটে, এমন-কি মৃত্যুও ঘটে বলে তারা বিশ্বাস করে। তাই যতোক্ষণ না ফিরের কাটান দেওয়া হচ্ছে, ততোক্ষণ তারা মনে স্বস্তি পায় না।

৫২ **ফিরে দেওয়া :** অড়া অড়া অড়া / ঘরগুষ্টি মড়া।
ছড়া দিয়ে বা'র ক'রব কুড়ি ঘরের মড়া॥

৫৩ **ফিরে কাটা :** একটি ধানে দুটি তুঁষ / ফিরা ভাঙে ঠাসঠুস।
ঘটির উপর বাটি / সাত ফিরাকে কাটি॥

ঝাড়ফুঁক, সর্পমন্ত্রের ছড়াগুলোও ইন্দ্রজালের অন্তর্গত। আমরা অন্যত্র মন্ত্র গান নামে এগুলোর আলোচনা করেছি বলে এখানে সে-সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট উপকরণ হলেও লোকগীতি এবং কথার সঙ্গে মৌল পার্থক্য এই যে, ধাঁধার মধ্যে মননশীলতা অনুস্যূত হয়ে থাকে, কিন্তু লোকগীতি এবং কথার মধ্যে হৃদয়ানুভূতি নিহিত থাকে। একদা আদিম যুগে ধাঁধা জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে সমাজের প্রায় সর্বস্তরে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকায়, মনে হয়, ধাঁধার প্রয়োজন শেষ হয়ে আসছে।

ধাঁধা কবে কোন যুগে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল, বলা কঠিন। লোকসাহিত্যের মধ্যে কোন শাখাটি প্রাচীনতম, তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্কের অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ছড়াই লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি। জনৈক

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ধাঁধাকেই প্রাচীনতম সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, যেহেতু ধাঁধা রূপক বিশেষ এবং আদিম মন দু'টি বস্তুর সংসর্গ, তুলনা, ঐক্য এবং বৈপরীত্য লক্ষ্য করেই চিন্তাধারাকে একটি বাস্তব রূপ দিত, তাই ধাঁধাই লোকসাহিত্যে প্রথম সৃষ্টি। কিন্তু একেবারে আদিম সমাজে রূপক সৃষ্টি কি আদৌ সম্ভব? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'রূপকের পরিকল্পনা উচ্চতর রস এবং জীবনবোধের ফল,' যা আদিম সমাজে নাকি কল্পনা করা যায় না। অবশ্য এই আদিম সমাজ বলতে কোন যুগের সমাজকে বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। অল্প-স্বল্প চিন্তাভাবনা করতে পারে এমন সমাজে কেন যে রূপক সৃষ্টি সম্ভব নয়, বোঝা গেল না। দু'টি বস্তুর মধ্যে মিল-অমিল এবং সংসর্গ খুঁজে বার করা কিংবা তাদের মধ্যে তুলনা করার জন্য উচ্চতর জীবন বোধের একান্ত প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ডঃ ভট্টাচার্য আরো বলেন, 'মননশীলতায় অগ্রসর কোন সমাজের সংস্পর্শে না আসিলে কিংবা তাহা দ্বারা কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত না হইলে সেই সমাজে ধাঁধার জন্ম হইতে পারে না।'[১] প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন, খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত আদিবাসী সমাজ ছাড়া অন্য কোন আদিবাসী সমাজে ধাঁধার প্রচলন দেখা যায় না। তাঁর এই ধারণা একান্তই ভ্রান্ত বলে আমরা তাঁর এই বক্তব্য মেনে নিতে পারি না। কারণ, খৃষ্টান মিশনারীদের সংগৃহীত আদিবাসীদের ধাঁধা সংকলন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁদের আগমনের পূর্ব থেকেই আদিবাসী সমাজে ধাঁধা প্রচলিত ছিল। তাঁদের সংগ্রহ থেকে আমরা যে-সব ধাঁধা পাই, সেগুলোতে আদিবাসী জীবনসম্পর্কিত বিষয়বস্তুরই সন্ধান মেলে।

আদিম সমাজের জাদুক্রিয়ার সঙ্গে যে ধাঁধার একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তুকতাক অলৌকিকতার যুগে মানুষ অনেক কিছুই সরাসরি বলতে ভরসা পেত না। তাই সে রূপকের আকারে কিংবা বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে একধরনের সামঞ্জস্য রেখে কথাটা ঘুরিয়ে বলত। সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এখনো ধাঁধার প্রচলন দেখা যায়। গাজন উৎসব, বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ধাঁধার ব্যবহার দেখা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাচীনকালে আদিম সমাজে ধাঁধা লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ধাঁধার রচনা বা উত্তরদান কিছুটা

১ বাংলার লোকসাহিত্য, ৫ম, পৃ. ২

বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া সম্ভব হয় না। ধাঁধার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া সেই বিষয়ে ধাঁধা রচনা করা সত্যিই অসম্ভব। এই প্রসঙ্গেও ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'লোকসাহিত্যের সামগ্রিক সৃষ্টির (Communal creation) বা গোষ্ঠীগত রচনার যে একটি দাবী আছে, ইহাতে তাহা কতখানি পূর্ণ হয়, তাহা বিশেষ বিবেচনার বস্তু।'[২] কথাটি ভেবে দেখবার। ধাঁধার মধ্যে যেহেতু মননশীলতার প্রয়োজন, তাই একযোগে বহুজনের মননশীলতা নিশ্চয়ই একটি ধাঁধার সৃষ্টিকার্যে সম্মিলিত হয় নি। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি-সৃষ্টির কথাটি স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ব্যক্তি-সৃষ্ট ধাঁধার আদিম রূপটি আমরা কেউ জানি না, সমাজের মানসিকতার উপযোগী বলে সমাজ ধাঁধাটি গ্রহণ করেছিল, অনুমান করতে পারি এবং মুখে-মুখে প্রচারিত হতে গিয়ে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ধাঁধাও সামগ্রিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ধাঁধার ব্যবহার করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে ধাঁধা বা Riddle উপদেশমূলক শিক্ষাবিধি ছিল। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী সমাজেও ধাঁধা লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। জ্ঞানবৃদ্ধরা ধাঁধার মধ্য দিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ বা পর্যবেক্ষণ সূত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কিশোর এবং তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতেন। ধাঁধার উত্তরটি সব সময়ই 'জনশ্রুতিমূলক' একথা অনস্বীকার্য। ফলে ধাঁধা এবং তার উত্তর এক অচ্ছেদ্য চিরন্তন বাঁধনে বাঁধা থাকে। অন্যকথায়, বয়োজ্যেষ্ঠদের উপলব্ধ জ্ঞান অপরিবর্তিতভাবে ধাঁধার মাধ্যমে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত এবং সঞ্চিত হয়ে থাকে। অনেক সময় এর মধ্যে আচারধর্মিতাও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন আচারমূলক গান বা লোককথাতেও এর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ধাঁধার আকারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জাওয়া গীত, সাখী গান এবং আহীরা গানে জীবনের বিচিত্র বিষয়বস্তুর ওপর নীতি শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে। ঝাড়খণ্ডে ধাঁধার অন্যতম নাম 'জ্ঞান কহনী', নামেই প্রকাশ যে এর মধ্যে জ্ঞানের কথাই থাকে। সরাসরি উপদেশ না হলেও এগুলোর মাধ্যমে যে একটি পরিচিত বস্তুকে রূপকের আবরণে এবং মিল-অমিল ঐক্য-অনৈক্যের মাধ্যমে অনভিজ্ঞ চিত্তে চমক এবং বিস্ময় সৃষ্টি

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯

করে সেই বস্তুটিকে নবতররূপে আলোকিত করে তোলা হয়, তাতে সন্দেহ নেই। এর ফলে অনভিজ্ঞ শিশু-কিশোর-তরুণের মানসলোকে বস্তুটি বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। প্রতিদিন যেসব বস্তু বা ভাব আমাদের চোখ বা মনের গোচরীভূত হয়ে থাকে, তা'ও যে কতোখানি অপরিচিত থেকে থাকে, একটি ধাঁধার মধ্য থেকে তা আকস্মিকভাবে আবিষ্কার এবং উপলব্ধির আনন্দ থেকে বোঝা যায়।

ধাঁধার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় বা জাতির মানসলোকের সন্ধান সহজেই পাওয়া যায়। তাদের চিত্তবৃত্তি বা মননশীলতা কোন পর্যায়ের তা তাদের ধাঁধার গঠনভঙ্গি, বিষয়বস্তু ইত্যাদি থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায়। ঘরগেরস্থালির জিনিষপত্র, দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিজগৎ, পশুজগৎ ইত্যাদি ধাঁধার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। নিছক কল্পনার জগতের পরিবর্তে বাস্তবজীবনের সঙ্গেই ধাঁধার সম্পর্ক; জীবনের প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব বস্তু বা ভাবকে নবতর আলোকে জনচিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি, এই শ্রেণীর রচনায় তা পুরোপুরি প্রকাশ না পেলেও এগুলো লোকসাহিত্যেরই উপকরণ। বাস্তব বস্তু বা ভাবকে সরস ভাষায় এবং চিত্রে রূপায়িত করে লোকজীবনে আনন্দ সঞ্চার করে ধাঁধা। চিত্রধর্মিতা ধাঁধার অন্যতম বিশিষ্ট গুণ; ঐক্য-অনৈক্যের বিচিত্ররেখায় এর চিত্রকল্পগুলো নির্মিতি লাভ করে থাকে; সম্ভাব্য উত্তরটি খুঁজে বের করবার কাজে এই চিত্রগুলো যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।[১] 'কাঁচায় লদবদ পাকায় সিঁদুর/যে না ব'লতে পারে তার বাপ উঁদুর।' জিজ্ঞাসাকারীর ভঙ্গিটা বেশ আক্রমনাত্মক। জিজ্ঞাস্য বস্তুটি সম্পর্কে আভাসে একটি রূপকচিত্র দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, এর জনশ্রুতিমূলক উত্তর হল 'হাঁড়ি' বা যে কোন মাটির পাত্র। উত্তরটা খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটি একটি বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ চিত্রে পরিণত হয়।

ধাঁধার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এ-শ্রেণীর রচনা সম্পূর্ণতঃ যৌথভাবে উপভোগ্য। এর জন্য কমপক্ষে একজন জিজ্ঞাসাকারী এবং একজন উত্তর-দাতার প্রয়োজন। অবশ্য আড্ডায় বা মজলিসেই এর আসর বিশেষভাবে জমে ওঠে।

ধাঁধা প্রধানতঃ মস্তিষ্কজাত হলেও এর মধ্যে কাব্যগুণ একেবারে অনুপস্থিত থাকে না। জীবনরসসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে এর উদ্ভব বলেই এগুলো অত্যন্ত

সরস হয়ে থাকে। ভাবে-ভাষায় গঠনভঙ্গিতে রূপকে-উপমায় এগুলো কাব্য-ধর্মী হয়ে ওঠে।

লৌকিক ধাঁধার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এর স্বল্পায়তন বা সংক্ষিপ্ততা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কখনো একটি পঙক্তিতে, কখনো দুই থেকে চার পঙক্তিতে এর বিস্তার ঘটে থাকে। ঝাড়খণ্ডের লৌকিক ধাঁধা প্রায় সর্বত্রই একটি বা দুটি পঙক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকে। স্বল্পায়তনের হলেও ছন্দোবদ্ধতা এর কাব্যধর্মিতাকেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করে থাকে। ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রোতার মননে যে দোলা এবং আকস্মিকতার ঢেউ তুলে বিস্ময়, কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, ছন্দহীন রচনার পক্ষে তা সম্ভব হয় না। ছন্দের বাঁধুনি প্রায় ক্ষেত্রেই নিখুঁত এবং আঁটোসাঁটো; ফলে যুগ-যুগান্তর লোকমুখে প্রচারিত হলেও পরিবর্তনের স্রোতে একেবারে হারিয়ে যায় না কিংবা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করে না। আদিম মানুষের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফসল এই ধাঁধার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত হয়ে থাকে; ফলে এদের মধ্যে লোকমানসের গভীর চিন্তাশীলতা বা চিন্তার গভীরতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। বহু যুগের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, বস্তুজ্ঞান রসবোধের জাদুস্পর্শে সুসংহত ছন্দোবদ্ধতায় শাশ্বত কালের ধাঁধার শরীর লাভ করে থাকে।

ধাঁধার গঠনভঙ্গিতে পরিচ্ছন্নতা এবং সুসংবদ্ধতাও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। জনমানসে কৌতূহল অব্যাহত রেখে চিরকালীন স্থান পেতে গেলে এদু'টি গুণের সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন। পরিচ্ছন্ন, সুসংবদ্ধ স্বল্পা-য়তনের মধ্যে কাব্যগুণ ও চিত্রময়তার নিগূঢ় সাহচর্যে ধাঁধা শ্রোতার সম্মুখে ইঙ্গিতময়তার একটি শরীরী রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং এই কারণেই জনচিত্তে মনোহারী অনুভবের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এর ভাষায় কোনরকম জটিলতা থাকে না; সুন্দর ভাষা, উপমা এবং রূপকল্পের প্রয়োগে এর শিল্পসৌন্দর্য বিকশিত হয়ে থাকে। প্রাজ্ঞ চিন্তাধারা, যুক্তিতর্কের মেলবন্ধনে সুগঠিত ভাবনা একে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। এর মধ্যে আনন্দ এবং রসের যেমন সন্ধান মেলে, তেমনি মেলে কৌতুক আর রহস্যময়তার সন্ধান।

হাস্যরসের সৃষ্টি ধাঁধার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হাস্যরস যেমন কৌতুকের সঞ্চার করে, তেমনি কৌতূহল এবং আগ্রহও বাড়িয়ে দেয়। (২) 'তুলুক বুঢ়ি মুলুক যায়, দুটা ঠেঁগার মার খায়'—এর মধ্যে যেমন হাস্যরস আছে, তেমনি

কৌতুকও আছে। কেউ যদি বেড়াতে বেরোয় আনন্দে, আর সেই আনন্দ লাভের জন্য তাকে প্রহার খেতে হয় তাহলে হাস্যরসের সঙ্গে কৌতুকরসের অনাবিল মিশ্রণ যে ঘটে, তাতে সন্দেহ নেই। এর জনশ্রুতিমূলক উত্তর হল ঢোল ; ঢোল বাজাতে হলে দু'হাতে দুটো কাঠি দিয়ে পিটিয়ে বাজাতে হয়। কারো কারো মতে বুদ্ধি বা জ্ঞানের চর্চার চেয়ে নির্মল হাস্যরসসৃষ্টিই ছিল ধাঁধার একমাত্র উদ্দেশ্য ; বুদ্ধির চর্চা হয়তো বা উপলক্ষমাত্র ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বা বস্তুর মধ্যে হাস্যরসের উপাদান সঞ্চিত হয়ে আছে। আমাদের আপত্তি ধাঁধার মধ্য দিয়ে জ্ঞানচর্চা বা লোকশিক্ষাকে উপলক্ষমাত্র বলায়। যে সুচতুর ভাষাভঙ্গিতে সুসংবদ্ধভাবে এর মধ্যে পুরুষানুক্রমের উপলব্ধ অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে, তা নিছক হাস্যরসসৃষ্টির জন্যই করা হয়েছে, এমন কথা আমরা মেনে নিতে পারি না। প্রবাদকে বাদ দিলে লোকসাহিত্যের আর কোন শাখায় এমন স্বল্পায়তনে পরিচ্ছন্ন সুসংবদ্ধতায় মানুষ তার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে সুচতুর রহস্যময় বাগভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ করেনি। ধাঁধা প্রধানতঃ মননশীলতা থেকে উৎপন্ন, তাই এখানে লোকায়ত মননশীলতার উৎকর্ষই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে ; হৃদয়ঘটিত সাহিত্যরস বা হাস্যরস সেখানে নিতান্তই সহচরের মতো পাশাপাশি থেকেছে মাত্র।

গঠনরীতির দিক দিয়ে ধাঁধা সাধারণতঃ একটি পদ থেকে তিন চারটি পদেও রচিত হয়ে থাকে। তবে ঝাড়খণ্ডের ধাঁধা প্রধানতঃ একটি দু'টি পদেই সীমাবদ্ধ থাকে। ছড়ার সধর্ম হওয়ায় এর মধ্যে ছন্দোবদ্ধ এবং সমিল হওয়ার দিকে একটি স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়। তবে সর্বত্রই ছন্দ এবং মিলের প্রয়োগ করা হয় তা নয় ; বরং বহুক্ষেত্রেই একটি পদে নিছক গদ্যের আকারে একটি মাত্র প্রশ্ন বিধৃত করা হয়। এইগুলো যে প্রাচীনতম রচনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গদ্যে-রচিত ধাঁধাও সহজ সরল ভাষায় চিত্রময়তা প্রত্যক্ষতা এবং বাস্তবতার আশ্চর্য মেলবন্ধনে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জনচিত্তে কৌতুহল এবং ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। (৩) 'ম-মা-এ বিটিকে গড করে'—চারটি শব্দের এই ধাঁধাটি উচ্চারিত হবার সাথে-সাথে শ্রোতা সচকিত না হয়ে পারে না। এখানে যে চিত্রটি পাচ্ছি তা প্রথাসিদ্ধ আচরণের বৈপরীত্যে গঠিত। যখন আমরা জনশ্রুতিমূলক উত্তরটি জানতে পারি, তখন স্বস্তি এবং আনন্দ দুইই পেয়ে থাকি। এর উত্তর হল, ভাতের

হাঁড়ি এবং 'খাপরী' (আকারে হাঁড়ির অর্ধেক, চওড়া মুখ মাটির পাত্র)। ভাত সেদ্ধ হয়ে যাবার পর ভাতের হাঁড়িকে নিম্নমুখী করে খাপরীতে ভাতের ফেন গালা হয়; এই চিত্রটিকে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে চারটি শব্দের সাহায্যে লোককবি বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

গঠনরীতির দিক দিয়ে ধাঁধার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একটি বক্তব্য যখন একটি পঙক্তিতেই শেষ হয়ে যায় তখন তার পাদপূরণের জন্য কিংবা ছন্দমিল বজায় রাখবার জন্য কিংবা নিছক অলংকার হিসাবে ব্যবহারের জন্য একটি অতিরিক্ত পদের সংযোজন করা হয়ে থাকে, তাতে অবশ্য এর চরিত্রের কোন হেরফের ঘটেনা। এদিক দিয়ে দেখলে ধাঁধার সঙ্গে ছড়ার এবং কিছু কিছু লোকগীতির একটা ঘনিষ্ঠ মিল লক্ষ্য করা যায়।

৪ ভগ্‌ত বড় শক্ত পণ্ডিত র'হল বস্তে,
গাছের ফল গাছেই র'হল বঁথটি গেল খস্তে। পাঁ'জ (পদচিহ্ন)

এখানে দু'টি পদের মধ্যে কোন সংগতি নেই, আসল প্রশ্নটি দ্বিতীয় পদেই রয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের ধাঁধাকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়: (১) প্রকৃতি বিষয়ক, (২) গার্হস্থ্যজীবনবিষয়ক, (৩) তত্ত্ব ও আচারমূলক এবং (৪) গাণিতিক ধাঁধা। এগুলোর মধ্যে তত্ত্বমূলক ধাঁধা সরাসরি ধাঁধার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না; ঝুমুর এবং টুয়াগানে চর্যাপদের মতোই সন্ধ্যাভাষায় কিছু তত্ত্বকথা প্রকাশ করা হয়েছে। ঝুমুর এবং টুয়া লোকগীতি হলেও এগুলোর রচনায় ব্যক্তিকবির সাহিত্যপ্রয়াসের নজির খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আচারমূলক আহীরা গান, সাথীগান, জাওয়াগীতে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এক ধরনের নীতি-উপদেশমূলক ধাঁধা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে উত্তরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করা হয় না, পরবর্তী পদে তার উত্তরও দেওয়া হয়ে থাকে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে গ্রহনক্ষত্র প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়বস্তুই ধাঁধার আদি উপকরণ। দূরের অনায়ত্ত বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যেমন সক্ষম হয়, তেমনি তা আমাদের মধ্যে কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসারও উদ্রেক করে থাকে। এদিক দিয়ে বিচার করলে প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাগুলোই যে প্রথমে রচিত হয়েছে, তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। তাই আমরা প্রথমে প্রকৃতি-জগৎ বিষয়ক ধাঁধা নিয়ে আলোচনা করব। এখানে একটা কথা মনে রাখতে

হবে, ধাঁধার বিষয়বস্তু সব সময়েই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে; নিছক কল্পনাজাত বিষয় এর অঙ্গীভূত হয় না। দৃষ্টিগ্রাহ্য, ফলে অনুভবগ্রাহ্য, বস্তুই মানুষের মনে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করতে পারে। এই সব বস্তু দূরে-অদূরে সর্বত্রই বিরাজ করতে পারে এবং মানবিক চেতনাকে স্পন্দিত করে তুলতে পারে। তবে যে-সব বস্তুর উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, সেই সব বস্তুই ধাঁধার উপজীব্য হয়ে থাকে।

শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা, বাতাস, ঘূর্ণিঝড়, চন্দ্রসূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জ—সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুই ধাঁধার মধ্যে বিচিত্র রূপকল্পের সাহায্যে প্রকাশ লাভ করে। এই ধরনের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল—

৫ ঝিকঝিক মানিকের ফঁটা অই ফুলটি পালি রে কুথা?
বান্যার দকানে নাই, রাজার ভাণ্ডারেও নাই॥ হুল (শিলা)

৬ ঘি চপ চপ মাধবলতা, এই ফুলটি পালি কুথা?
রাজার ভঁণ্ডারে নাই, কড়ি দিলে মিলে নাই॥—হুল

৭ আঁচিব ডু'বল পাঁচিব ডুবল ডু'বল বড় বড় মূঢ়া।
স'রষা ডু'বতে জল নাই ডু'বল রথের চূড়া॥—কুহড়া (কুয়াশা)

৮ এক যে আছে মস্ত বড় বীর. উয়াকে চইখে দে'খতে পাই না॥—হাওয়া

৯ আকাশ গুড়গুড় পাথরঘাটা, সাত শ ডালে দুটাই পাতা॥—মেঘগর্জন,
শিলাবৃষ্টি, নক্ষত্রপুঞ্জ, চন্দ্রসূর্য

১০ সুফল ফুটে্য আছে তুলইয়া নাই,
সুমরা মর্যে আছে কাঁদইয়া নাই,
সুবিছনা পড়্যে আছে শুয়ইয়া নাই॥—তারা, চাঁদ ও আকাশ

বলাবাহুল্য, আকাশ বাতাস চন্দ্রসূর্য নক্ষত্রপুঞ্জ কৌতূহল সৃষ্টি করলেও দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতার ওপর এগুলোর তেমন সরাসরি প্রভাব নেই। তাছাড়া দূরের জিনিষ হিসাবে এগুলো রহস্যময়, কিন্তু প্রাণের নিগূঢ়স্পর্শে এগুলো ততোখানি অনুভবগ্রাহ্য বাস্তবরূপ নিতে পারে না। তাই এ-সম্পর্কে রচিত ধাঁধার সংখ্যাও কম।

শূন্যলোক থেকে দৃষ্টি ফেরাবার পরই আদিম মানুষের চোখে তার পারিপার্শ্বিক পৃথিবী অজস্র বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হয়ে বিস্ময়কররূপে প্রতিভাত হত। তখন তার চারপাশে শুধু অরণ্যময় পৃথিবী ছিল; যেদিকে দৃষ্টি পড়ত, সেদিকেই গাছপালা ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ত না। তাই ঝাড়খণ্ডের

ধাঁধায় যে বিপুল পরিমাণে অরণ্যবৃক্ষ ফলমূল লতাপত্রের প্রসঙ্গ থাকবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। বস্তুতঃ অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ডের ধাঁধার এক বৃহৎ অংশ অরণ্যকে আশ্রয় এবং উপজীব্য করেই গড়ে উঠেছে। যে কোন বৃক্ষ তার অভিনব বৈশিষ্ট্যের গুণেই ধাঁধার রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র দাবি করে থাকে। সরল মানুষের মনে কৌতূহল এবং মননশীলতায় স্পন্দন তুলতে পারে, এমনি ধরনের বস্তুবৈশিষ্ট্যগুলো রূপক, চিত্রকল্প এবং কবিতার একত্র সম্মিলন ঘটিয়ে সাধারণতঃ ধাঁধার জন্ম দিয়ে থাকে।

ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী-অর্ধআদিবাসীদের জীবনে মহুল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মহুল থেকে শুধু মদই চোলাই করা হয় না, মহুল অরণ্যচারী মানুষের জীবনরসের উৎস বললেও চলে। মহুল সেদ্ধ, ভাজা, চালভাজার সঙ্গে ভাজা মহুলের ঢেঁকি-পেষাই 'মহুল লাঠা' ঝাড়খণ্ডী জনতার অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এর ফল 'কচড়া' থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তাই এরা সংবৎসর ব্যবহার করে থাকে। মহুলের জন্মরহস্য, গঠনপদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তাই ধাঁধার উপজীব্য হয়ে থাকে।

১১ গাছটির নাম হীরা, তাই ফল্যেছে গুড় বাইগন জিরা॥

—মহুল, কচড়া, পরাগ।

১২ উপরে বাঁসা তলে ডিম॥—মহুল।

১৩ ঢাক ঢোল ভিতর খোল, নিংড়ালে পড়ে ঝোল॥—মহুল।

১৪ মা বিটির একেই নাম, ডুমকা ছুঁড়ার ভিন্ন নাম॥

মহুল (গাছ ও ফুল), কচড়া।

সজনে গাছও ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। উষর ধূসর অরণ্যভূমিতে এই গাছ সারা বছর ধরে সব্জির সংস্থান করে থাকে; এর পাতা, ফুল ডাঁটা, এদের প্রিয় সব্জি। সজনে ফুলের ফুটে ওঠা এবং পরে ডাঁটায় পরিণত হওয়ার মধ্যে যে অভিনবত্ব দেখা যায়, তা লোকমানসে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে থাকে।

১৫ গাছটির নাম লালবিহারী, তাই ফল্যেছে তিন তরকারি॥

১৬ মুঢ়ি ছিল খই হল্য, আস্তে আস্তে নেজ বা' হরাল, দেখ ভগবান॥

১৭ ছিল মুঢ়ি হল্য খই, আস্তে আস্তে নে গুড় বা' হরাল অবাক হয়ে রই॥

বিভিন্ন বুনো ফল—শাল, পিঁড়রা, তাল, বেল, বাকড় আদি—অভিনব বৈশিষ্ট্যের গুণে ধাঁধায় স্থান লাভ করেছে—

১৮ গুড়রু হেঁসেন গুড়রু শশা হেঁসেন হেঁসেন কান।
জানবি ত জান নাই ত দে তিন মণ ধান ॥ —শালনী (শাল ফল)

১৯ পাত্ চিকচিক ফলটি গেড়া, যে নাই জানে তার গুষ্টি ভেড়া ॥ —পিঁড়রা

২০ উপর লে প'ড়ল ধুম, ধুম বলে আমার পঁদটা শুং ॥ —তাল

২১ মইধ বনে ঘটি টাঁগা ॥ —বেল

২২ মাঝ বনে ফাল টাঁগা ॥ —বাকড়

২৩ কাকা হে কাকা, বীচ বাহির ফল পাকা ॥ —ভেলা

২৪ এতটুকু ডালে, কিষ্ট ঠাকুর দলে ॥ —তেঁতুল

বাড়ির সব্জি ক্ষেতে বেগুন, লঙ্কা আদির চাষ হয়। গাছ থেকে বেগুন তুলতে গেলে পেছনে ধরে টানতে হয়। এই বিচিত্র পদ্ধতিকে লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে নিচের ধাঁধাটি—

২৫ জান কহনী জান, নেজে ধরি টান ॥

এখানে 'জান কহনী' শব্দটি লক্ষণীয় ; ঝাড়খণ্ডে ধাঁধা 'জান কহনী' কোথাও বা শুধু 'কহনী' নামেই সাধারণতঃ পরিচিত। 'শোলোক' এবং 'ভাঙন' শব্দও কোথাও কোথাও শোনা যায়।

২৬ মা ঝাঁপড়ী, বিটি সুঁদরী ॥ —লঙ্কা

মাত্র চারটি শব্দের ব্যবহারে এক অপূর্ব চিত্র-কবিতার সৃষ্টি। শব্দের মধ্যে বিস্ফোরণের অভাবিত ক্ষমতা যে নিহিত থাকে, তা এই ধাঁধাটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। শুধু ধাঁধার নয়, কবিতারও কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ এই রচনাটি থেকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়! ছন্দোবদ্ধতা, চিত্রকল্প, বৈপরীত্য, সংক্ষিপ্ততা, পরিচ্ছন্নতা, সুসংবদ্ধতা এবং ইঙ্গিতময়তার এমন একত্র সমাবেশ বড় একটা ঘটে না। ধাঁধার চারটি শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মনে যেন নিস্তরঙ্গ দীঘিতে আকস্মিক ঢেউ ওঠার মতো একটা আলোড়ন জেগে ওঠে। দু'টি বিপরীত চিত্র পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে কৌতুক ও হাস্যরসমণ্ডিত ধাঁধাটি আমাদের উপলব্ধিকে আনন্দময় করে তোলে। জননী এবং কন্যার মধ্যে কি অসম্ভব বৈপরীত্য! রুক্ষকেশিনী এলোকুন্তলা মাতৃমূর্তির পাশাপাশি রূপোজ্জ্বলা অপরূপা সুন্দরী তনয়া! লঙ্কাগাছে টকটকে লাল পাকা লঙ্কা ঝুলন্ত অবস্থায় না দেখলে এই অভাবিতপূর্ব চিত্রটির কথা কল্পনাই করা যাবে না।

২৭ শাঁক লদীর পাঁক নাই, জল আছে ত মাছ নাই ॥ —ডাব

২৭ ক কেউ হাঁসে কেউ ভাঁসে কেউ কাদায় লটপট ॥

—শালুক ফুল, পাতা ও মূল

ওপরের ধাঁধাটিতে শালুক-সম্পর্কিত চিত্রের চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করলেই চলবে না, এর মধ্য দিয়ে ঝাড়খণ্ডের লোকমানসের যে প্রাজ্ঞতা, উপলব্ধির প্রগাঢ়তা এবং বাস্তব পার্থিব জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে তা'ও লক্ষ্য করে দেখা দরকার। এই পৃথিবীর আজব খেলায় কারো-বা হাসিখুশিভরা জীবন, কেউ-বা জীবন-সমুদ্রে নিজেকে কোনক্রমে ভাসমান রাখতে ব্যস্ত, আবার কেউ-বা হতাশায়-বেদনায় ব্যর্থতায়-অপমানে পঙ্কে লুটোপুটি খাচ্ছে। চিত্রগৌরবে ধাঁধা লোকসাহিত্যের সব শাখার মধ্যে অদ্বিতীয়, কিন্তু অর্থগৌরবেও যে তা কতো গভীর হতে পারে তার নিদর্শন ওপরের এই ধাঁধাটি।

লাউ কুমড়োর লতা-পাতা ফল, আলুমুলো ভুট্টা ইক্ষু সব কিছুই লোক-মানসে কোন না কোন প্রকারে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাই এসব বস্তুও বিচিত্র রূপকল্পের মাধ্যমে ধাঁধার উপকরণ হয়ে থাকে।

২৮ গাইটা ব'হল বাঁধা, চ'রতে গেল পাঘা ॥ —লাউ-কুমড়োর ফল ও লতা

২৯ পাত্ চ'রতে যায়, ছাগল রহে বসেঁ ॥ —লাউ-কুমড়োর পাতা ও ফল

৩০ ঝাপঝুপা গাছটি, তার তলে শাঁকটি ॥ —মুলো

৩১ এ হেন মটা ঝাবঝুব্যাটা কাপড়ের তলে থাকে।
ছানায় দে'খলে মাগে, ঠাকুর পূজায় লাগে ॥ —জম্হা'র (ভুট্টা)

৩২ চিকচিক পাতা লিকলিক ডাঁড়ি, থাকে মধু ফেলাতে চপা ॥ —আখ

৩৩ ম'ধ বলে বুঢ়ী চু'ল শুখায় ॥ —বাবই ঘাস (sabai grass)

৩৪ উপর লে প'ড়ল ছুরি, ছুরি বলে আমি ঘুরি ঘুরি পড়ি ॥ —বাঁশ পাতা

৩৫ তিন শিঙ্গা তিরিং বিঙ্গা, পাত বাঙ্গা ফল খাঙ্গা ॥ —পানিফল

৩৬ পালাও রে ছানাপানারা, মুই কঁকুড়ং ॥ —চিহড়

জীবজন্তুও প্রকৃতিজগতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব। তাই ধাঁধার মধ্যে মানবশরীর বিভিন্নরূপে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। বস্তুতঃ মানবশরীর নিয়ে আদিম যুগ থেকে মানবমনে যে প্রশ্নের সঞ্চার হয়েছিল, আজো তার শেষ হয়নি। ঝাড়খণ্ডের আদিম মানুষও মানব শরীরের রহস্যভেদ করবার চেষ্টা করেছে, যার প্রকাশ ধাঁধার মধ্যে মেলে। একটি ধাঁধায় শরীরকে চতুষ্কোণ পুষ্করিণীর রূপকে কল্পনা করা হয়েছে; পদযুগল যেন বৃক্ষের মতো; বত্রিশটি দাঁত 'পেঁপেল' এবং জিহ্বাকে পাতা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে—

৩৭ চা'র কুন্যা পথ'রটি মনহর গাছটি।
বত্তিশটা পেঁপেল আছে তার একটি পাতা ॥

৩৮ ঝুড় তলে মুটুর-মুটুর মুটুর তলে ফেঁ।
ফেঁ তলে ফেদেড়-ফেদেড় বল্ ত ভায়া কে? —ভুরু, চোখ, নাক ও মুখ

৩৯ উত্তর দক্ষিন পুরুব পচ্ছিম ছাঁচা, কন্ ফলটা কাঁচা ॥ —জিভ

৪০ একটুকু কানি, শুকাতে না জানি। —জিভ

৪১ কা'টলে বাঁচে, না কাট'লে মরে ॥ —নবজাতকের নাভিছেদন

৪২ নওয়াতে পারি, ভা'ঙতে নারি ॥ —চুল

৪৩ হাহ গেল. হাহ আল্য ॥ —মন, দৃষ্টি

৪৪ গাছটা গেল চলি, পাতটা রইল বসি ॥ —পায়ের ছাপ

সদ্যোপ্রসূত শিশু আদিম মানবের মনে এক পরম বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দেখা দিয়েছিল। দশমাস মাতৃগর্ভে থাকবার পর শিশু জন্মগ্রহণ করে; জন্মগ্রহণ করেহ সে মাতৃস্তন্য পান করে থাকে। তার মুখে দাঁত থাকে না, তবু সে মাতৃস্তন চোষে। এই দৃশ্যটি তার মনে অভাবিতপূর্ব কবিত্বময় এক চিত্রসৃষ্টির প্রেরণা জোগায়। লোককবির মনে হয়, শিশু যেন ঠিক দশে-মাসে বা কালে-ভদ্রে আসা কোন আত্মীয়কুটুম্বের মতো। খাসি মাংসের আয়োজন করে কুটুম্বের সম্মানরক্ষা করতে হয়, কিন্তু যে খাসি কুটুম্বের সামনে হাজির করা হয় তার যেমন কোন হাড় নেই, তেমনি কুটুম্বেরও কোন দাঁত নেই। এখানে খাসি মাতৃস্তন এবং কুটুম্ব হল শিশু নিজে।

৪৫ দশে-মাসে আল্য কুটুম খাসি খাবে বল্যে।
খাসির ত হাড় নাহ, কুটুমের ত দাঁত নাই ॥

মানুষের নিজস্ব পরিবেশে বহু জীবজন্তু এবং কীটপতঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। এদের স্বভাবধর্ম এবং আচরণের মধ্যেও মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতুকরস উপভোগ করে থাকে; তাই দেখা যায় এরাও ধাঁধার উপজীব্য হতে পেরেছে।

৪৬ একটা গিরায় ঘরটা ডাঁঢ়ায়। —বোলতার চাক

৪৭ ম'ধ বনে সুরু চাউলের পুড়া। —আম পিঁপড়ের বাসা

৪৮ গুজরু আঁড়্যার গুজরু কাল, তাড়াতাড়ি যায় শিম'ল পাল। —ইঁদুর

৪৯ ম'ধ বনে বুঢ়ী ঝিঁজির ফেলায়। —কালো বিষ পিঁপড়ে

৫০ আট পা ষোল হাঁটু, মাছ ধ'রতে যায় লাঠু।
শুকনা বাঁধে ফেলি জাল, মাছ ধরি খায় চিরকাল ॥ —মাকড়সা

৫১ কুথিবল মতন জিনিষটা, ঢেঁকিব মতন আহাব কবে। —ছারপোকা

৫২ দুই সতীনেব একেই বা, কাব বা ডিম কাব বা ছা॥ —চিল ও ঘোড়া

৫৩ আঁকা বাঁকা নদীটি দিক চবনে যায়,
সাত রাজার কপাট খুলি কাঠকলাই খায়॥ —ঘুণ

৫৪ গাছে ঠেং জ্বলে পঁদ। —জোনাকী

৫৫ গাই ত গপী লয় দুদ্ ত মিঠা।
ষোল শ সতীনেব একটা পিঠা॥ —মৌচাক

কোন কোন ধাঁধাব উত্তর একটি মাত্র শব্দ দিয়ে প্রকাশ কবা যায় না। ধাঁধার আড়ালে 'একটি সংক্ষিপ্ত জনশ্রুতিমূলক কাহিনী' থাকে; সেটি পবিবেষণ কবে ধাঁধাব উত্তব ব্যাখ্যা কবে বোঝাতে হয়। ঝাড়খণ্ডেও এই ধবনেব বহু ধাঁধার সন্ধান পাওযা যায়; বলাবাহুল্য, এগুলো সর্বক্ষেত্রেই জীবজগৎ-সম্পর্কিত ধাঁধা।

৫৬ 'ধুমধুমাসি ধুমাগি বাইতে কেনে বুলছিস ?'
'টিপটিপাসি টিপাসি মাথায কেনে পড়ছিস ?'

বাত্রিবেলা মহুয়াতলায একটি শেয়াল ঘুবে বেড়াচ্ছিল। গাছেব ডাল থেকে তাকে দেখে মহুয়া খোঁটা দিয়ে বলল, ও ধুমসী মাগী, বাতেব বেলা ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন ? তাই শুনে শেয়াল টুপটাপ ঝবেপড়া মহুয়াকে ভেংচি কেটে বলল, তুই-ই বা আমাব মাথাব ওপব পড়ছিস কেন ?

৫৭ 'কালিঝুলি আওয়লে, পানি নাই পাওয়লে।'
'অবে দাঢি লাজ নাই, লোহ নাই পাওয়লে।'

জোঁক এমনিতেই কালো, বক্ত খেয়ে তা আরো কালো হয়, এমনি একটি জোঁককে দেখে একটি চিংড়ি মাছ বিদ্রূপ করে বলল, কালি-ঝুলি মেখেই তুই এসে হাজির হলি, গা-ধোবাব মতো জলও পেলি না কোথাও ? তার কথা শুনে জোঁক চিংড়ি মাছেব দাড়ির প্রতি কটাক্ষ কবে বলল, ওরে দেড়েল, তোর লজ্জাসবম নেই। তোব গায়ে কোথাও এক ফোঁটা রক্তও তো নেই।

অতঃপর নিম্নে কিছু জলচব জীব এবং কীটপতঙ্গসম্পর্কিত ধাঁধা উদ্ধৃত করা হল।

৫৮ ইং চংচং চিড়িং ঠেং, চ'খ গুজগুজ মাথাই নাই। —কাঁকড়া

৫৯ মাঝ পথ'বে কাড়ার লাদ। —কচ্ছপ

৬০ বার বছরের খাসি, এক কুট্যাই মাস। —গেঁড়ি শামুক

৬১ বাপরে বাপ, মাথায় প'ড়ল চাপ,
ঘর পালাল্য বাহির বাটে, আমি পালাব কন্ বাটে।
—জাল, জল ও মাছ

৬২ নাকে খায়, চইখে হাগে। —মাছ ধ'ববাব ঘুর্ণি

৬৩ ডাগুড় ডাগুব ডাগুড, বাবা থা'কতে বেটাব কেনে নেগুড। —ব্যাঙাচি

ঝাড়খণ্ডের মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় যে সব উপকরণ ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই ধাঁধার উপকরণ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের ধাঁধায় সবসময়ে যে বিস্ময় অনিবার্য শক্তি হিসাবে প্রেরণা জুগিয়েছে, তা নয়। যা চোখে পড়েছে এবং কিছুটা কৌতূহল সৃষ্টি করেছে, তাই এর উপকরণ হয়ে লোকশিক্ষা এবং শিশু-কিশোর-তরুণের বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

কৃষিকার্যের জন্য হলচালনা, বীজবপন. রোপণ, নিড়ান, ছেদন আদি অনেকগুলো কার্যধারাকে ক্রমান্বয়ে পালন করতে হয়। হলচালনার জন্য গরু এবং হালুয়ার (হলচালনাকারী) প্রয়োজন পড়ে। এ সমস্তই ধাঁধার বিষয়বস্তু।

৬৪ ঘসর ঘসর ঘসকা, তিনমুড দশ পো। —দু'টি বলদ ও হালুয়া

৬৫ ছড়্যাই করি হাঁতড়াই বু'ল্লেক,
চিপিচিপি আগে ফুটাই দিলেক। -বীজবোনা, বোয়া, নিড়ান ইত্যাদি।

কামারের পেশার উপকরণ এবং প্রকরণও কম ঔৎসুক্য জাগায় না। তার বাতাস করবার চর্ম-নির্মিত যন্ত্র 'চাপুয়া', গনগনে লাল লোহাকে পিটিয়ে মনের মতো রূপ দেওয়া,—এসব লোককবির মনে বিস্ময় আর কৌতুকের উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছে।

৬৬ ঘরের লে বা'হরাল্য কুকুর,
কুকুর বলে আমার পেটটা ফাকার-ফুকুর। —চাপুয়া

৬৭ দুই বহিন কালী, পাদে আলাপালি। —চাপুয়া

৬৮ লাল ধানে কাল্যা মারে, তার ঘর উপারে। —গরম লোহা ও হাতুড়ি

কুমোরের হাঁড়ি-কুঁড়ি বানাবার চাক, হাঁড়ি বানাবার রীতি-পদ্ধতিও ধাঁধার বিষয়বস্তু।

৬৯ এক টিপ্‌নি ঝাটাটি, ছাতার পারা মাথাটি। —কুমোরের চাক

৭০ একাঁই একাঁই ফলে, এক সঁগে পাকে। —হাঁড়ি তৈরি করা ও পোড়ানো

৭১ সাজালে সাজে বাজালে বাজে,
হেন ফুল ফুট্যে আছে বাজাবের মাঝে। —হাঁড়ি

চবকার নড়বড়ে দাঁত, ফোকলা পাটি. চক্ষুকর্ণহীনতাসত্ত্বেও তার বড় বড় বুলি (ঘর্ঘব শব্দ) ধাঁধা রচনার পরিবেশ গড়ে তুলেছে—

৭২ দাঁত লড়লড ফগ্‌লা পাটি, চ'খ মুখ নাই মুহের চাটি।

ঘবগেরস্থালিব বিবিধ আসবাবপত্র, যেমন চাষবাস, রান্না-বান্না, নাচ-গান, বিলাসব্যসন ইত্যাদি সম্পর্কিত উপকবণ নিয়েও কিছু কিছু ধাঁধা বচিত হয়েছে।

৭৩ একটা বুঢ়ীর দাঁতগাই সুদা। —চিকণি।

৭৪ চা'বধারে তাব হাড়গড মাঝখানেতে শাঁতি
বাঁশ বনে তাঁতি। —দড়িব খাট

৭৫ একটা বুঢ়ীব আঁতগিলাই শুধা। —দড়িব খাট

৭৬ ইঘর যাই উঘর যাই, ডুম কবি কাচাড় খাই। —ঝাঁটা

৭৭ একটা বুঢ়ীর পিঠে দুধ (=স্তন)। —কুলো

৭৮ ঢ্যাঁগা মামার পঁদ কানা। —শিঁকে

৭৯ যতই দিবি ততই খায়, নে" গডালে পেছ্যাই যায়। —দড়ি পাকানো

৮০ টিপিক টিপিক যায়, নেজে আহার খায়। —ছুঁচসুতো

৮১ পায়ে কাদা মাথায় কাদা, ডাঁঢ়াই আছে ঠাকুর দাদা। —বাড়ির ছাদ

৮২ যাছিস ত দিঁই যা নাই যাছিস ত দিস না। —দরজায় শেকল তোলা

৮৩ রাজাঘরের মেনি গাই, হাজার টাকাব মরিচ খায়। —শিলনোড়া

৮৪ লহার গাই লহার বাছুর, দুধ দেয় উছুল উছুল।—তেল পেষাই যন্ত্র

৮৫ চামচিকা ভুঁইনিকা, তার দাম চ'দ্দ সিকা। —কোদাল

৮৬ ঠুরকু মামার ঢাঁগা পাঁ'জ। —গাড়ির চাকার দাগ

৮৭ মাথা রাখ্যে জল খায়। —লম্ফ বা ডিবে

৮৮ লিকলিক বাতাটি, তাব সঁগে কথাটি। —বই

৮৯ হুঁকরে গাই, ঠিকরে বাছুর। —বন্দুক ও গুলি

৯০ লেদা গাছে বদা হুঁকরে। —বন্দুক

৯১ পুটুরু আঁড়্যায়, পাহাড় ধসকায়। —ধানের গাদা ও পাই-পইলা

ঝাড়খণ্ডের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র হল মাদল, ঢোল, নাগরা, ধমসা। এগুলোকে নিয়েও ধাঁধা রচিত হয়েছে—

৯২ মামার ছাগল ছুলেই মেমায়। —মাদল

৯৩ বনের লে বা'হরাল্য কাড়া,
কাড়া বলে আমার পেটে ঢাডা। —ধমসা

তত্ত্ব ও আচারমূলক ধাঁধা সম্পর্কে আমরা এখানে কোন আলোচনা করব না। জাওয়া, আহীরা, সাথী এবং টুয়া গানে প্রাশ্নোত্তরমূলক যেসব প্রসঙ্গ আছে, তার মধ্যে ধাঁধার মেজাজমর্জি থাকলেও সদর্থে সেগুলো ধাঁধা নয়। আমরা যথাস্থানে এসম্পর্কে আলোচনা করেছি।

গাণিতিক ধাঁধার সংখ্যা ঝাড়খণ্ডে খুবই কম। একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

৯৪ থাপড় জমা টুসকি খরচ; বাকি রইল কত ? —আট

দু'টো করতল এক না করলে 'থাপড়' বা তালি হয় না। অতএব, 'থাপড় জমা' বলতে দশ আঙুল অর্থাৎ দশ বোঝাচ্ছে ; দু' আঙুল দিয়ে টুসকি দিলে দুই খরচ হয়ে যাচ্ছে—বাকি থাকছে আট। আসলে প্রশ্নকর্তা যখন এই ধাঁধাটি জিজ্ঞেস করে তখন থাপড় এবং টুসকি দুটোই সে চোখের সামনে দেখিয়ে ব্যাপারটাকে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ করে তুলে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবাদ

ঝাড়খণ্ডে প্রবাদ শব্দটি একেবারেই অপরিচিত শব্দ, কিন্তু প্রবাদ ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় অপ্রচলিত নয় ; বরং এই উপভাষার মধ্যে অসংখ্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় প্রবাদের প্রতিশব্দ হল 'দাঁতকথা' বা শুধুই 'কথা'। সাধারণ মানুষ যখন প্রবাদের প্রয়োগ করে, তখন তার আগে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা করে ; যেমন, 'কথায় আছে', 'কথায় বলে', 'সেই বলে না' ইত্যাদি। বুঝতে অসুবিধা হয় না, ঝাড়খণ্ডে 'কথা' শব্দটি প্রবাদের সমার্থক। শুধু প্রবাদের প্রতিশব্দ হিসাবেই নয়, পুরাকথা বা কাহিনীর প্রতিশব্দ হিসাবেও 'কথা' শব্দের ব্যবহার হয়।

এই 'দাঁত্‌কথা', 'কথা' বা প্রবাদও ধাঁধা, ছড়ার মতো লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপকরণ। প্রবাদের মধ্যে শুধু দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার প্রকাশই যে থাকে তা নয়, মননশীলতাও এর অন্যতম চারিত্রগুণ। এদিক দিয়ে বিচার করলে ধাঁধার সঙ্গে প্রবাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। উভয়েই সংক্ষিপ্ত পরিসরের হয়ে থাকে, উভয়েই গদ্যে-পদ্যে রচিত সরস রচনা এবং উভয়ের অর্থই সরাসরি প্রকাশ পায় না—বরং বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করে অর্থোদ্ধার করতে হয়। যেহেতু প্রবাদের মধ্য দিয়ে মননশীলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাই কারো কারো মতে আদিম সমাজ বা উপজাতির সমাজ কিংবা লোকসমাজের নিম্নস্তরে প্রবাদ উদ্ভব লাভ করতে পারে না। তাঁরা বলেন, এই শ্রেণীর সমাজে কোথাও প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ্যগোচর হলে ধরে নিতে হবে, তাদের অতীতজীবনের গৌরবময় ঐতিহ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যে-সব আদিম সম্প্রদায় হাজার বছর ধরে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে, তাদের মধ্যে উঁচুস্তরের মননশীলতা বিকাশ লাভ না করলেও সমাজ-মানসের উপযোগী মননশীলতা অবশ্যই গড়ে ওঠে। আদিবাসীরাও বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতো উন্নত সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ প্রবাদের রচনা করতে না পারলেও তাদের মননশীলতার উপযোগী প্রবাদ নিশ্চয়ই রচনা করে। তাই আদিম সমাজ, উপজাতি সমাজ কিংবা নিম্নস্তরের লোকসমাজে প্রবাদের উদ্ভব একেবারেই সম্ভব নয় এমন কথা আমরা বিশ্বাস করি না। প্রবাদের উদ্ভব-কাহিনী যথেষ্ট রহস্যাবৃত হলেও সামাজিক প্রয়োজনেই যে এর উদ্ভব ঘটেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন বিষয়ে বারবার একই অভিজ্ঞতা অর্জন করবার পর তার ভিত্তিতে এক একটি প্রবাদ রচনা অস্বাভাবিক নয়। এই অভিজ্ঞতা সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। প্রবাদ মূলতঃ কাহিনী-ভিত্তিক। প্রায় প্রতিটি প্রবাদের পশ্চাৎপটে কোন না কোন কাহিনী বা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। বর্তমানে কাহিনীটি লুপ্ত হয়ে গেলেও প্রবাদটি যথারীতি অস্তিত্বরক্ষা করে চলেছে। প্রবাদ কাহিনীর সারবস্তু মাত্র। এখনো বহু প্রবাদের পশ্চাৎপটে কাহিনীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রবাদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। কোন একটি সংজ্ঞার সাহায্যে প্রবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে কোন সংজ্ঞাকেই একেবারে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেশ-

বিদেশের বিভিন্ন পণ্ডিত প্রবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, যিনি যে সমাজের বা দেশের অন্তর্ভুক্ত তিনি সেই সমাজ বা দেশের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদের কথা স্মরণে রেখে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন ; ফলে কিছুটা একদেশদর্শী হয়ে পড়লেও কোন সংজ্ঞাই অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নয়। স্পেনদেশীয় একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—A proverb is a short sentence based on long experience. অর্থাৎ প্রবাদের আয়তন সংক্ষিপ্ত এবং উপজীব্য দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা। স্বল্পায়তনের মধ্যে প্রবাদের এই সংজ্ঞা আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই সংজ্ঞার 'সংক্ষিপ্ততা' এবং 'দীর্ঘ অভিজ্ঞতা'কে গ্রহণ না করে সংজ্ঞার মধ্যে প্রবাদের বিষয় এবং উদ্দেশ্য না থাকার অভিযোগ তুলেছেন।[১] কোন সংজ্ঞার সাহায্যেই যে কোন বিষয়কে সর্বাংশে সুস্পষ্ট করে তোলা যায় না, তা তো সর্বজনস্বীকৃত সত্য। যে কোন বিষয়ের বহুদিক থাকে, যা স্বল্পায়তন সংজ্ঞার সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না ; তাই বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক প্রকাশ পেয়ে থাকে। ডঃ ভট্টাচার্যের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি এই রূপ—'প্রবাদ গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি।'[২] এই সংজ্ঞাটি যে সর্বাংশে সম্পূর্ণ, এমন কথায় আমরা বিশ্বাস করি না—যদিও একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এটি দেশ বিদেশের পণ্ডিতদের প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার নির্যাস মাত্র, তবে সংজ্ঞাটি যে প্রবাদের অনেক ক'টি বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত করতে পেরেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লক্ষণীয় ডঃ ভট্টাচার্য এখানে শুধু 'সংক্ষিপ্ত' নয় 'সংক্ষিপ্ততম' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন এবং 'অভিজ্ঞতা'র কথাও স্বীকার করেছেন।

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো প্রবাদও গোষ্ঠীজীবনের সম্পদ। কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে বহুজন মিলে ধাঁধা, প্রবাদ আদির সৃষ্টি করে নি, বরং এর পশ্চাতে ব্যক্তিমানসের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, রসবোধ এবং সৃজনশীলতাই যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে আদিম কৌম সমাজব্যবস্থায় ব্যষ্টির কোন স্থান ছিল না বলেই ব্যক্তি-সৃষ্ট সমস্ত রচনাই সমষ্টির সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। প্রবাদের উৎসও বিশেষ কোন ব্যক্তিমানসে,

১ বাংলার লোকসাহিত্য, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১

২ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬

কিন্তু লোকজীবনের রীতি-অনুসারে ব্যক্তি-সত্তা গোষ্ঠী-সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ায় প্রবাদ অপৌরুষেয় রচনায় পরিণত হয়েছে।

প্রবাদ সমাজের অন্তঃস্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই প্রবাদের মধ্য দিয়ে সমাজমানসের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সমাজের মধ্যে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সব কিছুই প্রবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ব্যঙ্গকৌতুক এবং বক্রোক্তি প্রবাদের প্রাণসম্পদ। সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড-গুলোকে প্রবাদের মধ্যে তির্যক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এক একটি প্রবাদ রচিত হয়, যার মধ্যে বিস্ফোরণের ক্ষমতা নিহিত থাকে। Proverb photographs the varying lights of social usages ; the experience of an age is crystalized in the pithy aphorigm.[৩] প্রবাদ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। সামাজিক আচার-ব্যবহারের হুবহু প্রতিচ্ছবি প্রবাদের মধ্যে বিধৃত হয়ে থাকে ; প্রবাদে বিশেষকালের বিশেষ অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্ত পরিসরে রূপ পরিগ্রহ করে। এই অভিজ্ঞতা সরাসরি সহজভাবে প্রকাশ পায় না, বরং রূপকের আধারেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। বক্রোক্তি এবং ব্যঙ্গকৌতুক প্রায় সময়ই রূপকের মধ্যে সংগুপ্ত থাকে।

গুণগতভাবে প্রবাদের বিচার করে দেখলে দেখা যায়, এর মধ্যে সংক্ষিপ্ততা, অর্থবহতা এবং সরসতা অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান থাকে। A proverb is a saying in more or less fixed form marked by 'shortness, sense, and salt', and distinguished by the popular acceptance of the truth tersely expressed in it.[৪] অর্থাৎ প্রবাদ এমন একটি উক্তি বা বাণী যা কমবেশি একটি অপরিবর্তনশীল আকারের হয়ে থাকে, সংক্ষিপ্ততা, অর্থবহতা এবং সরসতা যার বিশেষত্ব এবং এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সত্য গোষ্ঠী বা সমাজ কর্তৃক সাধারণভাবে স্বীকৃত। এখানে আকারের দিক দিয়ে প্রবাদের অপরিবর্তনশীলতা, সংক্ষিপ্ততা, অর্থবহতা এবং সরসতার ওপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তেমনি গোষ্ঠী-স্বীকৃত সত্য যে প্রবাদের আত্মস্বরূপ তা'ও স্বীকার করা হয়েছে।

৩ Oriental Proverbs : Ed. Dr. Mahadev Prasad Saha

৪ Oral Literature in Africa : Ruth Finnegan.

রূপকের আধারে রচিত সমস্ত প্রবাদের বিষয়বস্তু যে মানুষ, তাতে সন্দেহ নেই। মানুষের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার প্রবাদে উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হয়ে থাকে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, প্রবাদে মানবচরিত্রের দুর্বলতার দিকটিই সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে; সমালোচনার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং তির্যক দৃষ্টি মানবিক দুর্বলতার ওপর নির্মমভাবে বর্ষিত হয়েছে। এদিক দিয়ে দেখলে প্রবাদে মানবচরিত্রের সৎ গুণাবলী মোটেই যোগ্য সমাদর লাভ করে নি। আসলে প্রবাদের মাধ্যমে ত্রুটি-বিচ্যুতির যতোখানি সুকঠোর সমালোচনা করা হয়, গুণাবলীর প্রশংসা তার সামান্যতম অংশও করা হয় না।

প্রবাদে নর অপেক্ষা নারীর সমালোচনাই বিশেষভাবে করা হয়ে থাকে। প্রবাদের রচনার ক্ষেত্রেও তাই এর অপেক্ষা নারীর প্রাধান্যই বেশি। সত্যি কথা বলতে কি প্রবাদের ব্যবহার পুরুষসমাজ অপেক্ষা নারীসমাজেই সমধিক লক্ষ্যগোচর হয়ে থাকে। নারী শুধু প্রবাদ রচনাই করে না, ধারণ এবং বহনের বিশেষ দায়িত্বও পালন করে থাকে। নারীর চেয়ে নারীর কঠোর সমালোচক আর কে হতে পারে? তাই দেখা যায়, প্রবাদে নারীর বিভিন্ন আচার-ব্যবহার সম্পর্কে যতোখানি তীক্ষ্ণ এবং নির্মম বিদ্রূপ বর্ষিত হয়ে থাকে, পুরুষের ক্ষেত্রে তা নামমাত্র বললেও চলে।

সমাজ-সংসার পারিবারিক জীবন প্রবাদে সর্বাধিক স্থান অধিকার করে আছে। সামাজিক রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের প্রতি ঝাঁজালো বক্রোক্তি যেমন করা হয়েছে, তেমনি পারিবারিক জীবনের বিচিত্র সম্পর্ক, আত্মীয়স্বজন এবং তাদের কৌতুককর আচরণের প্রতি ব্যঙ্গ এবং কটাক্ষও বারে-বারে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, এই শ্রেণীর প্রবাদে বহু ক্ষেত্রেই রূপক ব্যবহার করা হয় না; নিরলংকার নিরাবরণ ভাষায় এই শ্রেণীর প্রবাদ অপ্রতিহত-গতিতে মর্মভেদ করতে সক্ষম হয়। ঝাড়খণ্ডের প্রবাদেও এই ধরনের বিষয়-বস্তুই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

প্রথমে পরিবার বা কুটুম্বজীবন-সম্পর্কিত প্রবাদগুলো উদ্ধৃত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যে কোন সমাজেই বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমে দুটি অনাত্মীয় পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তাবন্ধন গড়ে ওঠে। কুটুম্বিতার মাধ্যমে দু'টি পরিবার একটি কুটুম্ব পরিবারে পরিণত হয়। ঝাড়খণ্ডে এই বন্ধন বা কুটুম্বিতা গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ-দু'টি পরিবার পরস্পরের সুখদুঃখের অংশীদার হয়।

বরকনের নির্বাচন, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান, আযোজন-সমারোহ সমস্তই প্রবাদে শাণিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে।

১-২৭ ধরা-বাঁধা বেহা, মন সযদা সাঁগা ॥ সাঁগা আর মাঁগা ॥ নিসন্তন্যার ঝি, তার গণন-গাঁথন কি ॥ সাঁগা-উ মায়া, ন থঁজা-উ বলা ॥ ভাঙা ঘরে থঁজা বলা, বেহাল্যা পুরুষ ছাড্যা সাঁগা ॥ গাযের কন্যা শিঁঘন নাথী ॥ তুনিয়া থা'কলে কনিযার অভাব ॥ যেমন দাদা ভজহরি, তেমনি দিদি মঞ্জুরী ॥ সাত খাঁই খাঁই আঠে পা ॥ মিঞা বিবি রাজি, কি ক'ররেক কাজি ॥ কুলের কন্যা চেপটি অ ভাল ॥ জল খাবি ছান্যে, ঘর জুড়বি জান্যে ॥ তুরুৎ লগন তুরুৎ বিহা ॥ যাহার সঙ্গে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডম ॥ এক মায়াকে আনাগানা, দু' মায়াকে ছিঁড়া কানা। তিন মাথা যার ঘাড়ে হাঁড়ি, চা'র মাথা যার গলায দ'ড়ি ॥ কন বেহাকে দু' ঘর আলতা ॥ কন বিহার তরে আগ ঘইডে আলতা ॥ উঠ ছুঁড়ী তর বেহা, পাত্তর ঘরের গুযা ॥ যার বেহা তার মনে নাই, সাঁই পড়শীর ঘুম নাই ॥ পরের নিয়েঁ ররের বাপ, লুট্যে লিলেই মনস্তাপ ॥ নাচে কুদে ররিযাতি, যার লাগে কড়িপাতি ॥ ঢোল বাজাবি সিদা লিবি কন্যা দেখছিস কেনে ॥ পরের বিহা, ডাঁটাই ঠিঁহা ॥ বেহার মজা বাজনা, জমির মজা খাজনা ॥ ঢাকে ঢলে বিহা, কাঁসিতে কেনে মানা ॥ সেই মাগী ভাতার করে, হবে দরে একেই পড়ে ॥ আঘন মাসে চুঁট্যার-অ সাতটা বহু ॥

যে-কোন পরিবারে পিতামাতার ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মাতা-সম্পর্কিত প্রবাদে মহিমাই প্রকাশ পেযে থাকে, কদাচিৎ শ্লেষ বা বক্রোক্তি ব্যবহার করা হয়।

২৮-৩৩ চিড়া বল মুড়ি বল ভাতের পারা নাই। মাসি বল পিসি বল মায়ের পারা নাই ॥ মাই থা'কলে কি কেউ মাসির তরে কাঁদে ॥ মায়েই জানে ছাল্যার বেদন ॥ ছানা ন' কাঁ'দলে মা-অ দুধ খাওয়ায় নাই ॥ কামের (কন্যার ?) মা ভিতরি, ররের মা বাহারি ॥ মায়ের নাম চুটকি বাঁদী, বেটার নাম সুলতান খান ॥

সন্তানের জন্মদাতা হিসাবেই পিতার বিশিষ্ট ভূমিকা প্রবাদেও স্বীকৃত।

৩৪-৪১ আয় থা'কলে ব্যয়, বাপ থা'কলে বেটা ॥ বাপে নাই পুতে, চঁগা ধরি মুতে ॥ বাপকা বেটা পচ্ছিম কা ঘডা, কুচ নাই কুচ থড়া থড়া ॥

বাপের কালে নাই চাষ, বেনা বনে বাস ॥ বাপের কারণে সৎমাইকে গড় ॥ ভিন্নু ভাতে বাপ পড়শী ॥ ভিন্নু ঘরে বাপ পড়শী ॥ নিজে বাঁ'চলে বাপের নাম ॥

প্রবাদে মাসিপিসির সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায় না ; ব্যঙ্গ এবং বক্রোক্তির শিকার হতে হয়েছে মাসিপিসিদের।

৪২-৪৫ খড় সম্পর্কে পুয়াল মাউসী ॥ ধান সম্বন্ধে পুয়াল মাউসী ॥ ঘরঘর মসি ঘরঘর পিসি ।। মসি বলি পঁদ চিমটায় ॥

পুত্র যতোদিন পারে নিষ্কর্মার মতো পিতৃ-অন্ন ধ্বংস করে থাকে। তাই পুত্র সম্পর্কিত প্রবাদে পুত্র-প্রসঙ্গ অশ্রদ্ধা এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।

৪৬-৫৮ থাঁই হাগে শুঁই জাগে, সে পুত কোন কাজে না লাগে ॥ পুত আর ভূত ॥ ছঁড়কে না করিহ দয়া, ছঁড়ের আঠারটা মায়া ॥ যত ছানা, তত দেনা ॥ ছানাব লে ছানার গু ভারী ॥ কলের ছানা গলে, ধূলার ছানা বলে ॥ ঘুমা'ল ছানাব কিসের ভাগ ॥ যে-ছানা কাঁদে না, সে ছানা দুধ পায় না ॥ পুত থা'কতে আঁটকুড়া ॥ হওয়া পুতে আঁটকুড়া ॥ ঘরেউ ভাত নাই, মায়েউ পিঁটেছে ॥ কলের শভা ছানা, কানের শভা সনা ॥ ছানা হাগে বাঁ'চতে, বুঢ়া হাগে ম'রতে ॥

ঝাড়খণ্ডের পরিবারে বধূর জীবন যে অত্যন্ত যন্ত্রণার ছিল, তা আমরা অন্যত্র বলেছি। প্রতিনিয়ত গালি-গালাজ, ব্যঙ্গবিদ্রূপ তো ছিলই, তার ওপর ছিল শারীরিক নির্যাতন ; এমন-কি ক্ষুধার অন্নও তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হত না। অত্যাচারে নিগ্রহে অতিষ্ঠ হয়ে তাই অনেক সময় বধূ গোপনে পিত্রালয়ে পলায়ন করত। প্রবাদের মধ্যেও বধূব যন্ত্রণাজর্জর রূপটি সহজেই নজরে পড়ে।

৫৯-৬৬ কাজে নাই পাইটে বহড়ী, লাউ কা'টতে দৌড়াদৌড়ি ॥ কলির বহু ঘরভাঙানি ॥ থাক বিটি সহেঁ, সব যাবেক বহেঁ ॥ বাদলে-বাদলে বেলা যায়, ছচরা বহু তিনবার খায় ॥ বউ বিরাল মাঁছি, তিন নাই বাছি ॥ আসরে না পাঁই ঠাঁই, ঘরে আসি মাগীকে কিলাই ॥ যাকে ঘর করাব নাই, তাকে দিয়েঁ বরাবর রাইতে উখু'ন দেখা করাব ॥ বউ পালালে ঠেঁগা ধর্যো কি লাভ ॥

জামাই পরিবারেরই একজন হলেও জামাই-এর প্রতি আদর কিংবা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সামাজিক চিন্তাভাবনার একটি বিশিষ্ট চিত্র প্রকাশ পায়।

কন্যার মঙ্গলামঙ্গল জামাই-এর মেজাজমর্জির ওপর নির্ভর করে, তাই জামাই-এর আদর না করে উপায় নেই ; অন্যদিকে জামাই পরিবারবহির্ভূত লোক এবং কন্যার অপহারক হওয়ায় পরাজিতের বেদনা লুকোবার জন্য তাকে রঙ্গব্যঙ্গ, শ্লেষবিদ্রূপ এবং বক্রোক্তির তীক্ষ্ণ আঘাতে জর্জরিত করা হয়। প্রবাদে এ-আঘাত অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে।

৬৭-৭০ ঝি-জামাই বাঁকা কাঠ॥ জামাই-এর ভাই খঁজা বলা॥ যা'চলে জামাই খায় না, রুটি, সকাল হলে ঢেঁকি চাটি॥ ভাদর মাসের খরায় ঘরজামাইয়া পালায়॥

প্রবাদে মামার ভূমিকাও মোটেই শ্রদ্ধেয় নয় এবং তীব্র বক্রোক্তিই মামার ভাগ্যে জুটে থাকে।

৭১-৭২ ছুঁই যায় নাই মামু, বুলে ছামু ছামু॥ মামাঘর-উ যা, ডুম'র তল-উ তা॥

প্রবাদের রচয়িত্রী হিসাবে নারীর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। নারীই নারীর চারিত্রিক দুর্বলতার খবর রাখে বেশি। তাই নারীর নিষ্ঠুর সমালোচক নারীই হয়ে থাকে। নারীর আচার ব্যবহার, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যঙ্গ-কৌতুকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রায়িত হয়েছে প্রবাদে।

৭৩-৮১ ঝুড়ি কাঠের রাঁধনা, রাঁড়ী মেয়্যার কাঁদনা॥ ঠিটি ছ্যাল্যার বা'ড়, কর'ল বাঁশের বা'ড়॥ ইয়ায় নাই উয়ায় দড়, ঢররা চইখে কাজল পর॥ চোর ছিনার মুখে দড়॥ কামারিনের ছানা হল্য, কুম্‌হারিন ডা'ল ভাত খাল্য॥ সরষা বাড়ে ফুলে, মায়া বাড়ে ছুলে॥ বৃন্দাবনে সবাই সতী নাম কিনেছেন রাই॥ আ'খ বাড়ির শিয়াল রাজা বনের রাজা বাঘ। বেহা ঘরে মেয়্যা রাজা সমান খুজে ভাগ॥ ভাত দিবার ভাতার নাই, কিল মারার গুসাঁই॥

ঝাড়খণ্ডের পরিবারজীবনে কুটুম্বের স্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তার আদর-অভ্যর্থনা তাই যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গেই করতে হয়। এর ফলে গৃহস্বামীর যথেষ্ট খরচপত্রও হয়। তাই প্রবাদে বিমিশ্রভাবনায় কুটুম্ব চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে।

৮২-৮৮ কুটুমের লাগি মরালি হাঁস, ছানার পনার সবারেই মাঁস॥ অতিথ আনে নাখে দড়ি, কুঁচ্যা খায় শালের বাড়ি॥ সাঁঝের কুটুম বজ্রাঘাত॥ লিলজ কুটুমকে বিহুন ধানের ভাত॥ আলে গেলেই কুটুম, নিত

ভাঁওয়রে চাষ ।। আঘা'ল কুটুম ভাগ্যে মিলে ।। বাঁধ লক্ষ্যে চাষ, কুটুম লক্ষ্যে বাস ।।

পরবর্তী প্রবাদগুলোতে রাজা-প্রতিবেশী, ধনী-দরিদ্র আদি সম্পর্কে সরস মন্তব্য করা হয়েছে।

৮৯-১০৫ আগুনে নাই মানে অদা, রাজা নাই মানে দাদা ।। রাজা-উ দাদা, ন আগুন-অ অদা ।। রাজা বাদী ঘর চলে, পড়শী বাদী ঘর চলে না ।। দে'খব রাজার হড়বড়ি, নাই ত দিব গড়বড়ি ।। রাজার বাগানের আম, বাঁদরে-বাঁদরে ছাড়া-কামড়া ।। রাজার পাদে গন্ধ থাকে না, পরজার পাদে থাকে ।। আপনার গাঁয়ে কুকুর রাজা ।। আ'জ রাজা, কা'ল ফকির ।। পড়শী নাই যুথা, চাঁপ ছাড়বি তুথা ।। ঘচ্‌ট'লকে খামচ'ল, নেঙট'লকে চিপক'ল ।। যার গায়ে লাল গামছা, তার কথা গুড় খা'' মচা ।। যাহার গায়ে নাই কানি, তাহার কথা নাই মানি ।। গরীব লক ফড়িং খায়, ঘড়ায় চড়্যে জল ঘাট যায় ।। গরীব লক মাদার পায়, ঘন ঘন দরবার যায় ।। গরীবের রাগ পেটে পচে ।। নিতভকাকে দেয় কে ।। নিধন্যার ধন হলে দিনে দেখে তার ।।

আত্মচিন্তা, নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথা সবাই ভাবে। পরের সম্পদদর্শনে এবং উন্নতিতে ঈর্ষ্যাবোধ করা, সমালোচনা করা মানবসমাজের অতি সাধারণ ঘটনা। তাই অম্ল-মধুর রসে জারিত হয়ে এইসব চিন্তাও প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। আসলে প্রবাদে অন্যের দুর্বলতা, লোভ, ঈর্ষ্যার প্রতিই কটাক্ষ করা হয়।

১০৬-১২৯ নিজের কথা বললে নিজেকেই পরাচিত ক'রতে হয় ।। নিজের জীবন পরের ধন, সবাই দেখে ।। আপনার চু'ল বাঢ়ুক, পরের চু'ল পুড়ুক ।। আপনার বুইধে তরি, পরের বুইধে মরি ।। আপ রুচি ভজন, পর রুচি শিঁগার ।। আপনার কুঢ়া'র, আপনার ঘাড়ে ।। আপনার ঘড়ার ঘাঁস, কা'টতে কিসের লাজ ।। ই বাঁ'হি কামড়ালেউ দুখায়, উ বাঁহি কামড়ালেউ দুখায় ।। উপর দিগে মুঁহাঁই থুঁ'কলে আপনার মুঁহেই পড়ে ।। নিজে না ম'রলে কেউ স্বরগে নাই যায় ।। পরের দেখি করি হায়, যেউ থাকে সেউ যায় ।। পরকে হাজার কর পর লয় ভাল, দুধে আঁগার গুল দুধ লয় কাল ।। পর জর উনহানে নিয়ে ভর ।। পরের মুড় ছাতারের কুড়, বুক করে দুর দুর ।।

ধান কু'টলে চা'ল হবেক, পরের নিন্দা করো কি হবেক ॥ আপনার গুণ জানে নাই খেদী, পরকে বলে চেপানাথী ॥ পরের বরহাবাড়িএ বাঁদরে বাঁদরে লড়াই ॥ পরের ধনে বরের বাপ, লুট্যা লিলেই মনস্তাপ। পরমন্দয় পুরী ক্ষয় ॥ আনলকের আন চিন্তা, কুলকের কুচিন্তা ॥ পরের ধনে পদ্মানী ॥ পরের বাগে ভুঁয়ে খাত ॥ চাল'নের পদ ঝরঝর করে, চাল'ন পরের বিচার করে ॥ খায় নিন্দা পরের চাটা।

ধনসম্পত্তি, টাকাকড়ি-সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবাদ—

১৩০ ১৪৬ টাকা ফাকা ॥ হাতে নাই চ'দ্দ কড়া, মিনসা যায় নেকরা পাড়া ॥ হাতে নাই পয়সাকড়, মশায় যাছে সেকরা বাড়ি ॥ অলপ ধন, বিকল মন ॥ ধন যাই বাউডানির যাবে। অল্প ধনে মাহাজনি করে, খাতক থা'কতে মাহাজন মরে। লিকড়ি যাব হাট, হাট দেখি হিয়া ফাট ॥ কড়ি আর দড়ি, এই গিনাই কাচ দয়। ফেল কড়ি মাখ তেল, তুঁই কি আমার পর ॥ দে পয়সা, বুগলী খসা ॥ টাকার বেটা, পাথর কাটা ॥ পাচ টাকায় কুহলা গাই, বকনা বাছুর, চার পাই দুধ ॥ হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না ॥ হাতে নাই পয়সা কড়ি, লাড কাটতে দৌড়াদৌড়ি ॥ মন আছে ত ধন নাই, ধন আছে ত মন নাই ॥ সনা ভাগে হাজার বার, মানুষ তোলে একবার ॥ ধনের মধ্যে ধন, তিন সুড়া শণ, হ বণ আর উ বণ ॥

ভাগ্যাভাগ্য দৈবচিন্তাও প্রবাদের বিষয় হয়ে থাকে। কখনো কখনো এর মধ্য দিয়ে লৌকিক ধর্ম প্রকাশ পায়, কখনো নীতিকথা আভাসিত হয়ে ওঠে কখনো-বা সতর্কতাবাণী উচ্চারিত হয় ॥

১৪৭ ১৮০ এক কথা দুই বল, লও ঠাকুর ফল জল ॥ ঈশ্বরের মার ক্ষুরের ধার, নাই দিলে নাই নিস্তার ॥ ধরণ মরণ পানী, সহদেব বলে এ তিন না জানি ॥ নিশাসে বিশ্বাস কি ॥ হব্যার ধন হর্যা লিল, মটকা-মটকি সার হল্য ॥ যা ছিল গুঁড়িবাঁড়ি, সব লিল হর্যা গুঁড়ি ॥ কপালগুণে কাপাস ফুটে ॥ ঠাকুরের ক'রতে বদার জাহিরা বেশি ॥ যে খায় চিনি, তাকে দেয় চিন্তামণি ॥ যার যখন চলে, মুতে বাতি জ্বলে ॥ লাড়ু খাছি স্বরগ যাছি ॥ স্বরগ যাব, লাড়ু

খাব ॥ ঝাড়া গোলক বিন্দাবন, হেসেন মটা মুলা দরশন ॥ রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে ॥ জীউ মরে আপনার দষে, কি ক'রবেক হরিহর দাসে ॥ যেমনি গুরুর তেমনি চেলা, মাগে হত্তকী দেয় ভেলা ॥ লণ্ড গুরুর ভণ্ড চেলা (আন্ধা গুরু বা'হরা চেলা) মাগে গুড় ত লায়ে ঢেলা ॥ খাটুয়াকে ভগবান নাপুয়া ॥ তেল দে'খলেই দেব্‌তা, হাল বা'হলেই ঢেলকা ॥ হাল বা'হলে ঢেলা, তেল দে'খলে ভূত ॥ তুরুৎ দান মাহাপুণ্যি ॥ যত দান, তত মান ॥ নি-খাওয়ার ধন স্বরগ॥ নি-সাথীকে ভগবান সাথী॥ মা'নলে শিব না মা'নলে পাথর॥ যে জীউ দি'য়েছে, সে আহার দিবেক ॥ যে ঠিনে জল, সেই ঠিনেই গঙ্গা ॥ হুড়মুড় যাত্‌রা, যা করে বিধাতা ॥ হেঁতরূপী ভগবান ॥ কলি যুগে ধর্মের পঁদে শূলি ॥ যা থাকে কপালে, তাই হবেক সকালে ॥ সবার দুয়ারে টঙ্কা টঙ্কা, গুরুর দুয়ারে লবডঙ্কা ॥ যা দেখি নাই নিজের নয়াণে, পত্তুক না যাই গুরুর বচনে ॥ সুমকে গরাম ডরায় ॥

মানবচরিত্রের মতো মানবসমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণ অবলম্বন করেও বহু প্রবাদ রচিত হয়েছে। ঢেঁকি মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ঢেঁকির আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই সম্ভবতঃ মানবজাতি সর্বপ্রথম যন্ত্রসভ্যতার গোড়াপত্তন করে। ঢেঁকি সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

১৮১-১৮৯ আলয়মালয় দিন যায়, বা'ত হলে ঢেঁকশাল যায় ॥ আঁলয়মালয় দিন যায়, রা'ত হলে ঢেঁকি বাটে ॥ দিন গেল আলহে মালহে, সাঁঝের বেলা ঢেঁকি চাটে ॥ ফপরা ঢেঁকির আওয়াজ বেশি ॥ ঢেঁকশাল যাবি, ন পাটরা কুঁড়া খাবি ॥ সাধে কি কুকুর ঢেঁকশাল যায় ॥ ঢাপার টুপুর কার? আউস ধান যার। এমন ক'রলে হয়? মাথা কুটলেউ লয় ॥ ঢেঁকি স্বরগে গেলেউ ধান কুটে ॥ ঘরের ঢেঁকি কুম্‌হীর ॥

গরুবাছুর ছাগল-ভেড়া আদি গৃহপালিত জীবজন্তুও প্রবাদের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সব জীবজন্তুর চারিত্রিক গুণাগুণ প্রকাশ পেয়েছে, কখনো বা এই সব জীবজন্তুর রূপকে মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিক সমালোচিত হয়েছে।

১৯০-২১৬ রইল বলদা ঘরে, না রইল হালে, তার দুঃখ সব্বকালে ॥ দুধালি গাই এর লাথি-অ সহায় ॥ দুধালি গাই-এর গঁডরানি-অ সওয়াদ ॥ ষাঁড়ে-ষাঁড়ে লড়াই হয়, বাছুরের ঠেঙ যায় ॥ যেমন গরু তেমন বাগাল ॥ বাঢ় গরুকে বাউরী বাগাল ॥ কুঢ্যা গরুব ভিন্ন গঠ ॥ কুটী গরুব ঝুড় আশরা ॥ কুড্যা গরুর ঝুঁড় আশ্রয় ॥ হিঁসাবের গরু বাঘে খায় না ॥ গাই ন গরু, সুখে ঘুমায় হারু ॥ কুল্হুর গরুর আমাবস্যা নাই ॥ গঠে গণায়, পাঘায নাই বাঁধায় ॥ সাঁঝে সাত হাল, সকালে এক হাল-অ নাই ॥ বিকা গরব মুল নাই ॥ বিকা গরুব দাঁত দে'খতে নাই ॥ গরু বুঢালে শিং বাঢে, মানুষ বুঢালে মু বাঢে ॥ মানুষ বুঢায় আঁতে, গরু বুঢায় দাঁতে ॥ গুঢ়ি নিয়েঁ চাষ করে, বুটী নিয়েঁ বাস করে ॥ খাঁকে ছিল তাঁতি তাঁত বুন্তে, গরহ হল্য আঁড়্যা গরু কিন্তে ॥ খুঁটার জোরে কেড়্রু নাচে ॥ দুধে উঠায় ভাত, কাড়ায় উঠায় ঘাট ॥ কাড়ায় কি জানে সুজি ঘাঁটার সওয়াদ ॥ কাড়া মরে হদে, মানুষ মরে মদে ॥ মরা ঘড়ার পাদে-উ লাভ ॥ হাগ ঘড়া পাদ ঘড়া, যাতে হবেক ধমকগড়া ॥ আটে পিঠে দড়, ত ঘড়ার পিঠে চড় ॥

বন্য জীবজন্তু-সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবাদও ঝাড়খণ্ডের লোকমুখে প্রচলিত আছে।

২১৭-২৩৪ মরা হাতী হাজার টাকা ॥ মারি ত হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার ॥ মরদ কা বাত, হাতী কা দাঁত ॥ মাঘের জাড় বাঘের ঘাড়ে ॥ নাচারী বাঘ খাঁকড়ী খায় ॥ বাঘ চিন্হে গপাল ঠাকুর কাড়ার মতন শিং ॥ ভালুকে কি শালুক চিন্হে, চিন্হে গাঢ়ার উইমেকা ॥ লেদা গাছে ভালুক নাচে ॥ শিয়ালের গুয়ে কাজ, শিয়াল বলে আমি পর্বতে হাগি ॥ সোব শিয়ালের একেই বাহা ॥ এক শঁশার বার বাঁসা ॥ খেঁড়া বলে হামার ঠেঙশালকে আলে হামি জল খাব ॥ ছাড়া ঘরে কটাশ রাজা ॥ বড় বড় বাঁদরের বড় বড় পেট, সমুন্দর ডেঁঘিতে মাথা করে হেঁট ॥ মাকড় মরালে ধকড় হয় ॥ এক বাঁদরের মুঁ পু'ড়লে সব বাঁদরের মুঁ পুড়ে ॥ বাঁদরের হাতে শাঁলেগ্রাম ॥ হরিণের শিং-এ মাছি বসে না ॥

গৃহপালিত অন্যান্য জীবজন্তু-সম্পর্কিত প্রবাদ—

২৩৫-২৪৫ ছাগলের দ্বারা উ কি ধান মাড়ান যায়।। ছাগল-অ চ'ববেক, ঠবকা-উ বা'জবেক।। যাহে ঋণ তাহে ঋণ বুটী ভেড়ী কিন।। গঠ ভেড়ী পকাঁই মবে।। কুকুব গু হ খত্, ন ডযাব কহাউ সত্।। চেঁদড় কুকুব বাসাতে ঢুঁকে।। সাধে কি কুকুব পাটব কুঁচা খায়।। বিবালেউ কি দুধ খাতে ছাড়ে।। খড়া বিলাই-এব আবশুলা পথ্যি।। সাধে কি বিবাল গাছে উঠে।। উশাস মাটি বিবালে খুনে।।

ঝাড়খণ্ডেব অত্যন্ত সুপবিচিত কাকপক্ষীব রূপকেও প্রবাদে মানবচবিত্রেব সমালোচনা কবা হযেছে।।

২৪৬-২৫৬ বে"ল পা'কলে কা'খাব ক ভাগ।। কা'ই কুক্কুট কাওযা, নি-ঘাওযাকে কবে ঘাওযা।। ভাত ছড়ালে কাওযাব অভাব?। কান নাই দেখেই কাওযাকে খেদ।। চেঁচই-এব বুতলে আশমান নাই রুখে।। হরবব হই মবে ষাঁড় হাঁস, ডিম খায দাবগাবাবু।। টিযায় খাল্য ধান, পেচাব মাথায ধুমকুম।। চাড়ে মবে পেচা, তালগাছে বাঁধে মাচা।। পেচা পবেব চডবেই দেখে।। আঘা'ল বঘলীব পুঁঠি তিতা।। খাক বঘলী মোন আশে, আম অা'সব কাত্তিক মাসে।।

সাপ-ব্যাঙ সবীসৃপ-কীটপতঙ্গ আদিব বিচিত্র আচবণেব সঙ্গে মানুষেব আচাব-আচবণেব ঘনিষ্ট সম্পর্ক লোকমানসে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ধবা পড়ে। তাই মানুষেব বিভিন্ন আচবণ-প্রসঙ্গে কটাক্ষ বা বক্রোক্তি কবতে গিয়ে প্রবাদে এই সব প্রাণীব রূপকেবও ব্যবহাব যথেষ্ট পবিমাণে লক্ষ্যগোচব হয।

২৫৭-২৭৭ সাপেব লেগা বাঘেব দেখা।। ছট সাপাকে বড় সাপা, বড় সাপাকে বিধাতা।। সাপেব মুখে গঁদ।। সাপ অ মবে, ডাঁগ অ না ভাঙে।। সাপে খালেউ খাবেক, বাঘে খালেউ খাবেক।। বেঙ বিঁধতেউ সনাব কাঁড়।। জুয়ানে বেঁঘ অ চেহ্‌বা।। বেঁঘেড় কি জানে মধুব মবম।। যদি হবে গচই শোল, তাথে বড় গণ্ডগোল।। অতি সিযানেব গলায় দড়ি, কুঁচ্যা খায শালেব বাড়ি।। কেঁকলাসেব দোড়, বাকুণেব মোড়।। পতঙ্গ মা'বতেউ মাতঙ্গ।। উকুন্যা মুড়, পযজাব-খাউকা তুঁড়।। কান তলে উখুনের ডেবা।। কেঁড়বই-এর একটা ঠেঙ ভা'ঙলে নাই বাতায়।। চুঁট্যায় ঢোল কাটে।। ছুঁচা মবালে হাত বাসায়।। বাঁধা খাঁকড়ী ছাল্যাব বশ।। ডাঁডায়

জানে গুড়ের সন্ধান ।। উই উদুর কুজন, গড়া ভাঙে তিন জন ।।
ছুঁচার চাকর চামচিকা, তার মাইনা চ'দ্দসিকা ।।

বিভিন্ন ধরনের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যও প্রবাদের উপজীব্য হয়েছে। বিচিত্র খাদ্য এবং রন্ধন-ভাবনাকে উপলক্ষ্য করে মানবসমাজের বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা, আচার ব্যবহারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২১৮-৩২০ কুথাবার কে, আমড়া খাবে কে ।। কিসের লাগি কি, সলতা শাগে ঘি ।। যেই ধানের সেই চা'ল, বাঁধনী গুণে আ'ল থা'ল ।। ছি ছি কি কুড়চি ফল, ভাত নাই কচি ঝিঙ্গি ডুল ।। থাকুক পিঠা, ভাতেই বাঁধ ।। যে জল বহে, সে কি শঁষে মরে ।। দয়া করি দিই নুন, ভাত মারে তিন গুণ ।। ভজের আগু, রণের পেছু ।। তেল পু'ড়লে ঘি, ঘি পু'ড়লে থাবি কি ।। বাঁদার ভাত গাল উনার ।। পেটে ভক মুখে লাজ, সে বঁধুয় নাই কাজ ।। জালে সংবাদ, ন ঝালে সংবাদ ।। নিযাদিয়া থাবাথাবি, খাওয়া-দাওয়া ভায়া-চাবি ।। নাই কাজ, ত খই ভাজ ।। খই-অ জলপান, তাতি-অ মুনিস ।। পুরা চা'ল ভাতে বাড়ে ।। যার জন্য প্রাণ কাঁদে, ধান ভাঙে ভাত বাঁধে। যার জন্য প্রাণ কাঁদে না, চা'ল থা'কতে ভাত বাঁধে না ।। ভকে না মানে কাঁচা, ঘুমে না মানে অদা ।। ভাত আর কাঠ ফুরালে জগান দিয়া মুস্কিল ।। ভাত ফুরালে ধার মিলে, কাঠ ফুরালে ধার মিলে না ।। বেহা নবে মাড় ভাত বলি কে জানে ।। পালে খাই, না'হলে পাররণে খাই ।। যে ভাত বাঁধে, সেই তরকারি পায় না ।। আদে 'গলায় পায় চকায় মকায় খায় ।। থাবার লক অনেক, ক'ররার কেউ নাই ।। আম খাবি, ন ই, জাম খাবি, ন ই ।। ভুলে ভালে পাইকারি, ঝোলেঝালে তরকারি ।। যমের মুঁহে পিঁড়রা ভাজা ।। পেটে আছে হালি, দাঁতে ঠেঁকছে বালি ।। আঘা'ল পেটে অমৃত-অ তিত' ।। গলায় পালে বিষ খাতেউ রাজি ।। ভাজা খালে তেলের খরচ ।। সঝা আঙুলে ঘি নাই উঠে ।। ভাতকে টানটান, পিঠাকে ছ মণ ধান ।। সময়ের শিঁগার, আকালের ভাত ।। ছানাম-পনায় মাসের পিঠা ।। খাব ত পেট ভরি, শুব ত খা'ট ভরি ।। ব'সলেউ ভাত, চ'ললেউ ভাত ।। মদনমহন ঘি পায় না, ভালুককে সাড়ে সাত মণ ।। উদ খাতে খুদ নাই, শেলে বাজায়

শিঁগা ।। ছুতার বড় বন্ধু, ধান দিলেই চিড়া ।। মাঠে গঠে নাই ধান, কিসের অত মুসিয়ান ।।

ঝাড়খণ্ডের জনজীবন একান্তভাবে কৃষিকর্মের ওপর নির্ভরশীল। আমরা অন্যত্র বলেছি, এখানকার লোকভাবনা সন্তান-কামনা এবং শস্য-কামনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। তাই কৃষিকর্ম ঝাড়খণ্ডী জনতার জীবনচর্যার অঙ্গবিশেষ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। কৃষিকর্মের বহু অভিজ্ঞতা প্রবাদে বিধৃত হয়ে আছে। ব্যবহারিক জীবন থেকে আহৃত এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে ঝাড়খণ্ডী কৃষকদের বিশিষ্ট ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে কৃষি-সম্পর্কিত প্রবাদে সব সময় যে ব্যঙ্গ শ্লেষ বা বক্রোক্তির ব্যবহার হয়, তা নয়; কোন কোন প্রবাদে ঐতিহ্যানুসারী কৃষি-অভিজ্ঞতাগুলো সরাসরি রূপ লাভ করেছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, প্রবাদের বিশিষ্ট ধর্ম অন্তর্মুখী-নতার পরিবর্তে এই সব প্রবাদে বাহ্যমুখীনতাই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাই বলে এগুলো প্রবাদ নয়, এমন-কথা বলা ঠিক নয়। ব্যবহারিক জীবনের বহু অভিজ্ঞতা এই সব প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে বলে এগুলোকে প্রবাদ ছাড়া অন্য কোন নামে চিহ্নিত করা সঙ্গত নয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ঝাড়খণ্ডে খনার বচন বা ডাকের বচনের প্রচলন নেই। অধুনা পাঁজি-পুঁথির কল্যাণে স্বল্পশিক্ষিত দু'চার জন গৃহস্থ কৃষকের মুখে এ-জাতীয় বচন এক আধটা শোনা যায় মাত্র। কৃষিসম্পর্কিত কতকগুলো প্রবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল। এগুলোতে জমি তৈরী, বীজ বপন, ফসলের পরিচর্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে, এমন-কি কৃষক সম্পর্কেও কিছু অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে।

৩২১ ৩৪২ থাঁকুয়াই চষি ঘর নাই পশি ।। চাষে রূপ নাশে ।। পেট কহ কহ আক্কাই ডাকে, শুকনা ধানে বাদল ডাকে ।। যে আইড চষে সেই রইল বসি, নাঢ়াকাটা মা'রল ঠাসি ।। নিত্ ভাঁওয়রে চাষ ।। চাষীর চাষ, মুসলমানের পরবাস ।। অলপ চষি, বিস্তর ঘঁষি ।। শ সনলা হাজার কলা, কি ক'রবেক আকাল শালা ।। ভা'গমানের আ"খ বাঢ়ে, অভাগার ধান বাঢ়ে ।। যার আ"খ তার গুড়, কুঁড়াসুবা পেঁড চুষ ।। নাঢ়া মার খায়, গুমস্তা হেঁস্রে ।। আগে বঁদ, পরে খঁদ ।। বঁদ গুণে খঁদ ।। বাইগণ বাড়ির লঙ্কাউ ঝাল ।। মাটি লক্ষ্মী কপাল গুণে থাকে ।। আশায় মরে চাষা, ধিয়ানে

মরে ঘুগী ।। খড় নাই, আবাদ খায় ।। বাপের কালে নাই চাষ, ধানকে বলে দুব্বা ঘাঁস ।। অবলার সঁগে চাষ, অদেখার সঁগে ঘরবাস ।। আদা বাড়িটা কাদা হবেক, বাইগন বাড়িটা ভাঙ্গে যাবেক ।। শালের ধান গলে, বাইদের ধান গাইদ ।। জল প'ড়ছে গাইদে, ধান লাগাব বাইদে ।।

প্রবাদের চলনভূমির সমাজ বা লোকজনের সামগ্রিক রূপ প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রবাদ যে-কোন অঞ্চলের সমাজজীবনের দর্পণবিশেষ। প্রবাদে লোকভাবনা অকপটে নিরাবরণ ভাষায় প্রকাশ পেয়ে থাকে। মানুষ-জনের রুচি, রসবোধ, নীতিবোধ এবং জ্ঞান প্রবাদে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই প্রবাদে কোনরকম সংস্কার বা শব্দব্যবহারে বিন্দুমাত্র দ্বিধার ভাব পরি-লক্ষিত হয় না। প্রবাদ-রচয়িতা অশ্লীল, গ্রাম্য বা ইতর, যে কোন শব্দই হোক না কেন, নির্দ্বিধায় সাবলীল ঢঙে সে শব্দের ব্যবহার করেছে। আমরা অন্যত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা নিতান্তই আপেক্ষিক বস্তু; একই বস্তু বা ভাবনা এক সমাজে শ্লীল, অন্যসমাজে অশ্লীল বিবেচিত হতে পারে। যে অঞ্চলের লোকসাহিত্য আলোচনা করা হবে, অশ্লীলতার অভিযোগ তোলার আগে সেই অঞ্চলের রুচি এবং রসবোধের আলোচনা এবং বিচার প্রথমে করা দরকার। ঝাড়খণ্ডের লোকমানসে তথাকথিত অশ্লীল এবং গ্রাম্য বস্তু বা ভাবনা খুব একটা বিকারের সৃষ্টি করে না। নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদগুলোতে তথাকথিত 'অশ্লীলতা' এবং 'গ্রাম্যতা' নির্বিকার প্রকাশ লাভ করেছে; এ-জাতীয় কয়েকটি প্রবাদ ইতিপূর্বে অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৩৪৩-৩৬১ পঁদে নাই চাম, সেনাপতি নাম ।। দিতে ন থুতে, চঁগা ধরি মুতে ।। রাগে হা'গলে নিজেকে ফে'লতে হয় ।। হাগায় না মানে বাঘা ।। লিলজের পঁদে গাছ বা'হরালে লিলজ বলে আমার ছাঁ'হবা হছে ।। হা'গতে জানে নাই বন্দুক ঘাড়ে ।। মড়া-উ কি পাদে ।। বুঢ়া পঁদেও আসন লাঠা ।। পঁদে নাই টেনা, রাম সিং-এর বেনা ।। পঁদে নাই ছালচামড়া, খাতে খুজে পাকা আমড়া ।। ব'সতে দিলম পিঁঢ়া, পঁদে লা'গলঁ শূলা ।। ধাইকেউ পেঁদের কথা ।। যার যখন চলে, মুতে বাতি জ্বলে ।। অভাগায় মাগ পালে বাসে মায়ের পারা, নিভাতারী ভাতার পালে বাসে

বাপের পাবা ।। লিখ্যে দিল্যম কলাপাতে, পঁদ মাবাব পথে-ঘাটে ।। অড়তল বড়তল, সেই বুঢ়িব পঁদতল । পঁদ নেংটা, মাথায় ঘংটা ।। হা'গব চ নাই বাট অ ছা'ড়ব নাই ।। হাগন্তিব লাজ নাই ত দেখন্তিব কি লাজ ।।

কিছু কিছু প্রবাদে বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে সরস মন্তব্য শোনা যায় । এগুলোর মধ্য দিয়ে কিছুটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ য প্রকাশ পায় না, তা নয়, তবে এগুলোর মধ্যে যে ঐতিহাসিক বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না, এমন কথাও ঠিক নয় । সত্য কথা বলতে কি এইসব সম্প্রদায়-ভিত্তিক প্রবাদে প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই প্রকাশ পায়—নিছক বিদ্বেষ এর উপজীব্য হয় না । চারিত্রিক দুর্বলতা, বিচিত্র আচরণ ইত্যাদির প্রতি বক্রোক্তি করা হয়েছে, কখনো-বা সরাসরি বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যক্ত করা হয়েছে । সমতল বাংলা থেকে আগত ব্রাহ্মণ, তেলী, বণে আদি সম্প্রদায় সম্পর্কেও প্রবাদে সরস মন্তব্য করা হয়েছে—

৩৬২ ৩৭৬ কানা গরু বামুন দান, বামুন বলে আন আন ।। বামুন গেল ঘব, লাঙল তুলে ধর ।। লম্বা বনা গাছ, সুতা-বেধা মানুষ ।। গঙ্গার নাই ঘাট, ব'স্টমের নাই জাত ।। জাত গেলেই ব'স্টম ।। ব'স্টম টম টম হাঁড়িব ভিতর পৈতা বাখ্যে খুকড়া খাবার মন ।। সকাল সিনান বিকাল ভাত, কেবে জানাব বাম্না জাত ।। জাত বাঙালি, নিঠুর তেলী ।। মোল্লার দোড় মসজিদ তক ।। এক উড়িয়ায় গা উজড়, এক ঝাড়ুয়ায় বন উজড় ।। যুগির ঘরে ঢেঁকি, যুগি ম'রছে বকি ।। শুঁড়ির সঙ্গে চলবি হাট, হাতে লিবি জুমটা কাঠ ।। অতি লভে তাঁতি মরে ।। তাতি-অ কি মুনিস, ন খই-অ জলপান ।। তাতি বকা ।।

ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল কুর্মি-কামার-কুমোর মুচি আদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপ-জাতিগত বৈশিষ্ট্য, বিচিত্র রীতি-সংস্কার, আচার-আচরণও প্রবাদে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে ।

৩৭৭ ৩৯৬ সাঁওতালের বাগ, কাড়াব বাগ ।। মাঝি পাজিব ছা, ঝাঁপ দিই দিই চুনহাকে যা ।। গোড় হোড় কড়া, তিন ধর্ম ছাড়া ।। কু কুড়মি, তিন সাঁওতাল ।। কল কুড়মি কড়া, বেদবিধি ছাড়া ।। টাঁড় কুড়াম লেটেপেটে ।। কুড়মি আর্জে চিনি, খায় পানী ।।

বাঁশ বনে ডম কানা।। নাপিতের ঠেউ ছাপিত।। নাপিত দেখলেই নখ বাড়ে।। নাপিতের আশি, ধরার বাসি।। ফাটে ফুটে ধরার কি।। নদী পাইরালে কুঁড়টা বাজা।। মুচির শাপে কি ডাংরা মরে।। তাঁতি কামার মুচি, তিনের কথায় মুতি।। তাঁতি কামার কুম্হার, এ তিন বড় ছিনার।। কুমহারের ঠাকার ঠুকুর, কামারের এক ঘা।। কন কামে কামার ব্যস্ত।। খাড্যা বাঁড্যা।।

একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করবার জন্য প্রবাদে অনেক সময় কয়েকটি সমধর্মী চিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে প্রবাদের বিশিষ্ট ধর্ম বক্রোক্তির চেয়ে সরসতার প্রাধান্য দেখা যায়।

৩৯৭-৪০৬ গাছের মধ্যে তুলসী পাতের মধ্যে পান। তিরির মধ্যে রাধিকা পুরুষ ভগবান।। ঘরের শভা আঁচর পাঁচির খেতের শভা ধান। কলের শভা শিশু ছাল্যা যেমন লৌতনচাঁদ।। চাবা চিনহায় আইড়ে তাঁতি চিনহায় পাইড়ে। ভাতার-ছাড়া মাযা চিনহায় খাচার-খিচির চাইলে।। মাছের মধ্যে রুই, শাগের মধ্যে পুই, ছাতুর মধ্যে উই।। জাড়ের মজা ছিঁড়া কাঁথা রোদের মজা ছাতা। বুঢ়ালে পিরিতের মজা মাথায় পানকাঁটা।। মুঢ়ির মজা নুনলঙ্কা ভাতের মজা ডা'ল। যৌবন পিরিতের মজা আঁখি ঠারাঠারি।। হাঁড়িকে বেড়ি ছুঁড়িকে শাড়ি, ছঁড়াকে সাজে নিশি দাঢ়ি।। জনহা'র পড়ায় দাঁতের বড় খুশি, মাছপড়ায় খাওয়ায় তুটি বেশি। চা'ল ভাজা খাতে মজা দেখতে মজা মুড়ি। এক ছাপ্যার মা ক'রতে মজা দে'খতে মজা ছুঁড়ি।। ছাগলবাগাল কানকেটা বা ভেড়াবাগাল গাধা। ম'ষ বাগাল হিটিং টিড়িং গরুবাগাল রাজা।।

কখনো কখনো প্রবাদে কোন কোন স্থানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে কটাক্ষ করা হয়। সব সময়ই যে এগুলো অভিজ্ঞতা প্রসূত হয়ে থাকে, তা নয়, বরং কৌতুকরস সৃষ্টিই যেন এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে ব্যঙ্গ-বক্রোক্তির ঝাঁজ যে একেবারেই থাকে না, তা'ও নয়।

৪০৭-৪১২ ভিতর ভংভং দুয়ারে কুলুপ, তবে জানবি শিলদা মুলুক।। মুখে পান মাথায় চাদি, তবে জানবি মাটিয়াবাঁধি।। থাঁকে ঠেকা

মাথায় বাটি, তবে জানবি পাথ্‌রাঘাটি ।। পাইটা ডাগব মুখে দড়, তবে জানবি নরসিংগড ।। মুখে পান হাতে চুন, তবে জানবি মানভূম ।। কুষ্ঠ আব ফাইলেরিয়া, এই নিয়ে পুরুলিয়া ।।

রচনাশৈলীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাদ লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে নিঃসন্দেহে সংক্ষিপ্ততম। স্মৃতিতে সংবক্ষণের জন্য এবং প্রয়োজনমতো প্রয়োগের জন্য প্রবাদের সংক্ষিপ্ত হওয়াটা একান্তই আবশ্যক।

৪১৩-৪৬০ কবু নাই গম্‌হা, আ'জ পুন্নিমা ।। যার হাত, তার পাত ।। সব কথা ধুর, ফকিরার মা ঘুর ।। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপান্ন ।। চোবের রাগে ভুঁয়ে ভাত ।। যাকে কবি হীন, সেই রাখে দিন ।। মবদ বড যধা ।। মনে নাই পাপ, কিসেব সন্তাপ ।। ফুলা মরে জাড়ে ।। শগডেব পাটি তল উপর ।। দশ লাগে, ত ভূত ভাগে ।। নিত্‌ রুগীকে অষুদ কত ।। একা নদী ষোল কশ ।। সোলুকে মুলুক মারে ।। রকা কাম, চখা দাম ।। চোরকে-উ শিঁকা বাঁহুক ।। ভূতের-অ জনম দিন ।। দুশমনকে-উ উঁচু পিঁঢ়া ।। দেশ গুণে ভেঁশ ।। ছিঁডে ফাটে মিঞা জানে। শালুক-চিন্‌হা গপাল দাস ।। ভাঙা জুঁয়া'ল গরাম থান ।। যত জাঁক, তত ফাঁক ।। হববর তিন তের ।। অনা কথা ভেডের ভেড়ের ।। লুডি বুডি থুড়ি, থুডি বুডি লুড়ি ।। আকালের মেঘ সকালে ।। ইঁচলি দিয়েঁ শোল বাঝা ।। উথ'লে খুট খুট, তেলাই-এ খুত খুত ।। ক'রতে লাবি কিছু, থাকি সবার পিছু ।। কান টা'নলেই মুড আসে ।। কানার লে জিরপা ভাল ।। গাছের ছাহা, মানুষের রাহা ।। ধুবকে শল-অ ভারী ।। ধূরের মরণ পাশ ।। পরকে অঝা, ঘরকে বঝা ।। পাগের উপর কলগা ।। যত ফুড়রে, তত থড়রে ।। বতর পাইরালে বছব পাইরায় ।। বাঁশ মরে ফুল্যে, মানুষ মরে বুলেঁ্য। বে'ট হালকে কাঠের ফাল ।। লহায় লহা কাটে, জা'তে জা'ত কাটে ।। হরে দরে একেই হাঁটু ।। হাথের আলিসে মচ বাঁকা ।। মারের লে ধাকান বেশি ।। বিটির নাম চাঁপা ।। গাঁ সম্পর্কে মুচি কাকা ।। না'চতে জানে না মাদল্যার দষ ।।

প্রবাদের মধ্যে মিল অনুপ্রাস যেমন দেখা যায়, তেমনি গদ্য-পদ্যের ব্যবহারও

সবিশেষ লক্ষ্যগোচর হয়। প্রায়-গদ্য প্রবাদের প্রথম শব্দের সঙ্গে শেষ শব্দের মিল আমাদের এর ছন্দোবদ্ধতাব ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। ছন্দোবদ্ধ প্রবাদের মিত্রাক্ষর রচনার সৌষ্টবও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৪৬১-৪৭৮ গজথপ থালভরা, কামের বেলায় আঁচল-ধরা।। হাতের লাঠি, পথের সাথী।। আঁগা গুণে পাঁগা, লহা গুণে ট্যাঁগা।। নিজের নাই খাতে, খাঁদার মা সাথে।। হাজারে গুজার নাই।। পরের দেখি করি হায়, যেউ থাকে সেউ যায়।। সঙ্ দষে, লহা ভাঁসে।। যদি চলে মনহারী, কি করে জমিদারি।। আঁধার ঘরে দিনের আল, যৎক্ষণ জ্বলে তৎক্ষণ ভাল।। সাঁজে সঞ্ঝা সকালে ছড়া, তবে হবেক লক্ষীর গড়া।। দোস্তী ক'রতে ক'রতে কুস্তি।। রঙ ক'রতে ঢঙ।। কাটে-কুটে কাটিয়ার, লু'ট্যে খায় বান্নুয়ার।। মার মার, ন পগার পার।। বাইদ চাষা বকন্নাসা।। মাগনার উপর চাখনা।। নাই কাম, ত ধান ভান।। আঁটকুড়ার ধন কাট কুড়ে।।

প্রবাদে সব সময় সমিল ছন্দের ব্যবহার হয় না। ছন্দ কিংবা মিলহীন প্রবাদের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তা ছাড়া নিরক্ষর জনতা প্রায় সময়ই ছন্দোবদ্ধ প্রবাদের প্রয়োগ করতে গিয়ে গদ্যে রূপান্তরিত করে ফেলে। প্রবাদ গদ্যে রচিত হলেও প্রবাদের বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে।।

৪৭৯-৫১৮ ন মন লহা তা'তবেক, ন রাধা না'চবেক।। ঘর ভা'ঙলে শুই, সিঁদ দিলে ভং।। রাগের গুরুগুঁসাই নাই।। পাথরে পাঁচ কিল, কি ভাতে সাত কিল।। গাঁ যাওয়া, গাছ চঢ়া।। পেটের বলে বল, ন বাঁহির বলে বল।। লোম ব'াছতে কম্বল ফাঁক।। বাইগন বস্তায় স'রষা ধ'রবেকেই।। আঁকাডা চা''লের মধ্যে দকান।। জল ঠেঁগালেউ কি ধূরে যার।। যার না'পতে নাই, তার পাইটা ডাগর।। চালের কুমড়া-উ চালকে ভারী?।। উয়ার এক হাত সনা এক হাত রুপা; উয়ার সঁগে কি?।। ভাব জিনিষটা বেশি দিন থাকে নাই।। গড়া কাটি ডগায় জল।। গলা ক'রতে ভেঁহগা রাস্তা।। এক গাঁয়ে কি দুদিন আমাবস্যা।। ফি ডুবেই কি শালুক।। নাখে কাজ ন বাসাতে কাজ।। কানার ঠেঙ চঢ়ায় পড়ে।। হাল

ছাড়ি বেলার বাট ।। এক হাতে মাদ'ল বাজে না ।। আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত ।। গরজ বড মরদ ।। চাকরি নকরী জলের তিলক ।। ধীর পানী পাথর কাটে । দিন যায় কথা থাকে ।। দিন গেলে ঋণ কে থায় ।। না রহে বাঁশ না বাজে বাঁশরি ।। পারি লারি মুহে কেনে হারি ।। যা'চতে গেলে মাণিক হীন ।। পচা আদার ঝাল বেশি ।। সমের ধন শয়তানে থায় ।। গায়ের বাসে ভূত পালায় ।। গাছে ঘুধি হিড ফাট ।। গাঁ বড, তার উপব কুল্‌হি ।। কুঢ়্যা খুজে আইডতল ।। ছাপর বনের টুই উদাম। জলের সময় জল সুয়াদ ।। খই থাতে ভগা ল'ডছে ।।

কিছু কিছু প্রবাদ মাত্র দু'টি শব্দের সংযোজনের ফলে রচিত হয়ে থাকে। এই জাতীয় প্রবাদই সম্ভবতঃ সংক্ষিপ্ততম হয়ে থাকে। দু'টি বিপরীত মের্ম্র শব্দের মধ্যে বক্রোক্তির সাহায্যে ভাবসামঞ্জস্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। শ্লেষের তীব্রতাও সহজেই আভাসিত হয়ে ওঠে।

৫১৯-৫২৮ চাবা আর ভুঁষা ।। মডা আর মাডা ।। মাটি আর মা-টি ।। ছানা আর পনা ।। বকা আর পকা ।। ছাকড় আর মাকড ।। হাতি আর লুথি ।। একা আর বকা ।। কথা আর কাঁথা ।। চাঁদে আর মেনী বাঁদরের পঁদে ।।

বলাবাহুল্য, এগুলোর সাহায্যে সব সময় সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না। এর ফলে এগুলোকে প্রবাদ হিসাবে গ্রহণ করা কতোখানি যুক্তিযুক্ত, তা বিতর্কিত ব্যাপার। তবে এগুলোও অনেকাংশে অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানেরই প্রকাশ মাত্র; এগুলোও শ্লেষ এবং বক্রোক্তির ব্যবহারে রীতিমতো শাণিত। তাছাড়া সাধাবণ মানুষ এগুলোকে প্রবাদ হিসাবেই ব্যবহার করে থাকে বলে আমরাও প্রবাদ হিসাবে সংকলিত করেছি। ইংরাজিতে Proverbial Phrase নামে চিহ্নিত খণ্ডপ্রবাদগুলোকে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বলে অভিহিত করেছেন। এই জাতীয় খণ্ড প্রবাদগুলো যেমন সাধারণতঃ বাক্যাংশ হয়ে থাকে, তেমনি খণ্ডিত ভাব এবং অর্থও প্রকাশ করে থাকে। তবে রচনারীতির দিক দিয়ে এগুলো প্রবাদের সমগোত্রীয় হয়। এই ধরনের খণ্ড প্রবাদ ঝাড়খণ্ডে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রচলিত আছে।

৫২৯-৫৬৫ উবগারীকে বাটে মারা ।। আউখের গুড় পুইয়ে মারা ।। ভাত

ঘরে স্থই বিকা।। বাঁশ গাড়ি কবা।। শঁশা ঘুমান।। ডামী ধবা।। কাল্হা জিয়া হওয়া।। চুল্হায় বসাঁই উল্হানা।। চ'খের কাজল চুরি করা।। পালখীর দামে কন্যা বিকান।। উড়ে আস্তে ছিঁড়ো পড়া।। হাঁ কা'ঢ়লে ফফশ গুণা।। ম'রতে ব'ললে লুমে থাকা।। নদী না দেখ্যেই নেংটা হওয়া।। বঁগাব মাকে চঁগা দেখান।। হল্য বুঢ়িব রথ দেখা।। ঘবের খাঁই শিখান॥ চখো স'রষা ফুল খামান॥ গরবে পবব দেখা॥ ডবে পিঁপড়া গাঢ়া খুজা॥ ঢেলায় ঢেলা ভাঁগা॥ তেলুয়া মাথায় তেল লেসা॥ না-পাবাকে ঠেলেঁ ভাগান॥ পেটে খাঁয়ে পিঠে লাদা॥ স্থঁচা মু বুচা হওয়া॥ আঢ়া কাম বাঢ়া করা॥ ঘরের লাজকে বা'হবের লাজ করা॥ লাপঁ্যাই পাথ্যা বনান॥ পশ্চিম দিগে বেলা উঠা॥ হাত আহড়ে স্থর্য ঢাকা॥ বাঁ হাতে ডান হাতে পয়সা খরচ করা॥ সাপের মুখের লে বাঘের মুখে॥ সাঁওতাল পাড়ায় লং বিকা॥ মাঝি পাডায় লবঙ্ বিকা॥ মাছের তেলে মাছ ভাজা।। ভর তাকে মাদ'ল ভাঙা।। এক গাঢ়ার লে বা'হরাঁই আর এক গাঢ়ায় সামান।।

Idiom বা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছও অনেক সময় প্রবাদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বলাবাহুল্য, এগুলোর মধ্যেও প্রবাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না।

৫৬৬-৫৮৭ জলে আগুনে।। ঝোলেঝালে অম্বলে।। তেলে মুনে ছ্যং ছ্যাং।। ধন্নমার॥ কুল্হুচাড।। পিতম ভাঁড়া।। কাঁধে কুকুরে শিকার।। এক গহা'লের গরু।। মহুল্যা বাসাত।। গোল আলুর জা'ত।। লা'পত্যা পূঁজি।। ভাদর গহলী।। গুড়তুড।। পাত ঠেকায় সাপ।। তুঁই টুস মুঁই টুস।। সতীন বাইদ।। ডাল-ভাঙা কশ।। নওয়া নওয়া নলিতা।। আশার সংসার।।

কোন কোন প্রবাদ বা খণ্ডপ্রবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কাহিনী এখনো শুনতে পাওয়া যায়। যেমন ওপরের 'কুলহু চাড়' এবং 'পিতম ভাঁড়া' খণ্ড প্রবাদ দু'টি। ধলভূমের মাটিয়াবাঁধি গ্রামে জনৈক কলু এবং পিতম মাহাত নামে দু'বন্ধু ছিল। কলুকে কেউ কিছু দিলে সে না নেবার ভান করে আরো বেশি আদায় করবার 'চাড়' (<চাল) দেখাত। অন্য দিকে পিতম লোককে ঠকিয়ে জিনিষপত্র হস্তগত করত। এই থেকে অই খণ্ড প্রবাদ দু'টির স্থষ্টি। 'গুড়তুড়'

খণ্ড প্রবাদটি বাংলার লোককথার 'জিসমিস' বস্তুর সমার্থক এবং সমান্তরাল ঝাড়খণ্ডী লোককথা থেকে উদ্ভূত। 'খাবার বল্যে আনলি যাকে, সেই খাল্য আমার তিন ছাকে' (৫৯০) প্রবাদটিও কাহিনীমূলক। এক চিল পাখি খাবার ভেবে একটি বিড়ালকে তার বাসায় নিয়ে এসেছিল। শেষ তক বিড়াল চিলের খাবার না হয়ে উল্টে সে চিলের তিনটি শাবককে খেয়ে পালিয়ে যায়। চিলের আক্ষেপোক্তি থেকে এই প্রবাদের সৃষ্টি। 'পারি কি লারি, তুঁষকুড় কি পাঁ''শকুড়', 'ম'রল গঁগা কালগুয়ারী', 'কি ডুবেই কি শালুক উঠে', 'ভত্তা ভালা, ঘরে ঘরেই' (৫৯১-৫৯৪) আদি প্রবাদও কাহিনীমূলক। আমরা আগেই বলেছি, প্রবাদ প্রধানতঃ কাহিনীমূলক; প্রবাদের উৎপত্তির মূল কাহিনীটি প্রায় ক্ষেত্রেই লুপ্ত হলেও প্রবাদটি সমাজমানসে স্থায়ী আসন অধিকার করে টিঁকে আছে। 'বাম ডাঙুয়া ফতে সিঙা' এবং 'যত হাঁসি তত কান্না, বল্যে গেছে রাম সন্না (৫৯৪-৯৬) প্রবাদ দু'টিও যে কিংবদন্তীমূলক তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোথায় ছিল বামডাঙা কিংবা কে ছিল ফতে সিং বা 'বাম সন্না' (শর্মা ?) আজ আর খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।

সবশেষে আমাদের সংগৃহীত ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন স্বাদের আরো কিছু প্রবাদ উদ্ধৃত করে এই আলোচনার সমাপ্তি টানা হচ্ছে।

৫৯৭-৭০২ রাম না জন্মিতেই রামায়ণ॥ মন ঠাণ্ডা ত কাঠায় গণ্ডা॥ গলার মধ্যে মালা, কুটুমের মধ্যে শালা॥ যে যত পায়, সে তত চায়॥ কবে পা'কবেক তাল, তৎকে অনেক কাল॥ তর হাডে কাজ কি মাসে কাজ॥ মনের সুখে গেলি হাট, হাট দেখি হিয়া ফাট॥ বুঢ়া মারি খুনের দায়॥ মা'রব ব'ললে ডর থাকে, দিব ব'ললে আশ থাকে॥ জামিন হয় দিতে, গাছে উঠে ম'রতে॥ বা'হরে ঢাকা ভিতরে গোল॥ বা'হরে ঢাকঢোল, ভিতরে গণ্ডগোল॥ ছিঁড়ে ফাটে মিঞা জানে। উপর কঠা খখর বাঁশ, ধার উধার বার মাস॥ পাত্র দেখ্যে ঝি, পাত দেখ্যে ঘি॥ যার গহনা তাকে সাজে, অন্য লকে ঠরকা বাজে॥ বেহা গেলে ছামড়ায় লাগি॥ যন ডালে করি ভর, সেই ডালেই মড় মড়॥ নআ নআ নলিতা, পুন্না হলে বিষপিতা॥ সবেই ভাল সবেই মন্দ, পিয়াজ রশুন একেই গন্ধ॥ ঘ'ড়ের ফাঁ'স ঘাড়ে॥ পথে পালি কামার, ফাল পাজাঁই দে আমার॥ সব বুদ্ধি লটর পটর, এক

বুদ্ধি চিৎপটম ॥ আঙরা ধুলে কালি যায় না ॥ আঁটকুড়ার আঠ্‌র মন, বাঁঝির ষোল মন॥ মন সাচা ত কাঠুরায় গঙ্গা॥ ডালুয়া উঁদুরের নেজেই চিহ্নায় ॥ কাঁহা খুজ ঢেঁড়, ঘরে হিঁ ঢেঁড় ॥ চেঁকার ডরে পালাই ন তেঁত'ল তলে বাঁসা ॥ যদি দেখ চালের টুই, তবু বাঁধ গণ্ডা দুই ॥ রীতা মা'তলে গীতা, মন হরষের কথা ॥ দৌড় ধাপে বার, ঘরে বসি তের ॥ দুনিয়া ডু'বলে এক হাঁটু জল ॥ ভর বতরে মাদ'ল ছেঁদা ॥ এক কাম দুই আড়্‌তি॥ বাঘা ঢাল দুইই মার ॥ শ কথায় সতী ভুলে, এক কথায় মাগী ভুলে ॥ প'রতে হবেক শাঁকা, ত মুখটা কেনে বাঁকা ॥ কুথাউ কিছু নাই, খুড়া ভগ্‌তা কার্মাইছে ॥ যেমন কম্ম তেমন ফল, মশা মা'রতে গালে চড ॥ ব'সতে দিলম কম্বল, ফিঁচা কুট কুট করে ॥ কার ঘরে ডিঁগা ডিঁগা, কার ঘরে ডাল মুরগা ॥ বে"ল খাইতে তিতা, পরের পুরুষ মিঠা ॥ চোর পালালে বুদ্ধি বাঢ়ে ॥ শুনা কানা ভুনা, পথ পায় না তিনজনা ॥ নাচ আর মাছ, সব সময় লাগে না ॥ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, জল ঠেঁগালেউ কি ধুরে যায় ॥ ইঙ্গিতে পণ্ডিত বুঝে মুখ্যু বুঝে কিলে, সাঁইপড়শী বুঝে তখন চখ্যে আঙুল দিলে ॥ একটা হত্তকী সারা গাঁয়ের আদ্দাশী ॥ বুদ্ধি থা'কলে বাপ ঘরে ছা হয় ॥ যে যত দেড় ফুট্যা মানুষ, সে তত বদমাইস ॥ বসি বসি খালে নদীর বালি-এউ কুল্যায় নাই ॥ চল্‌ ব'ললেই কাঁধে ঝুলি ॥ এমন জায়গায় বসবি যেমন কেউ না বলে উঠ, এমন কথা বলবি যেমন কেউ বলে না ঝুঠ ॥ দে'খলেই চোর, না'হলে গগাঁই মর ॥ কি ক'রবেক বেতনে, মারি দিব খেঁটনে ॥ একেই অলের বিঁঝা, কার লাগে খসরমসর কার লাগে তিতা ॥ পূর্বে যার পরে তার, যুগে যুগে অবতার ॥ যেইসাকে তেইসা, খইসাকে দাইদা॥ অল-অলক্ষের ঝারি, জল থাঁয়ে থাঁয়ে মরি॥ অগ্রু যুগের ঘুঘি আড়া পেছু দিগে শিয়াড়া॥ আঝ ক'রতে মাঝ ঘর, মাঝ ঘর ক'রতে ভিতর ঘর ॥ আঁতের বল নাই, গভরিরেই তেজ ॥ আন শু'নতে আন, নেজে ধর‍্যে টান ॥ কথা যাবি, ন্‌ঘরেই আছিন ॥ গাছ চঢ়ার লে পেছু ঠেলা লকেই বেশি ॥ গা'হতে গা'হতে গলা ব'হতে ব'হতে নালা ॥ গুণ থা'কলে কাঁদি, চু'ল থাকলে

বাঁধি॥ চ'ললে চল্লিশ বুদ্ধি, না চ'ললে হতবুদ্ধি॥ চইখ-অ নাই, আর চ'খশূল-অ নাই॥ চিন না চিন, লৌতন দেখ্যেই কিন॥ ছট দেখ্যে আঢ়ায়, বড় দেখ্যে ঢাড়ায়॥ জাইত-অ গেল, পেট-অ নাই ভ'রল॥ জীউ যায় নাই ছটফটানির সার॥ দহরা কাপড়ের তেহরা জাড, নিকাপড়কে পাথর আড়॥ দিয়াকেই দিয়া, অদিয়াকে আগুড দিয়া॥ নিত সিনানের গায়ে মইল, গা বাসাছে চেঁকা খইল॥ নগে ছিঁডবেকটার তরে বঠিনের খজ॥ ব'লতে সে বনে নাই, না ব'ললে চলে নাহ॥ বুঢ়া লক আর লদী ধারের গাছ॥ ভকালে আনলা-উ রুচায়, ঝুমালে খাঢ়রা খাইটেউ নিদায়॥ ভালই হল্য সনা ম'রল, দুটা কাঁথা হামারেই হল্য।। মরালে অ-মব মরে।। মনের দুখে অরুণে বাস।। মা'নলে শিব না মা'নলে পাথর।। যত লকের তত কথা, সইতে লারি যাব কথা।। যাব যাব ঠেঁগের ধূলা নিয়েই যাব।। যার যহত্ত্ব নাই, তার মহত্ত্ব নাই।। যে পাইরাবেক মাঘ মাস, সে দে'খবেক বার মাস।। যাহার যখন মাথা ফাটে, সেই তখন চূন খুঁজ্যে বুলে।। লিলজ নাচে ভেঠর দেখে।। সাপ-অ না মরে, ডাঁগ-অ না ভাঙ্গে।। হাঁস্যে হাঁস্যে কথা বলে, মুনস্যা বলে পিয়াদাই লহে।। হাঁ'সতে হাঁ'সতে মা'রব ঠনা, বা'জবেক যেন ঝনঝনা।। খাবার বেলা লুবুর সুবুর, কাজের বেলা পেংঘা।। নামেই তালপুকুর, ঘটি-অ ডুবে নাই।। চিরকাল গেল কুচা কুঢ়াঁই আ'জ বলে হাটবার কবে।। রূপের গরব দুদিন বই ত লয়।। অলগলতা ডগে বাঢ়ে গড়ায় জানে না।। বাপের নাম শাগপাত, ছাল্যার নাম মিঠাই দাস।। চা'র আনার খুকড়ী, দশ আনা পদ্গন্তমী।। কমরে যদি আছে বল, মূঢ়া কদা'ল ধর।। যার পেটে ঘা সে বলে বাঁ'চব, যার টাঁকে ঘা সে বলে ম'রব।। ছেল্যা খেলাঁই গেল দিন, আ'জ বলে ডাহিন।। ছিল ঢেঁকি হলা তুল, কা'টতে কা'টতে নিরমূল।।

চতুর্থ অধ্যায়
রূপকথা

রূপকথা যে অত্যন্ত সুপ্রাচীন সৃষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই। রূপকথা লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো যুগে যুগে মৌখিক ধারায় প্রচারিত হয়েছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের মূল কাঠামোর অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।. As popular legends and tales they claim of course the highest possible antiquity, being older than the *Jatakas*, older than the *Mahabharata*, older than the history itself. From age to age, and from generation to generation, they have been faithfully handed down by people rude and unlearned, who have preserved them through all the vicissitudes of devastating wars, changes of rule and faith, and centuries of oppression. They are essentially the tales of the people.[১]

এখানে 'রূপকথা' শব্দটি সব ধরনের কথা বা কাহিনীর পরিচয়-জ্ঞাপক শব্দ হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। For lack of more adequate English term, 'fairy tale' is frequently extended to describe other types of nursery tales that have nothing to do with fairies or supernatural beings[২]. আমরা 'রূপকথা' শব্দটি ইংরাজি fairy tale এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছি। সাধারণভাবে কথা বা কাহিনীর মধ্যে রূপকথা, ব্রতকথা, পুরাকথা এবং ইতিকথাও পড়ে। এখানে শুধুমাত্র রূপকথা নিয়েই আলোচনা করা হবে। বর্তমানে 'লোককথা' শব্দটি অত্যন্ত প্রচলিত। লোককথাকে রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথা এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। রূপকথা এবং ব্রতকথার মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা অত্যন্ত কঠিন। ব্রতকথা সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করছি। উপকথা মূলতঃ পশুপক্ষী-সম্পর্কিত কাহিনী, আয়তনে সংক্ষিপ্ত, বাস্তবজীবন

১ Charles Swynnerton : Romantic Tales from the Punjab, London 1908
২ The Companion Guide to World Literature. Mentor Book, New York

ও পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত; এ-কাহিনী আসলে পশুপক্ষীর রূপকে মানুষেরই কাহিনী। ঈশপের উপকথা কিংবা উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই'-এর কাহিনীগুলোকে উপকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু যে সব কাহিনীতে পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের চরিত্রও থাকে, সেগুলোকে কি নামে অভিহিত করা যায়? কিংবা যে সব কাহিনীতে পশুপক্ষীর প্রাধান্য থাকলেও কেন্দ্রীয় চরিত্রটি মানুষ এবং তারই প্রয়োজনে সমস্ত কাহিনীটি আবর্তিত হয় তাকেই বা কি নামে অভিহিত করা যায়? আমাদের মনে হয় এই ধরনের কাহিনীকে-ও রূপকথার অন্তর্গত করা উচিত।

ডঃ সুকুমার সেন কথা, রূপকথা এবং ব্রতকথার উৎস নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন, "…'কথা' সর্বনামজাত অব্যয়। অর্থ 'কেমন করে'। গল্প শুনতে শুনতে এখনকার শ্রোতারা যেমন কৌতূহল-প্রেরিত হয়ে বলে 'তারপর, তারপর'। দু'হাজার আড়াই হাজার বছর আগেকার শ্রোতারা সেই ভাবাবেশে উদ্রিক্ত হয়ে বলত 'কথা, কথা'। তার থেকে শব্দটি চলিত হয়ে গেল গল্প অর্থে, পদোন্নতিও হল অব্যয় থেকে বিশেষ্যে এবং স্ত্রীলিঙ্গে। তারপরে গল্প বলা অর্থে এর থেকে নামধাতুর সৃষ্টি হল 'কথায়তি'। ক্রিয়াটি অনতিকাল পরে অর্থ সম্প্রসার করে 'ক্রু' ধাতুর সমার্থক হয়ে পড়ে।…

বাঙলায় লৌকিক কাহিনী অর্থাৎ folk-tale বা fairy tale অর্থে একদা অপূর্বকথা শব্দটি চলিত ছিল। কালক্রমে লোকমুখে অপূর্বকথা পরিবর্তিত হল অপুরুব কথায়। তারপর অপরূপ কথায় অবশেষে 'অপ'-বাদ ত্যাগ করে দাঁড়াল রূপকথায়। অঞ্চল বিশেষের কথ্য ভাষায় এবং সর্বত্র শিশু রসনায় আদি র-কারের প্রতি বিমুখতার ফলে শব্দটি দাঁড়িয়েছে উপকথায়!"[৩]

ডঃ সেনের মন্তব্যকে ব্যাখ্যা করলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে তিনি folk-tale এবং fairy-tale এর মধ্যে যেমন সীমারেখা টানেন নি, তেমনি রূপকথা এবং উপকথাকেও এক এবং অভিন্ন বলেছেন। আমরাও তাঁর মত সমর্থন করি। কারণ উপকথা শব্দটি উচ্চারণ করলে কোনক্রমেই পশুপক্ষীর কথা আমাদের মনে আসে না। শব্দটির মধ্যে যে কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাব এবং অবজ্ঞা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকথা' প্রবন্ধটি[৪] স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 'উপকথা নামটির

পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায়—নকলের প্রতি আসলের, মেকির প্রতি খাঁটির, নীচের প্রতি উচ্চের যে অবজ্ঞা সেই ভাব। …পক্ষান্তরে রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্য-ঘন মাধুর্য, একটি ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটি সাড়া জাগাইয়া দেয়। সমালোচক বোধ হয় উপকথা নামটিই পছন্দ করিবেন; কিন্তু রসপিপাসু পাঠক যে রূপকথা নামটির পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।' পরিষ্কার বোঝা যায়, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপকথা শব্দটির পরিবর্তে রূপকথা শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি folk-tale এবং fairy tale এর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন। তাঁর মতে, 'কোন কোন লোক-কথা অতিরিক্ত রোমান্সধর্মী, কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে ইহারা স্বাধীন বিহার করিয়া থাকে, ইংরাজিতে ইহাদিগকে fairy tale ও বাংলায় রূপকথা বলা হয়'।[৫] উপকথা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'কতকগুলি কাহিনী একমাত্র পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়া থাকে, কোন কোন কাহিনীতে নরনারী ও পশুপক্ষী উভয়েই সমান অংশ গ্রহণ করে। ইহাদিগকে ইংরাজিতে Animal Tale বলে'।[৬] সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তিনি লোককথাকে রূপকথা এবং উপকথা এই দুটি বিভাগে ভাগ করবার পক্ষপাতী; ব্রতকথা লোককথার লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় তাকে তিনি এর মধ্যে তৃতীয় স্থানভুক্ত করেছেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথার মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। রূপকথা অনেক সময় ব্রতকথায় পরিণত হয়ে থাকে। সব শ্রেণীর কথার মধ্যে রোমান্স আছে, কল্পনারও বিস্তার আছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে গল্প বা কাহিনী রচনা সম্ভব বলে মনে হয় না। শিশুদের সংসারানভিজ্ঞ মনে বাধাবন্ধহীন কল্পনার রাজ্য এবং বাস্তব পৃথিবীতে খুব একটা পার্থক্য থাকে না। রূপকথা এবং উপকথার কাহিনী তাদের কল্পনায় সমানভাবে বিম্বিত হয়ে থাকে।

রূপকথার বিরুদ্ধে অলীকতা ও অবাস্তবতা সম্পর্কে এই যে অভিযোগ

সে-সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি রূপকথার রাজ্যেও সেই মানবমনের আদিম-সনাতন নীতিরই আধিপত্য। সেই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তিসম্পদ লাভ, পাপপুণ্যের জয়পরাজয়—পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিষই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া, রূপকথার রাজ্যের অলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়।' তাই বাস্তব-অবাস্তবের একটা অলীক সীমারেখা টেনে রূপকথা এবং উপকথার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই মনে হয়।

আমরা 'রূপকথা' শব্দটিই ব্যবহারের পক্ষপাতী, যদিও আমাদের আলোচ্য অঞ্চল ঝাড়খণ্ডে রূপকথা শব্দটি একেবারে অজ্ঞাত। ঝাড়খণ্ডে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা আদি সব ধরনের কথার জন্য একটিই সাধারণ নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে—'কহনী', কোথাও বলা হয় 'রা'ত কহনী'। নিবন্ধের শীর্ষক, 'কহনী' রাখাই যুক্তিযুক্ত ছিল, কিন্তু আমরা রূপকথা এবং 'কহনী'র মধ্যে পার্থক্য দেখি না বলে 'রূপকথা'ই রাখা হল।

রূপকথার সঙ্গে সরাসরি বাস্তবজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। তবে এর মধ্যে অনেক সময়ই রূপক এবং সংকেতের সাহায্যে মানব-চরিত্র এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। অলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যেও লৌকিক জীবনের অনেক ঘটনার ইঙ্গিত থাকে। বাস্তবজীবনের আদিম-সনাতন কামনা-বাসনাগুলো, বিচিত্র অভিজ্ঞতারাশি কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে রূপকথায় আত্মপ্রকাশ করে থাকে। অনেক সময় ইতিহাস কিংবা ইতিহাসাশ্রিত গল্পকথা বিকৃত রূপে বা পরিবর্তিত অলৌকিকতার ছদ্মবেশে রূপকথার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব, অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক ঘটনাবলীর মেলবন্ধনে রূপকথা তার আশ্চর্য শরীর লাভ করে। রূপকথায় চমকের পর চমক রয়েছে; শিশুরা অবাকবিস্ময়ে জলজ্বল চোখে রূপকথা উপভোগ করে এবং কল্পনার পাখায় ভর করে রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্রদের সাথে এ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ে। এই চমক তথা বিস্ময় রয়েছে বলেই রূপকথায় সব সময় একটি 'তারপর' জেগে থাকে, যতোক্ষণ না কথকের মুখে 'আমার কহ্‌নী ফুরাল্য' শোনা যায়।

রূপকথার চরিত্রগুলো কোথাও তাদের ব্যক্তিকতা কিংবা স্থানিকতা পায় নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নামাঙ্কিত করা হয় নি ; শুধু বলা হয়ে থাকে, অনেক অনেক দিন আগে কোন এক দেশে একজন রাজা কি একজন রানী কি একজন রাজপুত্র কি একজন রাজকন্যা কিংবা একজন গরীব অথবা কুঁড়ে লোক ছিল। দেশ-কাল-পাত্র কোনটিকেই নামাঙ্কিত করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

'এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালীবাহন; কাশী, কাঞ্চী, কনোজ, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাহার রাজত্ব এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল, আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুতবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা…।'

আসলে রূপকথা মানুষেরই গল্প কিন্তু এর মধ্যে কখনো বিমূর্ত কখনো অমূর্ত অতিপ্রাকৃত আত্মা কিংবা জাদুকরী চরিত্রের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। রূপকথার গল্পশরীরের অন্তরালে এইগুলোই আত্মার মতো বিরাজ করে চমক এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। নাই-দেশের এই চরিত্রগুলো তাই রূপকথাকে সদাসর্বদা রসসিক্ত এবং সঞ্জীবিত করে রাখে।

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো রূপকথাও অতি সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রচার লাভ করে থাকে। রূপকথার মধ্যে এমন একটি অমর জীবনীশক্তি আছে যা দেশান্তরিত বা ভাষান্তরিত হলেও বিনষ্ট হয় না। তাই বলা যেতে পারে, লোকসাহিত্যের মধ্যে রূপকথা সর্বাধিক প্রাণবান শাখা। রূপকথা নাই-দেশের কথা। নির্বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের কাহিনীই রূপকথার কাহিনী। তাই যে কোন রূপকথাই সর্বদেশীয়, সর্বকালীন এবং সর্বজনীন হয়ে থাকে।

রূপকথায় কোন রকম জটিলতার স্থান নেই। গঠনভঙ্গি অত্যন্ত সহজ, সরল ; কথনভঙ্গিও এক অননুকরণীয় সারল্যমণ্ডিত। বিভিন্ন পরিবেশ এবং প্রতিবেশ রচনায় কাহিনীতে পুনরাবৃত্তি অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। রূপকথাকে

হৃদয়গ্রাহী এবং আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য মধ্যে মধ্যে ছড়াব প্রয়োগ এব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ছড়াগুলো সাধারণতঃ করুণ সুরে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে; ঝাড়খণ্ডে রূপকথার মধ্যবর্ত্তী এই সব ছড়াকে 'রুদন' (রোদন) বলা হয়ে থাকে।

রূপকথার বিষয়বস্তু অসংখ্য। পণ্ডিতবৃন্দ এ-পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক সুস্পষ্ট মৌলিক বিষয়বস্তুর (motif) সন্ধান পেয়েছেন। লোকবৃত্তেব বিষয়বস্তু এবং সাধারণ প্রবাদ-প্রবচন আদিব ওপব ভিত্তি কবে এমন সব বিষয় বিকশিত হয়ে উঠেছে, যাদেব মধ্য থেকে নিষ্ঠুর বাজা, নিষ্ঠুব বিমাতা, হিংসুটে ভগ্নী, উৎপীড়িত স্ত্রী, ঈর্ষালু সপত্নী আদি অনড় চিবন্তন চবিত্রেব সন্ধান পাই। এই বিষয়বস্তুগুলোকে আরো সুন্দর ভাবে গড়ে ওঠবাব জন্য সুযোগ এবং সাহায্য দিয়েছে অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক ঘটনাবলী। জাদুদণ্ড, জাদু অঙ্গুবী, অলৌকিক কায়াবদল এবং পুনর্বাব রূপপরিগ্রহ, অপ্রাকৃত বিবাহ এবং জন্ম-বৃত্তান্ত রূপকথাকে আমাদেব চিবকালীন কল্পনাব জগতেব দলিল হিসাবে রূপায়িত কবেছে। কিন্তু তাই বলে কাহিনীতে কিংবা গল্পবসে খাপছাড়া ভাব আসে না, ববং আবো নিবিড় হয়ে ওঠে। এ-সম্পর্কে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন—Despite the setting in a never-never land where any sort of supernatural event may occur, the story has an inner consistency, and once the strange element in the situation is accepted, the other aspects of the tale have reality. The fairy tale always has a happy ending : virtue is rewarded.[৭] রূপকথা যদিও নীতিকথা প্রচারের উদ্দেশ্যে বচিত হয় না তথাপি, এর মধ্যে আমাদের বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম আদি বোধেব প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই পড়ে থাকে। বাস্তব জীবনে আমবা অন্যায় এবং অধর্মেব পাষণ্ড লীলা দেখে থাকি, বাস্তবজগতে সম্ভব না হলেও কল্পনার জগতে আমরা পাপ এবং অধর্মকে দণ্ডিত দেখতে উৎসুক। তাই রূপকথায় সব সময়ই পাপ এবং অধর্ম শাস্তিলাভ করে থাকে। রূপকথাব অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কাহিনীতে অনিবার্যতঃ একটা মধুর পবিণতি থাকে। নায়ক-নায়িকাব মৃত্যুতে কাহিনী সাধাবণতঃ শেষ হয় না। যে কোন অলৌকিক উপায়ে তারা পুনর্জীবন লাভ কবে থাকে। যে-কাহিনী

৭ The Companion Guide to World Literature

নায়ক-নায়িকার মৃত্যুতে শেষ হয়ে থাকে, তা নিঃসন্দেহে বিকৃত, অধঃপতিত রূপ অথবা কথকের স্মৃতি-ভ্রংশের পরিণতি। আদিম মানব কোনদিনই মৃত্যুকে স্বীকার করতে রাজী হয় নি। তাই তারা পুনর্জীবন, কায়াপরিবর্তন এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত। মৃত্যুঞ্জয়ী মানবের একটি সুন্দর রূপকথা পুরাণে একটি বিখ্যাত উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে, সেটি হল নচিকেতার উপাখ্যান।

লোককথার ওপর অধ্যয়নের জন্য অধ্যাপক ষ্টীথ্ টম্‌সন একটি আন্তর্জাতিক নিয়মের প্রবর্তন করেন। এই নীতি Index of Tale Types নামে পরিচিত। তিনি লোককথাগুলোকে টাইপ-অনুসারে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করেন : প্রথমতঃ পশুপাখির কাহিনী (Animal Tales), দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোককথা এবং তৃতীয়তঃ হাস্যরসাত্মক এবং টুকরো কাহিনীমূলক ঘটনা। একে Type Index-ও বলা হয়ে থাকে। টম্‌সন সাহেব প্রতিটি টাইপকে এক একটি সংখ্যার সাহায্যে নির্দিষ্ট করে দেন। বলাবাহুল্য এর সাহায্যে-ও প্রতিটি রূপকথার সুষ্ঠু অধ্যয়ন সম্ভব হয় না। কেননা একই রূপকথার মধ্যে একাধিক টাইপ বা আদর্শ থাকে, যার ফলে কোন রূপকথাই স্বাধীন এবং অন্য আদর্শনিরপেক্ষ হতে পারে না।

অধ্যাপক টম্‌সন এরপর কাহিনীগুলোকে motif বা অভিপ্রায় অনুসারে পুনর্বিভাগ করেন। এই পুনর্বিভাগটিই motif index নামে পরিচিত। তিনি A থেকে Z পর্যন্ত বিভিন্ন অভিপ্রায় অনুযায়ী ভাগ করেন যার মধ্যে পশুপক্ষী (animals), নিষেধাজ্ঞা (taboo), ইন্দ্রজাল (magic), বিস্ময় (marvels), রাক্ষস (ogres), পরীক্ষা (tests), পণ্ডিত ও মূর্খ (the wise and the foolish), প্রতারণা (deception), ভাগ্য বিপর্যয় (reversal of fortune), সুযোগ ও ভাগ্য (chance and fate), পুরস্কার ও শাস্তি (rewards and punishments), পাশবিক নিষ্ঠুরতা (unnatural cruelty), অস্বাভাবিক বিবাহ (unusual marriage) আদি অভিপ্রায়-গুলো অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি লোককথার আলোচনা সর্বত্র টম্‌সন সাহেবের এই অভিপ্রায়-সূচী অনুসারেই করা হয়ে থাকে। অবশ্য এই রীতি অনুসারেও রূপকথার সুষ্ঠু অধ্যয়ন সব সময় সম্ভব হয় না। কেননা একটি মাত্র অভিপ্রায়-মূলক রূপকথা প্রায় সর্বত্রই বিরল। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কোন রূপকথার একাধিক অভিপ্রায়ের সমাবেশ ঘটলেও একটি কেন্দ্রীয় অভিপ্রায়ও থাকে। বহু পরিবর্তনের মধ্যেও এই কেন্দ্রীয় বা মূল অভিপ্রায়টি

সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে। তবে রূপকথার বিচার শুধুমাত্র অভিপ্রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়।প্রত্যেকটি রূপকথার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, সেটির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শুধুমাত্র অভিপ্রায় অনুযায়ী রূপকথার বিশ্লেষণ করা হলে তাতে পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা থাকে, রস-বিচার অনেকাংশেই অবহেলিত হয়ে পড়ে। তাই লোককথার আলোচনায় অভিপ্রায় এবং রস-বিচারের সমান ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়।

রূপকথা-সমৃদ্ধ যে কোন দেশ বা অঞ্চলের মতোই ঝাড়খণ্ডও রূপকথার ঐশ্বর্যে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ। অজস্র রূপকথা ঝাড়খণ্ডের গ্রামে-গ্রামে লোকমুখে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীন-প্রাচীনাদের মৃত্যুর ফলে রূপকথা শোনাবার কিংবা শোনবার আগ্রহে যেন কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়ে গেছে। তাছাড়া শিক্ষা ও শিল্প প্রসারের ফলেও জনজীবনের অকৃত্রিম প্রাণচাঞ্চল্য যেমন লুপ্ত হয়ে আসছে, তেমনি লোকসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণও স্তিমিত হয়ে আসছে। তবু এখনো ঝাড়-খণ্ডের গ্রামে-গ্রামে দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যেবেলায় রূপকথার আসর বসে। কথকের চারপাশ ঘিরে বাচ্চাদের এখনো ভিড় জমে। গরু-ছাগল চরাবার সময় দিনের বেলাতেও গরু-ছাগল বাগালেরা গোচারণ মাঠে মহুয়া-ছায়ায় বসে 'কহনী' বলে থাকে। দূরের হাটে বা মেলায় যাবার সময় পথের শ্রম ভোলার জন্য পথচারীরা রূপকথা বলে থাকে। রান্নার দেরী থাকলে মা-মাসিরা শিশুদের সন্ধেবেলায় জাগিয়ে রাখবার জন্য রান্নার ফাঁকে-ফাঁকে 'কহনী' শোনায়, তেমনি অবুঝ শিশুদের ঘুম পাড়াবার জন্য-ও 'কহনী' শোনাতে হয়। বিয়ে-বাড়ির আনন্দ-উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ যে 'কহনী' শোনানো এবং শোনা, তা আগেই বলা হয়েছে। আসলে ঝাড়খণ্ডের রূপকথার প্রাণপ্রবাহ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখনো গতিশীল।

ঝাড়খণ্ডের রূপকথা সংগৃহীত হয়েছে অত্যন্ত কম। শত শত রূপকথা ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এখন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকটি রূপকথা মুদ্রিত করে রসিকজনের নিকট উপস্থিত করা হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য-র 'বাংলার লোকসাহিত্য', ৪র্থ খণ্ডে, বর্তমান গবেষকের প্রবন্ধ 'ধলভূমের রূপকথা' (মধ্যাহ্ন ১৩৩৪) তে, এবং অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পশ্চিম সীমান্ত-বঙ্গের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে কয়েকটি মাত্র রূপকথা সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের ভাষা কিংবা গল্প বলার ভঙ্গি কোনটাতেই রক্ষিত হয় নি। কৃত্রিমতা কিছুটা এসেছে অস্বীকার করবার উপায় নেই, তবে আঞ্চলিক উপভাষার

কাহিনী অনুসরণ করে রস-গ্রহণ কবার দুস্তর বাধা যে তার ফলে অতিক্রম করা গেছে, তা'ও অনস্বীকার্য। বর্তমান নিবন্ধে-ও আঞ্চলিক উপভাষা রক্ষা করা হয় নি। রূপকথাগুলোর মূল কথাবস্তুই এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সীমান্ত বাঙলার লোককথা আলোচনা-প্রসঙ্গে ডঃ সুধীরকুমার করণ বলেছেন, সীমান্ত বাঙলার লোককথারও একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তা কল্পনার রঙে রঞ্জিত রূপকথা নয়—আদিম বিশ্বাসনির্ভর উপকথা। তিনি বলেছেন, 'এই সব অঞ্চলের লোককথারও নিজস্ব একটি রূপ আছে, এসব কাহিনীতে কল্পনার রং চড়ানো হয়নি। আদিম বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই লোকজীবনের বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাত্র। এগুলিকে কাহিনী না বলে আদিম পূজাপদ্ধতির ভাষামন্ত্র নামে অভিহিত করলেও দোষের হবে না। দৈত্য-রাক্ষস-পরী-হুরীর রূপকথার কোন রূপই এর মধ্যে নেই। এ ক্ষেত্রে কথা-নায়ক হচ্ছে অপদেবতা অথবা ডাইনী, গুণী অথবা ভূত, আর তারই সঙ্গে একান্তভাবে সম্পর্কবান আদিম মানুষের সমাজ।'[৮] আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ডঃ করণ পশ্চিম সীমান্ত বাঙলা বা ঝাড়খণ্ডে রূপকথার অস্তিত্বের কথা একেবারে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি করম ব্রতকথার নজির টেনেছেন। কিন্তু ব্রতকথা যে রূপকথারই অধঃপতিত রূপ তা তো স্বীকৃত সত্য। এই কাহিনীর মধ্যে ব্রতকথা এবং পুরাকথার উপস্থিতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ডাইনী-সম্পর্কিত কাহিনী কিংবা রাখাল-রঙ্কিনী কাহিনী লোককথা নয়, ওগুলোকে পুরাকথা বা myth বলা-ই বাঞ্ছনীয়। ডঃ করণের গ্রন্থ রচনাকালে ঝাড়খণ্ডের কোন রূপকথা সংকলিত হয়নি বলে এবং তাঁর নিজের সংগ্রহেও সম্ভবতঃ কোন রূপকথা ছিল না বলেই তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। কেননা আমাদের সংগৃহীত রূপকথা আলোচনা কালে আমরা দেখব, কাহিনীর মধ্যে হুরী-পরী না থাক, রাজপুত্র-রাজকন্যা আছে, রাক্ষস আছে, এবং রূপকথার রূপও আছে। ঝাড়খণ্ডে আদিম সমাজব্যবস্থার অবশেষ এখনো আছে, তাই বলে এখানকার জনজীবনে রাজা-মন্ত্রী অপরিচিত চরিত্র ছিল এমন কথা ভাববার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলে মনে হয় না। আদিম সমাজব্যবস্থাতেও গোষ্ঠী-নায়ক বা দল নায়ক ছিল। রাজার পরিবর্তে লোককথায় হয়তো একদা এই

৮ সীমান্ত বাঙলার লোকযান, পৃ ২৮।

দলনায়কই ছিল। রূপান্তর এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে কোন জাতিই বিকাশ লাভ করে থাকে। স্বভাবতঃই তাদের ভাষা-সংস্কৃতিতে যেমন রূপান্তর এবং পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি তাদের লোককথাতেও রূপান্তর এবং পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তা রোমান্সধর্মী রূপকথাতে উন্নীত হয়েছে। তাই ঝাড়খণ্ডে রূপকথা নেই, একথা যুক্তিযুক্ত নয়।

ডঃ করণের অন্যতম অভিযোগ হল এখানকার লোককথা কল্পনার রঙে রঞ্জিত রোমান্স নয়। কল্পনার ব্যাপ্তি উন্নত মানসিকতার পরিচয়, তাই ঝাড়খণ্ডের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কল্পনার ব্যাপ্তি থাকা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু কল্পনার ব্যাপ্তি না থাকলে কোন কাহিনীই রচনা করা সম্ভব নয়। ব্রতকথাই হোক আর পুরাকথাই হোক, রূপকথাই হোক আর উপকথা, সর্বত্রই কল্পনা সগৌরবে স্থান পেয়ে থাকে। তাই ঝাড়খণ্ডের লোককথা রূপকথার মধ্যেও এই কল্পনার ব্যাপ্তি সহজেই নজরে পড়ে।

প্রথমেই কলাবতীর গল্প নিয়ে আলোচনা করা যাক। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, এই নিবন্ধে আলোচিতব্য সমস্ত লোককথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেষণ করা হবে; যেখানে অপ্রয়োজনীয় মনে হবে, ছড়া বা 'রদন'গুলোও বাদ দেওয়া হবে।

১ এক যে ছিল রাজা। তার সাত ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়ের নাম কলাবতী। রাজপুত্রেরা রোজ গভীর অরণ্যে শিকার করতে যেত। একদিন ছোট রাজপুত্র একটি আশ্চর্য আম্রফল নিয়ে আসে, এবং প্রতিজ্ঞা করে যে সে কাউকে অই ফলটি খেতে দেবে না। যে খাবে তাকেই বিয়ে করবে সে। ঘটনাক্রমে কলাবতী সে ফলটি খেয়ে ফেলে। যখন কলাবতী ভাই-এর প্রতিজ্ঞার কথা শুনল তখন সে আত্মহত্যার জন্য কাছের নদীতে গেল। তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রথমে রাজা নদীঘাটে গেল এবং রাজকন্যাকে ঘরে ফেরার জন্য ডাক দিয়ে বলল,

কলাবতী, কলাবতী, ঘর কেনে নাই আস,
শুখনা ভাত খাড়ারখুড়ুর বেগুন পড়া বাসি।

নদীতে একগলা জলে দাঁড়িয়ে কলাবতী বলল,

যা"ক যা"ক সোব যা"ক হোক হোক বাসি
বাপ হয়ে শশুর হবে ই জীবন কি রাখি।

কলাবতী ঘরে ফিরল না। একে একে রানী এবং বড়ো রাজপুত্রেরা এল।

সবাই একই ভাবে কলাবতীকে ডাকল। কলাবতী সবাইকে তাদের সঙ্গে ভাবী সম্পর্কের কথা তুলে ফিরিয়ে দিল। সবশেষে এল ছোট রাজপুত্র। সেও কলাবতীকে ঘরে ফেরার জন্য ডাক দিল,

কলাবতী, কলাবতী, ঘরে কেনে নাই আস
শুখনা ভাত খাড়ারখুড়ুর বেগুন পড়া বাসি।

ততোক্ষণে কলাবতী নদীর জলে ডুবুডুবু। কোনমতে মুখ তুলে বলল,

যা"ক যা"ক সোব যা"ক হোক হোক বাসি
ভাই হয়েঁ ভাতার হবে ই জীবন কি রাখি।

কলাবতী উঠল না, নদীর জলে ডুব দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তারা দুজনে ভাসতে ভাসতে অন্য এক রাজত্বে গিয়ে পৌঁছল এবং সেখানে ঘর বেঁধে সুখে সংসার করতে লাগল।

রূপকথাটি ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক প্রাচীনত্বের কথা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করেছে। কলাবতীর গল্পে আদিম সমাজের ভ্রাতাভগ্নীতে বিবাহবন্ধনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভূখণ্ডের অংশ-বিশেষ এই ঝাড়খণ্ড। ভ্রাতাভগ্নীতে বিবাহের সর্বশেষ সংবাদ আমরা প্রাচীন মিশরে পেয়েছি; তাও পাঁচ হাজার বছরের কম নয়। এই রূপকথাটির মধ্যে যে-অভিপ্রায়টি প্রধান, তা হল incest motif বা অগম্যাগমন অভিপ্রায়। ভ্রাতাভগ্নীর বিবাহ সব সমাজেই নিষিদ্ধ (taboo), অথচ এই রূপকথাটিতে তাই ঘটেছে। এ-বিবাহ স্বাভাবিক নয় বলে একে টমসন সাহেবের অস্বাভাবিক বিবাহ (unnatural marriage—T110) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আম্রফলটিকে আশ্চর্য ফল বলা হয়েছে, তাই এখানে ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বস্তুর (magic object—D 800) অন্তর্গত ঐন্দ্রজালিক ফল অভিপ্রায়ের সংকেত আছে। এই ফলটি যে খাবে রাজপুত্রের প্রতিজ্ঞা অনুসারে সেই তার বধূ হবে। দৈবক্রমেই হোক বা যাই হোক, কলাবতী ফলটি খাওয়ার ফলে ভ্রাতার সঙ্গেই তার বিবাহ হয়েছে; সামাজিক বিধিনিষেধ (taboo) ফলটির ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার জন্য এখানে অবহেলিত হয়েছে। লক্ষণীয়, বাধানিষেধ উপেক্ষা করা সত্ত্বেও রাজপুত্র-রাজকন্যা কোন শাস্তি লাভ করেনি, শুধু তাদের পরিচিত দেশ-ঘর-সমাজ আত্মীয়স্বজন সব কিছু পরিত্যাগ করে দেশান্তরী বা স্বেচ্ছানির্বাসিত হতে হয়েছে।

২ এক রাজার সাত ছেলে এবং এক মেয়ে। রাজারানী ওদের রেখে

মারা যান। রাজকন্যার নাম মাধুরী। বড়ো ছ'জন রাজকুমারের বিয়ে হয়েছিল। ছোট রাজকুমার এবং রাজকন্যা মাধুরীর বিয়ে হয়নি। রাজকুমারেরা শিকার বড়ো ভালোবাসত। ওরা মাধুরীকে তার বৌদিদের কাছে রেখে শিকারে যেত এবং পশুপক্ষী মেরে নিয়ে আসত। একদিন মাধুরী বৌদিদের রান্নাবান্নার সাহায্যের জন্য সজনে শাক কুটছিল। হঠাৎ তার হাত কেটে গিয়ে সমস্ত শাকে রক্ত লেগে যায়। খাবার সময় রাজকুমারেরা সজনে শাক ভাজার বেশ তারিফ করল। বৌয়েরা জানাল শাক কুটতে গিয়ে মাধুরীর হাত কেটে রক্ত লেগে যায়, আর তাই শাক ভাজা অত বেশি মিষ্টি লাগছিল। বড়ো ছ'জন রাজকুমার মনে মনে ভাবল, যার কয়েক বিন্দু রক্ত অত সুস্বাদু তার মাংস না জানি কতো সুস্বাদু! তারা মাধুরীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। ছোট রাজকুমার কিন্তু সেই রক্তমাখা শাক ভাজা খায় নি। শিকার থেকে ফেরার পরই মাধুরী তাকে সব কথা বলেছিল। সে কিংবা মাধুরী প্রথমে ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পারে নি। তারপরে মাচা বেঁধে ছ'ভাই যেদিন মাধুরীকে জানাল, সেদিন ওকে নিয়ে ওরা শিকার-শিকার খেলবে, তখন দু'টি ভাইবোন সব বুঝল। চোখের জলে একে অন্যের কাছে বিদায় নিল। বোন বলল, 'দাদা, তুমি আমার মাংস খেও না। তুমি মাছ আর কাঁকড়া ধরে এনো। ওরা যখন মাংস খাবে তুমি খাবে মাছ, আর ওরা যখন হাড় চিবোবে তুমি চিবোবে কাঁকড়া। তারপর আমার উচ্ছিষ্ট মাংস আর হাড় তুলে নিয়ে একটি উইঢিবির কোকরে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ো।' কাঁদতে কাঁদতে মাধুরী মাচায় গিয়ে দাঁড়াল। বড়ো রাজকুমাররা কিছুতেই তাকে তীরবিদ্ধ করতে পারল না। তখন ছোট রাজকুমারকে তীর ছুঁড়তে বলল, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হল না। বড়ো রাজকুমাররা তখন তাকেই হত্যা করার ভয় দেখাল। তখন মাধুরী কাঁদতে কাঁদতে ছোট রাজকুমারকে বলল, 'দাদা' বোনের মাংস খাবার জন্য দাদারা যেখানে বোনকে মারতে চায়, সেখানে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। তুমি তীর ছোঁড়'। তখন ছোট রাজকুমার অনিচ্ছায় অন্যমুখে তীর ছুঁড়ল, কিন্তু সেই তীরেই মাধুরীর মৃত্যু হল। বড়োরা যখন মাধুরীকে কাটতে কুটতে ব্যস্ত, তখন ছোট ভাই মাছ আর কাঁকড়া ধরবার জন্য বেরিয়ে গেল। খাবার সময় সে মাধুরীর কথামতো পর্যায়ক্রমে মাছ আর কাঁকড়া চিবোল। শেষে পরিত্যক্ত মাংস আর হাড়গুলো নিয়ে গিয়ে একটি উইঢিবির কোকরে

মাটি চাপা দিল। কিছুকাল পরে ওখানে একটি সুন্দর বাঁশ গাছ গজিয়ে উঠল। এক ডোম বাঁশটি কেটে বাঁশি বানাল। তারপর সেই বাঁশি বাজিয়ে ভিক্ষে করতে বেরুল। বড়ো ছ'জন রাজকুমারের দোরে বাঁশি না বাজাবার জন্য বাঁশিটি ডোমকে মিনতি করল—

ইয়ার ঘরে বাজা'স না রে ডমু ভাই
ই ত বঠে দুষমণ ভাই।

ছোট ভাই-এর দোরে বাজাবার জন্য বাঁশি ডোমকে বলল—

ইয়ার ঘরে বাজাবি রে ডমু ভাই
ই ত বঠে সহদর ভাই।

বাঁশির স্বরে ছোট রাজকুমার মাধুরীর কণ্ঠস্বর চিনতে পারল। সে ডোমকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাঁশিটি হস্তগত করল। বাঁশিটি সযত্নে ঘরে তুলে রেখে সে রোজ গরুর পাল নিয়ে মাঠে যেত। ফিরে এসে দেখত কে যেন তার ঘরদোর নিকিয়ে রেখেছে। রান্নাবান্নার কাজও শেষ। দিনকতক সে এই ঘটনা লক্ষ্য করল। কিন্তু রহস্যভেদ করতে পারল না। তখন একদিন বাড়ির এক কোণে লুকিয়ে থাকল। মাধুরী বাঁশি থেকে বেরিয়ে ঘর দোর নিকোচ্ছে এমন সময় ছোট রাজকুমার আড়াল থেকে বেরিয়ে তার চুলের গোছা ধরে মুখ ঘুরিয়ে দেখল যে সে মাধুরী। তখন সে বাঁশিটি পুড়িয়ে দিল। অমনি মাধুরীর গা জ্বালা শুরু হল। তখন রাজকুমার তার গায়ে আমলা-মেথি-চুয়া-চন্দন লাগিয়ে দিল। দেখতে দেখতে মাধুরীর গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে গেল। তারপর দুই ভাইবোনে সুখেদুঃখে মিলেমিশে বাস করতে লাগল।

এই রূপকথাটিও ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক প্রাচীনত্বের কথাই ব্যক্ত করে। কাহিনীটিতে প্রথমেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে ক্যানিবালিজম বা নরমাংসলোলুপতার অভিপ্রায় (G 10)। পৃথিবীর সর্বদেশেই নরমাংসাহার অভিপ্রায়ের রূপকথার চল আছে। আদিম জাতিদের মধ্যে একদা নরমাংসাহার প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ শত্রুর বা অন্য গোষ্ঠীর লোকের মাংস তারা ভক্ষণ করত; তারা বিশ্বাস করত, তার ফলে মৃত ব্যক্তির ক্ষমতা বা গুণ তারা অর্জন করতে পারবে। কিন্তু এখানে নিছক নরমাংসাহারের প্রবৃত্তিই প্রবল এবং যার মাংস তারা খেল সে তাদের সহোদরা। এই রূপকথাটি সারা ঝাড়খণ্ড জুড়ে সামান্য হেরফের ছাড়া প্রায় একই আকারে দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বে ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া অঞ্চল পশ্চিমে

মধ্যপ্রদেশ উত্তরে সাঁওতাল পরগণা এবং দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিটি আদিবাসী-অর্ধআদিবাসী সমাজে এই কাহিনীটি প্রচলিত আছে।

এই কাহিনীর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়, অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির সমাধির ওপর বাঁশগাছের জন্ম (Reincarnation in plant—tree—growing on grave—E 6 31)। এ ছাড়া বাক্‌শক্তিসম্পন্ন বাঁশি অভিপ্রায়টিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে (F 810 ?)। এখানে Transmigration of soul বেশ সুপ্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। অনার্যসংস্কৃতির আত্মার আশ্রয়পরিবর্তনমূলক মীথ্-এর ইঙ্গিত এখানে আছে। Sir E.B. Tylor তাঁর Religion in Primitive Culture, II. গ্রন্থে বলেছেন, The temporary migration of souls into material substances, from human bodies down to morsels of wood and stone, is a most important part of the lower psychology. আলোচ্য রূপকথাটিতে husk-mythও প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বাঁশিটি মাধুরীর husk হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিগ্রহীতার সাময়িক অনুপস্থিতিতে কেউ যদি এই আবরণটি নষ্ট করে কিংবা পুড়িয়ে ফেলে তবে সে তার কায়াপরিবর্তনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মাধুরীর বাঁশগাছে কায়াপরিবর্তনকে Transformation বা রূপান্তর অভিপ্রায় হিসাবে গ্রহণ করা যায়। W.R S. Ralston এই Husk-myth কে an expansion of a Hindu myth[১] হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই আবরণটি পুড়িয়ে দেবার পর গাত্রদাহ শুরু হলে বিভিন্ন দেশের রূপকথায় প্রলেপ হিসাবে বিভিন্ন জিনিষের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের রূপকথায় আমলা-মেথি-চুয়া-চন্দনের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলোও অনার্যসংস্কৃতির চিহ্নাবশেষ।

রূপকথাগুলো আদিম অনার্যগোষ্ঠীর লোকেদের সৃষ্ট, একথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানে যেসব রাজা-রাজপুত্রদের কথা বলা হয়েছে তারা আসলে আদিবাসী সমাজের দলনায়ক এবং তাদের পুত্রবর্গ ছাড়া কেউ নয়। কাহিনীগুলোতে রাজপুত্র-রাজকন্যাদের অনুপ্রবেশ পরবর্তীকালে ঘটে থাকা অসম্ভব নয়। প্রায় গল্পেই শিকারের কথা আছে; স্বভাবতঃই রূপকথাগুলোতে

১ Introduction Indian Fairy Tales, Maive Stokes, London, 1880

আদিম মানবের শিকারবৃত্তির যুগের কথাই বলা হয়েছে, ধরা যেতে পারে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, রূপকথার বিশিষ্ট ধর্ম অনুসারে প্রায় কাহিনীতেই সাতজন রাজপুত্র এবং একজন রাজকন্যার কথা বলা হয়েছে। এই রূপকথা-গুলোর কোনটিই আদিম পূজাপদ্ধতির ভাষামন্ত্র নয় কিংবা কথানায়ক-নায়িকাগণ অপদেবতা অথবা ডাইনী গুণী অথবা ভূত নয়।

মানুষের জীবন তুচ্ছ হিংসা-লোভ পরশ্রীকাতরতা আদিম ভয়াবহতায় ভরা। সপত্নীহিংসা, সপত্নী-পুত্রকন্যাদের প্রতি ঘৃণা কিংবা ননদভাজের বিষাক্ত সম্পর্ক এখনো ঝাড়খণ্ডের দৈনন্দিন জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ঝাড়-খণ্ডের রূপকথাও তাই এই সব অভিপ্রায়ের সমাহারে এক অনবদ্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। সপত্নী-হিংসা এবং তার ফলশ্রুতি যে কি মারাত্মক হতে পারে তার পরিচয় আমরা নিচের রূপকথাটি থেকে সহজেই অনুভব করতে পারি।

৩ এক রাজার সাত রানী। রাজার ছেলেপিলে নেই। এক সাধু তাঁর দুঃখ শুনে বললেন, 'যাও, অই যে আম গাছ দেখছ, ওখান থেকে আম পাড়বে। ডান হাত দিয়ে ঢিল ছুঁড়ে, বাম হাত দিয়ে শূন্যে সাতটি আম লুফে নিয়ে রানীদের দিয়ো। রানীরা যেন স্নান করে শুদ্ধ পবিত্র মনে জনে-জনে একটি করে আম খায়, তাহলেই সন্তান হবে।' রাজা সাধুর কথামতো আম পেড়ে রাজমহলে ফিরে পাটরানীর হাতে সব ক'টি আম দিয়ে সাধুর কথা বললেন। ছোট রানী তখন আড়ালে, রান্নাঘরে। ওর রূপযৌবনের জন্য বড়ো রানীরা সবাই তাকে হিংসা করত। তাই বড়ো রানীরা ওকে ফাঁকি দিয়ে সাতটা আম নিজেরাই ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেলল। ছোটরানী এসে ওরা কি খেল জিজ্ঞেস করতেই ওরা জ্বলে উঠে দাঁত খিচিয়ে উঠল। তখন ছোট রানী ফেলে-দেওয়া আঁটি সাতটি খেয়ে শিলনোড়া ধুয়ে জলটাও খেয়ে ফেলল। যথাসময়ে ছোট রানীর গর্ভ প্রকাশ পেল, কিন্তু বড়ো রানীদের কোন গর্ভলক্ষণ দেখা গেল না। রাজা ছোট রানীর ওপর সন্তুষ্ট হলেন। সপত্নীরা হিংসায় জ্বলতে লাগল। প্রসবের দিন কতক আগে রাজা বিশেষ কাজে রাজ্যভ্রমণে বেরুলেন। দু'টি সোনার ঘণ্টা রুপোর ঘণ্টা দিয়ে বললেন, 'যদি ছেলে হয় সোনার ঘণ্টা বাজাবে, আর যদি মেয়ে হয় তো রুপোর ঘণ্টা। ঘণ্টার শব্দ পেলেই আমি যেখানে থাকি না কেন সেখান থেকে চলে আসব। অকারণে কিন্তু ঘণ্টা বাজিয়ো না।' যথাকালে ছোট রানী সাত ছেলে আর এক

মেয়ের জন্ম দিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বড়ো রানীরা বাচ্চাগুলোকে তক্ষুনি গোবরগাদায় সরিয়ে রেখে পোড়া কাঠ ঠুটকো ঝাঁটা এনে ছোট রানীর বিছানায় রেখে দিল। তারপর রুপোর ঘণ্টাটি বাজিয়ে দিল। রাজা এলে রাজাকে দেখাল ছোটরানী অই সব পোড়া কাঠ ঠুটকো ঝাঁটা প্রসব করেছে। রাজা রেগেমেগে ছোটরানীকে সেই মুহূর্তে ঘোড়াশালে নির্বাসন দিলেন। তারপর ক্ষুব্ধচিত্তে আবার রাজ্যভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন। একটু রাত্তির হলে বড়ো রানীরা বাচ্চাগুলোকে কুমোরের গর্তে ফেলে দিয়ে এল; ভাবল, শেয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলবে। এদিকে সকালবেলা নিঃসন্তান কুমোরদম্পতি ওদের পেয়ে হাতে স্বর্গ পেল। আদরে-যত্নে বাচ্চাগুলো বেড়ে উঠতে লাগল। একদিন কাঠের ঘোড়া আর মাটির পুতুল নিয়ে সাত ভাই এক বোন রাজার পুকুরে গেল। ওরা বলতে লাগল, 'কাঠের ঘড়া মাটির পুথুল, পানী পিঅ।' স্নান করতে-করতে রানীরা অবাক হয়ে ঘটনাটা দেখল। রানীরা ওদের চিনতেও পারল, দুর্ভাবনা বাড়ল। তাই বাচ্চাগুলোকে ডেকে আদর করে বিষ-মেশানো মিষ্টান্ন খাইয়ে মেরে ফেলল আর একটা গর্তে ফেলে দিল। ওখানে একটি সুন্দর গাছ হল। তাতে নানান রঙের আটটি ফুল ফুটল। গন্ধে চারপাশ ভরে উঠল। চাকরের মুখে খবর পেয়ে রাজা এলেন ফুল পাড়বার জন্য। পারুল ছিল প্রায় নাগালের মধ্যে। রাজাকে দেখে পারুল অন্য ফুলদের ডেকে বলল—

রাজা মশাই ফুল খুঁজছে দিব কি নাই
ভাইরে, দিব কি নাই।

অন্য সাতটি ফুল তখন বলল—

দিঅ না দিঅ না ফুল পারুল বহিন সগ্‌গে ফেঁক ডাল
এত এত ছাল্যা থা'কতে মায়ের ঘড়াশাল।

ফুলেরা সব হাতের নাগালের ওপরে উঠে গেল। এবার রানীরা এল, কিন্তু কেউই ফুলের নাগাল পেল না। হাত বাড়ালেই ফুলগুলো ওপরে উঠতে উঠতে আসমানে নাচতে শুরু করে। তখন ফুলেরা রাজাকে বলল, 'ছোট রানীকে ঘোড়াশাল থেকে নিয়ে এলে তবেই ফুল পাবে'। ছোট রানীকে তক্ষুনি নিয়ে আসা হল। ওকে দেখে সব ক'টি ফুল ঝুপঝাপ করে তার কোলে ঝরে পড়ল। আশ্চর্য, রাজা দেখল, ওরা আর ফুল নেই, সাতটি সুন্দর ছেলে আর একটি

ফুলকন্যা ছোট রানীর কোল আলো করে তুলছে। রাজা বললেন, 'এ কি করে হয়'। ছেলেমেয়েরা বলল, 'যেমন করে মানুষের পেটে মানুষ না জন্মে পোড়া কাঠ ঠুটকো ঝাঁটার জন্ম হয়'। তখন রাজা সব বুঝতে পারলেন। বড়ো রানীদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ছোট রানী আর সাত ছেলে এক মেয়ে নিয়ে রাজা আবার সুখে ঘর বাঁধলেন।

রূপকথাটি 'সাত ভাই চম্পা'র একটি রূপান্তর, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রূপকথাটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঝাড়খণ্ডে এসেছে, নাকি এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রচারিত হয়েছে, তা তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। তবে এই রূপকথাটিতে যে আদিম রুক্ষতা পরিলক্ষিত হয় তা পশ্চিমবঙ্গের প্রভাববর্জিত। গল্পটিতে সপত্নীহিংসা এবং পাপের শাস্তি বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া তুকতাক এবং ম্যাজিকের ছড়াছড়ি সমস্ত কাহিনীটিকে একটি অসাধারণ অলৌকিকতা দিয়েছে। গাছ থেকে আম পাড়া কিংবা আম বেঁটে খাওয়ার মধ্যে কিছু কিছু Ritual বা আচার-অনুষ্ঠান দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পোড়া কাঠ ঠুটকো ঝাঁটা ঝাড়খণ্ডে ভূত প্রেত ডাইনী তাড়াবার অলৌকিক জাদুদণ্ড হিসাবে এখনো ব্যবহৃত হয়। কাহিনীটিতে এগুলো ব্যবহারের ফলে গল্পরস আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। Huskmyth এর সন্ধান এখানেও পাওয়া যায়। কিন্তু পার্থক্য এই এখানে Huskটি নষ্ট করবার কোন প্রয়োজন পড়ে নি। মৃত শিশুদের আত্মার কায়াপরিবর্তন যেমন সহজভাবে প্রথমে বৃক্ষে এবং তারপর সাতটি ফুলে সংঘটিত হয়েছে, তেমনি ফুলগুলোর কায়াপরিবর্তন ঘটেছে শিশুশরীরে। রূপকথাটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এটির মধ্যে নানান উপকরণ এবং অভিপ্রায়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

রূপকথাটির মধ্যে অনেক ক'টি অভিপ্রায়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায় হল Talking Flowers বা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পুষ্প। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায় হল মৃত শিশুদের সমাধির ওপর ফুল গাছের জন্ম (Reincarnation in plant growing on grave—E631)। তৃতীয়তঃ পাশবিক নিষ্ঠুরতা (unnatural cruelty), বিমাতাগণ শিশুদের প্রথমে গোবর গাদায়, পরে কুমোরের গর্তে নিক্ষেপ করেছিল এই আশায় যে শেয়াল-কুকুর তাদের খেয়ে ফেলবে। কিন্তু দৈবের কৃপায় তারা রক্ষা পেয়ে যায়, কুমোরদম্পতি তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে লালনপালন করে। পরে বিমাতারা

যেদিন তাদের পুকুরঘাটে দেখে, সেদিন বিষাক্ত মিষ্টান্ন খাইয়ে মেরে ফেলে। ফলে এখানে চতুর্থ অভিপ্রায় নিষ্ঠুর বিমাতা (cruel stepmother) সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। সপত্নীঈর্ষ্যা (jealousy of co-wives)-ও এর অন্যতম অভিপ্রায়। বড়ো রানীরা ছোট রানীর রূপযৌবনের জন্য তাকে ঈর্ষ্যা করত ; তার ওপর ছোট রানী যখন গর্ভবতী হল এবং আটটি সন্তানের জন্ম দিল তখন তাদের ঈর্ষ্যা চরমে ওঠে। বিধি-নিষেধ (Taboo) এর আর একটি অভিপ্রায়। সাধু শুদ্ধ পবিত্র মনে আম খেতে বলেছিলেন। কিন্তু ঈর্ষ্যাকাতর বড়ো রানীরা ছোট রানীকে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, স্বভাবতঃই তারা মনের শুদ্ধি এবং পবিত্রতা হারিয়েছিল, ফলে তারা সন্তানের জননী হতে পারে নি। শেষতক তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল, যা আর একটি অভিপ্রায় হিসাবে ধরা যেতে পারে। আম ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু হিসাবে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে ; আম খেয়ে ছোটরানী সন্তানের জননী হতে পেরেছিল, এটি magic remedies for barrenness অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া বিজয়িনী ছোট রানী (successful youngest queen) অভিপ্রায়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৪ এক রাজার সাত ছেলে। বড়ো ছ'টি ব্যবসা করে, শিকারে যায়, রাজত্ব দেখে। কিন্তু ছোট রাজপুত্র একেবারে কুঁড়ের বাদশা। কেউ তাকে ভাল বাসত না। একদিন সে রাগে অভিমানে কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেল। একটি শাহড়া গাছে সে কোপ লাগাতে শুরু করল। তখন সে শুনতে পেল কে যেন বলছে, 'ধারে ধারে কেটো ওরে মধ্যিখানে আমি আছি বসে।' তখন ছোট রাজপুত্র একটু একটু করে গাছটা কেটে ফেলল। দেখল ভেতরে একটি ফুল রয়েছে। ফুলটি হাত দিয়ে ছোঁয়ামাত্র একটি পরমাসুন্দরী রাজকন্যা হয়ে গেল। শাহড়া ফুল থেকে তার জন্ম বলে তার নাম হোল শাহড়াবতী। ছোট রাজপুত্র পরম আদরে তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে এল। শাহড়াবতীকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হত না। তার মতো সুন্দরী তখন সারা তল্লাটে কেউ ছিল না। তার গায়ের রঙ ফুলের মতো, তার মাথায় মেঘবরন বারো হাত লম্বা চুল। একদিন রাজপুত্রেরা ব্যবসায় বেরুল। যাবার সময় শাহড়াবতীকে নির্দেশ দেওয়া হল, স্নান করবার জন্য সে যেন নদীতে না যায়। বিদেশ থেকে ছোট রাজপুত্র শাহড়াবতীর জন্য কি আনবে জিজ্ঞেস করায় শাহড়াবতী জানাল যেন ছোট রাজপুত্র তার জন্য একটি

তসব শাড়ি আব একটি বেগুনী রঙেব শাড়ি নিয়ে আসে। শাহডাবতী বাইরে যায় না। রাজমহলের ভেতর রোজ স্নান করে। একদিন মাথার চুল খুব ময়লা হয়েছে দেখে দাসীদের বলল, 'চল নদীতে যাই, এ চুল বাড়িতে পরিষ্কার করা যাবে না।' নদীতে চুল ঘষতে ঘষতে এক গাছা চুল উঠে গেল। পাছে চুলে জড়িয়ে মাছ মবে তাই শাহডাবতী পাতাব পোঁটলায় মুড়ে চুলটি জলে ভাসিয়ে দিল। সেই নদীব নিচেব ঘাটে অন্য দেশের রাজা স্নান করছিল। পুঁটুলির ভেতর বারো হাত লম্বা চুল দেখে চুলের রূপসীকে খুঁজে বের করবার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে যেখানে শাহডাবতী স্নান করছিল সেখানে চলে এল এবং শাহডাবতীকে জোর কবে ধবে নিয়ে গেল। শাহডাবতী জানাল তার ছ' মাসের ব্রত উদ্‌যাপন না হলে সে রাজাকে বিয়ে করতে পারবে না। এদিকে বাণিজ্য থেকে ফিরে শাহডাবতীকে না পেয়ে ছোট রাজপুত্র পাগলের মতো হয়ে গেল। তসর শাড়িব ঝুলি বানিয়ে এবং বেগুনী রঙের শাড়ির পাগড়ি বেঁধে যোগী বেশে রাজপুত্র ঘর ছেড়ে বেরুল। পথে রাখালদের কাছে টিকটড দু'টি পাখি কিনে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই রাজার দেশে এসে পৌঁছল। রাজার দোরে সে কাবো হাতে ভিক্ষে নিতে চায় না। এদিকে শাহডাবতী রাজপুত্রের কণ্ঠস্বব শুনে চিনতে পেরেছে। রাজপুত্র যখন শাহডাবতীব হাতে ছাড়া আব কারো হাতে ভিক্ষে নেবে না জানাল, তখন রাজা কুকুর লেলিয়ে দিয়ে রাজপুত্রকে মেবে ফেলল। শাহডা-বতী বলল, 'যোগীকে রাজবাড়ির বাইবে পোড়াতে নেই।' রাজা যোগীকে পোড়াবার জন্য রাজবাড়ির ভেতরেই চিতা সাজাবার আদেশ দিল। তখন শাহডাবতী বলল, 'আমি কখনো যোগী পোড়ানো দেখিনি, আমি যোগী পোড়ানো দেখব।' যখন চিতায় আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, তখন শাহড়াবতী চিতায় ঝাঁপ দিল। দুষ্ট রাজাও সঙ্গে সঙ্গে চিতায় ঝাঁপ দিয়ে শাহড়াবতীকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কবল। সবাই এক সাথে পুড়ে ছাই হল। এদিকে সেই টিকটড পাখি দু'টি রাজপুত্র আর শাহডাবতীর হাড়গুলো বেছে জড়ো করল। তারপর অমৃতকুণ্ড থেকে জল এনে ছিটিয়ে দিল। অমনি ওরা বেঁচে উঠল। তারপর ওরা একটি প্রকাণ্ড মাঠের চারপাশে ঘুরল, আর দেখতে-দেখতে ওখানে একটি আশ্চর্য সুন্দর রাজবাড়ি তৈরী হল। ওখানেই ওরা সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

রূপকথাটি বিদ্যুৎচমকের মতো রামায়ণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শাহড়াবতী এবং সীতার মধ্যে সমান্তরাল মিল না থাকলেও আপাতঃ মিল খুঁজে বের করা কঠিন নয়। সীতার জন্ম হয়েছিল মাটি থেকে, শাহড়াবতীর শাহড়া গাছ থেকে। রাবণ সীতাকে কেশাকর্ষণ করে অপহরণ করে, শাহড়াবতীর বেলাতেও সুদীর্ঘ কেশ তার সর্বনাশের মূল কারণ অর্থাৎ সেও অপহৃত হয়েছিল। রাবণের মতো দুষ্ট রাজারও পরিসমাপ্তি মৃত্যুতে। সীতার অগ্নি পরীক্ষার মতো শাহড়াবতীও চিতাতে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং পুনরায় বেঁচে উঠেছিল। শাহড়াবতীর গল্পে Myth-এর স্পন্দন পাওয়া যায়। W. Grimm হয়তো এই ধরনের Myth-কেই the broken down forms of forgotten myth বলেছেন। রূপকথাটিতে আরো কয়েকটি জিনিষ লক্ষণীয়। প্রথমতঃ সমাজজীবনের বিশেষ ছাপ রয়েছে রাজার ছেলের কুড়ুল হাতে কাঠুরে বৃত্তিতে। রূপকথাটি যে অত্যন্ত প্রাচীন তা এখান থেকেই উপলব্ধি করা যায়। রাজা অভিধাটি সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। এ কাহিনী সেই সময়ের যখন পেশা কিংবা বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ ঘটেনি। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রধানের বা সর্দার বা গোষ্ঠীনায়কের ভূমিকা কিছু কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি লাভ করেছে মাত্র। অবশ্য বর্তমান ঝাড়খণ্ডেও গ্রাম-প্রধান বা সর্দাররা এখনো স্বহস্তে মাটি কাটা, লাঙল চালানো, কাঠ কাটা, ফসল কাটা কাজগুলো করে. থাকে ; এখানকার সমাজ-ব্যবস্থা আদিম কোম বা গোষ্ঠীজীবনকে এখনো অনেকাংশে অনুসরণ করে চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ গাছের ভেতর ফুল, ফুলের ভেতর রাজকন্যা শাহড়াবতী একমাত্র রূপকথার অলৌকিক জাদুমন্ত্রেই সম্ভব। এখানে সহজেই অলৌকিক জন্ম, বিস্ময়, রূপপরিবর্তন আদি অভিপ্রায়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়। তৃতীয়তঃ বাধা-নিষেধ ; শাহড়াবতীকে নদীতে স্নান করতে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল, এবং সে তা শোনে নি বলে বিপদে পড়তে হয়েছিল। চতুর্থতঃ রাজপুত্র এবং শাহড়াবতীর virtue জয়ী হয়েছে এবং পাপী রাজার vice বা পাপ জীবনের মূল্যে শাস্তি পেয়েছে। এই অভিপ্রায়টি অবশ্যই নীতিমূলক। পঞ্চমতঃ মৃতের পুনর্জীবনলাভ অভিপ্রায়টি (Resuscitation) অন্য একটি অভিপ্রায় অমৃতকুণ্ডের জল (Water of life)-এর মেলবন্ধনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এই অভিপ্রায়টিও রূপকথার সব দেশেই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এ ছাড়া উপকারপ্রাপ্ত প্রাণীর (এখানে টিকটড় পাখি) কৃতজ্ঞতামূলক সেবা এবং অলৌকিক রাজপ্রাসাদ (মাঠের চারপাশে

ঘোরার ফলে আশ্চর্য রাজপ্রাসাদের সৃষ্টি) অভিপ্রায়গুলোও উপেক্ষণীয় নয়। রাজপুত্র এবং শাহজাদীর পুনরায় জীবিত হয়ে-ওঠার মধ্যে আদিম মানুষের মৃত্যুকে পরাজিত করে, অমৃতকে লাভ করবার দুর্বার ইচ্ছা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। মানুষের জীবন-চেতনা মৃত্যুকে ব্যর্থ করে কাহিনীটিকে একটি সার্থক রূপকথার মহিমা দান করেছে।

৫ এক যে থাকে সুখী আর দুখী। সুখীরা বড়ো লোক। সুখীর বড়ো অহংকার, দুখীকে মুখে রা ও কাড়ে না। দুখীরা বড়ো গরীব, তুলোর ব্যবসা করে খায়। একদিন রোদ্দুরে তুলো শুকোচ্ছে, এমনি সময় ঝড় উঠল। সব তুলো উড়ে যেতে লাগল। দুখীও তুলোর পেছনে পেছনে দৌড়তে লাগল। যেতে যেতে কলাগাছ কলাকাঁদির সাথে দেখা হল। ওরা বলল, 'দুখী, কোথায় চললি।' দুখী বলল, 'আমার তুলো উড়ে যাচ্ছে, তাই তুলোর পেছনে দৌড়চ্ছি।' পথে ঘোড়ার পালের সাথে দেখা হল। 'শিব' ঘোড়াটা বলল, 'দুখী, তুই কোথায় যাচ্ছিস?' দুখী বলল, 'আমরা বড়ো গরীব, তুলোর ব্যবসা করে খাই। তুলোগুলো সব ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে, তাই পেছনে-পেছনে দৌড়চ্ছি।' দুখী আরো এগিয়ে চলল। এবারে রাস্তায় গরুর পালের সাথে দেখা হল। গরুর পালের জিজ্ঞাসার জবাবে সে একই কথা বলল। দুখী এগিয়ে যেতে যেতে একেবারে সূর্যের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। সূর্য ঠাকুর দুখীকে দেখে বলল, দুখী, তুই এলি, এবার তোর কথা বল।' তখন দুখী তাদের দুঃখের কথা জানাল। সূর্য ঠাকুর বলল, 'ওই উত্তর দিকের পুকুরে ডুব দিয়ে আয়। মোট তিনবার ডুব দিবি, বেশি দিস না। দু' বার ডুব দিলে তোর খুব গহনা হবে. তিনবার ডুব দিলে তুই রূপসী হবি।' দুখী পুকুরে ডুব দিতে গেল। দু'বার ডুব দিতেই তার সারা গায়ে সোনা হীরে-মাণিকের গহনা ঝলমল করে উঠল। তিনবার ডুব দিতে সে অপরূপা সুন্দরী যুবতী রাজকন্যার মতো হয়ে গেল। স্নান করে সে সূর্য ঠাকুরের কাছে ফিরে এল। তখন সূর্য ঠাকুর একগাদা শাড়ি দিয়ে বলল, 'তোর যেটা খুশি পরে নে।' কতো দামী শাড়ি, দুখী এতো শাড়ি জীবনে দেখে নি। ও বলল, 'আমি সস্তা শাড়িটাই পরি।' সূর্য ঠাকুর বলল, 'না না, তুই দামীটাই পর।' দুখী কিন্তু সেই সস্তা শাড়িটাই পরল। তখন সূর্য ঠাকুর বলল, 'তোর যা যা খুশি নিয়ে নে। যতোগুলো বইতে পারবি, সব নে।' দুখী দেখল তার চার পাশে থরে-থরে কতো দামী জিনিষ সাজানো

রয়েছে। যে কোন লোকেরই লোভ হবে। কিন্তু দুখী গরীব, ওসব জিনিষে ওর লোভ হোল না; কি হবে ওসব নিয়ে, তুলো ব্যবসা করে তো খাবার জোটাতে হয়। দুখী ছোট্ট পেড়ীতে দু' চারটে সস্তা শাড়ি আর জিনিষ ভরে নিল। সূর্য ঠাকুর বলল, 'ওই ছোট্ট পেড়ীতে ক'টা জিনিষ ধরল? একটা বড় পেড়ীতে সব ভরে নে।' দুখী কিন্তু ছোট্ট পেড়ীটাই নিল। সূর্য ঠাকুরকে বলল, 'আমি এবার যাই।' সূর্য ঠাকুর বলল, 'তাই যা। তোর আর কোন দুঃখ থাকবে না। তুই বড় উদার, তোর লোভ নেই; আমি বড়ো খুশি হয়েছি। তোর অই পেড়ীর জিনিষ কোনদিন শেষ হবে না। যা চাইবি, তাই পাবি।'

দুখী আবার সেই পথ ধরে ঘরে ফিরে চলল। আবার গরুর পালের সাথে দেখা হল। ওরা বলল, 'দুখী, তুই ফিরে এলি? চল্ তোর সাথে আমরাও যাই।' দুখীর পেছনে-পেছনে গরুর পাল চলতে লাগল। এবার ঘোড়ার পালের সাথে দেখা হল। ওরাও বলল, 'চল, আমরাও তোর সাথে যাই। দুখী, তুই বড়ো কাহিল হয়েছিস, তোর পেড়ীটা আমাদের পিঠে তুলে দে, আর তুইও কারো পিঠে উঠে বস্।' দুখী ঘোড়ার পিঠে পেড়ী রাখল, নিজে চাপল। কিছু দূর যেতে কলাগাছ কলা কাঁদির সাথে দেখা হল। ওরাও দুখীর সাথে চলল। দুখীর মা দূর থেকে দুখীকে দেখে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ওগো, আমাদের দুখী ফিরে আসছে। সঙ্গে আছে কলাগাছ কলা কাঁদি, ঘোড়ার পাল, গরুর পাল, ঘোড়ার পিঠে পেড়ী-পেটরী।' দুখীর মায়ের খুশির অন্ত নেই। দুখীদের দুঃখ কাটল।

দুখীর রূপ, গাভরতি গহনা, ধনসম্পত্তি, কলাগাছ, ঘোড়ার পাল গরুর পাল দেখে সুখীর খুব হিংসে হল। বলল, 'আমিও তুলোর ব্যবসা করে দুখীর মতো সব নিয়ে আসব।' সুখী তুলোর ব্যবসা করে। একদিন ঝড় এল। ঝড়ে-ওড়া তুলোর পেছনে সুখী দৌড়তে লাগল। পথে পড়ল কলাগাছ কলাকাঁদি, ঘোড়ার পাল, গরুর পাল। সুখী কারো কথার জবাব দিল না, কারো দিকে ফিরেও তাকাল না। সুখী সোজা সূর্য ঠাকুরের ঘরে চলে গেল। সূর্য ঠাকুর সুখীকেও উত্তর দিকের পুকুরে স্নান করে আসতে বলল। বলল, 'মনে রাখিস, তিনবার ডুব দিবি, বেশিও না কমও না। দু'বার ডুব দিবি, গা-ভরতি গহনা পাবি। তিনবার ডুব দিবি. আলো-করা রূপ পাবি।' সুখী আনন্দে ডগমগ হয়ে পুকুরে স্নান করতে গেল। দু'বার ডুব দিল, গা-ভরতি গহনা হল। তিনবার

ডুব দিল, আলো-করা রূপ হল। সুখী ছিল দারুণ লোভী। ভাবল, আব একবার ডুব দিলে না জানি আবো কি পাব। যেই আর একবাব ডুব দিয়েছে, অমনি কোথায় গেল গা-ভবতি গহনা আর আলো-কবা রূপ। সুখী তার আগের চেহাবাও হাবাল, দেখতে ভীষণ বিশ্রী হয়ে গেল। সুখী কাঁদতে-কাঁদতে সূর্যেব কাছে গেল। সূর্য বলল, 'আমি কি করতে পাবি, নিজের দোষে চারবাব ডুব দিয়ে তো এই দশা ঘটালি। দুঃখ করে আর কি হবে। নে, শাড়িব গাদা থেকে তোব পছন্দ মতোন শাড়ি বেছে নিয়ে পবে নে।' বলে একগাদা শাড়ি দেখিয়ে দিল। সুখী একটা খুবই দামী শাড়ি পরল। সূর্য ঠাকুব বলল, 'তোব যা যা খুশি, পেড়ী ভবে নিয়ে নে।' সুখী একটা মস্ত বড়ো পেড়ী ভবে জিনিষপত্তব নিয়েছে, বইতে তাব ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। একটু হাঁটে আবাব একটু জিবিয়ে নেয়। সুখী খুব কাঁদতে লাগল। গরুব পালকে দেখে পেড়ীটা পৌছে দিতে বলল। গরুব পাল ওব ওপব বেগে ছিল, এবারে তেড়ে এসে লাথি আব গুঁতো লাগাল। সুখীব পেড়ী-পেটী পড়ে গেল, শাড়ি ছিঁড়ে গেল। এবাবে দেখা হল ঘোড়াব পালেব সঙ্গে। ঘোড়াবাও বেগে ছিল, সুখীব কথায় লাথি লাগাল। সুখীর প্রাণ যায়-যায়। সে আব কোন দিকে না তাকিয়ে কলাগাছকে পেছনে ফেলে ছেঁড়া কাপড়ে এলোচুলে হতকুচ্ছিৎ চেহাবা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিবল। সুখীব দশা দেখে সুখীব মা কেঁদে ফেলল, সুখীবা এবার খুব গবীব হল, আব দুখীবা খুব বড়োলোক হল।

রূপকথাটি অবিকল একটি ব্রতকথাব মতো। ব্রতকথার প্রতিটি লক্ষণ এর মধ্যে বর্তমান। সূযপূজাব ব্রতকথা হিসাবে সহজেই এটিকে স্বীকাব করে নেওয়া যায়। অবশ্য সূযব্রত ঝাড়খণ্ডেব কোথাও চল নেই বা এটি ব্রতকথাও নয়। এমনও হতে পাবে, কোন দিন এটা ব্রতকথাই ছিল। আবাব কোনদিন এটা ব্রতকথা হিসাবে ব্যবহৃত না হলেও এটা যে ব্রতকথাব স্বীকৃতি পেতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্রতকথা এবং রূপকথাব মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট সীমাবেখা টানা সম্ভব নয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচায ঠিকই বলেছেন, 'বিশ্লেষণ কবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পাবা যাইবে যে অনেক প্রচলিত ব্রতকথাই রূপকথা কিংবা উপকথার ক্ষেত্র হইতে আসিয়াছে এবং অতি সহজেই ইহাদের মধ্য হইতে ধর্মীয় লক্ষ্যটুকু পবিত্যাগ কবিয়া ইহাদিগকে পুনবায় রূপকথা কিংবা উপকথাব ক্ষেত্রে ফিবাইয়া লইয়া আসিতে পাবা যায়।'[১০] সুখী দুখীর

[১০] বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১১

কাহিনীতে রূপকথার বিভিন্ন অভিপ্রায় যে আছে তা একটু পরেই বিশ্লেষণ করে দেখানো যাবে। এটি যে ব্রতকথারও লক্ষণাক্রান্ত, প্রথমে তাই বিশ্লেষণ করে দেখানো হচ্ছে। ব্রতকথায় দৈব বা ভাগ্যই মুখ্যস্থান অধিকার করে থাকে। লৌকিক দেবতা থাকলেও তা যে দৈবেরই রূপক চরিত্র, তাতে সন্দেহ নেই। ব্রতকথায় দৈব অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ একটি অপরিহার্য অভিপ্রায়। মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনাই ব্রতকথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে। অলৌকিকতার স্পর্শ থাকলেও প্রায়-বাস্তব জীবন-ধর্মী উপাখ্যানই ব্রতকথার বিষয়বস্তু। সুখী-দুখীর গল্প বিশ্লেষণ করলেও আমরা এই লক্ষণগুলো সহজেই খুঁজে পেতে পারি। সুখী দুখীর জীবনে দৈব বা ভাগ্যই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লৌকিক দেবতা সূর্য এখানে উপস্থিত থাকলেও দৈবই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করেছে। দৈবের প্রসাদে দুখী সুখের জীবন পেয়েছে, আর সুখী স্বচ্ছল জীবন হারিয়ে দুঃখের জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। দৈব যেন নানান রূপে সুখী এবং দুখীকে পরীক্ষা করেছে; দুখী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভাগ্যবতী হয়েছে এবং সুখী তার অপরিমিত লোভের জন্য ভাগ্যহীনা হয়েছে। সুখের এবং দুঃখের দু'টি সংসারের দু'টি চরিত্র তাদের মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা-বাসনা সহ যে-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে কাহিনীটি একটি জীবনধর্মী উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে।

এই রূপকথাটির প্রধান অভিপ্রায় দৈব অনুগ্রহও নিগ্রহ। দুখী তার উদার নির্লোভ স্বভাবের জন্য দৈব অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং অযথা লোভের জন্য সুখী দৈব কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় অভিপ্রায়টি হল বাকশক্তিসম্পন্ন বৃক্ষ (কলাগাছ) এবং পশু (ঘোড়া এবং গরু)। তৃতীয় অভিপ্রায় ইন্দ্রজাল বা জাদু; তিনবার ডুব দিলেই গা-ভরতি গহনা এবং আলো-করা রূপ একমাত্র জাদুমন্ত্রেই সম্ভব, এখানে তিনটি ডুব ইন্দ্রজালের কাজ করেছে। চতুর্থ অভিপ্রায় বাধা-নিষেধ; সূর্য তিনবারের বেশি ডুব দিতে নিষেধ করেছিল, সুখী লোভে পড়ে চারবার ডুব দিতে গিয়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পঞ্চম অভিপ্রায় অফুরন্ত জিনিষপত্রের পেড়ী-পেটী (inexhaustible treasure); দুখীর নির্লোভ স্বভাবের জন্য সূর্য ঠাকুর তার পেড়ীকে অফুরন্ত ভাঁড়ারে পরিণত করেছিল। ষষ্ঠতঃ দয়ালু এবং সাহায্যকারী বৃক্ষ ও পশু; দুখীর নিরহংকার স্বভাবের জন্য কলাগাছ, গরুর পাল ও ঘোড়ার পাল তাকে সাহায্য ও সেবা করেছিল। এছাড়া নির্লোভের পুরস্কার এবং লোভীর শাস্তিও এই কাহিনীর

অন্যতম উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়। বলাবাহুল্য এখানে কিছুটা নীতিকথাও প্রকাশ লাভ করেছে, যা রূপকথার ধর্ম না হলেও ব্রতকথার ধর্ম।

অতঃপর আমরা রূপকথার আলোচনা শেষ করব সেই কথাগুলো দিয়ে যা শোনবার জন্য ছেলেবেলায় ঠাকুরমার গল্প কখন শেষ হবে তার অপেক্ষা করে থাকতাম :

আমার কহনী ফুরাল্য / লট্যা গাছটি বুঢ়াল্য।
কেনে রে লট্যা গাছ বুঢ়ালি ?—গরুয় কেনে খায়।
কেনে রে গরু খা'স ?—বাগালে কেনে চরায় নাই।
কেনে রে বাগাল চরা'স নাই ?—গুলিনে কেনে ভাত দেয় নাই।
কেনে রে গুলিন ভাত দিস নাই ?—ছাল্যা কেনে কাঁদে।
কেনে রে ছাল্যা কাঁদিস ?—পিঁপড়ায় কেনে কামড়ায়।
কেনে রে পিঁপড়া কামড়া'স ?—জল কেনে করে নাই।
কেনে রে জল করিস নাই ?—বেঙ কেনে ডাকে নাই।
কেনে রে বেঙ ডাকিস নাই ?—সাপে কেনে খায়।
কেনে রে সাপ খা'স ?
আমার চাষ ন বাস, আমার টুরি বে'ঙই আশ॥

পঞ্চম অধ্যায়
ব্রতকথা

ঝাড়খণ্ডে খুব বেশি ব্রতের প্রচলন নেই। করম এবং জিতিয়া এখানকার প্রধান ব্রত। ধরম পূজাকেও ব্রতানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জিতিয়া এবং ধরম ব্রত প্রধানতঃ পুত্রসন্তানের মঙ্গলকামনায় উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে ; এই দু'টি ব্রতের লক্ষ্যবস্তু সন্তান। এই দু'টি ব্রত কিন্তু করমের মতো সর্বজনীন নয়। করম ব্রতে গ্রামের যে কোন কুমারী কন্যা অংশগ্রহণ করতে পারে, এমন-কি ছোট ছোট ছেলেরাও অংশগ্রহণে অধিকারী হতে পারে ; কিন্তু জিতিয়া বা ধরম ব্রতে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে না ; যে-পরিবারে

ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, শুধুমাত্র সেই পরিবারের লোকেরাই অংশগ্রহণ করতে পারে। কেউ কেউ বাঁধনা উৎসবকেও গো-ব্রত হিসাবে উল্লেখ করবার পক্ষপাতী। বাঁধনা পরব ঝাড়খণ্ডে ব্রত হিসাবে উদ্‌যাপিত হয় না। এমন কি টুসু পরব, যা পশ্চিমবঙ্গে তোষলা ব্রত নামে পরিচিত, ব্রত হিসাবে পালিত হয় না। ব্রতের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল, এটি উদ্‌যাপনের জন্য 'বার' (<ব্রত ?) বা উপবাস একান্ত প্রয়োজন। বাঁধনা বা টুসু পরবে উপবাসের কোন প্রয়োজন পড়ে না। তাছাড়া ব্রতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, ব্রতকথা, বাঁধনা বা টুসু পূজার পেছনে কোন ব্রতকথা খুঁজে পাওয়া যায় না। করম, জিতিয়া এবং ধরম ব্রতের সঙ্গে ব্রতকথাও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ধরম পুজা প্রসঙ্গে আমরা ব্রতকথার সারাংশ এবং গানের অংশবিশেষ উল্লেখ করেছি। সাম্প্রতিককালে বাঁধনা পরবের সময় পুরাণ থেকে আহৃত কপিলা গাভীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত কপিলামঙ্গল গীত হতে শোনা যায় ধলভূমে। কিন্তু এই উপাখ্যানকে ঠিক ব্রতকথা বলা যায় না।

ব্রতকথা চরিত্রগত দিক দিয়ে লোককথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ব্রতের সঙ্গে জড়িত বলেই এই সব কাহিনীকে লোককথা থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়, অন্যথা ব্রতকথা এবং লোককথার মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। ঝাড়খণ্ডের ব্রতকথায় কোন পৌরাণিক দেবতার স্থান নেই; লৌকিক দেবতারাই সাধারণ মানুষের আরাধ্য দেবতা। এই সব দেবতা যে শুধুমাত্র কল্যাণই করে থাকেন, তা নয়, এদের মধ্যে শুভ এবং অশুভ দু'টি ক্ষমতাই বিদ্যমান। এঁরা ইচ্ছা করলে ইষ্ট যেমন করতে পারেন, তেমনি অনিষ্টও করতে পারেন। ভক্তের প্রতি এঁরা যেমন বরাভয় দান করে থাকেন, তেমনি যারা এঁদের বিরুদ্ধাচরণ করে, এঁরা তাদের সমূহ সর্বনাশও করে থাকেন। এরা রুষ্ট হলে ক্ষেতে ফসল ফলে না, ফললেও এঁদের কোপদৃষ্টিতে সে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, এঁরা বাম হলে সন্তানলাভে বঞ্চিত হতে হয় সাধারণ মানুষকে, সন্তান জন্মগ্রহণ করলেও এঁদের অশুভ দৃষ্টিতে রোগগ্রস্ত হয়, অকালমৃত্যু হয়। তাই সাধারণ মানুষের কাছে লৌকিক দেবতাদের গুরুত্ব এবং মর্যাদা অত্যন্ত বেশি। তবে লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের ভক্তদের যে খুব একটা দূরত্ব থাকে, তা'ও না, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় দেবতা এবং ভক্ত পরস্পরের এতোই অন্তরঙ্গ যে একে অন্যের সুখে-দুঃখে আনন্দে-বেদনায় সমানভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। লৌকিক দেবতা এবং

লোক উভয়েই যেন একই রক্তমাংসে গঠিত। মানুষের মতোই লৌকিক দেবতাদের আচারআচরণ, জীবন চর্যা, প্রয়োজন পড়লে তাঁরা মানুষের বেশে লোকসমাজে নেমে আসেন। লৌকিক দেবতার মধ্যে দেবত্ব যতোখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি মনুষ্যত্ব লক্ষ্যগোচর হয়। মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারেন বলেই এই সব দেবতা মনুশাসিত স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়ে লৌকিক জীবন যাপন করছেন, এবং অস্তিত্বের দুর্লভ আনন্দ-রস ভোগ করতে পারছেন। এই কারণেই এঁরা পুরাণে ধর্মগ্রন্থে স্থান পান নি, সাধারণ মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা স্নেহমমতায় রচিত ব্রতকথায় এঁরা পরম মর্যাদায় স্থান লাভ করেছেন। মানুষের সুখ-দুঃখের সহচর দেবতার কথা বলে ব্রতকথাগুলো একান্তই লোকায়ত, তাই ব্রতকথার মধ্য দিয়ে দেবতার কথা বলা হলেও এগুলো লোককথার লক্ষণাক্রান্ত, স্বভাবতঃই এগুলো লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট উপকরণ।

বিষয়বস্তুর বিচারে লোককথা এবং ব্রতকথার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ব্যবহারিক প্রয়োজনে লোককথাই ব্রতকথায় রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রতকথা আচারঅনুষ্ঠানমূলক হওয়ায় কাহিনীর মধ্যে পরিবর্তনসাধন করা হয় না, একটি বিশিষ্ট রূপলাভ করবার পর যুগে যুগে ব্রতোদযাপনের কালে একই কাহিনী অপরিবর্তিত ভাবে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। ব্রতকথাগুলো আচারমূলক হওয়ার ফলে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। জিতিয়া এবং ধরম পূজার ব্রতকথা বর্তমানে অত্যন্ত সীমিতভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। করম ব্রতকথা ঝাড়খণ্ডে এখনো জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, এর কারণ, এই পূজার অনুষ্ঠান ঝাড়খণ্ডের সর্বত্রই যেমন হয়ে থাকে, তেমনি এই ব্রতে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে। আমরা এখানে করম পূজার ব্রতকথাটি বিবৃত করে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখব।

"করম ঠাকুরের কথা শোন শোন সব 'বার্তি'রা (ব্রতীরা), করম ঠাকুরের কথা বলি মন দিয়ে শোন। করম ঠাকুর ত শুধু দেবতা নয়, রাজাও। তার কাছে যা চাওয়া যায়, সব পাওয়া যায়। যে যা মানত করে সুর তার ফল ফলে। যে তাঁর পূজো করে তার ঘর ধন-ধান্যে, সন্তান-সন্ততিতে ভরে যায়, দুধে-ভাতে সুখে থাকে। করম ঠাকুর ভারী রাগীও। যে তাঁকে মানবে না, তার

সর্বনাশ হবে। তার ঘর-সংসারে আগুন লাগে, ধনসম্পত্তি খোয়া যায়, পুত্র-কন্যা মরে যায়।

সে অনেক দিন আগেকার কথা। কোন এক গ্রামে করমু আর ধরমু নামে দুই ভাই সুখে বাস করত। তাদের খাবারের অভাব ছিল না, জমিজমা ছিল। দু'ভাই বিয়ে-থা করে মনের আনন্দে দিন কাটাত। চাষ-বাসে তাদের দিন কেটে যেত, বারো মাসে তের পরব করত; আনন্দ ছাড়া যেন তারা আর কিছু জানত না। যে-ঠাকুরের পুজোয় ওরা সবচেয়ে আনন্দ পেত, তা এই করম ঠাকুরের পুজো। হাঁড়িয়া পিঠের ছড়াছড়ি। কুটুম্বে ঘর ভরে যেত; সন্ধ্যায় তারা পুজো করত আর সারা রাত্রি মদ আর হাঁড়িয়ার নেশা করে ঢোল-ধমসা-মাদল বাজিয়ে নেচে-গেয়ে করম ঠাকুরকে খুশি করত। তারপর রাত শেষে করম ঠাকুরকে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে পৌঁছে দিত। তারপর স্নান করে এসে আগের দিনের রান্না-করা বাসি ভাত এবং নুন-তেল-হলুদবর্জিত বাসি ডাল কচুপাতায় খেয়ে পারণ করত। একদিন হয়েছে কি, বড় ভাই করমু বাসি ভাতে পারণ না করে গরম ভাতে পারণ করল। করমু ভেবেছিল, বাসি ভাতই কি আর গরম ভাতই কি, সব সমান, পারণ করা হলেই হল। গরম ভাত খেয়ে পারণ করার ফলে ওদিকে করম রাজার গা জ্বালা শুরু হল। অমৃত কুণ্ডে বার-বার ডুব দিয়েও গায়ের জ্বালা শেষ হল না। করম ঠাকুর তাই বেজায় রেগে গেলেন। করমুর সংসারে সর্বনাশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

(কোন কোন স্থানে ব্রতকথার এই প্রথম স্তরেই অন্যরূপ কথা শুনতে পাওয়া যায়। ওরা বলে: করমু আর ধরমু দু'টি ভাই এক সাথে বাস করত। করমু করত ব্যবসা আর ধরমু করত চাষ। ধরমু চাষের কাজ শেষ করে ভাদ্র মাসে করম ঠাকুরের পুজো করত। একবার ধরমু বন্ধুবান্ধব আত্মীয়কুটুম্বের সাথে মদ-হাঁড়িয়া খেয়ে নেশাভাং করে সারারাত করম পুজোর নাচে মত্ত রয়েছে। করমু বাণিজ্য থেকে ফিরেই এই কাণ্ডকারখানা দেখে রেগে আগুন। করমঠাকুরকে টেনে লাথি মেরে দূরে ফেলে দিল সে। করম ঠাকুর রাগে-অপমানে ক্ষেপে আগুন হয়ে গেলেন।)

বারতিরা শোন। করম ঠাকুরের কোপে করমু আর ধরমু ঝগড়া করে পৃথক হয়ে গেল। করম ঠাকুরের দয়ায় ধরমুর সংসারে সম্পদ, সুখশান্তি; করম ঠাকুরের অভিশাপে করমুর সংসারে অভাব, যন্ত্রণা, অশান্তি। করমু আর তার বউ নিরুপায় হয়ে খেটে খেতে শুরু করল। ধরমুর চাষবাসের কাজে

সাহায্য করে, কিন্তু যা খাবার পায় তাতে পেট ভরে না। একদিন ধরমুর ঘরে 'বেগার' খাটবার জন্যে মেহনতি চাষীমজুরদের ভীষণ ভিড়। করমু জমি তৈরি করার কাজে যোগ দিল, তার বউ সেই জমিতে ধান রোপণের কাজে। সকালের খাবার মানুষেরা সবাই পেল। করমু আর তার বউ ভাবল, ঘরের লোক বলে তাদের খাবার পেতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু যখন ওরা সত্যি-সত্যিই খাবার পেল না, তখন দুঃখ পেল না, ভাবল, ঘরের লোক বলেই ধরমু ওদের খেতে দিতে ভুলে গেল। মনকে সান্ত্বনা দিল: সকালে না হোক, ক্ষতি নেই—দুপুরে পেট ভরে খাওয়া পাব। কিন্তু দুপুরেও ওরা খাবার পেল না, ধরমু যেন ওদের খেতে দিতে ভুলে গেছে। ঠিক আছে, ওরা ভাবল, সন্ধ্যায় বেশ ভালো করে খাওয়া পাবে। করম ঠাকুর যার ওপর বাম, তার ভাগ্য চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যায়। সন্ধ্যাতেও ওরা খাবার পেল না। খিদের জ্বালায় নাড়িভুঁড়ি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। স্বামীস্ত্রী দু'জনে মিলে পরামর্শ শুরু হল: কি করা যাবে এরপর। ধরমু তার নিজের ভাই, সে-ও তার মুখে তাকাল না? প্রতিশোধ চাই। বউকে বলল, 'চল, যতোখানি রোপণ করেছিস, উপড়ে ফেলে দিবি; আর আমি যতোখানি আল তৈরি করেছি, কোদাল চালিয়ে শেষ করে দিয়ে আসব।' শ্রাবণ মাস। ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বেরিয়ে গেল মাঠে। করমু আল কেটে ফেলবার জন্য যেই কোদাল তুলেছে কে যেন তার হাতে এসে ধরল, বলল, 'খবরদার কাটবি নে, তুই তোর নিজের দোষে এই ভোগান্তি এনেছিস গরম ভাতে পারণ করে তুই করম ঠাকুরের গায়ে জল্'ন ধরিয়ে দিয়েছিস। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে অমৃতকুণ্ডে করম ঠাকুর জ্বালা নেভাবার জন্যে ডুবছেন আর উঠছেন। তোর করম কপাল বাম। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে গিয়ে করম ঠাকুরকে খুশি করে নিয়ে আয়, আবার সব ফিরে পাবি।' করমু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার বউকে ডেকে নিয়ে ঘরে ফিরল। তারপর সারারাত স্বামী-স্ত্রীতে সলাপরামর্শ করে স্থির করল, করমু করমঠাকুরকে নিয়ে আসবার জন্য সেই রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়বে। তখনো মোরগ ডাকে নি, গাঁয়ের সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে; করমু অন্ধকারে গা ঢেকে করম ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

করমু হাঁটছে, হাঁটছে, হেঁটেই চলেছে। ভোর হল, সূর্য উঠল, চার-পাশে আলো ছড়িয়ে পড়ল। বেলা যতো বাড়ে করমুর খিদে ততো বেশি বেড়ে যায়। আগের দিনে খাবার জোটে নি, তার ওপর এতো বেশি পথ

হাঁটাহাঁটি। কাঁহাতক আর সহ্য হয়; একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে মাঠের ওপর এক জায়গায় ছায়া দেখে বসে পড়ল। কিন্তু হায় কপাল, সে ছায়াও দাঁড়াল না। অবাক হল সে, ছায়ায় বসল আর সে ছায়াও দূরে সরে যাচ্ছে! করমু বলল, 'ধুত্তোরি, করম কপাল বাম হলে একটু ছায়াও মিলবে না?' করমু যখন এই কথা বলে চলতে শুরু করল, তখন সেই ছায়া তাকে ডেকে কথা বলল: 'কোথায় যাচ্ছ ভাই?' মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে করমু অবাক হয়ে তাকাল। দেখল, খড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে একটি লোক হেঁটে চলেছে, তারই ছায়ায় সে বসেছিল। করমু জবাব দিল, 'আমার করম কপাল বাম হয়েছে। তাই করম ঠাকুরকে আনতে যাচ্ছি।' তখন লোকটি বলল, 'ভালোই হয়েছে ভাই; করম ঠাকুরকে আমার 'আদ্দাশ' (<ফা. অরজ্ দাশ্ত=আবেদন) জানিয়ে জেনে নিয়ো, বারো বছর ধরে আমি কেন হাঁটা থামাতে পারছি না কিংবা খড়ের বোঝাও কেন মাথা থেকে নামাতে পারছি না।' আবার এগিয়ে চলেছে করমু। সামনে পড়ল একটা পুকুর; আয়নার মতো ঝকঝক করছে তার জল। করমু ভাবল, যাক, জল খেয়ে হলেও পেট ভরানো যাবে। তেষ্টায় হাঁসফাঁস করে পুকুরে নেমে যে-মুহূর্তে এক আঁজলা জল মুখে তুলবে, দেখল, সমস্ত জলে লক্ষ লক্ষ পোকা কিলবিল করছে। হাতের জল ফেলে দিয়ে আরো এগুল, যদি গভীরের জলে পোকা না থাকে। আঁজলা ভরতি জল তোলে আর ফেলে দেয়। শুধুই পোকা। 'করম কপাল বাম', বলে বিড় বিড় করে বকতে-বকতে করমু যখন চলে যাচ্ছে, পুকুরটি ডেকে বলল, 'ভাই, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' করমু বলল, 'আমার করম কপাল বাম হয়েছে, তাই করম ঠাকুরকে নিয়ে আসতে চলেছি।' পুকুরটি বলল, 'ভালোই হল ভাই, আমার আদ্দাশটি করম ঠাকুরকে পৌঁছে দিয়ো, জেনে নিয়ো, এতো এতো বছর ধরে পড়ে আছি, আমার জল গরু-বাছুরও কেন ছোঁয় না, আমার জলে কেন এতো পোকা।' করমু ঘাড় নেড়ে এগিয়ে চলল।

কে জানে এখনো কতো দূরে করম ঠাকুরের দেশ। পেটে দানাপানি নেই। করমু যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসছে। পৌঁছতে পারবে কি না তার ভয় লাগছে। হঠাৎ সামনে অনেক গাছ দেখে ভাবল, নিশ্চয় ওতে ফল ধরেছে, এরপর পেট ভরে ফল খাবে। কাছে গিয়ে দেখল, সব ডুমুর পেকে গাছের তলায় পড়ে সব ছড়িয়ে রয়েছে। সারা গাছে পাকা ফল।

তাড়াতাড়ি কিছু ফল কুড়িয়ে দেখে শুধু পোকা। ভাবল, কবে থেকে নিচে পড়ে আছে, তাই এতো পোকা ; গাছে চড়ে টাটকা ফল খাবে। গাছের ফল ভেঙে দেখে, ভেতরে হাজারো পোকা কিলবিল করছে। তখন করমু গাছ থেকে নিচে নামল, বলল, 'এখানেও করম কপাল বাম।' করমুকে চলে যেতে দেখে ডুমুর গাছ বলল, 'তুমি কোথায় চলেছ, ভাই ?' খিদের জ্বালা, তার ওপর সবার একই প্রশ্ন ; করমু যেন বিরক্ত হল, বলল, 'কোথায় আবার, করম কপাল আমার ভেঙেছে, তাই করম ঠাকুরকে খুঁজতে বেরিয়েছি।' ডুমুর গাছ বলল, 'আমার একটু উপকার করো ভাই। করম ঠাকুরের দেখা পেলে আমার কথাও জিগ্যেস কোর, আমার ফল জনপ্রাণী কেউ ছোঁয় না, আমার ফলে কেন এতো পোকা।' সম্মতি জানিয়ে করমু তার পথ খুঁজে-খুঁজে ক্লান্ত পায়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল।

তখন দুপুরবেলা। দূরে একটি কুটির দেখতে পেল সে। হঠাৎ এতোক্ষণ বাদে তার বিড়ির নেশা যেন চাগিয়ে উঠল। কুটিরের দরোজায় উঁকি দিয়ে দেখল, ভেতরে এক বুড়ি পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। আশ্চর্য, তার দু'টি পা উনুনে ঢুকিয়ে দেওয়া রয়েছে ; দগদগ করে আগুন জ্বলছে, অথচ বুড়ির পা পুড়ছে না। দু'হাত দিয়ে বুড়ি চিংড়ি মাছ বেছে চলেছে একটি চুবড়িতে। বুড়ির কাছে করমু আগুন চেয়ে আগুন পেল না। বুড়ি বলল, 'আমার উঠবার উপায় নেই।' আবার 'করম কপাল বাম' বলে করমুকে চলে যেতে দেখে ডুমুর গাছের মতোই বুড়িও প্রশ্ন তুলে তার করম কপাল বাম হওয়ার এবং করম ঠাকুরের খোঁজে যাত্রার কথা জেনে নিল। তারপর বুড়ি করমুকে ডেকে বলল, 'করম ঠাকুরকে আমার দুঃখের কথা জানাবে ; বারো বছর ধরে আমার পা আগুনে ঠেকিয়ে ধান সেদ্ধ করছি আর দু'হাতে চুবড়ির চিংড়ি মাছ বেছেই চলেছি অথচ আজো কেন না আমার পা দু'টো পুড়ল, না ধান সেদ্ধ হল, আর না চিংড়ি মাছ বাছা শেষ হল।' করমু আবার এগিয়ে চলল। এবার সামনে পড়ল গরুর পাল। করমু ভাবল, এবার বুঝিবা করম ঠাকুর সদয় হলেন ; এবার গাই দুয়ে দুধ খেয়ে পেট ভরব, আর যে সহ্য হয় না। কিন্তু হা কপাল, যেই সে একটি গাভীর কাছে এগিয়ে গেছে, অমনি সেটি তাকে তাড়া করে এল, লাথি মেরে গুঁতিয়ে করমুকে বিব্রত করে তুলল। করমুর মনে বড়ো দুঃখ হল। এখানেও করম কপাল বাম, দুঃখের ভারে সে যেন ভেঙে পড়ছে। তবু সে পা বাড়াল সামনের দিকে। গরুর পালের যেটি

'শিরোমণি', সে করমুকে প্রশ্ন করে তার গন্তব্যস্থানের কথা জেনে নিল। তারপর সে তাদের নিজেদের দুঃখের কথা প্রকাশ করল। 'আমরা এসে এতোকাল এখানে রয়েছি, অথচ আমাদের 'গলা-গুসাঁই' (<গোপালক-গোস্বামী) পেলাম না। আমাদের এ দুঃখ কবে কাটবে, তুমি করম ঠাকুরের কাছ থেকে দয়া করে জেনে নিয়ে এসো ভাই।' করমুর পথ যেন শেষ হয় না। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পায়ের শিরা-উপশিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। তবু করমু হাঁটছে, যেন ছুটে চলেছে সে। সন্ধ্যের আগেই তাকে করম ঠাকুরের কাছে পৌঁছতে হবে। হঠাৎ সামনে অনেকগুলো ঘোড়া দেখতে পেল। জয় করম ঠাকুর, এবার বুঝি দুঃখের দিন শেষ হল। ঘোড়ায় চড়ে খুব শীগগির করম ঠাকুরের কাছে পৌঁছে যাব, করমু ভাবল। কিন্তু যেই না কাছে গিয়ে একটি ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠেছে, ঘোড়াটি এমনিভাবে পিঠে ঝাঁকানি দিল যে করমু মাটিতে পড়ে গেল। ঘোড়ায় লাথি আর কামড়ের চোটে নাজেহাল হয়ে ধুলো ঝেড়ে করমু ছুটে পালাচ্ছিল, তখন ঘোড়ার দলের নেতা ডেকে বলল, 'এমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছ ভাই ?' করমু তার সব কথা জানিয়ে বলল, 'আমার করম কপাল বাম, করম ঠাকুরকে খুঁজতে বেরিয়ে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, আর হাঁটতে পারছি না।' ঘোড়াদের নেতা দুঃখ প্রকাশ করল, বলল, 'তোমার এই দুঃসময়ে তোমাকে সাহায্য করতে না পারার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তবু আমাদের কথা করমঠাকুরকে জানিয়ো, এক যুগ আমাদের কোন গলা-গুসাঁই নেই, কোন্ দোষে আমাদের এই দুর্দশা ?'

সন্ধ্যা হয় হয়, হাঁটতে হাঁটতে করমু যেখানে এসে পৌঁছুল, তারপর আর এগুনো যায় না। শুধু জল, থই থই জল। করমু কি করবে ভেবে পেল না, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে সে কাঁদতে শুরু করল। এই তবে সাত সমুদ্দুর তের নদী। এতো কাছে এসে ফিরে যেতে হবে, করম ঠাকুরের দেখা সে পাবে না ? তার কান্নার শব্দে একটি ভাসন্ত কাঠের গুঁড়ি তার কাছে এগিয়ে এল ; বলল কি হয়েছে ভাই, তুমি কাঁদছ কেন ?' করমু চমকে তাকিয়ে দেখল, তার সামনে প্রকাণ্ড হাঙ্গর ভাসছে। ভয় পেয়ে সে কিছুটা সরে বসল। হাঙ্গরকে কথা বলতে শুনে করমু অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর তাকে তার সব কথা খুলে বলল। শেষে বলল, 'আমার করম কপাল বাম, তাই এতোটা পথ এসেও সাত সুমুদ্দর তের নদী পেরুতে পারলাম না।'

তখন হাঙর বলল, 'তার জন্য এতো ভাবনা কিসের? আমার পিঠের ওপর চড়ে বস, আমি তোমাকে সমুদ্দুর পার করে দিচ্ছি।' করমু বলল, 'তোমাকে বিশ্বাস কি, যদি মাঝ সমুদ্দুরে আমায় খেয়ে ফেল, তখন?' হাঙর বলল, 'আমাকে বিশ্বাস কর, আমিও তোমার মতোই দুঃখী। আজ বারো বছর ধরে আমি ডুবতে পারছি না, আর কোন কিছু খেতেও পারছি না। আমি তোমাকে পার করে দেব, তবে একটা শর্তে—করম ঠাকুরের কাছ থেকে তুমি আমার এই দুঃখের কারণ জেনে নিয়ে আসবে।' করমু সম্মতি জানাল। হাঙরটি ডেকে বলল, 'তবে এসো।' করমু হাঙরের পিঠে চড়ে বসল। তরতর করে জল কেটে হাঙরটি এগিয়ে চলল। ওপারে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে আমি এখানেই অপেক্ষা করব। শীগগির ফিরে এসো।'

ওপারে মাটিতে পা রেখে করমুর আনন্দ আর ধরে না। দূর থেকে সে করম ঠাকুরের নিবাসউদ্যান দেখতে পেল। কাছে পৌঁছে করমু দেখল, করম ঠাকুর অমৃতকুণ্ডে ডুবছেন আর উঠছেন। করমুর যেন আর তর সয় না। সেও অমৃতকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে চলল, করম ঠাকুরের কাছে পৌঁছে তাঁকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। করম ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন— 'কে আমায় ধরেছিস ছেড়ে দে; আমার সারা গা হুহু করে জ্বলছে—না ডুবলে আমি জ্বলে খাক হয়ে যাব।' করমু বলল 'কে, তোমার এই দশা করেছে ঠাকুর, না বললে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না।' করম ঠাকুর বললেন, 'করমু নামে একজন চাষা আমার পুজো করে 'পান্তা ভাতে' (বাসি) 'পানণা' (পারণ) না করে গরম ভাতে পারণ করেছিল, তারপর থেকে আমার এই জ্বালা।'

করমু কেঁদে ফেলল, বলল, 'ক্ষমা কর ঠাকুর, ক্ষমা কর ঠাকুর, ক্ষমা কর, আমিই সেই করমু। তোমার কোপে পড়ে আমিও অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমি তোমার পুজো করবার জন্যে তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।' ঠাকুর বললেন, 'তুই আমায় অস্পৃশ্য করেছিস, শীগগির চলে যা তুই এখান থেকে।' করমু যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, বলল, 'তোমায় আমি কিছুতেই ছাড়ব না ঠাকুর। তুমি ছাড়া আমার কোন গতি নেই। তোমাকে না নিয়ে আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না।' করম ঠাকুর যাবেন না, করমুও ছাড়বে না। শেষ তক করমু করম ঠাকুরকে টেনে নিয়ে অমৃতকুণ্ডের পাড়ে তুলল।

সেদিন ভাদ্রমাসের পার্শ্বৈকাদশী তিথি। আকাশে একাদশীর চাঁদ, ঝিরঝির

করে আলো ঝরে পড়ছে। দু' একটা হালকা মেঘ মাঝে-মাঝে চাঁদের মুখ ঢেকে দিচ্ছে! দু' একটা নিশাচর পাখির গলা পাখলানোর শব্দ করমুর কানে আসছে। করমু ঠাকুরের স্পর্শে যেন পবিত্র হয়ে উঠছে। সম্মুখে কবম ঠাকুর। পুজোর কোন উপকরণ নেই, শুধু ভক্তি আর দু'চোখেব জল। করম ঠাকুর তুষ্ট হলেন। করমুর মাথায় হাত রাখলেন; আশীর্বাদ করলেন, 'আগেকার সম্পত্তির লক্ষগুণ সম্পত্তি ফিরে পাবি। সুখ আর শান্তি তোর সংসারে অচল হবে।' করমু অশ্রু-ভেজা কণ্ঠে বলল, 'ঠাকুব, তুমি না গেলে আমি কিছুতেই সংসারে ফিরে যাব না। আমি এইখানেই পড়ে থাকব আর তোমার পুজো করব।' করম ঠাকুর তার মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, 'পাগল আর কি, আমি কি আর যেতে পারি রে, তুই ঘরে ফিরে যা। আমি সব সময় তোর সঙ্গে থাকব, যখন দরকার পডবে আমায় ডাকিস। আর শোন্, এই যে গাছটি দেখছিস না, যার তলায় আমরা বসেছি, আজ থেকে এর নাম হবে করম গাছ। আজকের এই তিথি, ভাদ্রমাসের একাদশী তিথিতে এই গাছের ডাল আঙিনায় পুঁতে মদ-হাঁড়িয়া-পিঠে খেয়ে সারা রাত আত্মীয়-স্বজনের সাথে আনন্দ-নৃত্য করবি। পরেব দিন সকালবেলা নিয়মমতো বাসি ভাতে পারণ কবে অনুষ্ঠান শেষ কবিস।'

কথা শেষ করে করম ঠাকুর যেই আবাব অমৃতকুণ্ডে নেমে যাবেন, করমু আবার তাঁকে টান দিল। বলল, 'ঠাকুব, রাস্তায আসবাব সময় অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে; তারা সবাই আমার মতোই কষ্ট ভোগ করছে। ওরা আমার পথ চেয়ে বসে রয়েছে, ওদেব দুঃখের কারণগুলো না বলে দিলে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না।' করম ঠাকুর বললেন, 'পরের কথায় কাজ কি, তুই তোর সব পেয়েছিস, ফিরে যা।' করমু বলল, 'তা হয় না ঠাকুর, ওরা যে আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে।' তখন করম ঠাকুর ধৈর্য ধরে করমুর মুখ থেকে খড-মাথায় মানুষটিব, ডুমুর গাছের, পুকুরের, গাভীদলের, বুড়ির, ঘোড়াদের এবং সবশেষে হাঙ্গরের কথা শুনলেন এবং ওদের দুঃখের কারণ-গুলোও করমুকে বলে দিলেন। করমু সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করল। ঠাকুর অমৃতকুণ্ডে নেমে গেলেন। করমু উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পথ ধরল।

বারতি-রা, শুনছ তো সব। পুজোর নিয়ম শুনলে, অনিয়ম করলে তার কি ফল ফলে তা'ও শুনলে। করমু এবার ঠাকুরের পুজো শেষ করে ঘরে

ফিরছে, তোমরা ঠাকুরকে ফুল দাও। (এই সময় চার পাশ থেকে বারতি বা ডালার ফুল করম ডাল দুটোর ওপর ছুঁড়ে দেয়।)

বারতি-রা শোন। করমু আনন্দে ডগমগ হয়ে ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছল। এদিকে হাঙ্গর অপেক্ষা করে আছে, কখন করমু ফিরছে, করমুকে দূর থেকে দেখে হাঙ্গর জিগ্যেস করল, 'ভাই করমু, আমার দুঃখের কারণ কি জেনে এলে আমায় সব খুলে বল, নইলে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।' করমু হাসতে হাসতে বলল, 'ধীরে বন্ধু, অত আতুর হলে কি চলে? আগে আমায় ওপারে পৌঁছে দাও, তারপর আমি সব কথাই খুলে বলব।' হাঙ্গর কিছুতেই রাজি হয় না। তখন করমু বুঝিয়ে বলল, 'তোমাকে যদি এখনই সব কথা খুলে বলি, তাহলে তুমি জলে ডুবে যাবে, আমি আর পার হতে পারব না।' হাঙ্গর কি যেন ভাবল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে এসো, ওপারে গিয়ে কিন্তু বলতেই হবে। কথা দিচ্ছ?' করমু ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল। তরতর করে করমু হাঙ্গরের পিঠে চড়ে ওপারের ডাঙায় গিয়ে পৌঁছুল। হাঙ্গরের পিঠ থেকে নেমে করমু বলল, 'হাঙ্গর ভাই, বারো বছর আগে এক রাজকন্যাকে তুমি গিলে খেয়েছিলে, মনে পড়ে?' হাঙর কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়ে।' করমু বলল, করম ঠাকুর বলেছেন, ঐ রাজকন্যার গলায় ছিল 'শতেশ্বরী' (শতনরী) হার। সেই হার তোমার পেটে এখনো আছে। ওটি উগরে ফেলে বামুন-বোষ্টমকে দান করলেই তুমি ডুবতে পারবে আর সব কিছু খেতে পারবে।' এই কথা বলতে না বলতেই হাঙ্গরটি একটি শতেশ্বরী হার উগরে ফেলল। বলল, 'করমু ভাই, বামুনবোষ্টম কোথায় পাব, তুমিই আমার বামুনবোষ্টম, তুমিই এটি নাও।' করমু হারটি হাতে তুলে নিল। 'বিদায় করমু ভাই' বলতে বলতে হাঙ্গরটি জলে ডুবে গেল। করমু 'বিদায়' বলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

করমু এবার মহা উৎসাহে ঘরমুখো ছুটে চলল। ঘোড়াদের দলপতি করমুকে দূরে দেখতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল। বলল, 'করমু ভাই, আমাদের কিছু কথা করম ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছ কি?' করমু বলল, 'পেয়েছি'। ঠাকুর বলেছেন, তোমাদের বাথানের (গোষ্ঠের) উত্তরকোণে অজস্র মণি মাণিক্য পোঁতা রয়েছে, সেগুলো কোন বামুনবোষ্টমকে দান করলে তোমাদের গলা শুদ্দাই জুটবে, আশ্রয়ও মিলবে।' ঘোড়াদের শিরোমণি বলল, 'বামুনবোষ্টম আর কোথায় পাব, তুমিই সেগুলো খুঁড়ে নাও, করমু

ভাই ; সব তোমাকে দিলাম।' করমু খুশি হয়ে গর্ত খুঁড়ে দেখে রাশি-রাশি মণি-মাণিক্য। ওর যেন আনন্দ ধরে না। এতো মণি-মাণিক্য নিয়ে যাবে কি করে, করমু যেন চিন্তিত হল। ঘোড়াদের দলপতি বলল, 'ওগুলো আমাদের পিঠে তুলে দাও ; অন্য গলা-গুসাঁইতে কাজ নেই, আমরা তোমার সাথেই যাব।' করমু অন্য ঘোড়ার পিঠে মণি-মাণিক্য তুলে দিয়ে নিজে দলপতির পিঠে চড়ে ঘরমুখো চলতে লাগল। (বারতি-রা আবার পুষ্পাঞ্জলি দেয়, কেননা করমু করম ঠাকুরের কৃপায় ধনবান হয়ে ঘরে ফিরছে।)

এবার পথে পড়ল গরুর পাল। শির গরুটি করমুকে ঘোড়ার পিঠে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হল। বলল, 'তুমি তাহলে করম ঠাকুরকে পেয়ে গেছ করমু ভাই। করম ঠাকুর আমাদের আদ্দাশ শুনে কি বললেন, শীগগির বল।' করমু বলল, 'তোমাদের বাথানের দক্ষিণ কোণে ঘড়াভরতি মোহর রয়েছে, সেগুলো যদি কোন বামুনবোষ্টমকে দান কর, তাহলে তোমাদের গলাগুসাঁই এবং আশ্রয় সব জুটবে।' শির গরুটি ঘোড়াদের মতোই করমুকে মোহরগুলো খুঁড়ে নিতে বলল। করমু মোহরগুলো মাটি খুঁড়ে বের করল আর ঘোড়ার পিঠে তুলে এগুতে শুরু করল। শির গরুটি বলল, 'করমু ভাই, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব, আমাদের তুমি সঙ্গে নাও।' বারতি-রা এবার করম ঠাকুরকে 'দুধ ঢাল' দাও। বারতি-রা পাত্র থেকে দুধ গড়িয়ে দেয় করম ডালের গায়ে।)

বারতি-রা শোন। করমু ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেই বুড়ির কুটিরে এসে পৌঁছুল। বুড়ি বলল, 'করমু বাছা, আমার কথা বল্ রে ; আমি যে আর পারছিনে।' করমু বলল, 'কবে কোন্‌কালে তুমি কোন্ বিড়িখোরকে এক 'তিত্‌কি' (কাঠি) আগুন দাও নি, বরং উল্টে উনুনের আগুনের কাঠে লাথি মেরেছিলে, তাই তোমার পা-ও পোড়ে না, ধানও সেদ্ধ হয় না আর চিংড়ি মাছ বাছাও শেষ হয় না। তোমার উনুনের তলায় তোমার পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি রয়েছে ; সেগুলো বামুনবোষ্টমকে দান কোর, তুমি ভালো হয়ে উঠবে।' বুড়ি বলল, 'করমু, তুই খুঁড়ে নে বাছা। বামুন-বোষ্টম কোথায় খুঁজব, তুই-ই আমার বামুন-বোষ্টম।' উনুন খুঁড়ে টাকাকড়ি নেবার পর বুড়ি আবার ভালো হয়ে গেল। তার পা উনুন থেকে টেনে নিল, ধান সেদ্ধ হল আর চিংড়ি মাছ বাছাও শেষ হল। বারতিরা শ্বশুর ঘরে গিয়ে উনুনের মুখে লাথি মের না যেন কিংবা কেউ আগুন চাইলে তাকে আগুন দিতে ভুলো না।

বুড়ির দশা দেখলে তো; দাও, এবার ফুল দাও। (বারতিরা আবার আঁজলাভরতি ফুল ছুঁড়ে দেয় করম ঠাকুরের পায়ে।)

করমুর এখন প্রচুর ধনসম্পত্তি। ঘোড়ার পিঠে চড়ে আবার পথ চলতে শুরু করল। সঙ্গে ঘোড়া এবং গরুর পাল। এবার সম্মুখে পড়ল সারিসারি ডুমুর গাছ। করমুকে দেখে ওরা সবাই একযোগে প্রশ্ন করল, 'করম ঠাকুরকে পেয়েছ? আমাদের আদ্দাশ শুনে কি বললেন?' করমু বলল, 'ঠাকুর বলেছেন, তোমাদের সবচেয়ে পুরনো গাছটির গোড়ায় কিছু অর্থ লুকানো রয়েছে। অইগুলো কোন বামুন-বোষ্টমকে দান করলে কাকপক্ষী তো ফল খাবেই, মানুষও খাবে; ফলে আর পোকা থাকবে না।' বুড়ো গাছটি করমুকে ডেকে বলল, 'বামুন-বোষ্টমের অপেক্ষায় থাকতে পারব না ভাই। তুমি এগুলো নিয়ে যাও, আমাদের কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দাও।' করমু গাছের গোড়া খুঁড়ে সমস্ত লুকানো অর্থ ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। ডুমুরের ফল হাতে তুলে নিয়ে ভেঙে দেখল, আর পোকা নেই। বারতিরা, করম ঠাকুরের গল্প শুনছো তো; এবার ঠাকুরকে ফল দাও। (বারতিরা সংগৃহীত হরিতকী এবং বেল ফল করম ডালের গোড়ায় আঁজলা করে ছুঁড়ে দেয়।)

করমু আবার পথ ধরল। দূর থেকে পুকুরের জল চিকচিক করছে দেখতে পেল। পুকুরের জল ছলাৎ ছলাৎ করে প্রশ্ন করল, 'করমু, করম ঠাকুরের কাছে আমার আদ্দাশটা কি জানিয়েছিলে ভাই?' করমু বলল, 'তোমার ঘাটের বড় পাথরের তলায় একটি মাণিক লুকানো রয়েছে, সেটি কোন বামুন বোষ্টমকে দান করে দিও—তোমার জলে আর পোকা থাকবে না; গরু-বাছুর মানুষ সবাই তোমার জল খাবে।' পুকুরটিও অন্যদের মতোই করমুকে মাণিকটি নিতে বলল। করমু খুশি হয়ে পাথর সরিয়ে মাণিকটি তুলে নিল। তারপর আঁজলা ভরে জল তুলে দেখে জলে আর পোকা নেই; ঢকঢক করে আঁজলার জল খেল করমু। গরুবাছুর ঘোড়ার পাল সব ধীরে ধীরে পুকুরে নেমে জল খেয়ে তৃষ্ণা দূর করল। বারতিরা, এবার করম ঠাকুরকে 'জল ঢাল' দাও। (বারতিরা করম ডালের গোড়ায় জল ঢেলে দেয়।)

করমু ক্রমশঃ বাড়ির কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। খড়ের বোঝা মাথায় লোকটিকে যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল, দেখল তার প্রতীক্ষায় সেখানেই চক্কর কাটছে। করমুকে ঘোড়ার পিঠে দেখে সে নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাছাড়া এতো এতো গাইগরু ঘোড়ার পাল আর

ধনসম্পত্তি দেখে লোকটি বলল, 'ভাই, ঠাকুরের কাছ থেকে আমার কথা কিছু কি জানতে পেরেছ?' করমু বলল, 'তুমি কবে কার মাথায় খড়ের কুটো দেখার পরও তাকে তা বলে দাওনি; তাই তোমার এই দুর্দশা।' লোকটি সব কথা স্বীকার করে নেওয়ার পর খড়ের বোঝা সে তার মাথা থেকে সরিয়ে নিচে নামাতে পারল। বারতিরা শুনছ তো, কারো মাথায় খড়ের কুটো দেখেও তাকে না বলে দেওয়ার কি দুর্দশা! দেখো, যেন তোমরা কখনো এ ভুলটি না কর।

করমু এবার দু'চোখে তার গাঁয়ের ছবি স্পষ্ট দেখতে পেল। করমুর সাথে গরুর পাল ঘোড়ার পাল দেখে কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি, সত্যি সত্যিই করমু ফিরে আসছে। দূর, করমু এতো গরু এত ঘোড়া কোথায় পাবে; যে খেতে পায় না. সে এসব পাবে কোথায়! কিন্তু যখন করমু তাদের কাছে পৌঁছুল, তারা দেখল করমুর সাথে শুধু গরু আর ঘোড়ার পালই নয়, ঘোড়ার পিঠে মোহর টাকাকড়ি মণিমাণিক্যের ছালা। করমুকে ওরা ঘিরে ধরল: কোথায় পেলে তুমি এসব, কে দান করেছে। কতো লোকের কতো কথা। করমু তখন ওদের বুঝিয়ে বলল, 'এগুলো সব করম ঠাকুরের দেওয়া। ভক্তি ভাবে যে পুজো করে, সে ধনসম্পত্তি পায়; হাসি-আনন্দও পায়।' তারপর করমুর ঘরে সে কি আনন্দউৎসব, হইহুল্লোড়! সাতদিন ধরে তার ঘরে করম ঠাকুরের পুজো হল। হাঁড়িয়া আর মদ, মাদল আর ধম্‌সার বাজনা, আনন্দ-উচ্ছ্বসিত গান আর সারা রাত ধরে নৃত্য।

বারতিরা শোন, ভক্তিভাবে যে পুজো করে সে করমুর মতো ধনসম্পত্তি পায়, আনন্দ পায়। তোমরা সবাই ভক্তিভাবে পুজো করে করম ঠাকুরকে তুষ্ট কর; তোমরাও সব পাবে। বারতিরা এবার করম ঠাকুরকে সব ফুল দিয়ে তাঁকে প্রণাম কর। (বারতিরা ডালার বাকি ফুলগুলো ঢেলে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।)[১]"

ব্রতকথাটি ধলভূমের চাকুলিয়া থানার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত। করম পুজোর সময় ব্রতকথাটি যেভাবে কথিত হয়ে থাকে, এখানে যথাসাধ্য সেই ভঙ্গিটিই বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে; শুধু ঝাড়খণ্ডী উপভাষার পরিবর্তে শিষ্ট

১ বঙ্কিম মাহাত: ধলভূমে করম পরব (২)—ব্রতকথার কাহিনী; রবিবারের স্বাধীনতা ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২

বাংলায় পরিবেষণ করা হল। এই একই ব্রতকথা যে সর্বত্র কথিত হয়ে থাকে, তা নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহিনীর ঘটন-সংস্থানে পার্থক্য এবং বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে কাহিনীগত এই পার্থক্যের কারণ, প্রতিটি সম্প্রদায়ই সংস্কৃতিগতভাবে নিজেদের মধ্যে একটা সীমারেখা টানার চেষ্টা করে থাকে, যদিও আচারঅনুষ্ঠানে বা কথাবস্তুতে খুব একটা পার্থক্য লক্ষ্যগোচর হয় না; মৌল সুরটি সর্বত্রই প্রায় অভিন্ন বলা যেতে পারে। C H. Bompas তাঁর Folklore of Santal Parganas গ্রন্থে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত যে করমকথা পরিবেষণ করেছেন, কেউ কেউ তাকেই মৌলিক এবং প্রামাণ্য বলেছেন। বম্পাস সাহেব যে-কাহিনী পরিবেষণ করেছেন, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সম্ভবতঃ এটি কাহিনীর সারনির্যাস মাত্র। বিশদ বিবরণের দিক দিয়ে এই কাহিনীকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। করম ঠাকুরের গায়ে গরম ভাতের ফেন অজ্ঞাতসারে ছুঁড়ে ফেলার কথা ধলভূমেও শোনা যায়, তারই ফলে করম ঠাকুরের গাত্রদাহ শুরু হয়। করম ঠাকুরের কোপে করমুর সর্বনাশ হয়। বম্পাস সাহেব শুধু নির্যাসটুকু দিয়ে বলেছেন যে, বহুকাল অত্যন্ত দুঃখে-কষ্টে দিনযাপন করবার পর করমু আবার করম ঠাকুরের কৃপা লাভ করেছিল। কিন্তু করম ঠাকুরের কৃপালাভের পথে যে দুঃখকষ্টপূর্ণ কাহিনী তার কোন উল্লেখ নেই। আমাদের পরিবেষিত ব্রতকথা কিংবা ডক্টর সুধীর কুমার করণ পরিবেষিত কাহিনীতে করমুর এ্যাড-ভেঞ্চারের যে সুদীর্ঘ লোককথা প্রকাশ পেয়েছে, তার কণামাত্রও বম্পাসে দেখা যায় না। তবে ড° করণ পরিবেষিত কাহিনীতে সদাগর, লক্ষ্মী, সিদ্ধিদাতা গণেশ আদির অনুপ্রবেশ কাহিনীটিকে অনেক বেশি হিন্দুপ্রভাবপুষ্ট করে তুলেছে। আমাদের পরিবেষিত কাহিনীর মধ্যে বামুনবোষ্টমের উল্লেখ ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের কথা প্রমাণ করে, তবে এই প্রভাব যে খুবই সাম্প্রতিক কালের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

করম ব্রত যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তার প্রমাণ অর্বাচীন ভবিষ্যপুরাণে এর অন্তর্ভুক্তি। মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে সমগ্র অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ডে এই উৎসব অত্যন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রী প্রফুল্ল চরণ চক্রবর্তীর 'ব্রত ও আচার' গ্রন্থ থেকে জানা যায় করম ঠাকুরের প্রভাব পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলেও পড়েছে, যদিও ওখানকার ব্রতকথাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভবিষ্যপুরাণে করম-কাহিনী পাওয়া যায় বলে অনেকে করমব্রতের ওপর হিন্দু

সংস্কৃতির সরাসরি প্রভাবের কথা বলে থাকেন ; কিন্তু কথাটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বহু জনপ্রিয় লৌকিক ব্রত হিন্দু পুরাণে অংশলাভে সমর্থ হয়েছে। সত্যপীরের পূজোর জনপ্রিয়তাকে অনুসরণ করে সত্যনারায়ণ ব্রতের সৃষ্টির কথা সবারই জানা। যে-কোন ব্রত বা পূজানুষ্ঠানে যৎসামান্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে তাকেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ; এই ভাবেই করম-ব্রতও ভবিষ্যপুরাণে স্থান লাভ করে।

ব্রতকথা লোককথারই অঙ্গবিশেষ, ব্রতকথা পূজা এবং আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, লোককথা মনোরঞ্জনের সঙ্গে জড়িত— এই সামান্য পার্থক্য ছাড়া উভয়ের মধ্যে চরিত্রগত তেমন কোন অমিল দৃষ্টিগোচর হয় না। করমকথাতে লোককথার সব রকম বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। তাই Stith Thompson এর Motif Index অনুসারে করমকথারও অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। করমকথার মধ্যে সর্বাগ্রেই যে অভিপ্রায়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল করমুর ভাগ্যবিপর্যয় (Reversal of fortune), করম ঠাকুরের কোপে পড়ে করমু সর্বস্বান্ত হয়ে অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করে। দ্বিতীয়তঃ নিষেধাজ্ঞা বা বিধি নিষেধ (Taboo), করম-ব্রতের পারণ 'পাখাল' (<প্রক্ষালিত) বা বাসি ভাতে করবার নিয়ম, করমু এই নিয়মের ব্যত্যয় করে গরম ভাতে পারণ করেছিল বলে তার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল। তাছাড়া খড়ের বোঝা মাথায় লোকটি, উনুনে পা দেওয়া বুড়িও একই কারণে কষ্টভোগ করেছিল। ঝাড়খণ্ডে কারো মাথায় খড়কুটো দেখলে হয় টেনে ফেলে দিতে হয় নয় লোকটিকে বলে দিতে হয়, লোকটি এই নিয়ম মানে নি বলে এই শাস্তি পেয়েছিল। কেউ আগুন চাইলে প্রত্যাখ্যান করতে নেই, উনুনের মুখে দেবতা থাকেন বলে উনুনে লাথি মারতে নেই, বুড়ি এই নিষেধ মানে নি বলে দুঃখ ভোগ করেছে। তৃতীয় অভিপ্রায় হল সুযোগ এবং ভাগ্য (Chance and Fate), করমু করম ঠাকুরের কোপে পড়লেও শেষতক অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করবার পর লক্ষগুণ সম্পত্তি লাভে সমর্থ হয়েছিল। চতুর্থতঃ বিস্ময় (Marvels); কাহিনীটি আগাগোড়াই বিস্ময়ে ভরা : মাথা থেকে লোকটির খড়ের বোঝা নামাতে না পারা, উনুনের আগুনে বুড়ির পা না পোড়া, ধান সেদ্ধ না হওয়া, চিংড়িমাছ বাছা শেষ না হওয়া, হাঙরের জলে ডুবতে না পারা ইত্যাদি। পঞ্চমতঃ গাছ পুকুর, গরুর পাল, ঘোড়ার পাল, হাঙর ইত্যাদির বাক্‌শক্তি Talking Tree, Animal etc বা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন বৃক্ষ, প্রাণী ইত্যাদি অভিপ্রায়ের অন্তর্গত।

ষষ্ঠতঃ ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজি (Magic); শতেশ্বরী হার উপরে ফেলতেই হাঙ্গর ডুবতে পেরেছে, ধনসম্পদ দান করার ফলে গরুর পাল, ঘোড়ার পাল, বুড়ি, পুকুর, ডুমুর গাছ, বোঝা-মাথায় লোকটি—সবাই দুর্দশামুক্ত হতে পেরেছে; সমস্তই যেন ভোজবাজির মতো নিমেষের মধ্যেই ঘটে গেছে। ব্রতকথাটির মধ্যে আরো কিছু বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাহিনীটি সম্পূর্ণতঃ কৃষকজীবননির্ভর। সুদূর অতীতে গরু, ঘোড়া আদি গৃহপালিত প্রাণীগুলো বন্য প্রাণীর মতো অরণ্যে ঘুরে বেড়াত। কাহিনীটিতে আদিম মানুষের বন্য প্রাণীকে গৃহপালিত করে তোলার ইঙ্গিত আছে। ভাসমান হাঙ্গরের উপাখ্যানে হাঙ্গরমুখো নৌকোর সাহায্যে আদিম মানুষের সমুদ্র বিচরণের আভাস থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। আদিম মানুষ সাধারণতঃ নদী বা ঝরণা থেকে জল সংগ্রহ করত; এই জলই তারা পবিত্র এবং পানীয় মনে করত। কূপ পুষ্করিণী কৃত্রিম, তাই তার জল ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক; এখনো দেবপূজা করে পুকুরের প্রতিষ্ঠা না করা হলে কেউ জল পান করে না। ডুমুরের ফলের ভেতর সাধারণতঃ পোকা বিজবিজ করে; আসলে বুনো ফল খাদ্যদ্রব্য হিসাবে গ্রহণ করার কথাই ডুমুর ফলের প্রসঙ্গে ফুটে উঠেছে। বুড়ি এবং বোঝা-মাথায় লোকটির কাহিনীটিতে লোকবিশ্বাস এবং সংস্কারের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে; আদিম সমাজে সংস্কার, বিশেষভাবে কুসংস্কার, জীবনচর্যা নিয়ন্ত্রণ করত। এখানে এই সংস্কার বা বিধিনিষেধ মানা যে যে-কোন লোকের পক্ষে কল্যাণকর, তা লোকটির এবং বুড়ির দুর্দশা থেকে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরাকথা

আদিম মানব বিশ্বচরাচরের মধ্যে আশ্চর্য জীবজন্তু, গাছপালা এবং দুর্জ্ঞেয় ঘটনাবলীর সংঘটন দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাদের অবিকশিত বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিল অজস্র অবাস্তব কাহিনীসৃষ্টির মাধ্যমে।

ইংরেজীতে এই শ্রেণীর কাহিনীকে Myth বলা হয়, বাংলায় একে পুরাকথা বলা চলে। ঝাড়খণ্ডে এই শ্রেণীর কাহিনীকেও 'গল্প' বা 'কহনী' বলা হয়। পুরাকথা প্রধানতঃ দেবদেবীগণের কার্যকলাপকে উপজীব্য করেই গড়ে ওঠে। Myth শব্দটি গ্রীক শব্দ Mythos থেকে উৎপন্ন হয়েছে; এর অর্থ 'কোন কিছু বলা' অর্থাৎ মুখ দিয়ে উচ্চারিত কথা, ভাষণ বা কাহিনী। কিন্তু বিশিষ্ট প্রয়োগের ক্ষেত্রে Myth দেবদেবীগণের কার্যকলাপকেই বোঝায়। পুরাকথা দেবদেবীগণকে অবলম্বন করে রচিত হয়ে থাকে বলে পুবাকাহিনী এবং ধর্ম-ভাবনা খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাঁধা পড়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ধর্মভাবনা সম্পূর্ণতঃ আদিম প্রকৃতির, যখন ধর্মের মধ্যে বিশ্বাসের চেয়ে আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীকাশ্রিত ক্রিযাকাণ্ডের গুরুত্ব ছিল সমধিক। আচার-অনুষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় রীতিবিশেষ; দেবতারা একদা যে-ভাবে ঐন্দ্রজালিক এবং অলৌকিক কার্যাবলী সম্পন্ন করতেন, আচাব-অনুষ্ঠান তারই অনুকরণ-মাত্র—এর পশ্চাতে লোকবিশ্বাস এই যে, এর সাহায্যে দেবতাদের মতোই অলৌকিক এবং ঐন্দ্রজালিক কাযাবলী সম্পন্ন কবা যায়। এই বিশ্বস্ত অনু-করণের সাহায্যে যে আচাব পালন করা হয়, তা ইন্দ্রজালেব রূপ লাভ করে। কাজেই আদিম ধর্ম-ভাবনা বলতে বিশেযভাবে জীবনচর্যার উপকবণের ক্ষেত্রে মানুষ দেবতাদের মুল কার্যাবলীব ভক্তিভাবে যে-বিশ্বস্ত অনুকরণ করত, তাকেই বোঝায়। আদিমতম ধর্ম, নিশ্চিতভাবে বলা চলে, আচাব-মূলক ছিল। কিন্তু পুরাকথা ঠিক তা নয়। Myth, on the other hand, is in the strict sense of the term, the description of a rite, its story, the narrative linked with it. Not only so, but it possesses a mysterious virtue of its own as occasionally handing down those words of power supposed to be uttered by the god when he first celebrated the rite in question.[১] পুবাকথা আচারের বিবরণেব সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনীটিও প্রকাশ কবে থাকে। শুধু তাই নয়, পুবাকথার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট আচারটি পালনের সময় দেবতা যে সব কথা উচ্চারণ করে-ছিলেন, তা নিহিত রয়েছে বলে কল্পনা করা হয়; তাই পুরাকথাতে একটি রহস্যময় পাবিত্রতাও সংগুপ্ত থাকে। তাছাড়া পুরাকথা কোন আচাব বা

১. Lewis Spence: The Outlines of Mythology. P. 15

সংস্কারের কোন ব্যাখ্যা দেয় না, শুধুমাত্র আচার বা সংস্কারটিকে বিবৃত করাই এর লক্ষ্য।

পুরাকথায় গ্রহণবর্জনের কোন স্থান নেই। এর ফলে পুরাকথা তার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। Myth is, in its earliest form, the description of such rites, the story of them, "the book of words" which accompanies the dramatic representation of ritual. It jealously adheres to the letter and circumstance of that which it narrates or describes. To alter it in anyway is thought to destriy its magical or supernatural ifficacy.[২]

পুরাকথায় আদিম মানুষের যে-চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছে, তাকে মোটেই সংগত বা যুক্তিপূর্ণ বলা চলে না। আদিম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি শিশুর মতোই সরল এবং অপরিণত ছিল; স্বভাবতঃই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষাও তাদের আয়ত্তে ছিল না, তাই নিজেদের অভিজ্ঞতাকে বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে পারত না, বরং কল্পনার রঙের যথেচ্ছ অবলেপে অভিজ্ঞতাকে ভ্রমাত্মক এবং বিকৃত করে তুলত।

পৃথিবীর বহু রহস্যের ব্যাখ্যা করতে না পেরে আদিম মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং ভীতি-উৎপাদক রহস্যময় বস্তুগুলোর মধ্যে অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত ক্ষমতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে মানুষের মতোই জীবন্ত এবং সচেতন বলে মনে করত। শুধু তাই নয়, তারা প্রতিটি প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে প্রাণ বা আত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাসকেই পণ্ডিতমণ্ডলী Animism বা সর্বপ্রাণবাদ নামে অভিহিত করেছেন। এই বিশ্বাসের জন্যই দেখা যায়, লোককথা ব্রতকথা এবং পুরাকথার মধ্যে পাথর-পাহাড় গাছপালা নদী-পুষ্করিণী জীবজন্তু সমস্তই মানুষের মতো কথা বলছে এবং মানুষের মতোই আচরণও করছে। অর্থাৎ আদিম মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুতেই ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছিল। এই সর্বপ্রাণবাদ থেকেই দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। প্রাণময়

২. ibid P. 23

সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুই তখন দেবত্ব লাভ করতে শুরু করে। দেবত্বের ক্রম-বিকাশ প্রসঙ্গে অনেক ক'টি মত প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন গুণাবলীর স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিপূজা থেকে দেবতার উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে; পূর্বপুরুষের পূজা, ঝাড়খণ্ডে যাদের 'বুঢ়াবুঢ়ী' বলা হয়, এই ভাবেই চল হয়ে থাকা সম্ভব। দ্বিতীয় মত অনুসারে, প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তি থেকে দেবত্বের বিশ্বাসের সূত্রপাত; এই ভাবেই মেঘ-বৃষ্টি বজ্র-বিদ্যুৎ-অগ্নি এবং বিশিষ্ট বৃক্ষসমূহ (ঝাড়খণ্ডের করম পূজা), জীবজন্তু (ঝাড়খণ্ডের গো-মহিষের পূজা) আদি দেবত্ব অর্জন করে এবং পূজিত হতে থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, আদিম উপজাতিদের টোটেম বা কুলকেতুর প্রতি দেবত্ব আরোপের ফলেই দেবতার উদ্ভব ঘটেছিল। ঝাড়খণ্ডে টোটেম বা কুলকেতু যে দেবত্বের মর্যাদা লাভ করে আসছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের কুলকেতুকে দেবতাজ্ঞানেই পরিহার করে চলে। কুলকেতুর কোনরকম ক্ষতি সাধিত হলে গোষ্ঠীর সামূহিক সর্বনাশ হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে। চতুর্থ মত অনুসারে দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের মনের মধ্যেই সংগুপ্ত ছিল। আমাদের মনে হয়, এই সমস্ত মতবাদের কোনটিই সর্বাংশে সম্পূর্ণ নয়, আবার কোনটিই একেবারে অযৌক্তিকও নয়। এই সমস্ত মতবাদকে একত্রে সমন্বিত করে বোঝবার চেষ্টা করা হলেই বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের প্রতিটি দেবতার উদ্ভব কাহিনীর ব্যাখ্যা করা সম্ভব, অন্যথা কোন একটিকে অবলম্বন করলে তা একদেশদর্শী হয়ে পড়তে বাধ্য।

সর্বপ্রাণবাদের বিশ্বাসভূমিকে অবলম্বন করেই যে দেবত্বের উদ্ভব ঘটেছে তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু প্রাণময় সচেতন প্রাকৃতিক বস্তুর যেসব গুণে আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, দেবত্ব আরোপের পর সেই সব গুণের কার্যকারিতা, তীব্রতা এবং অমোঘতা অসীমিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল......It tended to reveal attributes essentially different from that of body—a supernatural and inexplicable quality of awe and might, associated with magical powers, which all spirits were thought of as possessing... ..[৩] দেবত্ব প্রাপ্তির পর প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে

৩ ibid P43

অপ্রাকৃত এবং দুর্জ্ঞেয় ভয় এবং ক্ষমতার যেমন বৃদ্ধি ঘটেছিল, তেমনি ঐন্দ্রজালিক শক্তিরও অভাবনীয় কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত আর তাই তারা দেবত্ব-প্রাপ্ত প্রাকৃতিক বস্তুগুলোকে ভয়ে-ভক্তিতে এবং বিস্ময়ে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে পরিহার করে চলত।

পুরাকথাতে বিবৃত দেবতাদের আবির্ভাব এই ভাবেই ঘটেছিল। এবার আমরা এই সব দেবতাদের কার্যকলাপের কাহিনীর উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখব। পুরাকথা শুধুমাত্র দেবতাদের বিচিত্র অলৌকিক কার্যাবলীর বিশ্বস্ত দলিলসর্বস্ব নয়; পুরাকথার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টিকথা, গ্রহনক্ষত্রের কথা, পাপপুণ্যের কথা, গাছপালা-জীবজন্তু পাহাড়পর্বত-নদীনালার জন্মরহস্যের কথা আদি বিচিত্র বিষয়বস্তু স্থানলাভ করে থাকে। সর্বক্ষেত্রেই অলৌকিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। দেবতারা অলৌকিক অপ্রাকৃত ঘটনা সংঘটিত করতে পারেন, যার ফল ব্যষ্টি বা সমষ্টি-জীবনে কল্যাণকর হয়। অলৌকিক ঘটনা-সংঘটনের জন্য কিছু আচারের বিশ্বস্ত অনুকরণ একান্ত প্রয়োজন, কারণ এছাড়া ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ডের অবতারণা করা সম্ভব হয় না। আমরা আগেই দেখেছি, পুরাকথা আচার-মূলক; কাহিনীর কোন কথা বা প্রসঙ্গ গ্রহণ বা বর্জন নিষিদ্ধ। পুরাকথার উদ্ভব আচার-অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে ঘটে-থাকা খুবই স্বাভাবিক। ঝাড়খণ্ডের কৃষি-ভিত্তিক বিভিন্ন উৎসব এবং পূজানুষ্ঠানের আচারগুলোর কথা স্মরণে রাখলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বৃষ্টি ফসল ইত্যাদির কামনায় এই আচারগুলো পালিত হয়, প্রয়োজন পড়লে জীববলির রক্তও দেবতাকে দেওয়া হয়। এই সব আচারই এখানকার পুরাকথার ভিত্তি রচনা করেছে। সর্দার-সামন্ত-রাজাদের আচারজীবনের পুরাকথা লোককথায় পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মতে বাস্তবে এই ঘটনাটিই ঘটেছে; তাই লোককথাকে broken down myth হিসাবেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

গল্প বলা বা রচনার ঝোঁক মানবসমাজের সর্বস্তরে লক্ষ্যগোচর হয়। তাই পুরাকথার উদ্ভব এবং বিকাশ প্রসঙ্গে গল্প বা কাহিনী রচনার ঝোঁকের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। আদিম মানুষ যে-বস্তুরই কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি, সে বস্তুর সম্পর্কে সে অলৌকিক অপ্রাকৃত কাহিনী রচনা করে ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছে। জীবন এবং ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী দুর্জ্ঞেয় অপ্রাকৃত

শক্তিগুলোর ব্যাখ্যা সে এই উপায়ে ছাড়া আর কিভাবে করতে পারত ? আসলে এই কাহিনী আবিষ্কারের ঝোঁক থেকেই পুরাকথার উদ্ভব হয়েছে বলে এর উপকরণ সরাসরি লোকথার উপকরণেও পরিণত হয়েছে। তবে পুরাকথা বা লোককথা যাই হোক না কেন, এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে, এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে প্রসারিত বা প্রচারিত হবার সময় বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সমাজের রীতিরেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার বিভিন্নতার জন্য কাহিনী-বয়নে এবং চরিত্রায়ণে পরিবর্তনসাধন খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে ; দু'টি গোষ্ঠীর জীবনচর্যার মধ্যে যদি সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে, তাহলে সমগ্র মূল কাহিনীর এবং চরিত্রাবলীর সম্পূর্ণ বর্জন এবং নবতর রূপায়ণও অসম্ভব নয়। ব্রতকথা প্রসঙ্গে আলোচিত করম-কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাঁওতালী কাহিনী, আমাদের সংগৃহীত ঝাড়খণ্ডী উপভাষা-ভাষীদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী এবং পূর্ব মৈমনসিংহে প্রচলিত কাহিনী ও ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখিত কাহিনীর মধ্যে এই কারণেই এত বেশি বিভিন্নতা এবং পার্থক্য দেখা গেছে।

শুধু যে আচারমূলক প্রতীকধর্মিতা থেকেই পুরাকথার উদ্ভব ঘটেছে তা নয় ; দু'টি বস্তুর মধ্যে তুলনা করবার প্রবৃত্তি বা সাযুজ্য কল্পনা থেকেও পুরাকথার উদ্ভব ঘটে। ভাবসংহতির সাহায্যে আদিম মানুষ বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বার করত এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস পেত। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, The most common and natural Consquence of analogy is identification. Because the wind, the sea, the fire move, they must, the savage supposes, be like men ; they must be persons, individuals.[8] এই জাতীয় কাহিনীকে পুরাকথা বলতে বাধা নেই, যদি কাহিনীটি আচারমূলক না হয়েও কোন দেবতার কার্যকলাপকে বিবৃত করে।

তাছাড়া একবার দেবতাদের বিশিষ্ট রূপ এবং গুণ আচারের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে গোষ্ঠীর মধ্যে সেই দেবতাদের সম্পর্কে জনপ্রিয় কাহিনীর উদ্ভব ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। উদ্ভাবিত কাহিনীর সাহায্যে আচারের শূণ্যস্থান পূরণ করবার ঝোঁক দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, তাই

8, ibid P54

দেবতাদের চরিত্র এবং গুণাবলীর উপযুক্ত ক্রিয়া-কাণ্ডের সাহায্যে পুরাকথার সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করা হয়।

এই সমস্ত কারণ ছাড়াও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতা, অজ্ঞতাকে গোপন করবার প্রবল ইচ্ছা, প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা-জনিত আতঙ্ক, আদিম মানুষের শিশুসুলভ বিস্ময়বোধ আদি মনস্তাত্ত্বিক কারণ গুলোকেও পুরাকথার উদ্ভবের অন্যতম কারণ বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। পুরাকথার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে Lewis Spence বলেছেন : It is possible to classify myths into quite a number of divisions : those which deal with the creation of the world, with the origin of man, which treat of the heavenly bodies, of places of reward and punishment, and most important of all, perhaps, of the adventures of the gods.[৫] অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব, মানুষের জন্মকথা, গ্রহনক্ষত্র, স্বর্গ-নরক এবং দেবতাদের কার্যকলাপ আদি কয়েকটি শ্রেণীতে পুরাকথাকে ভাগ করা যেতে পারে। জীবজন্তু পাহাড়পর্বত, নদীসমুদ্র সম্পর্কেও যেসব কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়, সেগুলোকেও পুরাকথার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণে রাখা দরকার : খাঁটি এবং মৌলিক পুরাকথা গোষ্ঠীর আচারমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে অনিবার্যতঃ জড়িত থাকে, এই কাহিনীগুলো দেবতা একেবারে আদিকালে যেভাবে আচার পালন করেছিলেন তারই মোটামুটি আক্ষরিক বিবৃতি বলা যেতে পারে।

পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্যের গোপনকথা জানবার কৌতূহল সেই আদিম যুগ থেকে অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। পৃথিবীর কিভাবে সৃষ্টি হল কিংবা কিভাবে মানুষজন জীবজন্তুর জন্ম হল সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করবার ইচ্ছা যুগে-যুগে মানুষের চিন্তাভাবনাকে আলোড়িত করে রেখেছে। ঝাড়খণ্ডেও তাই সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কিত কিছু কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। পৃথিবী এবং জীবজগতের সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়বারিধির কথা সব দেশের পুরাকথাতে স্থান পেয়েছে। তখন মাটি বা পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না; যে দিকে দৃষ্টি পড়ত শুধু জল আর জল। না ছিল গাছপালা, না ছিল মানুষজন জীবজন্তু। ঝাড়খণ্ডের পুরাকথায় একেই বলা হয়েছে 'জলঙ্কার' বা জলাকার সৃষ্টি। মহাপ্রলয়

৫, ibid P63

প্রসঙ্গে যে-কাহিনীটি শুনতে পাওয়া যায়, তা হল এই:—আদিকালে, সেই সত্যযুগে, ঈশ্বর এই পৃথিবীকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষজনের জীবনে হাসিখুশি ছাড়া দুঃখবেদনা ছিল না। মানুষে-দেবতাতে কোন পার্থক্য ছিল না। সুখশান্তি, ধনসম্পদ আর দীর্ঘজীবন সেদিন সৌভাগ্যের ভিত্তিমূল দৃঢ় করেছিল। কিন্তু এত সুখ বুঝি মানুষের সহ্য হল না, তাই তারা অধর্ম, অন্যায় দুরাচারে প্রবৃত্ত হল—ভগবানের কথা একেবারে ভুলে গেল। ভগবান ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে প্রাণীদের চৈতন্যোদয়েব চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও যখন কিছু হল না, তখন স্বর্গ থেকে 'গজবাজ' হাতিকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ফেললেন। হাতিব পায়েব চাপে পৃথিবী ফেটে গিয়ে জলে জলে ভরে গিয়ে 'জলক্কাব'-এর সৃষ্টি হল। পৃথিবীকে ধ্বংস কবে ভগবান নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আবাব তাঁব নিজের ভুলেই পৃথিবীকে নতুন কবে সৃষ্টি কবতে হয়েছিল। সে আব এক কাহিনী। ভগবান স্বর্গেব করম গাছেব পাতায় বসে স্নান কবতেন। একদিন খেয়াল বশে তিনি ঘাস দিয়ে একটি 'ষাঁড' হাঁস আব একটি 'ঢা'ড' (মাদী) হাঁস তৈবি কবে ফুঁ দিতেই হাঁস দুটো সজীব হয়ে স্বর্গেব আকাশে উডে গেল। হাঁস দুটো শুধু উডতেই লাগল, কেননা আশ্রয নেবার মতো কোন জায়গা ছিল না—পৃথিবীতে চাবপাশে শুধু জল ছাডা আর কিছু ছিল না। হাঁস জলেব জীব ভেবে ভগবান এদের পৃথিবীতেই পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এবা জলে নামলেও ডাঙার খোঁজে উডে বেডাতে লাগল। ভগবান বিব্রত হলেন। কিন্তু নতুন করে আর পৃথিবী সৃষ্টি না করে তিনি জলের তলাকার একটি ঘাস থেকে একটি করম গাছেব সৃষ্টি করলেন। জলের অনেক উঁচুতে সেই ডালপালা মেলে দিল। হাঁস দুটো করম গাছে আশ্রয় নিল, বাসা বাঁধল এবং যথাসময়ে দুটো ডিম পাডল, বাচ্চা জন্মাবাব দিন যতোই এগিয়ে আসে হাঁস দুটোর উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়, মাটি নেই—বাচ্চাগুলো জলে ডুবে মরে যেতে পাবে। তাই ওরা কান্না-কাটি শুরু করে দিল। ভগবানের টনক নডল। ডাক দিলেন মারাং বুরু (বড পাহাড) দেবতাকে এবং তাঁরই ওপব নতুন করে পৃথিবী সৃষ্টির আদেশ দিলেন। কিন্তু মাটি কোথায় যে পৃথিবীর সৃষ্টি হবে। কিন্তু তবু তো সৃষ্টি কবতেই হবে। তাই কচ্ছপ রাজেব চারটি পা চার কোণে টেনে বাঁধা হল। কচ্ছপ আর নডতে চড়তে পারল না, ভগবান তার দুঃখ বুঝে সান্ত্বনা দিলেন,

দশ বছরে একবার সে নড়তে পারবে। এবার বাসুকী নাগকে কচ্ছপের ওপর বসানো হল। তাকেও আশ্বাস দেওয়া হল, কচ্ছপের সঙ্গে সেও দশ বছরে একবার নড়তে পারবে। এবার নাগের মাথায় একটি বিশাল সোনার থালা রাখা হল। অই থালার ওপর নতুন পৃথিবীই সৃষ্টি করা হবে। জলের তলা থেকে মাটি তুলতে না পারলে পৃথিবী সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাই চিংড়িকে ডাক দেওয়া হল জলের তলা থেকে মাটি তুলে এনে থালা ভরবার জন্য। কিন্তু জলের তলা থেকে চিংড়ি মাটি তুলতে পারল না, মাটি তুলে আনতে গিয়েই দেখে সব মাটি জলে ধুয়ে যাচ্ছে। তখন ডাক পড়ল কাঁকড়ার। কিন্তু কাঁকড়াও মাটি তুলতে পারল না। জলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই মাটি গলে গিয়ে জলের তলায় নেমে যেতে লাগল। এবার শেষ ভরসা কেঁচো। কেঁচো জলের তলায় ডুবে পেট ভরে মাটি গিলে ওপরে ভেসে উঠে সেই থালায় মাটি উগরে ফেলতে লাগল। ধীরে ধীরে সোনার থালা মাটিতে ভরে উঠল। নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি হল। পৃথিবী তো সৃষ্টি হল কিন্তু ঠিক আগের মত হল না। তাই ভগবান মহাদেবকে আগের মত সুন্দর করে পৃথিবীকে সাজাতে আদেশ দিলেন। 'চাঁওরা' আর 'ভাঁওরা' দুই কাড়ার (মোষ) সাথে একটি বড়ো মই জুড়ে পৃথিবীকে সমতল করার চেষ্টা করা হল। মই-এর টানে অনেক বড়ো বড়ো ঢেলা এক এক জায়গায় জমে গিয়ে ছোট বড়ো ঢিবির সৃষ্টি হল। এগুলোই শক্ত হয়ে গিয়ে ছোট বড়ো পাহাড়-পর্বতে পরিণত হল! ঢিবিগুলোকে ভেঙে ফেলবার জন্য ছোট করবার জন্য তাদের ওপর লাঙল চালানো হল। কিছু কিছু লাঙলের দাগ এতো বেশি গভীর হয়ে গেল যে মাটির তলা থেকে জল উঠে তা ভরে ফেলল। এগুলো থেকেই নদীনালার সৃষ্টি হল। জলে-ভেজা মাটির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হল 'দুব' (দুর্বা) ঘাসের বীজ। সারা পৃথিবী এবার সবুজ হয়ে উঠল। এখানে ওখানে 'খড় জারা' (চোরকাঁটা)-র ঝোপ গজিয়ে উঠল। এই ঝোপ ঝাড়ের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হল শাল, পিয়াল, কেঁদ, ভুড়রু, আসন, কুড়চি, মহুল গাছের বীজ। পৃথিবী সৃষ্টির কাজ যেই শেষ হল, অমনি করম গাছের ডালে দুটো হাঁস আনন্দে ডেকে উঠল। ভগবান তাকিয়ে দেখেন, ডিম ফুটে দুটো বাচ্চা বেরিয়েছে ; হাঁসের বাচ্চা নয়, দুটো মানুষের বাচ্চা—একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে ; এরাই হল আদি মানব আর আদি মানবী।

উদ্ধৃত পুরাকথার মধ্যে ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক উপাখ্যান বিধৃত হয়েছে। উপাখ্যানটির মধ্যে মহাপ্লাবন, পৃথিবীর সৃষ্টি এবং আদিম নরনারীর জন্মকথা সম্পর্কে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস কথারূপ পেয়েছে। পাখির ডিমের মধ্য থেকে আদিম মানব মানবীর জন্মলাভ নিঃসন্দেহে অপ্রাকৃত এবং অলৌকিক ঘটনা; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় কি না হয়। পুরাকথাটির মধ্যে যে সব প্রাণীর উল্লেখ আছে, লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে তার সব ক'টিই মূলতঃ জলপ্রাণী। হাঁস, কচ্ছপ, বাসুকী নাগ, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, কেঁচো, সমস্তই জলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে জড়িত প্রাণী। মহাপ্লাবনের 'জলকাং' এর মধ্যে এরাই জলের তলায় বাস করত। পুরাকথাটিতে পাহাড়পর্বত, নদীনালা গাছপালা, তৃণ-ওষধি আদির সৃষ্টিকথাও বিবৃত হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে গ্রহনক্ষত্র, আকাশলোক সম্পর্কেও কিছু কিছু লোকবিশ্বাসমূলক পুরাকথা শ্রুতিগোচর হয়। সূর্য ধরম করম দেবতার ছদ্মবেশে এদের সাংস্কৃতিক-জীবনকে প্রাণময় করে রেখেছে। চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধির বিচিত্র আচরণের মধ্য দিয়ে এরা উদ্ভিদ জগতের জন্ম-মৃত্যু পুনর্জন্মের রহস্যভেদ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই সূত্রেই এরা মানুষের পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এ ছাড়া রাত্রিবেলা আকাশে অজস্র নক্ষত্র দেখে ঝাড়খণ্ডী মানুষ তাদের রহস্যভেদ করবার জন্য বিভিন্ন কাহিনীর সৃষ্টি করেছে। আকাশগঙ্গা (Milky way) কে ঝাড়খণ্ডে 'হাতি ডহর', কোথাও বা 'গাই ডহর' বলা হয়। এই পথ ধরে স্বর্গ থেকে হাতি নিচে নেমে আসে। মহাপ্রলয় সৃষ্টির সময় ভগবান গজরাজ হাতিকে এই পথ দিয়েই পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আকাশে এক সারিতে তিনটি তারা দেখে এরা তাদের নামকরণ করেছে 'দহিভারিয়া' বা দধিভারবহনকারী। ওরা নাকি স্বর্গে দই বিক্রি করবাব জন্য কাঁধে ভার নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আবার একগুচ্ছ তারার নাম দিয়েছে 'ছাগল বাগাল'; অজস্র নক্ষত্র যেন ছাগলের মতো মাঠে চরে বেড়াচ্ছে আর উজ্জ্বল কয়েকটি নক্ষত্র ছাগলবাগাল, মাঠে ছাগল ছেড়ে দিয়ে পাশাপাশি বসে খেলা করছে। সপ্তর্ষি নক্ষত্রপুঞ্জের নাম এরা রেখেছে 'সাত ভাইয়া' বা 'মড়া খা'টলা'। সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি হল এই যে এই সাতভাই-এর মা মারা গেছে, খাটের চার কোণে চার ভাই কাঁধ দিয়েছে, তিনভাই পেছনে পেছনে চলেছে—কিন্তু তারা তাদের মায়ের সৎকার করবে এমন ফাঁকা জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না; তাই তারা আজো কোথাও খাট নামাতে পারেনি; মায়েরও সৎকার করা সম্ভব হয় নি। চাঁদের

মধ্যে গাছের মতো যে- চিত্রটি ফুটে ওঠে তাকে এরা বলে করম গাছ, করম-ঠাকুর নাকি ওখানেই থাকেন।

পুরাকথা সাধারণতঃ দেবতাদের ক্রিয়াকাণ্ডকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। ঝাড়খণ্ডে বহু লৌকিক দেবতাকে অবলম্বন করে পুরাকথার সৃষ্টি হয়েছে। 'মাহরা' গীত প্রসঙ্গে আমরা ধরম ঠাকুরের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করেছি। ব্রতকথা প্রসঙ্গে করম ঠাকুর সম্পর্কিত পুরাকথার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। করম ঠাকুরের উপাখ্যানে বন্য জীবজন্তুর গৃহপালিত পশুতে পরিণত হওয়ার ইঙ্গিত যেমন আছে, তেমনি আছে বুনো ফলমূল খাদ্যদ্রব্য হিসাবে গ্রহণের কাহিনী। অতঃপর আরো কিছু লৌকিক দেবতা-সম্পর্কিত পুরাকথার আলোচনা করা হচ্ছে ধলভূমের চাকুলিয়া থানায় কানায়েশ্বর (বড় পাহাড়) এবং গোটাশিলা নামে দু'টি লৌকিক পাহাড়-দেবতার পূজা আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কানায়েশ্বর-দেবতার কোন মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় না। কানায়েশ্বর সম্পর্কিত কাহিনীটি এইরূপ : একদা দেবতা স্বমূর্তিতে পূজা গ্রহণ করতেন, সবাইকেই তিনি দর্শন দান করতেন। সন্ধ্যার সময় পূজা শেষ হলে দেবতা তাঁর সহচরদের সঙ্গে সচল সজীব আকারে ভোগ গ্রহণ করতে আসতেন। একবার 'দেহরী' (পূজারী) তার পশু বলি দেবার হাতিয়ারটা ভুলে ফেলে এসেছিল। বাড়িতে ফিরে আসবার পর হাতিয়ারটির কথা মনে পড়তেই সে তক্ষুনি আবার কানায়েশ্বর দেবতার কাছে ফিরে যায়। ভোগ গ্রহণে বাধা পড়ায় দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং হাতিয়ারটি দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, এরপর আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, আমার পূজা এরপর আড়াল থেকেই কোর। কথা হবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির তলা থেকে একটি বিশাল পাথর উঠে গুহামুখ বন্ধ করে দিল। পূজারী হাতিয়ারটা নিতে গিয়ে দেখে তা পাষাণ হয়ে গেছে। আজো তা ভাগ্যবানেরা দেখতে পায় জনশ্রুতি আছে। গোটাশিলা-সম্পর্কিত উপাখ্যানটি একটু ভিন্ন রকমের : মাটিয়াবাঁধি গ্রামে একদা গোটাশিলা দেবতা তাঁর বুড়ীর সঙ্গে বাস করতেন। 'বুড়ীর থান' এখনও আছে। গোটাশিলা রাত্রিবেলা ঘোড়ায় চড়ে সারা গ্রাম পাহারা দিয়ে শেষ রাত্রে ঘুমোতেন। গ্রামের ভুঁইঞারা (ছুতার) মাঝরাত্রি থেকে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চিঁড়ে কুটত বলে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হত। গ্রামের মোড়লকে বারবার স্বপ্নযোগে এই চিঁড়ে কোটা বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু মোড়লের পক্ষে গাঁয়ের লোকের পেশায় হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়নি বলে এক

রাত্রে গোটাশিলা চুপচাপ বুড়ীকে পেছনে ফেলে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যান। বেশী দূর যেতে না যেতেই বুনো মোরগ ডেকে উঠে ভোর হবার আভাস দিল! গোটাশিলা রেগেমেগে মোরগটির ঘাড় মুচড়ে ফেলে দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে এসে শালকুঞ্জে আশ্রয় নেন। ওখানেই তিনি এখনো শিবলিঙ্গের আকারে পূজা গ্রহণ করেন। ঘাড় মোচড়ানো মোরগটি পাষাণ হয়ে যায়। জনশ্রুতি আছে ভাগ্যবান হলে এখনো ওটি দেখতে পাওয়া যায়। গোটাশিলার বুড়ী যেমন মাটিয়াবাঁধি গ্রামে আছেন, তেমনি কানারেশ্বরের বুড়ী আছেন বুন্দর নামক গ্রামে। দুটো ক্ষেত্রেই একটি নালা বুড়োবুড়ির থানকে সংযুক্ত করেছে। দুটো ক্ষেত্রেই পাষাণ বস্তুর প্রসঙ্গ আছে। এই পাষাণ বস্তু-গুলো সম্ভবতঃ প্রস্তর যুগের চিহ্ন এবং এই গুলোই দুটি ক্ষেত্রেই দেবতা এবং তৎ-সম্পর্কিত পুরা কথার মৌল প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। ঝাড়খণ্ডে বড়াম ঠাকুরের পূজা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই দেবতা নাকি অত্যন্ত ভয়ংকর, এঁর পূজার রাত্রে সবাই দরজায় খিল এঁটে শুয়ে পড়ে—কেউ ডাকলেও সাড়া দিতে ভরসা পায় না। লোকশ্রুতি এই যে, বড়াম ঠাকুর রাত্রিবেলা নররক্তের জন্য প্রতিটি বাড়ির দরজায় দরজায় গিয়ে ডাকাডাকি করেন। ভুল করে কেউ ডাকে সাড়া দিলে বড়াম ঠাকুর তার ঘাড় মটকে রক্তপান করেন।

ঝাড়খণ্ডের ভয়ংকরী দেবী হচ্ছেন রঙ্কিনী। ডঃ সুধীরকুমার করণের গ্রন্থে রঙ্কিনী সম্পর্কে বিশদ পুরাকথার উল্লেখ আছে। রঙ্কিনী সম্ভবতঃ ভৈরবী বা জৈন ডাকিনী, এঁর ভৈরব বা ডাক শিলদায় অবস্থান করেন, একপদমূর্তি। সম্ভবতঃ মূর্তিটির একটি পা সুদূর অতীতে ভেঙে যাওয়ায় জনবিশ্বাসে ভৈরব একপদ দেবতা হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। শিলদার ভৈরব কখনো ধলভূমে ঘাটশিলায় রঙ্কিনীর সঙ্গে এক পায়ে হেঁটে দুম দুম শব্দ করে সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে দেখা করতে যান। ধলভূমে ভূমিকম্পের কারণ হিসাবে ভৈরবের একপদে সশব্দে গমণের কাহিনী বিবৃত করা হয়। অবশ্য ঝাড়খণ্ডে ভূমিকম্পের আরো একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। পৃথিবীর সৃষ্টিকার্যে সাহায্য করে ভার-বহনের দায়িত্ব নিয়েছিল কচ্ছপ ও বাসুকী নাগ। প্রতি দশ বছরে একবার করে এরা নড়াচড়ার অনুমতি পেয়েছিল। তাই ভূমিকম্প হলেই বলা হয় যে বাসুকী নাগ তার শরীর নেড়েচেড়ে ক্লান্তি দূর করছে। রঙ্কিনী সম্পর্কে অত্যন্ত সুপরিচিত পুরাকথাটি ঝাড়খণ্ডের সর্বত্রই শোনা যায়। অনেকদিন আগে শিখরভূমে রঙ্কিনী

থাকতেন। তাঁর সঙ্গে রাজ্যের রাজার চুক্তি হয়েছিল যে, রাজা প্রতিদিন রঙ্কিনীর ভোগের জন্য একটি করে মানুষ পাঠাবেন, না পাঠালে রাজ্যের সর্বনাশ হবে। নিয়ম মতো প্রতিদিন রঙ্কিনীর কাছে একটি করে মানুষ পাঠানো হত, রঙ্কিনী মানুষটিকে ঢেঁকিতে কুটে খেয়ে ফেলতেন। একবার এক গৃহস্থের একমাত্র ছেলের পালা পড়ল, গৃহস্থকে কেঁদে আকুল হতে দেখে তার বাগাল ছেলের বদলে যেতে রাজি হল। বাগাল কোঁচড়ের এক পাশে লোহার ছোলা অন্যপাশে আসল ছোলা নিল। তারপর নিশ্চিন্ত মনে আসল ছোলা চিবুতে চিবুতে রঙ্কিনীর কাছে গেল। রঙ্কিনী দেরি দেখে রেগে আগুন। বাগাল বলল, 'আমাকে তো খাবেই, তার জন্যই তো এসেছি, তবে আমাকে খাবার আগে এই ছোলা ভাজা খেয়ে দাঁতগুলো শানিয়ে নাও। বাগাল রঙ্কিনীকে লোহার ছোলা দিল, রঙ্কিনী যেই একটি ছোলা কামড়েছে অমনি একটি দাঁত ভেঙে গেল। এমনিভাবে অনেকগুলো দাঁত ভেঙে যেতে রঙ্কিনী ভয় পেয়ে পালাতে লাগলেন, কারণ যে লোক কড় কড় করে এত শক্ত ছোলা খেতে পারে সে নিশ্চয়ই মস্ত বড় বীর। রঙ্কিনীকে পালাতে দেখে বাগাল রঙ্কিনীর ঢেঁকি নিয়ে পেছনে তাড়া করতে লাগল। রঙ্কিনী ছুটতে ছুটতে ধলভূমে এসে ঢুকে পড়লেন। সামনেই নদীর ঘাটে এক ধোপা কাপড় কাচছিল। তার কাছে আশ্রয় চাইলেন। ধোপা রঙ্কিনীকে তার কাপড় কাচবার পাথরের তলায় লুকিয়ে ফেলল। এদিকে বাগাল এসে তাকে রঙ্কিনী কোনদিকে পালিয়েছেন জিগ্যেস করল। ধোপা দোটানায় পড়ল, মিথ্যে কথা বলতে তার বাধল। তাই সে কাপড় কাচতে কাচতে শিস দিয়ে পাথরটির তলার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। বাগাল বুঝতে না পেরে ফিরে গেল। তখন রঙ্কিনী বেরিয়ে এসে সেই ধোপাকে বলল, 'তুই আমার প্রাণ রক্ষা করেছিস, তাই তোকে এই ধলভূমের রাজত্ব দিলাম, যতোদিন আমার পূজা চলবে, ততোদিন তোর বংশের কোন ক্ষতি হবে না।' তারপর বললেন, 'তুই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলি, শিস দিয়ে বাগালকে আমার লুকানো জায়গাটি দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলি, তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি, ধোপারা কাপড় কাচতে গেলে শিস না দিলে তাদের অকল্যাণ হবে।' পুরাকথাটি থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টঃ প্রথমতঃ রঙ্কিনীর পূজা প্রথমে শিখরভূমে হত; দ্বিতীয়তঃ জৈন ডাকিনীর পূজার ওপর সেখানে আদিম জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছিল; তৃতীয়তঃ ধলভূমের রাজবংশ যে রজকবংশ এমন একটি

লোকবিশ্বাসের পরিপুষ্টি ঘটেছে, চতুর্থতঃ কাপড় কাচবার সময় ধোপারা যে শিস দেয় তারও একটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

একটি পুরাকথায় দেখা যায়, প্রথমে গরুবাছুর স্বর্গে থাকত। কিন্তু কোন গোপালক না থাকায় তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল গরুটি, কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠিকমতো গো-পূজা করতে না পারায় তার বাড়ি ছেড়ে আবার স্বর্গে ফিরে যায়। তখন তাকে এক ক্ষত্রিয় রাজার বাড়িতে পাঠানো হয়, কিন্তু অত্যাচারের ফলে সেখান থেকেও মহাদেবের ষাঁড় পালিয়ে যায়। শেষতক কেদারনাথ নামে এক ক্ষত্রিয় গো-জাতির প্রতি গভীর ভক্তি জ্ঞাপন করে মাতৃতুল্য সেবাযত্নে সন্তুষ্ট করে পৃথিবীতে গোমাতাকে বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়। যথাসময়ে শিব কেদারনাথের বাড়িতে এসে গোজাতির প্রতি তার সেবাযত্ন দেখে তাকে আশীর্বাদ করেন এবং গরুকে ঘুরিয়ে এনে সেবাযত্নে বেঁধে রাখার জন্য কেদারনাথের নতুন নাম-করণ করেন গুসাঁইবাই, কেদারনাথের গোসেবা-পরায়ণা স্ত্রীর নাম গোরয়া। ঝাড়খণ্ডের বাঁধনা পরবে গোপূজায় গুসাঁইবাই এবং গোরয়া মুখ্য দেবদেবী।

পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পাহাড়পর্বত নদীনালার উদ্ভব কাহিনী উল্লেখ করেছি। অতঃপর জীবজন্তু সরীসৃপ আদি সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি পুরাকথার উল্লেখ করব। প্রথমে সাপ সম্পর্কিত পুরাকথা। হেলে সাপ সম্পর্কে বলা হয়, এরা আকাশ থেকে মাটিতে বৃষ্টির সঙ্গে পড়ে থাকে। এরা বিষাক্ত সাপ (?) হলেও সহজে কাউকেই কামড়ায় না, কিন্তু একবার কামড়ালে মেঘ না ডাকা পর্যন্ত নাকি এরা কামড় ছাড়ে না এবং বিষও নামে না। 'তুতুড়' নামে এক ধরনের খর্বাকৃতি সাপ আছে যার লেজটি নারীর স্তনবৃন্তের মতো। এরা নাকি স্তন্যপায়ী, রাত্রিবেলা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে এবং কচি বাচ্চার মায়ের বিছানায় উঠে বাচ্চার মুখে লেজটি গুঁজে দিয়ে মুখ দিয়ে অবিকল শিশুর মতো মাতৃস্তন চুষে দুগ্ধপান করে। বলাবাহুল্য, সাপটি বিষাক্ত নয়। শিয়াড়চাঁদা বা চন্দ্রবোড়া ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ, কিন্তু শোনা যায় এই সাপ সহজে কামড়ায় না, পাতার আড়ালে অসাবধানে মাড়িয়ে ফেললে তিনবার শিস দিয়ে সাবধান করে দেয় এবং ছোবল মারে যার ফল, অনিবার্য মৃত্যু, এ সাপ কামড়ালে রুগীর গায়ে চাকা-চাকা দাগ উথলে ওঠে। শিয়াড়চাঁদা সম্পর্কে বলা হয়, এ সাপ বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে খর্বতর হতে শুরু করে এবং এক সময় খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে পড়ে,

তখন তার পাখা গজায় এবং আকাশে উড়ে যায়, উড়ন্ত পিঁয়াড়চাঁদার ছায়া কারো গায়ে পড়লে তার নাকি 'একাঙ্গী বাত' বা পক্ষাঘাত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন মাছ প্রসঙ্গেও নানা রকম কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। পৃথিবী সৃষ্টির জন্য যে মাটি তুলতে পারবে তাকে অর্ধেক পৃথিবী আর রাজকন্যা দেবার লোভ দেখানো হয়েছিল। চিংড়ি মাছ মাটি খাবলে জলের তলা থেকে তুলে আনতে গিয়ে পারে নি, ফলে অর্ধেক পৃথিবী বা রাজকন্যা কিছুই লাভ করতে পারে নি। তাই তারা আজো মনের দুঃখে জলের ভেতর মাটি খেয়ে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। কাঁকড়াও মাটি তুলতে পারে নি, তাই ওরা মনের দুঃখে জল ছেড়ে নরম মাটিতে বাসা বাঁধে আর অবিরত গর্তের ওপরে মাটি ঠেলে-ঠেলে ঢিবি বানায় আজো। চেং মাছের জন্মপ্রসঙ্গে বলা হয়, এই মাছ নাকি মাঠে-অরণ্যে মনুষ্যবিষ্ঠার গর্ত থেকে জন্মগ্রহণ করে, তাই ঝাড়খণ্ডের অনেকে এ মাছ খায় না।

কেঁচো কেন মাটি খেয়ে পৃথিবীর ওপরে মাটির ঢেল তৈরি করে, এর ব্যাখ্যা পৃথিবীর সৃষ্টিকার্যে কেঁচোর বিশিষ্ট ভূমিকার মধ্যে নিহিত আছে। কেঁচোই মাটি তুলে পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিল, তাই সে মাটির তলাকার অর্ধেক পৃথিবী পুরস্কার পেয়েছিল। সেই আনন্দে সে এখনো পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলার অভ্যাসে মাটি তুলে পৃথিবীর ওপরে ঢেলে চলেছে। গেঁড়ি-শামুকের জন্ম-সম্পর্কেও একটি কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র দান দিতে গিয়ে সবস্ব খোয়াবার পর তাঁকে ভাগ্যের বিপাকে শূকর রক্ষণা-বেক্ষণের চাকরি নিতে হয়েছিল। প্রত্যেকদিন শূকরের মলমূত্র পরিষ্কার করতে তার ভীষণ অসুবিধা হত। তাই তিনি একদিন ধর্মকে স্মরণ করে বললেন, 'আগামীকাল থেকে আমি শূকরের বিষ্ঠা পরিষ্কার করব না, খোঁয়াড় ঘর যেন আপনা থেকে পরিষ্কার হয়।' পরের দিন রাজা হরিশ্চন্দ্র সবিস্ময়ে দেখলেন শূকরের বিষ্ঠা গেঁড়িশামুকের রূপ ধরে খোঁয়াড়ের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কাঠবিড়ালির গায়ে তিনটি ডোরা দাগ কেন কিংবা সুউচ্চ বৃক্ষের মগডাল থেকে পড়লেও কাঠবিড়ালি মরে না কেন, এসম্পর্কেও ঝাড়খণ্ডে একটি কাহিনী শোনা যায়। রামচন্দ্র যখন সেতু বাঁধেন, তখন কাঠবিড়ালি সমুদ্রের জলে গা ভিজিয়ে বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে সেতুর কাছে গিয়ে ধুয়ে ফেলত; ফলে সেতুর মধ্যেকার ছোট ছোট ফাঁক ফোকরগুলো বন্ধ হয়ে যেত। রামচন্দ্র তার

এই সেবার জন্য তার পিঠে হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন ; বলেছিলেন, 'যতো উঁচু থেকেই তোর পতন ঘটুক না কেন তোর মৃত্যু হবে না।' তাই উঁচু মগডাল থেকে পড়লেও কাঠবিড়ালি মরে না। তার গায়ের ডোরা দাগগুলো রামচন্দ্রের আঙুলের দাগের স্মৃতি বহন করে চলেছে বলে বলা হয়।

তৃতীয় পর্ব

লোকসাহিত্যে প্রকৃতি, সমাজ ও জনজীবন

সাহিত্য, তা সে শিল্প সাহিত্য হোক কিংবা লোকসাহিত্য, সমাজের দর্পণবিশেষ। সামাজিক রীতিরেওয়াজ, দৈনন্দিন জীবনচর্য, লোকভাবনা সমস্তই সাহিত্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে সমান মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে কোনও সাহিত্য খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করলে সংশ্লিষ্ট ভাষা-ভাষী লোকজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ সহজেই গড়ে তোলা যায়। শুধু মানুষজনের আকার-আকৃতিই নয়, তাদের আচার-আচরণও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবন্ত-ভাবে প্রকাশ লাভ করে, আমরা আমাদের চারপাশে সাহিত্যের পাতা থেকে হঠাৎ জেগে-ওঠা চলমান জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে পারি। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে এই চলমান জীবন শুধু জীবন্ত অনুভবে স্পন্দিত নয়, প্রাণময় আনন্দবেদনায় একান্ত বাস্তব। লোকসাহিত্যের গানে-গল্পে প্রত্যক্ষ অরণ্য-ভূমির মানুষগুলো যেন তাদের সুখ-দুঃখ, লোভ ঈর্ষ্যা, হিংসা-কলহ নিয়ে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য শুধু সমাজের দর্পণই নয়, সমগ্র ঝাড়খণ্ড অঞ্চল তার বিবিধ বৈচিত্র্যে এখানে বিধৃত হয়ে আছে। এখানকার অরণ্য পাহাড়, নদী-নালা, গ্রাম-সহর, মেলা-পরবটাঁড়, সাজ-সজ্জা, গহনা-অলংকার সবকিছুই লোকসাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গাছপালা, জীবজন্তু, মাঠঘাট ঝাড়খণ্ডী মানুষের আনন্দবেদনার অনুভবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, কখনো মুক্তজীবনের প্রাণময়তার প্রতীক হিসাবে, কখনো বা মানবজীবনের রূপক হিসাবে ঝাড়খণ্ডের প্রাকৃতিক উপকরণগুলো লোকসাহিত্যে নিজ নিজ ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে।

লোকসাহিত্যকে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনজীবনকে গভীরভাবে জানবার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করলে ভুল করা হবে, এর মধ্য দিয়ে একটি অঞ্চলের সমগ্র রূপ ধরা পড়ে, তার কথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতি এবং জনজীবন এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা থাকে, শুধু বাস্তবজীবনে নয়, সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনের মধ্যেও।

বিশেষভাবে অরণ্যমানুষ প্রকৃতির ওপর এতোই নির্ভরশীল এবং ভাবনাগত-ভাবে এতোই অন্তরঙ্গ যে ঝাড়খণ্ডের জনজীবনকে অরণ্যপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়।

ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে প্রকৃতি, সমাজ ও জনজীবনের যে প্রতিফলন ঘটেছে, আমরা এই পর্বে তারই একটি ধারাবাহিক রূপরেখা রচনায় প্রয়াসী হব। তাই প্রকৃতি পর্যায়ে স্থান নাম, গ্রামনাম, হাটবাজার, মেলা-পরব, পাহাড়-জঙ্গল, নদীপুকুর, অরণ্যপ্রকৃতি, গাছপালা, ফুল-ফল, জীবজন্তু, পাখিপাখালি আদির রূপরেখা অঙ্কনের পাশাপাশি সমাজ ও জনজীবন পর্যায়ে সামাজিক রীতিরেওয়াজ, পারিবারিক কাঠামো ও বিবর্তন, বিবাহিত বিবাহেতর এবং বিবাহবিচ্ছিন্ন জীবনে নরনারী, প্রেমের বিচিত্র রূপ ও গতিপ্রকৃতি, যৌনতা, কুল ও কলঙ্কভাবনা, বিধিনিষেধ, নিষিদ্ধ অভিপ্রায়, যৌনসনন্দ, সাজসজ্জা, পোষাকপরিচ্ছদ, গহনা-অলংকার, খাদ্য ও পানীয়, পেশা-বৃত্তি আনন্দউৎসব, নৃত্যগীত আদি বিচিত্র বিষয়বস্তু এবং লোক ভাবনারও যথাসম্ভব আলোচনা করা হবে।

প্রকৃতি পর্যায়

ঝাড়খণ্ড নামটি যেমন বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তেমনি অধিকাংশ প্রাচীন অরণ্য-রাজ্যগুলোর নামও মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না; কয়েকটি অরণ্যরাজ্যের নাম অবশ্য এখনো মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। মানচিত্র থেকে এই সব নাম মুছে গেলেও মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি; এখনো মলভুঁই, সাতভুঁই, বাঁশবন, বরাভুঁই, শিখরভুঁই নামগুলো উচ্চারণ করে অরণ্যমানুষেরা আনন্দ পায়, রাজনীতির টানাপোড়নে যতোই তাদের নাম বদলে যাক না কেন। লোকসংগীতের মধ্যেও এইসব 'ভুঁই' বা 'বন' রাজ্যগুলো তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অরণ্য রাজ্যের নাম

১-৮ জলে কুলুপ জলে কুলুপ দিলে টুসু কি কর‍্যে, **চিল্কিগড়ের** বাংলাঘরে ছিলে টুসু কি কর‍্যে॥ **ধলভুঁই**-এ সা'জল **মলভুঁই**-এ বা'জল **বাঁশবনে** করম গাড়াল্য, **শিলদা** মুলুকে নিশি পুহাল্য॥ **ধলভুঁই**-এর ধবছাতা **বরাহাভুঁই**-এর ছঁড়ি খাতা, ভেলের ভেল্, মাথা

বাঁধিতেই দিন গেল্ ॥ **কল্যাণপুর দহিজুড়ি** বাজারে বিকায় মুড়ি, দকানে দকানে বিকায় মাথার ফুতুনি ॥ **রাইপুরের** টাঁইড়ে মা গ হল'দ বড় বসে, সেহ হল'দ বাঁটিতে রং কত চঢ়ে ॥ যাঁয়েছিলি **হেঁসলা** কুঢ়াঁই পালি বাঁশলা, কাঠ কাটা, সে ত রসিক-লাগা ছকরা ॥ **কাশীপুরের** রাজা তুমি নামটি তুমার লীলমণি, আঠারটি বেটা তুমার আরই খুজ পাটরানী ॥ **শিখরভুঁই**-এ রে বরদা তরি জনম রে **বরহাভুঁই**-এ লিলি গিরহবাঁসা ॥

ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক পটভূমি, ঐতিহ্য, জীবনচর্যা, মানুষজন, ভাষা ইত্যাদি যেমন বিশিষ্ট অঞ্চলের চারিত্রগুণমণ্ডিত, তেমনি একটু লক্ষ্য-করে দেখলেই বোঝা যাবে ঝাড়খণ্ডের স্থাননামগুলোরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রামনামগুলো প্রধানতঃ অরণ্যপ্রকৃতি-কেন্দ্রিক। পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে, কয়েকটি বিশেষ ধারায় এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। গ্রামনামগুলো যেসব বিষয় বা বস্তুকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে কয়েকটি এই ধরনের : ১. জীবজন্তুভিত্তিক, যেমন, ভালুকপাত্ডা, ঘডাধরা, হরিণধুকড়ি, ম'ষজভি ইত্যাদি ; ২. মাটিপাথর-ভিত্তিক, যেমন, কালাপাথর, রাঁগামাটিয়া, বালিভাসা ইত্যাদি ; ৩. ঘাগ-ঝরণা-দহ সম্পর্কিত, যেমন, ঘাগরা, ঝরাডি, চাকদহ ইত্যাদি ; ৪. গাছপালা-সম্পর্কিত, যেমন, শালগাজড়ি, মহুলচুঁই, কেঁদপুশি ইত্যাদি ; ৫. শস্যসম্পর্কিত, যেমন, লুকুইকানালি, রাহেডগড়া, বিরিহাঁড়ি ইত্যাদি ; ৬. ফুলফলসম্পর্কিত যেমন, কুড়চিশাহড়ি, কাঁশিডাঙ্গা, কদমডি, পিঁড়রাশল, ফুলকুসমা ইত্যাদি ; . পাহাড়-বনসম্পর্কিত, যেমন, পাহাড়পুর, রেঁগডপাহাড়ী, বনগড়া, বাঁশবন ইত্যাদি ; ৮. জাতিসম্প্রদায়-সম্পর্কিত, যেমন, বাগালবেড়া, মাহ্‌তমারা, ভুঁইয়াসিনান, খাড়িয়াশল ইত্যাদি ; ৯. বাঁধপুকুর সম্পর্কিত, যেমন, বাঁধজড়া, পথরিয়া, জলডহর ইত্যাদি ; ১০. টাঁইড়ডিহিডাঙ্গা-সম্পর্কিত, যেমন, সিধাটাঁইড়, ছাঁচনীটাঁইড়, ডাঁগরডিহা, ডাঙ্গাডি ইত্যাদি ; ১১. জমি সম্পর্কিত, যেমন, কুদাকচা, চেমাইজুড়ি, চড়ইগুঢ়া, জামিরাবাইদ, ঝাঁপডীশোল ধীরিঘুটু, ভাটুবেড়া. কুঁচ্যাকানালি ইত্যাদি ; ১২. পাখিপাখালি-সম্পর্কিত, যেমন, খুকড়াখুঁপি, মেজুরনাচনী ইত্যাদি। গ্রামনামের উৎস এই ক'টি শ্রেণীর মধ্যে খোঁজ করলে ভুল করা হবে। এখানকার গ্রামের নামকরণের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। আমরা মাত্র কয়েকটি শ্রেণীর উল্লেখ করে এটুকু

গ্রাম নাম

আভাস দেবার চেষ্টা করেছি যে, ঝাড়খণ্ডের গ্রামগুলোর নামকরণের পেছনে কোন **জটিল** চিন্তাভাবনা নেই, সাধারণ মানুষের চোখে যেসব বাস্তব প্রাকৃতিক বস্তু ধরা পড়েছে, স্থানের নামকরণের সময় সেই সব বস্তুই প্রাধান্য লাভ করেছে। ডঃ সুধীর কুমার করণ অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে গ্রাম নাম বা স্থান নামের আলোচনা করেছেন, আরো ব্যাপকতরভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে—গ্রাম নাম অধ্যয়নের ফলে শুধু যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকমানসের বিশেষ ধরনের চিন্তাভাবনার সঙ্গেই পরিচিত হতে পারি তাই নয়, অই অঞ্চলের ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাসও এর ফলে আমাদের কাছে এক নবতর রূপে ধরা পড়ে। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলোতে ঝাড়খণ্ডের বিচিত্র নামের বিভিন্ন গ্রামের উল্লেখ রয়েছে।

৯-১৫ **হাঁসাপাথরের** কন্যা **ডুবকাডিহির** বর, সে বর ভাঙাতে কন্যার কাঁ'দছে অন্তর॥ যাঁয়েছিলি **আঁগারনালী পিতলকাঁঠি** ঘুর্যে আলি পাঁঠার মাথা বড়ই লাগে মিঠা, রে **পাকুই**-এর কুটুম্বিতা॥ **মাটিয়াবাঁধি মাল-থাম আমাডুলার** গুণাধাম **কাঁটাবনীর** বিপিনবিহারী, না দে'খলে না র'হতে পারি॥ **ইঁদখড়া বারডাঁগা চৌকিচটি ছুটমাডাঁগা** পিয়াল পাকা বিকায় থালা থালা, এই ত ডাঁগা **দুধিয়ানালা**॥ **কন্যাডিহা নিশ্চিন্তা** বঁধুর বহু তিনটা হেলশিতা, গোপনে বাখ্যেছে আর দুটা॥ **বামদা শঙ্করবনী** বস্থিং এবিয়ায় লিল ঘেরি **টিয়াকাটি** ধারে পড়ে যায়, **দরখুলি** গহম কিনে যায়॥ **মানভুমের** পথে পথে **ভটমডি পাঁচাড়া গুরফা চিতাড়া বৈঁগাড়া, খারপড়া মাতালপড়া বেসরা বিড়ালিগৈড়া চেপড়া ভাঙ্গেড়া,** মচড থাঁয়ে ঘুর্যে আলি ধুবহি **গাঁগৈড়া**। **সিঁদরী চিড়কা বাগালবেড়া গামহারকুঁড়ি কুকুরগৈড়া** সতের **বেলগাড়া, জয়নগর ভবানীপুর** নিকটে **ছুটমুড়া**। যদি হে বহুত ছাড়া তার পাশেতে আছে **টাড়া কঁড়রা পুয়াড়া,** ভুলে গৃহবাস করে হলু তাঁতির

ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন হাটবাজারের কথাও লোকসংগীতে স্থানলাভ করেছে। হাটে পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত তো হয়ই, তাছাড়া প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, বিশেষভাবে শহরজাত পণ্যদ্রব্য, ক্রয় করবার জন্য জানপদ নরনারীর মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। হাটে ঘরগেরস্থালির বাঁধনে বাঁধা নারীসমাজ সাময়িক মুক্তির

হাটবাজার

নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায়, ভালোবাসার লোকের সঙ্গে দু'দণ্ড লুকিয়ে কথা বলবার নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পায়, যাতায়াতের পথে নির্জনস্থানে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়। হাটেবাজারে উপহার কিনে প্রার্থিতা নারীর হৃদয়হরণ করবার প্রয়াস পায় প্রেমাকাঙ্খী তরুণেরা। তাই লোকসংগীতে হাটের প্রসঙ্গও যথেষ্টই দেখা যায়।

১৩-২০ **ঘাটশিলার** হাটে মিঠাই দিলি কিন্যে, খনে খনে, আমার তকেই পড়ে মনে॥ **সড্ডিহার** হাট যাতে বাঙামালা টাঙা আছে দিদি ল, কিনে দে মোর ইঙ্গিতের মালা॥ **সিংপুরার** হাট যাব বাছ্যে বাছ্যে চুড়ি লিব দিদি গ, তবই মতন হাত লাড়িব॥ যাঁয়েছিলম **ঢুমকা** কিন্যে আ'নলম ঝুমকা সেই ঝুমকা পরৃহাব গ তকে, যে যা বলে বলুক পাড়ার লকে॥ **কু'লঠিকরীর** হাট যাতে দেখা হল্য দুজনে, যে কথা বল্যেছিলে ভু'লব নাই জীবনে॥

হাটবাজারের প্রসঙ্গ ছাড়াও মেলা-পরব টাঁড়ের কথাও লোকসংগীতে সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে মেলা এবং পরব অনুষ্ঠিত হয়। ইঁদ, ছাতা, বিঁধা, পারবণ (দুর্গাপূজা), টুসু ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করে মেলা বসে। পর্বোৎসবের সময় সামাজিক বন্ধন বিধি-নিষেধ অনেকাংশে শিথিল হযে পড়ে; তাই যৌবন-বিহ্বল নরনারী পরব টাঁড়ে বেপরোয়া আনন্দ উপভোগ করবার অবকাশ পায়। মুক্ত জীবনের স্বাদ পায় বলেই মেলায় পরব টাঁড়ে যুবকযুবতীর ভিড় সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়।

মেলা পরব

২১-২৬ **বড়কলার** গাঁজনে, বড জাঁক লাগে শিবের পূজনে॥ **থ-ডাঁগার** পরবে পাথরবসা চুড়ি, দেখ্যে মন টল্যে গেল কই কিনে দিলি॥ **বরাবাজারের** ইঁদ, **চাকলতড়ের** ছাতা, **কাশীপুর** পারবণ পরব লাগে মজা॥ **বরাবাজারের** ইঁদ **গবরঘুঁষির** ছাতা, হাটে হাটে দেখ্যে আল্যম কলাইবসা শাঁকা॥ **জয়দা** যাঁয়ে কি পাবি, **সতী** গেলে পতিফল পাবি॥ তকে হাওড়ায় লেগ্যে দাবড়াব, **দিগড়ি** ঘাটে উঠাঁই ডুবাব॥

অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ডে ছোটখাটো বহু পাহাড়পর্বত আছে; এর সাথে আছে বনজঙ্গল। কিছু কিছু পরিচিত পাহাড়পর্বত বনজঙ্গলও লোকসংগীতের

পাহাড়-জঙ্গল

উপজীব্য হয়েছে। পাহাড়-অরণ্য শুধু যে জ্বালানি কাঠের ভাণ্ডার হিসাবেই জনজীবনে অপরিহার্য তাই নয়, আঞ্চলিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এদের অবদান কম নয়। অরণ্যপর্বতের কাঠ, লাক্ষা, তসর, ফলমূল, ধূপধুনো, মধু, বিভিন্ন ধরনের ওষধি শহরাঞ্চলে বিক্রী করে জানপদবর্গ অন্নের সংস্থান করে থাকে। তাছাড়া ঝাড়খণ্ডী নরনারী বনে-পাহাড়ে তাদের আদিম জীবনকে সহজধারায় ফিরে পায় বলেও সংগীতে তারা এগুলোর কথা বলতে ভোলে না।

২৭-৩০ **বাগমুড়ির** পাহাড়ে হল'দ বড় বসে রে, চাঁপামণি হল'দ বাঁটে নাগর কেনে হাঁসে রে ॥ আহাড়ে পাহাড়ে যাব কন্ পাহাড়ে কাঠ পাব, **মিরগীঝ'র** পাহাড় যাঁয়ে বেহাই বল্যে ডাক দিব ॥ **লীলগিরির** পাহাড়ে দিদি বাঁশেরি লাঠি, **লেইদ** বনে চাঁপাব ফুল ধিক ধিক ঠিয়া, বঁধু নাচ-লাগাইয়া ॥ **দলমারই** পাহাড়ে গাড়ি চলে লহরে, তু হাল কাড়া মবে্যঁ গেল শহবে, কাজ নাই তব কাঠেব বেপারে ॥

ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি নদী বিভিন্ন শ্রেণীব লোকগীতির উপকবণ হয়েছে বারে বারে। শুধু নদীনালাই নয়, বাঁধ-পুকুবও গানের উপজীব্য হয়েছে সমান মর্যাদায়। 'যবুনা' নদী যে সর্বজন-পরিচিত যমুনা, তা ভাবলে ভুল করা হবে। ঝাড়খণ্ডেব লোকগীতির যবুনা কল্পলোকের নদী ; স্থানীয় যে কোন নদীই যবুনার রূপকে ছদ্মবেশে উপস্থিত থাকে। যবুনা নদীর উল্লেখ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণে রাখা দবকাব, প্রেম-সম্পর্কিত গান ছাড়া অন্যত্র এ নদীর উল্লেখ করা হয় না।

নদীপুকুর

৩১-৩৭ **যবুনাকে** জলকে গেলে পয়সা ঝলকাল্য, দাঁতে মিশি চইখে কাজল আমাকে ভুলাল্য ॥ ডু'বল ঝারি পার কর হরি, আমরা **সবন্নাখায়** সিনান করি ॥ **থরসতীর** বালি, অ তুঁই আশা দিয়েঁ ভুলালি ॥ **যথা** থালে কুথা হারালি, আমি বস্তে বস্তে পথ ভালি ॥ আমপাত চিরিচিরি নউকা বনাব, **দামুদর কাঁসাই** লদী হেলকে পাইরাব ॥ **কাঁসাই কুমহারী** লদী সে লদী পাতালভেদী লদী পারে ভুলেউ বিটি দিহ না, মরিলে খবর মিলে না ॥ **মাগুড়ার** বাঁধে ইজয়পিঁজয় **সিঁদরীর** বাঁধে শেঁয়াল ল, **বামহুনডিহার** বামহুন বাঁধে উঠে মাগুর মাছ ॥

ঝাড়খণ্ডের নরনারীর ভাবলোক-রচনায় অরণ্যপ্রকৃতি একটি বিশিষ্ট স্থান

অধিকার করে আছে। অরণ্যভূমির মানুষজনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার প্রধানতম শরিক অরণ্যপ্রকৃতি। অরণ্যপ্রকৃতির মতোই আদি এবং অকৃত্রিম আঞ্চলিক জানপদবর্গ ; বিভিন্ন ঋতু-পর্যায়ে প্রকৃতিতে যে সব পরিবর্তন ঘটে, তার প্রতিফলন সরাসরি জনপদ-জীবনেও ঘটে থাকে। তাই এখানকার মানুষ নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা প্রকৃতির বিচিত্র রূপালেখ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। অরণ্যপ্রকৃতি যেন তাদের সত্তাব একান্ত সহচর। স্বভাবতঃই প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তারা না পারে আনন্দের বর্ণময় ভাবরাশির রূপায়ণ করতে, না পারে বেদনার গভীরতাকে প্রকাশ করতে। তাই আনন্দ-বেদনার সজীব চিত্র ফুটে ওঠে অরণ্য-প্রকৃতির সাযুজ্য অনুষঙ্গে। এই জন্যই ঝাড়খণ্ডের অকৃত্রিম প্রাণময় লোকসংগীত অরণ্যপ্রকৃতি এবং ঝাড়খণ্ডী নরনারীর গভীর অন্তর-ভাবনার সমন্বয়ে এক অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। অরণ্যের হাসিকান্নার সঙ্গে কখনো জানপদবর্গ নিজেদের হাসিকান্নাকে মিশিয়ে দিয়ে একাত্মতা অনুভব করেছে, কখনো-বা জানপদবর্গের হাসিকান্নার শরিক হয়ে অরণ্যপ্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অরণ্য-প্রকৃতি

৩৮-৪২ বাড়ির গেঁদাফুল ফিরে মহকে, না যাহ দিদি জলকে, মাথার বেণী দলকে॥ আসন গাছ করে টলমল, বঁধু যাছ হে ছাড়িয়ে, গায়ের গামছা হাতে ধরিয়ে॥ আসন পাত খড়মড়িয়া ঝড়ি প'ড়লা, যন ছুঁড়াটার মেয়্যা নাই কাঁদি ম'রলা॥ আষাঢ় শরাবন মাসে তেঁত'ল পাতে জল, শ্বশুরঘরের লক দে'খলে চ'খে পড়ে লর॥ আষাঢ় শরাবণ মাসে নানারঙের ফুল ফুটে ফুল হেরি মনে পড়ে হরি, কেমনে যৌবন ধরি॥

ঝাড়খণ্ডের বিচিত্র ধরনের গাছপালাও জানপদ-ভাবনার সজীব পরিমণ্ডল রচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ গাছপালা উৎপন্ন হয়ে থাকে। সাহিত্যে এই সব গাছ-পালার প্রসঙ্গ দেখেও অনেক সময় অঞ্চলটিকে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়। ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি সুপরিচিত গাছপালা অন্যত্র খুব কম লক্ষ্যগোচর হয়। দৈনন্দিন জীবনচর্যার অনুষঙ্গ হিসাবে এই গাছপালাগুলো আঞ্চলিক জনজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িত হয়ে আছে। তাই লোক-সংগীতেও এই আরণ্য গাছপালাগুলো জনপদজীবনের চিত্তভাবনা সৌন্দর্যে

গাছপালা

বিশেষ অংশগ্রহণ করেছে। এই গাছপালা কখনো তাদের রূপের মাধ্যমে লোকভাবনাকে সহজ অনাবৃতভাবে প্রকাশ লাভে সাহায্য করেছে, কখনো-বা লোকভাবনার রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৩-৪৬ বড় বাঁধে উঠি ডুবি ছট বাঁধে কে তুমি, **আসৃতা** গাছে ডাল মেল্যেছে **হত্তুকী** তলে আমি॥ আষাড় শরাবণ মাসে জল পড়ে বসে রসে **ধাদকী** ফুল ফুটে **পলাশ** গাছে, এই রিঝ্ ভা'ঙব ব'শাখ মাসে॥ কাল জলে **কুঁচিলা** তলে ডুবল সনাতন, অ কি আস্বাদন, কি দেখায়েঁ ভুলালি রে মন॥ **কেঁদ** বুদা **ভুড়ুরু** বুদা ভিনাই ভিনাই যায়, যবুনার জলকে গেলে ভিনাই ভিনাই যায়॥

ঝাড়খণ্ডী নরনারী, বিশেষভাবে যুবকযুবতী, ফুল অত্যন্ত ভালোবাসে। যুবকেরা কানে গোঁজে এবং যুবতীরা খোঁপাতে। তাছাড়া ফুলের মালা খোঁপায় বা গলায় পরবার ঝোঁকও কম নয়। ফুল না পেলে যুবতীরা সুদৃশ্য পাতা গোঁজে খোঁপায়। ফুলের রং, রূপ আর গন্ধ যেমন মন টানে, তেমনি বহু ক্ষেত্রে ফুল প্রেমের দূতিয়ালিও করে থাকে। আসলে ফুল প্রেমেরই প্রতীক। স্ফুটযৌবন তরুণতরুণী তাই ফুলের জন্য আকুল হয়ে থাকে। খোঁপায় কিংবা কানে ফুল গোঁজার অর্থই হল হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস বা প্রেমভাবনাকে বাইরে প্রকাশ করা। ফুল যৌবনেরই রূপ, বিশেষভাবে যৌবনপ্রাপ্ত রমণী ফুলের রূপকে যৌবনের সমগ্র রূপরসগন্ধ প্রেম এবং আনন্দ নিয়ে রসিকচিত্তকে মুগ্ধ করে তোলে। তাই ঝাড়খণ্ডী লোকসংগীতে কতো বিচিত্র ফুল কতো বিভিন্ন রূপে এবং ভাবনায় যে মিছিলের মতো উপস্থিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

ফুল

৪৭-৫৯ অতদিন যে দেখি কালার কানে **জাম** ফুল রে, আ'জ কেনে কালার বদন মলিন রে॥ আ'ডেগ'ড়ে ফুটে **কাঁশি** চাঁইবাসার ফাঁসি রে, অনেকদিনের ভালবাসা দেখা কর্যে আসি॥ কুল্হি কুল্হি যা'হ না **কাগজী** ফুল তুল্য না, কাগজী ফুলের মালা শামের গলে দিহ না॥ কুল্হি কুল্হি যাতে ছিলি **চাঁপার** ফুল কুড়াঁই পালি চাঁপার কলি এতই রে সুন্দরী, ঘরে আছে **কদমের** কলি॥ **কিয়া** ফুলটি আ'নব ভাই আ'নব ছাতার আড়ে হে, তকে দেখাব না ফুল রং যাবেক ছাড়্যে হে॥ কানেত্তে গুঁজিলম **ধুতুরার** ফুল, বঁধু হারাঁই আলি জাতি কুল॥ **গেঁদা** ফুল গাঁথি দে ন মকে,

হাতে ধরি চুমু খাব তকে ॥ চৈত বৈশাখ্ মাসে ফুটিল **পলাশ** রে, মধু খাঁয়ে, ভমর উ'ড়ল আকাশ রে ॥ জাড়াতল যাহ্ না **জাড়া** ফুল ছুঁহ্ না দেখ জাড়া ছিটকে পড়িবে, এই কথাটি মনে রাখিবে ॥ শুকনা **শিমঁলের** কঁঢ়ি পর কেনে কানে, পর কি আপন হয় ইহ জান মনে ॥ **ঝিঁগা** ফুল সারি সারি ডাহিন খঁসায় গুঁজ ললক্কারি, **কাঁকুড়** ফুল ফুটে ছলক্কারি ॥ **ঝুরিঝুমকার** ফুল ফুট্যে হল্য আলা, আমার বঁধু ঘরে নাইখ কারে দিব মালা ॥ **কুড়চি** ফুল তু'লতে গেলে গায়ে লাগে খির, কি ফুল পরালি কালা লিলি জাতিকুল ॥

ফল

ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে ফুল যতো বেশি স্থান লাভ করেছে, ফলের স্থান সে তুলনায় অবশ্যই কম; তবু অজস্র গানে বিভিন্ন ধরনের ফলের প্রসঙ্গ আছে। এই সব ফলের মধ্যে সর্বত্র সু-পরিচিত ফল যেমন আছে, তেমনি ঝাড়খণ্ডের বুনো ফলও আছে। ঝাড়-খণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণভাবে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। এখানে অধিকাংশ লোক অত্যন্ত দুঃখেকষ্টে জীবননির্বাহ করে থাকে। বহু সংসারে একবেলাও ভাত জোটে না; তাই অরণ্যমানুষদের অনেকাংশে বুনো ফল-মূলের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে, বুনো ফলমূলও লোকগীতিতে স্থান লাভ করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, বরং এটাই স্বাভাবিক, লোক-জীবনের পূর্ণাবয়ব রূপ এই ভাবেই লোকসাহিত্যে পরিস্ফুট হয়।

৬০-৬৭ আম গাছে **আম** নাই ফাবড় কেনে মার, তুমার দেশের আমি লহি আঁখি কেনে ঠার ॥ আম ফলে ধঁকাধঁকা **তেঁত'ল** ফলে বাঁকা, এমন সময়ে বঁধু আমায় দিল ধঁকা ॥ আম পাকা লালে লাল **জাম** পাকা কাল, **কাঁঠা'ল** পাকা গজভরা খাতে বড় মজা ॥ আগ ডালের **মাদা'ল** পাকা আঁখি ধার্যে তু'লব, ডাঁটা ন রে সাইকেলবালা তর সঁগেই যাব ॥ কে কে যাবে কাঠ কুঢাতে কে কে যাবে বন, কাঠ পাত মিছা কথা **ভুড়রু** খাবার মন ॥ এ ডুংরি সে ডুংরি **পিয়াল** পা'কল, নাই যাব রে দাদা মন ভা'ঙল ॥ **কেঁদ** পাকা বড় মিঠা খাঁয়ে লে রে লাম্পট্যা, কেঁদ পাকা, তকে ডালেই হিলাব রে ॥ মেদনীপুর বাজারে **ভেলা** বিকায় অজনে ঘরের কথা মনে পড়ে বাজাবে, ভাব কর্যেছি ভেলা বাগানে ॥

বন্য জীবজন্তু, সরীসৃপ, জলচর জীব আদিও লোকসাহিত্যের উপজীব্য

হয়েছে। কথনো এইসব জীবজন্তু মানুষের শত্রু হিসাবে লোকগীতিতে উল্লেখিত হয়েছে, কথনো-বা খাদ্যদ্রব্য হিসাবে; কথনো এদের আচরণ লোকভাবনায় কৌতুকরসের সঞ্চার করেছে, কথনো-বা এরা লোককবির অন্তরভাবনার সুষ্ঠু প্রকাশের সহায়ক হয়েছে। কথনো-বা এইসব জীবজন্তু রূপক চরিত্র হিসাবে সাহিত্যরসকে ঘনীভূত করেছে।

জীবজন্তু

৬৮-৭৫ অ ললিতে চাবকি লে ল কাল **বিড়াল** কার বঠে, উনানশালে বস্তে আছে কাঁচা দুধের সর খাতে॥ ঘরে আছে **ছাগলছেড়ী** বিকে কর পয়সাকড়ি তু'ই পারিস যদি কুল'্যাই গুছ্যাই লিতে, তাউ বলিস ই পরবে নাই দিব যাতে॥ আমার লাতির বড ছাতি দুয়ারে বাধ্যেছে **হাতি** লাগুক টাকা দিব গুণাগারী, তবু না ছাড়িব জিমেদারি॥ শাল বাকলা বলি আসন বাকলা, জামাই বলি চুমাল্য বুঢ়া **লাকড়া**॥ বাগমুডির পাহাডে **বাঘের** বড ভয়, সনার যাদু রূপার ভাই পাছে কিছু হয়॥ গাড্যা তলে আঁড়্যা **শ'শা** ভালে, আমরা বলি ঝুনপুকি জলে॥ শি শি করে বনের **কে'কলা'স** টি, তর গলায় লাগাব নাগ ফাঁসি॥

ঝাডখণ্ডে খুব বেশি নদী-নালা বাঁধ-পুকুর না থাকলেও বর্ষাকালে এখানে অল্পবিস্তর মাছের আমদানি হয়। অন্য সময় ভাগ্যবান কয়েকজন, যাদের পুকুর আছে, কিংবা জেলে—যারা নদী-কূলের বাসিন্দা, মাছ খেয়ে রসনাতৃপ্তি করতে পারে। মাছ দুষ্প্রাপ্য বলে এবং তরকারি হিসাবে অভিজাত, প্রায় বিলাসের সামগ্রী বলে, বৃষ্টিবাদলে কষ্ট করে ঝাড়খণ্ডীদের মাছ ধরতে হয়। তবু আর দশটি জিনিসের মতোই খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে মাছ তাদের গানে উপস্থিত হয়েছে।

মাছ

৭৬-৮২ উই লত্ পুই লত্ অরুণদের ঘরে, **ইচলা** মাছের ঝল করে অনিলদের ঘরে॥ আমার বঁধু ভাত খায় নাই গগলী তরকারি, ডাঁঢ়াও দেখি, দুটি **ভাঁ'ড়ক্যা** মাছ ধরি॥ **শোল** মাছে ডেগাডেগি **পুঁঠি** মাছে ছলকারি, সামাল ভাই, কন্ মাছ ধারে চল্যে যায়॥ জল পড়ে ঝরাঝর মাছ উঠে সরাসর, **তিৎলা চেং গড়ুই মাগুর** ধরলি, উদয়্যা ঝুম'র গাহলি॥ ডুব্যে ডুব্যে মাছ ধরি শুদাই **পুঁটি টে'গরা**, অ ছট দেঅরা, মালি ফুলে ব'সল ভমরা॥ শালবাঁধের

আগালে মাছ ধরি সকালে, অ মাছ ধর্যোছি **গেঁতা** আর **পেঁকালে**॥ সোব মাছ খাওয়ালে বঁধু না খাওয়ালে **কুলহি** হে আর কি ফিরিব আমি নাইকান শলের কুল্হি॥

পাখি-পাখালি

জীবজন্তু, সরীসৃপ, মৎস্য আদির মতো ঝাড়খণ্ডের লোকগীতে পাখি-পাখালিও বিস্তৃত অংশ অধিকার করে আছে। পাখি-পাখালি প্রসঙ্গও কখনো নিছক বিবৃতি হিসাবে, কখনো সৌন্দর্যচেতনা হিসাবে, আবার কখনো বা রূপক হিসাবে লোকগীতে স্বাভাবিক ধারায় স্থান লাভ করেছে।

৮৩-৯০ লদী লদী যায় **বঘা** বালিচর্হা খায় রে, উড়িতে না পারে বঘা উলটবাজি খায় রে॥ দাদা দে রে বাটুলটি, বিঁধ্যে মারি শালা **শাঁকচিলটি**॥ অ রে **ময়না** পাখি, পান খাবি ত আনবি রে সনার জাঁতি॥ আল্য বেহাই গাল্য **খুকড়াটি**, আমার বিক্লে হপ্য, টাকা টি॥ **কেরকেটায়** খেড ঝাঁকে কেঁকলা'সে মাথা লাড়ে **ধলি পাঁ'ড়ুকায়** ধমসা গুড়ে ল সজনি॥ আ'সল রে **কারিকুরি** ব'সল রে থারাথারি, রে কারিকুরি, বসিল অগম দর্যার মাঝে॥ তাল গাছে **চঁটিকেরি** বাঁসা, বঁধু আস ভাই, হাত বাড়ালে লাগ পাই॥ সাদ কর্যে **গুঁড়ুর** পুষ্যেছি আমার গুঁড়ুর ঘুরে না, এমনি আমার ভাঙা কপাল ফড়িং মিলে না॥

সমাজ ও জনজীবন পর্যায়

সমাজ

আদিম সমাজ সাম্যবাদী এবং কোমবদ্ধ ছিল। আমরা অন্যত্র বারবার বলেছি যে, ঝাড়খণ্ডের সমাজব্যবস্থায় আদিম সমাজের সাম্যবাদী কোমবদ্ধ রূপটি এখনো লক্ষ্যগোচর হয়। গোষ্ঠীই একদা পরিবারের ভূমিকা পালন করত; কোন পরিবার বা ব্যক্তির বিশেষ কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু কালক্রমে গোষ্ঠীগত পরিবার ভেঙে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিবারের সৃষ্টি হয়। তখন একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে গোষ্ঠীপরিবারের রূপটির ক্ষুদ্র সংস্করণ বজায় রাখা হত; কিন্তু সাম্প্রতিককালে একান্নবর্তী পরিবার খুব কমই লক্ষ্যগোচর হয়। পরিবারের পুত্রসন্তানদের বিবাহ-কার্য

নিষ্পন্ন হলে এবং এক আধটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা পৃথগন্ন হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য যৎসামান্য জমি ভাগ দেওয়া হয়, কখনো বৃদ্ধ পিতামাতা কোন এক পুত্রের সংসারে আশ্রয় পান এবং মৃত্যু পর্যন্ত অবহেলার জীবন কাটান, কখনো-বা কোন পুত্রই তাঁদের আশ্রয় দিতে না চাইলে নিজেরাই আলাদাভাবে কষ্টের জীবন যাপন করেন। ঝাড়খণ্ডের সামাজিক রীতি অনুসারে পুত্র পৃথক হয়ে যেতে চাইলে সমাজ পিতাপুত্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করে জমি ভাগাভাগি করে দেয়; পিতার অনিচ্ছা থাকলেও পুত্র তার ন্যায্য পাওনা পাবার অধিকারী হয়ে থাকে। কন্যার যতোদিন পর্যন্ত বিবাহ না হয় ততোদিন তার সমস্ত ব্যয়ভার পিতাই বহন করেন; বিবাহের পর মাঝে মাঝে পিত্রালয় থেকে সে কাপড়চোপড় পেয়ে থাকে কিন্তু পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকে না। কন্যা বিধবা হয়ে ফিরে এলে কিংবা শ্বশুর-বাড়ি থেকে চিরকালের মতো পালিয়ে এলে কিংবা বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালে পিতার ওপর আবার সে ভার হয়ে চেপে বসে; পিতা তার ভরণপোষণ এবং সাঁগা বা পুনর্বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যু ঘটে থাকলে ভ্রাতার সংসারে ভগ্নীর মর্যাদা ঠিকমতো রক্ষা করা হয় না; ভ্রাতৃজায়া-শাসিত সংসারে তাকে অত্যন্ত অমর্যাদার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়।

ঝাড়খণ্ডের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সাম্যবাদের আভাসমাত্র পাওয়া গেলেও কোমবদ্ধতার রূপটি এখনো পুরোপুরি বজায় আছে। প্রতিটি গ্রামে প্রধানতঃ একটি গোষ্ঠী বা গোত্রের লোকের প্রাধান্য দেখা যায়। গোত্র বা গোষ্ঠী-প্রধান সাধারণতঃ মাহাতো বা সর্দার বা প্রধান নামে পরিচিত হয়। এই গ্রাম-প্রধানের আদেশনির্দেশ গ্রামের সবাইকেই মেনে চলতে হয়। গ্রামের মঙ্গলামঙ্গল, শান্তি-শৃঙ্খলা, বিচার-পরামর্শ সব কিছুর দায়িত্ব বা অধিকার তার ওপরই অর্পিত থাকে। অধুনা শিক্ষার প্রসার এবং শহর-জীবনের সঙ্গে জানপদবর্গের সরাসরি যোগাযোগ ঘটবার ফলে এই সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙনের মুখে; গ্রাম-প্রধানের ভূমিকা কোথাও কোথাও রীতিমতো প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। তবু যে-সব গ্রামে ঐতিহ্যগত সমাজব্যবস্থা এখনো প্রচলিত আছে, সেখানে গ্রাম-প্রধানের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের আদিম সমাজে দলনায়কের শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষানুক্রমে পরম্পরা-পুষ্ট; তাই এখনো ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে গ্রাম-প্রধানের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক বিধিনিষেধের উল্লঙ্ঘন করলে কিংবা কোন দুষ্কার্য করলে

গ্রাম-প্রধানই বিচার-সভা আহ্বান করে অন্যান্যদের সহযোগিতায় বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করে।

১-৩ উপর বাঁধ ভা'ঙলংটুসু নাম বাঁধে ঢেউ উঠে, উঠ উঠ গায়ের মড়ল হে জড়া পদ্ম যায় ভাসেঁ॥ কুলহি কুল্হি যাতেছিলি কে দিল রে আ''খ-ড়াঁড়ি, গায়ের মড়ল জা'নতে পালে মা'রবেক ল বেঁতের ছড়ি॥ মাহ্‌ত ঘরের দুয়ারে কিসের এত লক রে, ছুমুটু বহুটাকে মারোছে ভাশুরে রে॥

গ্রামপ্রধানের বিচারকে কেউ না মেনে অবহেলা করলে তাকে 'একঘর্‌যা' হতে হয়। গ্রামের অন্যান্যদের সঙ্গে তার সব রকম যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তবে আগেই বলা হয়েছে, অধুনা সমাজব্যবস্থাতে ভাঙন দেখা দিতে শুরু করেছে। ঝাড়খণ্ডের গ্রামজীবনেও দলাদলি নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরিবারগুলো যেমন ভেঙে যাচ্ছে, তেমনি সমাজব্যবস্থাও ভেঙে যাচ্ছে। সমাজের বিধিনিষেধগুলো সহজেই ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সমাজের বিধিনিষেধ সবা থেক কঠোর ছিল যৌনতার ক্ষেত্রে। গোষ্ঠীর পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য একই গোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌনমিলন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, বর্তমানে অগম্যাগমনের বিধিনিষেধ মেনে চলা হচ্ছে না।

মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে প্রধানতঃ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান পালিত হয়: নত্তা, নওা বা নত্তা (<নবরাত্র), বিবাহ এবং মৃত্যু। এই তিনটি অনুষ্ঠান একটি বিশেষ পরিবারের মধ্যে পালিত হলেও এগুলো সামাজিক অনুষ্ঠান। সমস্ত খরচপত্র পরিবার বহন করে, কিন্তু অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব থাকে সমাজের হাতে। সমাজের অন্যান্য সদস্য 'পেট ভাত'-এর বিনিময়ে সমস্ত কাজ সমাধা করে দেয়। এই সব অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানোর নিয়ম তো আছেই, তার ওপর গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে ভোজ দিতে হয়। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য কেউ ভোজ দিতে না পারলে গ্রামপ্রধানের কাছে তা নিবেদন করতে হয়, সমাজ সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভোজ দেবার দায় থেকে রেহাই দিয়ে থাকে, সমাজকে অস্বীকার করে কোন অনুষ্ঠানই করা সম্ভব নয়।

ঝাড়খণ্ডের সমাজজীবনে একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার বর্তমানে খুব বেশি দেখা না গেলেও একেবারে দুর্লভ নয়। অতীতে যে একান্নবর্তী পরিবারেরই প্রাধান্য ছিল তা আমরা জাওয়া গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি। সাধারণতঃ একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে

পরিবার

গৃহস্বামী এবং তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূ-পৌত্র-পৌত্রীরাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। আমরা আগেই বলেছি, এখানকার সমাজ অনেকাংশে কৌমবদ্ধ সমাজ। তাছাড়া এখানকার পরিবারগুলোকে কুটুম্ব-পরিবার বলা যেতে পারে; সম্প্রদায়গত কুটুম্বিতা তো আছেই, তার ওপর গোত্রগত, পরিবারগত কুটুম্বিতাও আছে। বিবাহের সূত্রেই দু'টি অপরিচিত পরিবাব কুটুম্ব-পরিবারে পরিণত হয়। তাই যে-কোন পরিবারে কুটুম্ব-সংকার একটি অবশ্য পালনীয় পাবিবারিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব; মানমর্যাদার বিশেষ প্রশ্ন এবং দু'টি পরিবাবেব মধ্যে মনোমালিন্যের আশঙ্কা কুটুম্বসংকারেব তারতম্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এ ছাড়া 'ফুল' পাতানো বা সখাসখীত্ব পাতানোর মধ্য দিয়েও দু'টি পবিবারের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়; ফলে 'ফুল' বা সখাসখীও কুটুম্বেব মতোই একটি বিশিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করে থাকে। গৃহস্বামীর কোন পুত্র বা কন্যার 'ফুল' তাঁর কাছে পুত্র বা কন্যা হিসাবেই স্থান পেয়ে থাকে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ক একই নিয়মানুসারে গড়ে ওঠে অর্থাৎ ফুলের মা তারও মা, দাদা-দিদিরা তারও দাদা-দিদি ইত্যাদি।

লোকসংগীতে পরিবাবেব বিভিন্ন জনের পরিচয় পেতে হলে অন্য পরিবার থেকে বিবাহ-সূত্রে আগত বধূব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজন; কারণ তার ফলে আমবা শ্বশুর-শাশুড়ী-ভাশুর-জা-দেওর-ননদ এবং স্বামী সম্পর্কে তার মনোভাবের পরিচয় পেতে পারি। আমরা জাওয়া গীত প্রসঙ্গে দেখেছি, এই সব একান্নবর্তী পবিবারে বধূব পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে পবিবাবের প্রতিটি সদস্যেব মতামতের কমবেশি গুরুত্ব ছিল। শ্বশুবালয়ে বধূর চরম শত্রু ননদ, অনেকটা অহি-নকুলের সম্পর্ক। পরস্পবের মধ্যে নিত্য ঝগড়া-কলহ, প্রতিশোধ-স্পৃহা লেগেই থাকে। তাই একটি গানে দেখা যায়, বধূ শ্বশুব-শাশুড়ী ভাশুব জা দেওব সবাইকে 'দহিদুধভাত' 'আর' ছলা কলাই ডা'ল' খেতে দেবার কথা বলেছে (শ্বশুরকে খাতে দিব দহি দুধ ভাত গ, গ, আর দিব ছলা কলাই ডা'ল ইত্যাদি) কিন্তু ননদের পাতে এগিয়ে দেবে উনুনের গবম ছাই আব তার পেছনে লেলিয়ে দেবে কুকুর (ননদকে খাতে দিব চুল্‌হার গরম পাঁ"শ গ, আর দিব কুকুর লেল্‌হাই)। অন্য আর একটি গানে পরিবারের বিভিন্ন জনের সঙ্গে তার সম্পর্কের মাধুর্য এবং তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছেঃ শ্বশুর শাশুড়ী এবং ভাশুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর, দহিদুধ-

ভাতের মতোই ; বড় জায়ের সঙ্গে যে-সম্পর্ক তার সঙ্গে হাঁড়ি-ধোয়া জলের তুলনা করা হয়েছে ; দেওরের সঙ্গে তার হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক কিন্তু ননদের সঙ্গে যে-সম্পর্ক তা কেন্দুকাঠের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গেই তুলনীয় ; আর স্বামী দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক ? প্রহারের সম্পর্ক।

৪ শ্বশুর কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে দহিদুধ-ভাত গ, সেইসনে। শাউড়ী কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে দহিদুধ-ভাত গ, সেইসনে। ভাশুর কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে দহিদুধ-ভাত গ, সেইসনে। জেঠানী কা বলনবসন কেইসনে যেইসনে হাঁড়ি-ধুয়া পানী গ, সেই সনে। দেওর কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে হাঁসি-ঠিট্টিলি গ, সেইসনে। ননদ কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে ফটফটি কাঠ গ, সেইসনে। সঁয়াকা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে পয়নার পাহার গ, সেইসনে॥

আর একটি সুদীর্ঘ জাওয়া গীতের মধ্য দিয়ে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে বধূর সম্পর্ক অত্যন্ত সহজ স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এ-গান এতোই প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব যে এ-গান বুঝি-বা একমাত্র নারীসমাজেই রচিত হতে পারে। এ-গানে কোন অলংকার নেই, কোন অনাবশ্যক অস্পষ্টতা বা অস্বচ্ছতা নেই। নির্যাতনে জর্জরিত বধূর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এ-গানের কথাবস্তুর উদ্ভব। শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, অথচ ভ্রাতৃজায়া দিব্যি ভালো মানুষের মতো পিঠেসন্দেশসহ বিদায় দেবার জন্য উদগ্রীব। শ্বশুর নিতে এসেছেন, বধূর কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে যাবার ইচ্ছে নেই ; কারণ শ্বশুরের সামনে সব সময়ই ঘোমটা টেনে চলতে হয়। হাস্যকর হলেও এই অজুহাতে বধূ চুপচাপ শুয়ে থাকে :

৫ আদাড়ে বাদাড়ে ঝিঁগা মবলি কা পাত গ, সেহ পাতে ননদী ঘুমায়। উঠ উঠ উঠ ননদ শ্বশুর আল্য লে'গতে গ, করে'্য দিব পিঠা কী সন্দেশ। শ্বশুরেরি সঁগে হামে নাহি যাব গ, ঘংটা টানিতেই দিন যায়।

শাশুড়ীর সঙ্গে যেতেও অনিচ্ছা, কারণ দাসীর মতো 'টঁকা ডালা'র ভার বইতে হবে :...শাউড়ীর সঁগে হামে নাহি যাব গ, টঁকাটা বহিতেই দিন যায়। ভাশুরের সঙ্গে পরিহারের সম্পর্ক, তাই রাস্তা এড়িয়ে ছায়া-ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলার অজুহাত:...ভাশুরের সঁগে হামে নাহি যাব গ, রাস্তা কাটিতেই দিন যায়। দেওরের সঙ্গে রঙ্গরসিকতার সম্পর্ক, তাই হাসি আর খেলার

মধ্য দিয়ে অকারণে দিন কেটে যাবার অজুহাত :...দেওরের স*ঁগে হামে নাহি যাব গ, হাঁসিতে খেলিতেই দিন যায়। ননদের সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক, তাই পদদাপে পরস্পরকে শাসন আর ত্রাসনের অজুহাত... ননদেরি স*ঁগে হামে নাহি যাব গ, এড়ি ধমকেই দিন যায়। সর্বশেষে স্বামী, যার সঙ্গে তার প্রহারের সম্পর্ক, তাই সে স্বামীর সর্বক্ষণ লাঠি-হাতে প্রহারের হুমকির কথা তোলে :......স*ঁয়ারি স*ঁগে হামে নাহি যাব গ, পয়না ঝলকেই দিন যায়॥

অতঃপর আমরা লোকসংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জীবনধারা পর্যালোচনা করে দেখব। ঝাড়খণ্ডে বিবাহবন্ধনটা একদা অনেকাংশে সন্তানোৎপাদনের চুক্তিবিশেষ ছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বধূর জীবন ক্রীতদাসীর জীবন ছিল, পরিবারে সন্তানোৎপাদন এবং দাসীবৃত্তি করা ছাড়া তার অন্য কোন ভূমিকা তেমন গুরুত্ব পেত না। স্বামী ইচ্ছা করলেই 'মঙ্গুরা' লাঠি দিয়ে প্রহারে-প্রহারে স্ত্রীকে জর্জরিত করতে পারত, 'পয়না ঝলকে' স্ত্রীকে তটস্থ করে রাখতে পারত ; স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল 'পয়নার পাহার' অথবা 'পানা কা শাট'—তাই যখন তখন স্ত্রীর ওপর কিলচড়ঘুঁষিবর্ষণে তার যেন মৌলিক অধিকার ছিল। বিবাহের আগে ভাবীবধূর মন জয় করবার জন্য নিজের ধনসম্পদের মিথ্যে রঙিন চিত্র অঙ্কনে সে যেমন পটু, তেমনি বিবাহের পরে বধূকে উপবাসী রাখবার ব্যাপারে সে প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্লজ্জচূড়ামণি। সংসারকে অতলে ডুবিয়ে সে যথেচ্ছ খরচ করতে পারে। সে ইচ্ছা করলেই একাধিক নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তার ফলও তাকে ভোগ করতে হয়। সে ইচ্ছা করলে হাতের 'লহা' ছিনিয়ে নিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে ; আবার বিবাহ কিংবা 'স*াঁগা' করতে পারে। অবশ্য স*াঁগার স্ত্রীর যেমন সামাজিক কৌলীন্য কম, তেমনি স*াঁগার পাত্রও স্ত্রীর কাছে নিতান্ত তাচ্ছিল্য লাভ করে থাকে।

বিবাহিত পুরুষ

৬-১২ ঝিলিরমিলির ঝিলিরমিলির জুসনায়, বুঢ়ায় খুঁদাল্য বুঢ়ির থুতনায়॥
তুঁই যে বলিলি পাঁইখা গরুবাছুর ঢে'ররে, তিলস'রষার লেখাজমা নাই।
সকালে উঠিয়েঁ দেখি বাঁড়িয়া বলদ রে, হাল জুড়িতে জুঁয়াল নাই,
পাঁইখা পা'খ লেদারুণ॥ এক সেরা চা''ল দিব মাড়ে-ভাতে বুঝ্যে
লিব, পেট না ভরিলে গা'ল দিব, কা'ল তকে রাঁধনী ছাড়াব॥ এক

বাটি আমানি তলে দুটি ভাত গ, সেহ দেখ্যে, বহু কাঁদে সাবা বা'ত গ ॥ যখন উডায় পয়সাকডি মীনাব বাপেব পায়ে পডি, কখন পিটে বিরৃহি-পিটা ডাং-এ, বাজে আসি মীনাব বাপের সং-এ ॥ বেহাল্যা পুরুষ হৎ্য ছাতা'টাকা নিয়ে যাথ্য, সাঁঘাল্যা পুরুষেব মুখে ছাই, পেছু পেছু লুঝুক লুঝুক যায় ॥

কিন্তু সব স্বামী যে এতোগানি নিষ্ঠুবতাব প'বচয় দিত না নয়, স্ত্রীকে অনেকেই সত্যিসত্যি ভালোবাসত। স্ত্রীব অসুখে বিসুখে তাবা উৎকণ্ঠাবোধ কবত, নিজেব মা বোনেব পীডনেব হাত থেকে বক্ষা কববাব জন্য আডাল দিয়ে দাঁডাত, স্ত্রীব হয়ে মায়েব কাছে নানান ব্যাপাবে অভিযোগ এবং সুপাবিশ দুইই কবত। অনেকে আবাব স্ত্রীব হাতেব পুতুলে পবিণত হত স্ত্রীব ফাইফবমাশ খাটতে গিয়ে হাঁফিযে উঠত। স্ত্রীকে ভয় কবে চলত এমন স্বামীব সংখ্যাও কম নয়, স্ত্রীব একটু আদব-সেবা পাবাব জন্য উপহাবে-উপঢৌকনে মন জয় করবাব চেষ্টা কবত, স্ত্রীব তর্জনেগর্জনে কখনো-কখনো তাকে তটস্থ হয়ে থাকতে হত—কখনো বা স্ত্রীব পীডনে জর্জবিত স্বামীও আত্মবিসর্জনের কথা ভাবত।

১২-১৭ দুই পালি জ্বব আসেঁ্যছে তাই আসেঁ্যছে লিতে, বুঝাই মানাঁই পাঠাঁই দে গ, চলুক ধীবে ধীবে, বরং আমি পথে লিব কলে ॥ 'রাথ্ রাথ তব ঝারিপানী রাথ্ রাথ্ তব পিঁঢা গ, দেহি কন্যাব কেমনে শুকিল গ।' 'মা তুমাব বাঁধনী বহিন তুমাব বাঁটনী, নিতি পবভু পেটেব কশলা গ।' 'মা যা"ক মোর দেশ বুলি বহিন যা"ক মোব নগব বুলি, তুঁই কন্যা পাটেব বানী গ, তুঁই কন্যা বেহালী বানী গ ॥' বাঁযেছিলম পবগণা কিন্যে আ'নলম ঝরণা, সেই ঝরণা পরৃহাব আশিনে, মৈলাম বাবা মাগীর কথা শুন্যে ॥ যখন দিই গ পয়সা-কডি তখন দেয় গ ভাতমুটি দু দিন কবে উপব্যা যতন, মীনাব মায়েব বাঁক্যেই থাকে মন ॥ হাতে লিব চুণথাডি ছাডাব তব নাগরালি অই থানকে গেছলি কি কাবণে, ভয় নাই তব বুকেব বেদনে ॥ আমি বেজার হলাম মীনাব মাযের সঁগে, ঝাঁপ দিব যমুনাব গাঙে ॥

ওপবেব গানগুলো থেকে শুধু যে বিবাহিত পুরুষের জীবনের কথাই ব্যক্ত হয়েছে, তা নয়, বিবাহিতা নাবীব ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্ব পেযেছে। বিবাহিতা নারীব জীবনধাবা শত বন্ধনে বাঁধা থাকলেও এবং তাকে প্রায়

ক্রীতদাসীর জীবন কাটাতে হলেও সে যে আদিম রমণীর রুক্ষতায় পুরুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখতে পারে, তা'ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আদিম নারী পুরুষের ওপর তার প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষমতা হারালেও সে যে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে নি, তা কয়েকটি গানে পুরুষকণ্ঠের সন্ত্রস্ত উক্তি থেকে বোঝা যায়। তবু বিবাহিতা নারীর জীবন যন্ত্রণার জীবন ছাড়া কিছু নয়। সেই বালিকাবয়সে তাকে 'পরের ঘর' করতে যেতে হয়। একবার বিয়ে হওয়ার অর্থ পিত্রালয় থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। দূরদেশে বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসবার জন্য লোকের অভাব পড়ে। ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না ভেবে বাপ-মা তাকে যে-বাড়িতে বিয়ে দেন, সে-বাড়িতে প্রতিদিনের অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে বধূ তার স্বপ্ন-ভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পেটে খেতে অন্ন জোটে না, প্রায়ই তাকে উপবাস করে থাকতে হয়। শ্বশুরালয়ের আত্মীয়স্বজনও কেউ তার দুঃখে সহানুভূতি জানায় না। শাশুড়ী-ননদী তার জীবনে কুগ্রহের মতো প্রতি-মুহূর্তে অনর্থসৃষ্টির জন্য তৎপর থাকে; তার দৈনন্দিন ঘরগেরস্থালির কাজকর্মে তারা কোনরকম সাহায্য তো করেই না, উপরন্তু তাকে কিভাবে বিপদে-বিপাকে ফেলা যায় তারই ষড়যন্ত্র করে। নিজের মনের সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে কিছু কেনাকাটা করবে কিংবা মেলা-পার্বণে যাবে তেমন কোন অধিকার তার থাকে না। স্বামীও তাকে ভালোবাসে না, অথচ তার মন পাবার জন্য সে কি না করে; ভালোমন্দ রান্না করে খাওয়ালেও সন্তুষ্ট হয় না—কোন কিছুতেই মন ওঠে না—বরং সব সময় সাহায্য অজুহাতে কিল-চড়-লাথি-ঘুঁষি-চাবুক-বর্ষণের জন্য উঁচিয়ে থাকে। স্বামী সন্তানের কোন দায়িত্ব নেয় না, সন্তানের খাদ্যসংস্থানের সব দায়িত্ব যেন তারই। তার ওপর স্বামী যখন তার যৌবন, তার নারীত্ব সব কিছুকে অবমাননা করে পরকীয়া প্রেমে মত্ত হয়ে ওঠে, তখন সে প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে ওঠে; কখনো-কখনো প্রতিহিংসা এতো বেশি তীব্র রূপ ধারণ করে যে স্বামীকে ঘরের ভেতর আটকে রেখে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতেও দ্বিধা করে না। আবার কখনো সে তার যন্ত্রণাজর্জর জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়; শ্বশুরালয়ে ফেরার চেয়ে সে জলে ডুবে আত্মহত্যা করা শ্রেয় বিবেচনা করে। নারীর জীবনটাই তার কাছে অর্থহীন ঠেকে, তাই নারীজন্মের প্রতি ধিক্কার জানাতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিবাহিতা নারী

১৮-৩১ মায়ে-বাপে বেহা দিল থাপরা ঘর দেখ্যেঁ ল, জনম গেল ঢালা মাড়

খাতে॥ যাহার ঘরে ননদ নাই তাহার বড মজা রে, খনেক তাতো খনেক বাসি খনেক চা''ল ভাজা॥ কতখন অধন দি'ইছি চা''ল মেরাতে ভুলে'া গেছি, ননদ বাদী, ডুবালি আমাকে, দে ন বহিন চা''ল গিলা মের'ায়ে॥ ছানা কাঁদে হরল গবল গহা'লে গবর ভরল, আ'জ মহুল গেল রে দু ঠেকা, শাশুড়ী ননদী বং দেখা॥ ইঁদ দে'খতে যাব বলি কাপড কাচিলি, ভাল সঁয়া বে, ইঁদ দে'খতে কই যাতে দিলি, সেহ্ কাপড পাট করি পেডিতে বাখিলি॥ মীনাব বাপের কথায় চলি তাউ হলি চখ্যের বালি, গা'ল দিছে মাতালিয়া ঢং-এ, লাচার হ'লি মীনার বাপের সং-এ॥ যখন র'াধি কচড়া পুরুষ বেজ'াই খে'চডা, শুদাই শুদাই কিল ঘু'ষি মারে, ঘরের কথা নাই বলি ডরে॥ যখন র'াধি শ'ল্লা শাগ পুরুষের হয় বেজ'াই রাগ, পেল'াই দিবেক খত ঢডার ধারে, ঘবেব কথা নাই বলি ডরে॥ ছানা কাঁদে মাই মাই ঘবে খাতে খাবার নাই, ছানার মা ত গেল অরুণ বনে, ছানা কাঁদে ধা'দকার বনে॥ জাডে ত থুরু থুরু বুকে দুটি হাত রে, পালঙ্কে উঠিয়া দেখি নাই প্রাণনাথ॥ গা'ল দিলি ভাল করলি পিঠ করলি র'াগা, তব বুকে পড'াই মারি কা'ল হব স'াগা॥ যেমন গ কাপডের পা'ড তেমন গ পুরুষের মা'র, শিশু অঙ্গে কতই না মা'র খাব, এবার আমি নামাল পালাব॥ আগুই আগুই রাহেড় বাড়ি তাহার পেছু শ্বশুর-বাডি, নাই যাব খালভরার ঘরে, ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥ রমণী জনমে শত ধিক, বেশি কথা কি কব অধিক॥

বিবাহবন্ধন পুরুষের পরনারীগমনের পক্ষে মোটেই বাধা নয়। পুরুষ বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত, তার পক্ষে পরনারীগমন মোটেই সামাজিক অপরাধ নয়। পুরুষ বিবাহিত হলেও দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনবার তার অধিকার আছে; সামান্য কলঙ্কের বিনিময়ে সে পরকীয়া প্রেমেও আসক্ত হতে পারে। এর জন্য সমাজ তার প্রতি কোন রকম দণ্ডবিধান করে না। গ্রামের কোন বিবাহিতা বধূ, বিবাহবিচ্ছিন্না নারী কিংবা কুমারী কন্যার সঙ্গে তার অবৈধ সংসর্গ গড়ে উঠতে পারে।

পরকীয়া প্রসঙ্গ

৩২-৩৪ খালভরা হামকে স'াতাছে, খাবার বেলা গাবারগুবুর খাছে। ঘরে আছে খাছে ধুছে পরের ঘরে মাউকাছে পরের ঘবে কিবা মজা পাছে। দুধ মিঠা গুড় মিঠা, পরের পুরুষ মিঠা, পরের পুরুষ কি জানে মোর

বেদনা, চখ্যের জলে ভিজল বিছনা ॥ আর কি ভালবাসবি আমাকে, তর বউ আস্তেছে মাঝ্যাকে ॥

বিবাহবন্ধন নারীর পরপুরুষসংসর্গের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিশেষ। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের আরণ্য জনজীবনে যৌনতার সবিশেষ প্রাধান্য থাকায় বিবাহিতা নারীও দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে সহজেই লঙ্ঘন করে যায়। লোক জানাজানি হলে কলঙ্ক রটে, স্বামীর প্রহার সহ্য করতে হয়, কখনো কুল যায়, কখনো-বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। আদিম ভূখণ্ডের রমণী তা সত্ত্বেও সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে পরপুরুষ-সংসর্গ করে। কখনো-বা স্বামীর পরনারীগমনের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায়, কখনো স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আক্রোশে, কখনো-বা পরকীয় প্রেমের স্বাভাবিক আকর্ষণে বিবাহিতা নারী বিবাহের পবিত্রবন্ধনকে উল্লঙ্ঘন করে। তবে এ থেকে কেউ যেন না ভাবেন যে ঝাড়খণ্ডের নর-নারী যৌনসর্বস্ব, চরিত্রের পবিত্রতাবোধ এদের নেই কিংবা যৌনতা এখানে একেবারে সংস্কারমুক্ত। রিবংসাবৃত্তির প্রাধান্য জনজীবনে থাকলেও একেবারে অবারিত এবং বাধাবন্ধহীন নয়, এই কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার। নিচের গানগুলোতে বিবাহিতা, এমন-কি সন্তানবতী, নারীর পরপুরুষভজনার ইঙ্গিত আছে।

৩৫-৪০ এলাচ লবং পানের খিলি কবে রে তুঁই খাওয়ালি, এমনি যে তর ভাবের নিশা ছ ছানার মা ভুলালি ॥ ছুটুমুটু ডিহালি কেনে ল তুঁই বিহালি, ছেল্যার মা হঁয়ে এবার আমরাকে ভুলালি ॥ আপন পুরুষের লাগ্যে কানা নেহগা শাগ ল, পরের তরে, অ তর ঝিঁগায়-মেশা ডা'ল ল ॥ পহিলা সাঁজের বেলা কে মারিল চালে ঢেলা, ঢেলা লহে গ পানের পটলা, গা'ল দিছে ননদ কুটিলা ॥ যখন যাই জলকে খালভরায় হুলকে, পাছে কন লকের সঁগে রাজটবিষয় আছে ॥ সনলা শাগ ভাজি ভাজি সি-পুরুষের নাই রাজি, কে পরহাল্য তকে লীল শাড়ি, পাড়ার লকে করে ভালাভালি ॥

ঝাড়খণ্ডের সমাজজীবনে বিবাহবন্ধন কোনক্রমেই অচ্ছেদ্যবন্ধন নয়। বিবাহবিচ্ছেদ পুরুষ বা নারী, যে কোন পক্ষ থেকেই ঘটানো সম্ভব। কোন কুমারী কন্যার সিঁথিতে হাটে-বাটে-ঘাটে-মেলায় একবার সিঁদুর ঘষে দিতে পারলে 'সিঁদুর-ঘষা' বিবাহরীতি অনুসারে তাকে যেমন সিদ্ধবিবাহ বলে মেনে নেওয়া হয়, তেমনি স্ত্রীর

বিবাহবিচ্ছেদ

সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে দিয়ে হাত থেকে নোয়া খুলে নিয়ে বিবাহবিচ্ছেদও ঘটানো যায়। এ ছাড়া সমাজপতিগণের মধ্যস্থতাতেও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানো হয়। কখনো কখনো সমাজপতিগণ একটি শালপাতাকে দু'টুকরো করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদ সিদ্ধ ঘোষণা করে। সাধারণতঃ ভরণপোষণের অক্ষমতার জন্য, স্ত্রীর চালচলন আচারব্যবহারের জন্য, স্ত্রীর ব্যভিচারের জন্য পুরুষ স্ত্রীত্যাগ করে থাকে।

৪১-৪৩ কুল্‌হিমুড়ায় টানাটানি লে লহা যাব আমি, খালভরাব এত মনে ছিল, আশিন টানে লহ লুট্যে লিল, আধা দিনে কুলে দাগা দিল॥ হাতে হাতে পান দিতে দেখ্যেছে পাড়ার লকে, চুণ দিতে দেখ্যেছে ভাশুরে, আ'জ ধনির কি আছে কপালে, আ'জ ধনির কি জানি কি করে॥ শালগাছে শুয়া পকা অইটাই বঠে বাবুর কাকা, দেখা পালে ব'লবে পিয়াকে, কি দষে ছাড়্যেছে আমাকে। জুঁঠাহাতে ভাত বাঁটা যেটা পাবি সেটাই চাটা, হাঁড়ি-খাওয়া নামটা তব উঠ্যেছে, সেই দষে তকে ছাড়্যেছে॥

অন্যদিকে স্ত্রীও স্বামীর পুরুষত্বহীনতা কিংবা পরনারীসংসর্গের জন্য বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। ঝাড়খণ্ডের সমাজজীবনে একদা নারীকে নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে জীবনাতিপাত করতে হত। প্রতি পদক্ষেপে আত্মীয়স্বজনের গঞ্জনা তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলত। তার ওপর ছিল স্বামীর অকথ্য অত্যাচার, প্রহারে-প্রহারে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে জর্জরিত করে তুলত; এই জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য স্ত্রী পিত্রালয়ে পালিয়ে গিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাত। কন্যার দুঃখের কাহিনী শুনে মা-বাবাও আর তাকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরৎ পাঠাতে রাজী হয় না, জামাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করে, এমন-কি মামলামোকর্দমাতেও জড়িয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় স্ত্রী তার প্রণয়ীর হাত ধরে অজানার পথে পা বাড়ায়।

৪৪-৫০ শুষনি শাগের ভাজি ই পুরুষটা বেজাঁই রাগী শিশুকালে কতই গঞ্জন সইব, চল দেওরা নামাল পালাব॥ বড় ঘরের বহু পালাল্য কেঁদে বনে, যাকেই শুদাই সেই বলে ভাই কে জানে॥ বাঁধনা পরব আল্য পিঠা সঁদেশ লিয়েঁ আল্য, ফুলুর মা, ফুলুকে ত জামাই আল্য লিতে। ফুলু আম্‌দের দুধের সর তাই আস্যেছে রাইতে জ্বর, ফুলুর বাপ, ফুলুকে ত নাই দিব যাতে॥ শ্বশুরঘরের খাল-

ভবারা লে'গতে আস্তেছে, নাই যাব গ আমার মাথা দুখাছে, কা'ল সকালে জবাব দিব দেশের মাঝেতে॥ মায়ে-বাপে বেহা দিল ঠেঁগা-ধরা বরকে, আর যাব নাই শ্বশুরঘরকে॥ আমার টুসুর একটি ছেল্যা মানবাজারে শ্বশুরঘর, জলের ঘাটে কলসী রাখ্যোঁ পাল ঁাই আল্য বাপের ঘর। আলি বিটি ভাল করলি আর ত ছাড়্যো দিব নাই, কমর বাঁধ্যে লা'গব লিয়াই জামাই বল্যে ছা'ড়ব নাই॥ দামপাড়ার লখিন্দর বিটিকে না কবায় ঘর, শ্বশুব-জামাই করে মকদ্দম', থা''ক বিটি না কবিব মানা।।

বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যাবার পর নারী বধূবেশ ছেড়ে কুমাবী কন্যা সাজে। সিঁথিতে থাকে না সিঁদুব, হাতে থাকে না নোয়া। বধূবেশ ছাডলেও তখন সে যৌন-অভিজ্ঞতায় উত্তাল উদ্দাম এক নারী। অতঃপর তার স্বাধীন নায়িকা সাজবার পালা। সমাজের অনুশাসনকে উল্লঙ্ঘন করতে সে কুণ্ঠাবোধ করে না। জাতি-কুল-কলঙ্ক ভয়ে সে কম্পিত হয় না। একরকম বল্‌গাহীন উদ্দাম জীবন কাটায় বলে লোকে তাদের 'উদমা ছুঁড়ী' বা 'উদাম ষাঁড়ী' বলে তাচ্ছিল্য করে। বিবাহবিচ্ছিন্না নাবীর বেশভূষা, চালচলন প্রায়শঃ রীতিবিরুদ্ধ হয়ে থাকে : শাড়ি পরবার ভঙ্গি, চুল বাঁধা এবং সিঁথির ঢং, চালচলনের বকমসকম সমাজের কাছে ঔদ্ধত্যমূলক চ্যালেঞ্জবিশেষ। সমাজ তাই এদের অনেক সময় একঘরে করে অথবা কুলটা আখ্যা দেয়। দেহের বিনিময়ে সে পরপুরুষের কাছ থেকে অলংকার-সাজসজ্জা সমস্তই সংগ্রহ করে নেয়। মধুলোভী পুরুষ তাদের চালচলন দেখে বুঝতে পারে, তারা বিবাহবিচ্ছিন্না নারী। সমাজের কর্তারা তাদের ধিক্কার দেয় কিন্তু তাবা নির্বিকার, তারা তাদের চালচলনে সাজসজ্জায় মহাভারত অশুদ্ধ হবার মত্যো কিছু খুঁজে পায় না। সৌভাগ্যক্রমে এদের সাঁগা হলে এরা কোথাও আশ্রয় পায়, অন্যথা যৌবন অতিক্রান্ত হলে অত্যন্ত হেনস্থার জীবন কাটাতে হয়; কটাভানারি করে কিংবা পরের বাড়িতে ঝি-কামিনের কাজ করে উদরান্নের সংস্থান করতে হয়।

বিবাহবিচ্ছিন্না নারী

৫১-৫৮ ভাঙা ঘরে খঁজা রলা কতই হিয়ায় সইব, বেহাল্যা পুরুষ ছাড়্যে আমি কতই ধৈর্য ধ'রব।। উঠুরে ফেলিল মাটি নাচনীদের সনার কাঁঠি, অ উদাম ষাঁড়ী, কতই বা পর্‌হাব শাঁকাশাড়ি॥ পাঁড়ুদহা যাতে যাতে চাইলে চিন্‌হেছি তকে, নাথে বেসর কানে মাকড়ি দলকে,

অকালে পুরুষ ছাড়ো'ছে ॥ শুকনা হত্তকী খাড়া যত ছুঁড়ী ভাতার-ছাড়া, ভাতার-ছাড়া নাম তদের গেল না, ধিক রে জীবন রাখ না ॥ লকে বলে ছি ছি আমি বা করোছি কি, নাথে লোলোক হাতে শাঁখা প'রেছি, বেহাল্যা পুরুষ ছাড়ে'ছি ॥ সকালে উঠ্যেছি আমি বা করে'ছি কি, সকালে উঠ্যেই সীঁতা কাটে'ছি, বিকালে বাজার বুলে'ছি ॥ হেন যৌবন দু'দিন তবে হবি গ পরের অধীন, যৌবন গেলে ছুবে না কেউ সজনি, তখন তুঁই খাট্যে খাবি কামিনী। হায় গ সাধের রমণী, ফুল ফুটিলে হবেক মলিন ॥ পাহাড়ে পরবতে ঘর তাই আস্তেছে সাঁঘার বর, বর দেখ্যে কইনা বেয়াকুল গ, শ্বশুরে-জামাই-এ গেঁদাফুল ॥

বিদ্রোহিনী নারী

নারীকে যতোই শাসন-অনুশাসনের বাঁধনে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করা হোক না কেন, তারা কিন্তু আর অবলা সবলা বালা হয়ে থাকতে রাজি হয়নি। পুরুষের নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ক্ষমতাকে তারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে যেন অনেকটা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে অথবা যুগধর্মের বিচিত্র আকর্ষণে দুঃসাহসিকার পদক্ষেপে সম্মুখে এগিয়ে এসেছে। যুগ-যুগান্তরের ক্রীতদাসীর জীবন কাটিয়ে উঠে তারা বর্তমানে অনেকাংশে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, বহুক্ষেত্রে পুরুষ আজ তাদের কুক্ষিগত। তাদের এই দুঃসাহসিক পদপাতকে রক্ষণশীল, এবং বলতে গেলে পরাজিত, পুরুষসমাজ সহজ মনে মেনে নিতে পারে নি। তাই তারা আধুনিকা নারীদের গানে-গীতে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করেছে। যে-কোন সমাজে অন্তঃপুরটা অত্যন্ত পেছনে পড়ে থাকে; সমাজের সত্যিকারের বিবর্তন এবং রূপপরিবর্তন তখনই ঘটতে পারে যখন নারীসমাজের নিভৃত অন্তঃপুরেও পরিবর্তনের দোলা লাগে। ঝাড়খণ্ডের জগদ্দল আদিম সমাজে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে; ঝাড়খণ্ডী নারীরাও কিছুটা শিক্ষার স্বাদ পেয়েছে এবং নাগরিক সভ্যতাকে পল্লীর অন্তঃপুরেও টেনে নিয়ে গেছে। এটা ভালো কি মন্দ হয়েছে, আমরা তার বিচার করব না। কিন্তু ঝাড়খণ্ডী নারীসমাজ যে শত সহস্র বৎসরের স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে গতিশীল হয়ে উঠছে, এটাই আশার কথা। পুরুষের স্বার্থপ্রণোদিত অনুশাসনের বেড়ি তারা লঙ্ঘন করতে পেরেছে এবং বেশবাসে চালচলনে রক্ষণশীল পুরুষের দৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করে চলতে পেরেছে —এরই মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণের আকুতি এবং পরিবর্তন-কামনায় বৈপ্লবিক

চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। পুরুষেরা যতোই কলিকালের দোহাই পেড়ে বিদ্রূপ করুক, ঝাড়খণ্ডের নারীসমাজের চলিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবর্তনই সূচিত হচ্ছে।

৫৯-৬২ কা'ল আন্যেছি পরের বিটি কাঁপাই দিল মাঝ্যার মাটি, কলি হল্য ভোর, মায়েবাপে না করে কদর॥ চৈত্ গাঁজনে, কতই গরব নারীর বেশভূষণে। পেছাপাঢ়্যা লীলশাড়ি পর্হল ডেঢ়ি করি চাভি ঝুলনে। হাতে উলুকির ছটা কপালে সিঁদুরের ফঁটা বেসর ঝুলনে। রায় হাড়িরামে গায় এ নারীকে পারা দায় লুলুক দলনে, ছাতিয়া ফুলাঁয়ে চলে গজগমনে॥ ঘোর কলিতে বিবাহ করা কেবল যন্ত্রণা। বিধবাদের হাতে চুড়ি সধবাদেব হাতে চুড়ি কে বুড়ি কে ছুঁড়ি চিনতে পারি না। উল্টা গোটে প্রাণকাঁটাতে সকল মজা লিলেক লুটে, তারা পরে শাড়ি বারাণসী ঢাকাই শাড়ি বই পরে না। তারা চাবিকাঠি খুঁটে বেঁধে অনন্ত বই পরে না॥ কলিকালের বহুবিটি উলটি বাঁধিল ঝুঁটি, আগুসালে আয়না বাখি গুঁজল বেলকঁঢ়ি। আগুপেছু চাহি দেখে মোকে ক্যায়সন সাজলি, য্যায়সন চমকে বিজলি। পায়ে আলতা পরে ধনি বাঁকা সীঁতা কাটে ধনি, কপালে সিঁদুরের টিকলি গলায় মাদুলি। শায়া লেলী শেমিজ শেলী ফেচাপাড়্যা শাড়ি লেলী, দুজনেতে বাজার যাব কিনব আঁচলি। রায় হাড়িরামের বাণী কলিযুগের সকল জানি, বেহাল্যা পুরুষ ছাড়্যো সাঁগায় মজলি॥

অতঃপর লোকসংগীতের সর্বব্যাপী বিষয়বস্তু প্রেম সম্পর্কে ঝাড়খণ্ডী লোকভাবনা বিচার করে দেখা যেতে পারে। পরিশীলিত সমাজে প্রেমও একটি উজ্জ্বল নির্মল পরিশীলিত রূপ ধারণ করেছে। নিরবয়ব প্রেমের ভাবনায়

প্রেম

উচ্চতর জনমানস যেমন পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনি উচ্চতর সাহিত্য প্রেমের নব নব রূপ এবং ভঙ্গিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। পরিশীলিত মন পরিশীলিত ভাষায় প্রেমভাবনাকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। তবে মানস প্রেম বা নিষ্কাম প্রেম বা Platonic love বলতে যা বোঝায় তা কতোখানি বাস্তবসত্য ঘটনা, তা রীতিমতো বিতর্কিত ব্যাপার। রক্তমাংসের নরনারীর প্রেম শরীর-নিরপেক্ষ হতে পারে, আদর্শবাদের বুলি আউড়ে এমন কথা বলা চলে কিন্তু বাস্তবে

যে শরীরের জন্যই আর্ত হাহাকার তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। শারীরিক মিলনের পথে যেখানে বাধা সেখানে বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাসকে অবলম্বন করে নিষ্কাম প্রেমে তুষ্ট থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, কিন্তু তনুর জন্যই যে মানসিক তাণ্ডব তা প্রেমিক প্রেমিকারা ভালো করেই বোঝে। ঝাড়খণ্ডে শরীর-নিরপেক্ষ প্রেমের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। আদিম নর-নারী সৃষ্টির আনন্দেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, দেহকে উপবাসী রেখে বিনা সংসর্গে সৃষ্টি সম্ভব নয় বলে তারা শুধুমাত্র বাক্‌নির্ভর প্রেমে ছলনার আশ্রয় নেয় না। দৈহিক প্রেমের ক্ষেত্রে বাক্‌পটুতার চেয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকারইঙ্গিত অনেক বেশি প্রাণময়, অর্থবহ এবং ব্যঞ্জনামধুর। সামান্য ভ্রূবিলাস, চকিত চাহনি, ইশারাইঙ্গিত প্রেমের ব্যঞ্জনাকে যতোবেশি গভীর এবং মর্মভেদী করে প্রকাশ করতে পারে, দিস্তা দিস্তা প্রেমলিপির সাহায্যেও তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তাই ঝাড়খণ্ডের প্রেমসংগীতে বারে-বারে চকিত চাহনি চোখ ঠারাঠারি এবং এবং ইশারাইঙ্গিতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বয়োসন্ধি

যৌবনাগমের অল্পবিস্তর শারীরিক চিহ্ন কিশোরীদেহে পরিস্ফুট হতে না হতেই তাকে ঘিরে প্রেমাকাঙ্ক্ষী তরুণদের গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। কিশোরী কন্যার মধ্যেও মানসিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। মাত্র কিছুকাল আগে যখন সে বালিকা ছিল, তখন তার দিকে কারো নজর পড়ে নি, অথচ এখন যৌবনোন্মেষের আভাসেই তার চারপাশে প্রেমলুব্ধ যুবকদের ভিড় বাড়তে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। প্রেমিকদের সে তাই মিনতি করে জানায় যে, সে এখনো অপ্রাপ্তবয়স্কা, এমন করে প্রলুব্ধ করে তারা যেন তাকে অকালে নষ্ট না করে, যৌবনের পূর্ণতা না এলে মিলনের আনন্দ মধুর হয় না। প্রাকযৌবনের প্রেমগুঞ্জনের বিভিন্ন ভাবনাও তাই লোকসংগীতের মধ্যে সাদরে স্থানলাভ করেছে।

৬৩ ৬৯ যখন ছিলি এত্তটুকু রা-উ কা'ড৩ নাই কেউ মু-টায় টুকু, এখন দিদি হয়েঁছি ডাগর গ, পেছুই পেছুই ঘু'রছে নাগর॥ কঁচি কদমের কলি কর‍্য না গ ভালাভালি পা'কলে কদমের আস্বাদন, কঁচি কদম ছুঁইনা এখন॥ দেখ্যেঁ বাঢালি তুকে তুঁই না দিলে আমাকে, বুকের মাঝে শিম'লকঁচি দলকে, সেইদেখ্যে মন ললকে॥ যখন ছিলি ছুটুমুটু খাঁয়েছিলি জন্‌হা'র ভুটু, এবার দাদা হয়েঁছি

ডাগর, কত ছলে ভা'লছে নাগর ॥ মধু খাতে আল্য বঁধু মধু খাতে দিব নাই, ষোল বছর বয়স আমার এ কলঙ্ক লিব নাই ॥ কত ছলে কথা বলে বাঁ চ'খটা ঠারিয়া, লাজ নাহি লাগে রে নিঠুর কালিয়া ॥ আষাড শরাবণ মাসে বাঁদ পখ'র ভর্যে গেছে, বুলানে বা'হরাছে জল উছলিয়া যাছে, কাঁচা শরীর নবীন বয়সে ॥

যৌবনসমাগম ঘটবার পর ঝাড়খণ্ডের যুবকযুবতী আদিম জীবনের মুক্ত প্রেমের আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। দেহজ সুখের প্রাবল্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যৌবন যতোদিন, ততোদিনই দেহের আনন্দ, জীবনের আনন্দ। ফুলের রূপরসগন্ধ ততোক্ষণই মনকে মাতায় যতোক্ষণ তা টাটকা থাকে, ঝিমিয়ে-পড়া কিংবা শুকনো ফুলের না থাকে সৌন্দর্য, আর না থাকে রূপরসগন্ধ। তাই যৌবন যতোদিন ততোদিনই নারীদেহের সৌন্দর্য, ততোদিনই তার প্রতি প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুরুষের আকর্ষণ এবং মধুস্বরে গুঞ্জন, একবার যৌবন গত হলে কোন পুরুষই তার প্রতি দৃকপাত করে না। তাই শরীরকে উপবাসী রেখে বাকসর্বস্ব প্রেমে ঝাড়খণ্ডী যুবতী আস্থা রাখতে পারে না। স্বল্পায়ু জীবনে প্রেমের দিন আরো স্বল্পতর, জ্যোৎস্নার আলো নিভলেই অন্ধকার, তাই যোগ্য প্রেমিক নির্বাচন করে প্রেমের সমস্ত রস নিংড়ে আকণ্ঠ পান করার পক্ষপাতী তারা। ঝাড়খণ্ডী লোকমানসের এমনিতরো যৌবনভাবনা বহু গানের মধ্য দিয়ে নির্দ্বিধ ভাষায় প্রকাশ লাভ করেছে।

যৌবন-ভাবনা

৭০-৭৪ শিঁয়াকুইলের কাঁটা বঁধুর লাগিল হিয়ায়, জাতি ছাড়া যায় হে বঁধু পিরিতি ছাড়া দায় ॥ আউশ ধান কাটিকুটি পুয়ালের গাদি, ভর যৌবনের বেলা যম হল্য বাদী ॥ জুসনা ডুবিলে অন্ধকার, ভবে কেবা কার, এই ছুদিন প্রেমেরি বাজার ॥ ধনযৌবন আড়াই দিন নজর ভর্যে মানুষ চিন, দিনা চারি, দুতি প্রেমেরি বাজার গ ॥ এদেশেতে না রহিব পিরিতি নগরে যাব, আমি বাছ্যে লিব রসিক একজনা হে, পিরিতি রতন কাঁচা সনা। কেউ যদি করে মানা কারই মানা শুনিব না, গোপন পিরিত রা'খব দুজনা ॥

আমরা আগেই বলেছি, ঝাড়খণ্ডের আদিম জীবনে প্রেম মানেই দেহজ প্রেম, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এর মধ্যে মন জানাজানি, ভালোলাগা, অনুরাগ ভালোবাসা একেবারে অনুপস্থিত থাকে। এখানে যুবকযুবতীর পারস্পরিক

সাত্ত্বিক প্রেম

সম্পর্কের একটিই লক্ষ্যবস্তু থাকে: শারীরিক মিলন। কখনো এই সম্পর্ক নিছক দৈহিক প্রবৃত্তির তাড়নায় সংঘটিত হয়ে থাকে; কখনো-বা এই সম্পর্ক অর্থ বা উপহার সামগ্রীর বিনিময়ে গড়ে ওঠে; আবার কখনো-বা নিছক অনুরাগের ফলেই যুবতী নারী প্রার্থিত ভালোবাসার পুরুষটির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

৭৫-৮০ নরসিংগড়ের চাথালে পাঁয়েছিল মাতালে, সে যে কি দুখ দিয়েঁছিল ব'লব কা'ল সকালে॥ আষাড়ে বুনিলম ধান লাল বং-এর শিঁষ, খই খাতে দিব ধনি আমার সঁগে শু'স॥ শাঁকাবীরা শাঁকা কাটে, কাটে গ কদমকলি, ইঙ্গিতে পরোছি শাঁকা কলেব বাবু দেয় টাকা॥ শালুক ফুলের বুদ্ধি নাই রাইতে শালুক ফুটে, যার সঁগে যার গোপন পিবিত অরাই মজা লুটে॥ তুমি আমাব পরাণ বঁধু চুহে চুহে খাও হে মধু, আমার মধুভরা ফুল বিনে অলিকুল বিফলে শুকায়ে যায় হে॥ শনিবারের মিঠাইখালা ধর ব'লতে ধবেঁছি, ছাড় ব'ললে কি ছাড়া যায় গ বহুত দিনের পিবিতি॥

ঝাড়খণ্ডী যুবতীর প্রেমচেতনায় পরিচিত জনেব চেয়ে অপরিচিত জনেরা কোন অংশে কম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে না। বরং বলা যেতে পারে, পরিচিত জনের চেয়ে অপরিচিত জনের প্রতি কৌতূহল যেমন সীমাহীন, তেমনি তীব্রতাও প্রচণ্ড এবং আকর্ষণ দুর্দমনীয় হয়। এই সব অপরিচিতদের মধ্যে বিদেশী এবং ব্যবসায়ীরা তাদের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। কখনো রূপ, কখনো পুরুষালি আকর্ষণ, কখনো-বা ব্যবসায়ীর টাকাকড়ির কাছে তারা নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়। কখনো-বা এদের সঙ্গেই এরা কুলত্যাগ, গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে যায়।

৮১-৮৪ এতটুকু পা'খটি কি সুন্দর নেজটি, দেখ ন গ দিদি কে বঠে লকটি॥ অ দিদি নাই র'হব ঘরে, ছাগল-বেপারী সঁগে যাব ধীরে ধীরে॥ গাড়ারগুড়ুর বহুটি জড়া রে কলসী, মা'রব বাঁশির ফাবড় ভা'ঙব কলসী, কদমের ডালে বস্যে ভা'বছে বিদেশী॥ চা'র কুন্যা পথ'রটি লবঙ্গলতায় ঘেরা রে, ডাল ভাঙি ফুল তুলে বিদেশী ভমরা॥

প্রেমবৈচিত্র্য

ঝাড়খণ্ডের প্রেমসংগীতে প্রেমের বিভিন্ন স্তরগুলো সুস্পষ্টভাবে রূপলাভ করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রসতত্ত্বের জটিল বিভাজন এর মধ্যে তেমনটা বিকশিত হয়ে না উঠলেও সাধারণ-

ভাবে প্রেমের মৌল স্তরগুলো অবশ্যই গীতবদ্ধ হয়েছে। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বা বিরহ এবং সম্ভোগ শৃঙ্গার বা মিলনের বিভিন্ন প্রেমানুভূতি ঝাড়খণ্ডী লোক-গীতিতে আশ্চর্য সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, ঝাড়খণ্ডের প্রেমগীতি বৈষ্ণব পদাবলীর উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। ভণিতাযুক্ত ঝুমুর প্রসঙ্গে একথা আংশিকভাবে স্বীকার করা গেলেও লোকায়ত গানের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের প্রভাব বা অনুকরণের কথা স্বীকার করা যায় না। লোকায়ত গানের প্রেম-ভাবনা এতোই আদিম প্রকৃতির দেহজ সুখের উল্লাসে ভরপুর যে, কোন বৈষ্ণবের পক্ষেই এসব গানকে পদাবলীর উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ঝুমুর পদাবলীর অনুকরণে রচিত এবং রাধাকৃষ্ণ-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হলেও এর মধ্যে যে প্রেম রূপলাভ করেছে, তা কোনক্রমেই বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার যথাযথ রূপ নয়, বরং ঝাড়খণ্ডের অরণ্য-আদিম প্রেম-ভাবনাই এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। আমরা ঝুমুর প্রসঙ্গে এদিকটি আলোচনা করেছি। এখানে আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণতঃ লোকভাষায় রচিত লোকায়ত গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

ঝাড়খণ্ডের লৌকিক প্রেমের মধ্যেও অলংকারশাস্ত্রসম্মত প্রেমের বিভিন্ন স্তর দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের প্রেমগীতি কোনক্রমেই অলংকারশাস্ত্র কিংবা উজ্জ্বলনীলমণির বিধিনির্দেশ অনুসারে রচিত হয়নি। প্রেম, তা সে লৌকিক হোক কিংবা শিষ্ট, কতকগুলো সুস্পষ্ট স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; এর মধ্যে পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার, মান, মিলন, বিরহ, বিচ্ছেদ স্তরগুলো বিশিষ্ট ; প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনে এই স্তরগুলো অনিবার্যতঃ এসে থাকে ; বলাবাহুল্য, এই স্তরগুলো শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে তারা অতিক্রম করে না, বরং এই হল প্রেমের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি। তাই লৌকিক প্রেমগীতিতে এই সব স্তর দেখা গেলে অনেকেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্পর্কিত পদাবলীর সম্ভাব্য প্রভাবের কথা চিন্তা করতে প্রলুব্ধ হন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের ভিত্তিমূল যে লৌকিক প্রেমের গভীরেই নিহিত এবং বিদ্বজ্জনের প্রেমসম্পর্কিত বিধিনির্দেশগুলো যে লৌকিক প্রেমের আধারেই রচিত এবং ভক্তিরসে জারিত, সেকথা মনে রাখলে লৌকিক প্রেমগীতিকে বৈষ্ণব-পদাবলীর বিশ্বস্ত অনুকৃতি বলে ভাববার কোন সংগত কারণ থাকে না। আমরা এর পূর্বে বিভিন্ন গান আলোচনা প্রসঙ্গে ঝাড়খণ্ডের প্রেমধারা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এখানে আমরা প্রেমের বিভিন্ন ভাব-বিভাবসম্পর্কিত গানগুলো উদ্ধৃত করছি মাত্র।

৮৫-৯১ **পূর্ব্বরাগ-অনুরাগ :** জ'ড় গাছের আগডালে হল'দ বরন পা'খটি, দেখ ন ল দিদি কে বঠে লকটি ॥' না'চতে বা'হরালে তরা বদন তদের •গরি, কার ঘরের নারী তরহা চিনিতে না পারি ॥ তাল গাছে তাল পংড়া কদম গাছে কলি রে, বঁধার গায়ে লাল গামছা চুটক দেখ্যে মরি রে ॥ আড় বাঁশি না বাজাও মোর জীবন না কাঁদাও, বনফুলে মনভুলে, মনকে মোব ভুলালি কত ছলে ॥ ছটমট পাখিটা বিজুবনে চরে রে, ডা'কছে গলার মালা মন কেমন করে বে ॥ বঁধুব বাড়ির কাল্লা ফুল আঁগি ঠারেঁ্য তু'লব, লিলজ বঁধুয়ার লাগি জলে ডুবেঁ ম'রব ॥ পাত তু'লতে যায়েঁছিলি তুল্যে আনলি লতা, বঁধুব সঁগে দেখা নাই স্বপনে হয় কথা ॥

৯২-৯৯ **অভিসার :** খিড়কি দুয়ারে কুকুব সদবে ভাশুর রে, কি কর‍্যে বাহির হব দু'পায়ে নপুর রে ॥ কাচা কাপড জুসনা রা'ত বঁধু সময় জান্যে আ'সবে, দিন কর না আনাগনা লকে কি বলিবে, কাচা কাপড় জুসনা বা'ত বঁধু সেদিন কবে আ'সবে ॥ ফিং ফিং জুসনা আঁধার ঘরে শু'সনা, তকে ত কাজলে সাজে জলে ধুঁয়ে দিস না ॥ বঁধুকে তর কথা দিয়েঁ কপাট দিয়েঁ শু'সনা, ভালবাসা মনে রাখিস ঘুমাই মর‍্যে যা'স না ॥ বঁধু আ'সবেক বল্যে কপাট না দিলম ঘরে, বঁধু হে, সরবস নিয়ে গেল চবে ॥ তালপাতের আগুড়টি খাডারখিড়ির করে রে, আ'জ ফিরে যাও প্রাণের বঁধু মনেতে ভাবিয়েঁ রে ॥ আমার বঁধু রা'তকানা বাডিবাটে আনাগনা, দেগ বঁধু গবরগাঢ়ায় ঢুক না, অই পিরিতির মরম জান না, বচনে কি মন মানে দবশন বিনা ॥ বাঁশি শুন্যে গ আমার মন মানে না বাখ'ল ঘরে, বারেবারে বা'জছে বাঁশি বা'হরা বা'হরা বল্যে ॥

১০০-১০৮ **খণ্ডিতা-কলহান্তরিতা-মান :** কুইলিনী বিরহিনী চলিল নৈহর, কেন পিয় না আইল এখন, বুঝিলি রে পিয় বাসিল পর ॥ পলাশ ফুলের মধু রে ভাই পড়ে ঝরাঝর, সারা নিশি রইলম জাগি নাই আল্য নাগর ॥ এত রা'ত ছিলে কার ঘরে, পানের ছিট লা'গল চাদরে ॥ কাঁসা ভা'ঙলে কাঁসা জড়ে মন ভা'ঙলে নাই জড়ে, জড়ালে নাই জড়ে বৃক্ষের পাতা হে, যাও হে বঁধু নিশি ছিলে যথা ॥ সাঁজে ফুটিল ফুল সকালে মলিন, কার কুঞ্জে ছিলে বঁধু হল্য এত দিন ॥ তুমার

পিরিত জানা গেল এত দিনে, মিছাই দেখা মনবাখা নয়নে নয়নে ॥ শুন অহে রসিকজন বুঝো লিলম তুমাব মন হাঁসি হাঁসি ফুল মালা পর্‌হালে, সাদা গায়ে কালি যে দিলে ॥ গাছেতে উঠিয়া মূলে দেয় ছেদন, বুঝা গেল বঁধু তুমাবি মন ॥ মাণিকপাড়াব রোডে যাতে তামুক বন্যে দিব তকে, আব দিব ডবল খিলির পান, কথা বল শাম, না বলিলে কাঁদিছে পবাণ ।।

১০৯ ১২৩ **বিরহ**: অ প্রাণ্ ককিলা বে এত রাইতে কেনে ডাক দিলি, নিভেছিল মনেব আগুন কেনে বা জ্বালালি ॥ আকাশেতে চাঁদ নাই কি কবিবে তাবা রে, বঁধুব মন চন্‌চল ছাড়ি যাবাব পারা ॥ আম পাকে লালে লাল পিযাল পাকে কাল, কন দেশে গেল বঁধু দেখা নাহি দিল ॥ আষাড মাসে পিয়া পববাসে, জাদুমণি বে, অ মন ভাঙিল কিসে। ইসে নাই তিসে ঘেবিল বিষে, বল্যো দিবি গ যেন নাগব আসে ।। আষাড শ্রাবণ মাসে নব ঘন মেঘ ডাকে আব কি তব মনে নাই বে আমাবে, প্রাণ কাঁদে ঘুমুবে ঘুমুবে ॥ আলতি পাতেব সবসবানি কাল্লাপাতেব ঘি, অনেক দিনেব ছাডাছাড়ি ভা'বলে হবেক কি ॥ আ'জ নিশি অবসবে সব বলিব তবে কেনে পব বাসিছ আমায় গ, কত দুঃখ সহিব আর ॥ আদাডে বাদাডে ঝিঁগা ঝিঁগায় জালি দিল নাই, এত বড পববে গ বঁধু আমাব আল্য নাই ॥ আদল বাদল ক'রল নিদিবিদি থবা দিল, হায় বে মবমে দাগা দিল, নবীন বয়সে আমার শামে ছাডেঁ গেল ॥ এতটুকু সুখ ছিল কে বে লুকায়েঁ দিল, চইখে-উ দেখি নাই কানে-উ শুনি নাই, এম্‌নি লম্পট্যা বঁধু ফিবে চা'হল নাই ।। এমন কে জানে, বঁধু গেলে ভা'বতে হয় মনে, ভাদর আদর মাইরি গেল অকারণে।। কুলহি বেড়াতে গেলে বসে বসে প্রাণ কাঁদে, নবীন প্রেম রে, দাঁতে নিশি গেল বিফলে ॥ ঝিঁগা ফুল সারিসাবি বঁধু বিনে ব'হ্‌তে নাবি, সহচরি, দিবানিশি অই ভাবনায় ঝুব্যে মরি ।। ডেড পহব বাতি তডপি উঠত ছাতি পতি নাই মোর পালঙ্ক উপরে, দহে প্রাণ মদনের শবে।। পথ'বেতে জল নাই কমল কেনে ভাঁসে রে, বঁধুর সঁগে দেখা নাই লক কেমে হাঁসে রে ।। লকে বলে ভুল ভুল কেমনে

ভুলিব বল ভুলিলে কি আর ভুলা যায় গ, দিবানিশি জা'গছে হিয়ায় ॥

১২৪-১২৭ **মিলন :** আস বঁধু তেল মাখ আমার বচন রাখ সিনাই আস অই যবুনার ঘাটে, দই চিড়া চিনি দিব খাতে ॥ আমি পূজা করিব তর গ, আ'জ নিশি নাই হবেক ভোর ॥ চৈত বৈশাখ মাসে ভেলা পাকেঁ লাল হয়েঁছে, অই ভেলা দিব শামের মুখেতে, তবু না ছাড়িব শাম তকে ॥ আস্ত বঁধু বস হেথা ব'লব মনের কথা অনেকদিনে পাঁয়েছি হে দেখা, এতদিন ছিলে বল কুথা ॥

১২৮-১৩০ **বিচ্ছেদ :** ইঁদে পরিলি শাঁখা জিতুয়াই ভাঙিল বে, হাতের শাঁখা বিজড় হল্য পিরিতি ভাঙিল রে ॥ পান খিলি তর আঁকাবাঁকা জাঁতি-কাটা সুপারি, এত গ তর ভালবাসা আ'জকে তুঁই জবাব দিলি ॥ সাধের টিকটিকি, সত্যি কথায় দিলি রে যাঁকি, ঢেলকা জাঁকা ব'হ্‌ল পিরিতি ॥

ওপরে উদ্ধৃত প্রেমের গানগুলো একটু খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে, এব মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের গান খুব কমই আছে। আসলে প্রাকৃত প্রেমেব গান মুক্ত প্রেম এবং পবকীয়া প্রেমেবই নিখুঁত অন্তবঙ্গ চিত্র তুলে ধবে। দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে শালীন সংযমেব বিশেষ ভূমিকা থাকায় মুক্ত পরকীয়া প্রেমের মতো বিহবল রসের সঞ্চার করতে পারে না। তাই শুধু ঝাডখণ্ডী লোকগীতি কেন, সব দেশের লোকগীতিতেই মুক্ত পরকীয়া প্রেম-প্রসঙ্গ সর্বাধিক স্থান লাভ করেছে। নীতিবাগীশ রক্ষণশীল সমাজপণ্ডিরা যতোই এ প্রেমের বিরুদ্ধাচবণ করুন না কেন, বাস্তব জীবনে যেমন সাহিত্যেও তেমনি এই প্রেম নিজস্ব মাধুর্য এবং সৌন্দর্যগুণে বিশিষ্ট ভূমিকা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। মুক্ত এবং পরকীয়া প্রেম গোপনচারী ; লোকদৃষ্টির আডালে এর লীলাখেলা। অন্যের দৃষ্টিকে এড়িয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা চোখের ইশারায় পরস্পর পবস্পরের প্রতি প্রেম নিবেদন কবে ('কুল্‌হি কুল্‌হি যাতেছিলি বঁধু করে ভালাভালি' ; 'চ'খের চাহনি মুখের ভাব রাখি, আমি একবেলা বা'হর'াই দেখি') ; কথা না বলে গোপন চোরা মুচকি হাসি দিয়ে প্রেমকে পল্লবিত করে ('আমি রা কাড়ি নাই লক বাদী, মুহে হাঁসি চঁখে ভাব রাখি'), গ্রামের কুল্‌হি পথে বাড়ির পেছনে হাটে-মেলায় তাদের দেখাসাক্ষাত ঘটে (কুলহি কুল্‌হি যাতে ছিলি কুল্‌হির মুড়ায় দেখা পালি নাগর আমায় দিল

আঁখি ঠাবি', 'বাড়িবাটে আনাগনা কতই বা করিব মানা ঝিকি ফুল, দেখ যেন না ডুবাহ কুল', 'কু'লঠিকবির হাটে যাতে দেখা হল্য দু'জনাতে'; 'মাঘের এই দিনে, দেখা হবেক মকর সিনানে')। এ প্রেমেব মিলনস্থল কখনো অন্ধকার গৃহকোণ ('বঁধু আসিবেক বল্যে কপাট না দিলম ঘরে'; 'টিনেব কপাট জানালায় ভালি, তুঁই আ'সব বল্যে কই আলি', আমি শুব জানালার গড়াতে, খঁচা দিয়েঁ উঠাবে আমাকে'), তবে বেশিব ভাগ ক্ষেত্র এ-প্রেমেব মিলনস্থল অবণ্য ঝোপঝাড, অন্ধকাব বৃক্ষতল, নির্জন মাঠ ; শয্যা ভূমি-শয্যা অথবা ডালপাতাব আশ্রয় ('আ'সব বল্যে আশা দিয়েঁ ল বৃদাতলে বা'ত গেছে, তুঁই আসবি টুকু সাঁজ হলে, কুলহি মুডাব গুলাচ গাছতলে')।

বলাবাহুল্য, পবকীযাচর্চা কিংবা মুক্ত প্রেম সমাজে কোনদিনই স্বীকৃতি লাভ করতে পাবে নি, ববং এ প্রেম চিবকাল নিন্দা এবং শাস্তি লাভ কবে এসেছে। এ-প্রেম জানাজানি হয়ে গেলে প্রেমিক-প্রেমিকাব সমাজে নিন্দা বটে, কলঙ্ক হয়, কুল নিয়ে টানাটানি পডে। কুলত্যাগিনীর স্থান সমাজে হয় না, তাই তাকে গৃহত্যাগ কবে চলে যেতে হয়। কখনো কখনো প্রেমিকা স্বেচ্ছায় প্রেমিকেব হাত ধবে গৃহত্যাগ কুলত্যাগ করে বেবিয়ে যায়, কখনো শ্বশুবালয়েব গঞ্জনায় কুলত্যাগ কবে, কখনো-বা পিত্রালয়েব দুঃখকষ্টে জর্জরিত যুবতী কন্যা ঘব ছেড়ে বেবিয়ে যায়। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় কুলত্যাগ করাকে 'বা'হবাঁই যাওয়া' বলা হয়। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলোতে কুল এবং কলঙ্কভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

কুল ও কলঙ্কভাবনা

১৩১-১৩৬ জলকে যে গেলি ধনি ফুল কুথায় পালি গে, পাছে ধনি গুণমণি কুল হাবাঁই আলি গে।। তুঁই ন কি ছিলি সতী কেনে হল্য এমন মতি সাদা গায়ে কালি কুথায় লিলি গে, তুই ধনি কলঙ্ক ঘটালি।। আমবা কুলবালা জানি নাই কন জ্ব'লা, সাদা গায়ে কাদা দিহ না, খাঁটি মালে মাটি দিহ না।। হাট গেলি বাজার গেলি কিনো আনলি ঝিলপি মিঠাই, খাঁয়ে মন ভুলালি, জাতি কুল সকলি গুচালি।। বেনাবসী শাড়ি লিব বেনারসী শায়া লিব কালববন জাকিট লিব, ই কুলেতে র'হব নাই গ বা'হবাঁই যাব।। মায়ে বাপে গা'ল দিল কিবা আমার দয হল্য, বা'হবাঁই যাছি গ মা কুলে কালি দিয়েঁ, একদিন হলেউ কাঁদবি গ মা সিংহাসন উপরে, অ মা নিরলে বসিয়েঁ ।।

মানব ইতিহাসের আদিমতম অন্ধকার দিনগুলোতে নরনারী নিরঙ্কুশ যৌনজীবন যাপন করত। তখন পুরুষ শুধু পুরুষ এবং নারী শুধু নারী হিসাবেই পরিচিত ছিল। একজন সন্তানোৎপাদনের যন্ত্রী এবং অন্যজন যন্ত্র ছিল। তখনো নর-নারীর মধ্যে অন্য কোন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। ধীরে ধীরে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য একই বংশের মধ্যে সম্পর্কনির্বিশেষে

যৌনতা

যৌন যোগাযোগ সীমিত করা হল। ক্রমে বিধিনিষেধ সৃষ্টি হওয়ায় জনক-দুহিতা, জননী-পুত্র সংসর্গ নিষিদ্ধ হল। ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক এবং বিবাহবন্ধন সামাজিক সনন্দপুষ্ট থাকলেও কালক্রমে এটিও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। গোষ্ঠী-বিবাহের যুগে মাতৃ-তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল, তাই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকে গোত্রান্তরে অর্থাৎ স্ত্রীর গোত্রে চলে যেতে হত। তখন জীবনধারা সাম্যতন্ত্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। সম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের কোন অধিকার ছিল না। সমস্ত সমষ্টির বা গোত্রের অধিকারে থাকত। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটল, তখন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের জন্য মাতৃ-অধিকার বিনষ্ট করে পিতৃ-অধিকার আত্মপ্রকাশ করল। এই সময়েই এক-বিবাহ রীতি (Monogamy) দেখা গেল। স্ত্রী বা পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য স্বামী বা পিতার অবাধ্য হতে পারত না। পরকীয়া চর্চা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়ে গেল; কিন্তু পুরুষদের বেলায় এ নিয়ম থাকল না। তারা পরকীয়া সংসর্গ করতে পারত। ফলে এক-বিবাহ বা এক-পুরুষ ভজনা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে হল না। মাতৃতন্ত্রের অবসানের ফলে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস বিপুলভাবে প্রভাবিত হল। এ-প্রসঙ্গে এঙ্গেলস্ এর উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে: The over-throw of mother-right was the defeat of the female sex, an event effecting the history of the world. The men seized the reins in the house also, the woman was degraded. enslaved, the slave of man's lust, a mere instrument for breeding children.[১] নারী ঘরে বাইরে সর্বত্র তার অধিকার হারাল। বিশেষ করে যৌনসংসর্গের ব্যাপারে তাকে নিষ্ঠুর যৌবন-যন্ত্রণা ভোগ করতে হল। ফলে নারীর মধ্যেও প্রতিশোধ-স্পৃহা দেখা দিল।

১ F. Engels—The Origin of the Family. P82, Moscow 1948

স্বামীকে প্রতারিত করে সময় সুযোগ মতো অন্য পুরুষের সাথে সংসর্গ করতে লাগল। বিশেষভাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এইসব ঘটনা ঘটতে লাগল। উত্তরাধিকার-সূত্রে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী এ সব পরিবারে নামমাত্র সম্পত্তিই পেয়ে থাকে। স্বভাবতঃই এই সব পরিবারে যৌননিধি নিষেধগুলো বারবার উল্লঙ্ঘিত হতে লাগল। প্রাচীন নিবঙ্কুশ যৌনজীবন ও কখনো-কখনো উঁকি দিত; কোন সম্পর্কই যেন সাত্বিক ভাবাবেগের মুহূর্তে বিচার্য বস্তু হত না। সমাজের অনুশাসিত নিষিদ্ধ অভিপ্রায়গুলো সংগোপনে ব্যক্তিবিশেষের কাছে সনন্দধন্য হযে পড়ত। বহু ক্ষেত্রেই গোপন সম্পর্ক প্রকাশ পেলে স্ত্রীকে শারীরিক পীডন, সম্পত্তি থেকে বঞ্চনা. বিবাহবিচ্ছেদ আদি নানা শাস্তি পেতে হত। পুরুষের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কলঙ্কই ঘটত, নারীব মতো তাকে সামাজিক শাসনে পীড়িত হতে হত না।

আমরা এর আগে দাম্পত্য জীবন, পবকীয়া চর্চা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনার সময ঝাডখণ্ডের সমাজে এবং পরিবাবে নারীর স্থান, তাদের যন্ত্রণাজর্জর জীবনকাহিনী, তাদের বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহ, পরকীয়া প্রেম, সামাজিক অনুশাসনের উল্লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয় লোকগীতির পর্যাপ্ত উদাহরণ-সহ সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। এবার বিভিন্ন লোকগীতিতে প্রতিফলিত নিষিদ্ধ অভিপ্রায় এবং যৌন সনন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের মধ্যে জনকজননীর সঙ্গে পুত্রকন্যার দৈহিক সম্পর্ক সর্বাধিক গর্হিত, নিন্দিত এবং কলঙ্কজনক পাপাচার হিসাবে সর্বদেশে সর্ব-সমাজে বর্তমান কালে পরিগণিত। ঝাড়খণ্ডের আদিম জনসমাজ এর ব্যতিক্রম নয়; এখানে এই ধরনেব সংসর্গ যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য পরিহারের সুকঠোর বিধিনিষেধ আছে।

নিষিদ্ধ অভিপ্রায

সাধারণতঃ পুত্রকন্যার যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জনকজননীব সঙ্গে তাদের শারীরিক সংস্পর্শ দুরান্বিত হয়ে পড়ে; তৃতীয় জনের অবর্তমানে একই গৃহে রাত্রিযাপন কিংবা একসঙ্গে নির্জন পথ হেঁটে দুর স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ; গভীর শোক কিংবা চরম ভাবাবেগের মুহূর্তেও শারীরিক সান্নিধ্য কল্পনা করা যায় না। যেহেতু ইতিহাসের অন্ধকার যুগেই এ-ধরনের সংসর্গ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, তাই সাহিত্যে এই নিষিদ্ধ অভিপ্রায়টি কদাচিৎ স্থান লাভ করে। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতি, লোককথা বা প্রবাদ-প্রবচন কোথাও এই সম্পর্কটির প্রতিফলন লক্ষ্যগোচর হয় না। শুধুমাত্র 'বাপভাতারী' 'বেটাভাতারী', 'মা-মাউগা'

আদি গালির মধ্যে এই নিষিদ্ধ অভিপ্রায়টির ইঙ্গিত মেলে মাত্র; এ ধরনের গালি দেওয়ার অর্থই হল চরম অপমান করা।

ভ্রাতা-ভগ্নীর সংসর্গও নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের পর্যায়ে পড়ে। যৌবনোদ্গমের প্রাক্কাল থেকেই ভ্রাতাভগ্নীর মধুর সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান রচিত হতে থাকে। যৌবনে পরস্পর গা ঘেঁষে বসা, একই বিছানায় বসা বা শোয়া, তৃতীয় ব্যক্তি ছাড়া একই গৃহে রাত্রিযাপন, দূরের পথে দু'জনে যাত্রা, বোনের গায়ে ইচ্ছে করে হাত রাখা কিংবা তার চুল ধরে টানা বা চড়-চাপড় কষানো নিষিদ্ধ। একদা ভ্রাতাভগ্নীর যৌনসংসর্গ এবং বিবাহ সনন্দপুষ্ট ছিল। এই সম্পর্কের মধ্যে দৈহিক আকর্ষণ সবচেয়ে তীব্র কিন্তু সামাজিক বিধিনিষেধের ফলে যৌবনকালে অবিবাহিত ভ্রাতাভগ্নীর সম্পর্ক অত্যন্ত দুরধিগম্য হয়ে পড়ে। ভ্রাতাভগ্নী সংসর্গও অত্যন্ত নিন্দনীয়, কলঙ্কজনক এবং অক্ষম্য সামাজিক পাপাচার হিসাবে গণ্য করা হয়। রূপকথার 'কলাবতী' কাহিনীতে এই অভিপ্রায়টি আছে। কয়েকটি লোকগীতিতে এই নিষিদ্ধ সম্পর্কটি আভাসিত হয়েছে মাত্র।

১৩৭-১৩৯ যমুনার জল কাল সে জলে সিনান ভাল ননদ ছিল সতীন হয়েঁ গেল, কদমতলায় কে আছে আর বল।। ই চালের পুই সে চালের পুই পুই-এ মারে মেচড়ি, তরা ল সব ভাইভাতারী মাকে বলিস শাউড়ী॥ তদের ভাই-বহিনের পিবিতি, কাত্‌লা মাছে পাতলা বেসাতি॥

শ্বশুর-শাশুড়ী পিতৃমাতৃস্থানীয়, তাই পুত্রবধূ কিংবা জামাতার সঙ্গে সংসর্গ সর্বতোভাবে পরিহার করা হয়। এটিও নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের পর্যায়ে পড়ে এবং এ-ধরনের সম্পর্কও নিন্দনীয়, কলঙ্কজনক পাপাচার হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। তবু এই পরিহারের সম্পর্কটি লোকসংগীতে কটাক্ষের বিষয় হয়েছে:

১৪০-১৪২ তদের তাল গাছে তালের মছা, শ্বশুর অঝা বউ কেনে বাঁঝা॥ হুঁকা কাটা ক'লকা বুচা জাড়া থাডার নল, অই দেখ তর জামাই আল্য তামুক খাতে বল, শাউড়ী হয়েঁ হুঁকা লাগায় জামাই হয়েঁ হাত বাঢ়ায়।। সিংভুঁই চাঁইবাঁসা, শাউড়ী-জামাই-এ করে তামাসা॥

মামা-ভাগ্নী সম্পর্কটিও নিষিদ্ধ সম্পর্ক। মেঘবৃষ্টি বজ্রপাতের সময় মামা-ভাগ্নীর এক গৃহে থাকা নিষিদ্ধ। মামী-ভাগ্নে সম্পর্কটিও একই ধরনের নিষিদ্ধ

সম্পর্ক। মামাশ্বশুর এবং ভাগ্নে-বউ সম্পর্কটি ঝাড়খণ্ডে ভাশুর ভাদ্রবধূ সম্পর্কের মতোই অত্যন্ত বেশি রকমের পরিহারের সম্পর্ক। মামাশ্বশুরকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, তার ছায়া মাড়ানোও নিষিদ্ধ। একই ভাবে ভাদ্রবধূর ভাশুরকে স্পর্শ করা যেমন অভাবনীয় তেমনি তার ছায়া মাড়ানোও অকল্পনীয় সামাজিক অপরাধ এবং পাপ। অথচ মজার কথা এই যে, ঝাড়খণ্ডের লোকসংগীতে এই দুটি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অজস্র গীত রচিত হয়েছে, বিধিনিষেধের বজ্র-আঁটুনির জন্যই সম্ভবতঃ এইসব সম্পর্কের মধ্যে যৌন আকর্ষণ তীব্রতম, তাই লোককটাক্ষও সরস গানের মধ্যে কৌতুকের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছে।

১৪৩-১৫০ মামীর গলায় জড়া মাদুলি, ধারে ধারে লেখা আছে ল ভাগ্না-ভাতারী। মামী কি করলি ল লক হাঁসি, বিনা ফুঁকে বাজে জড় বাঁশি।। উপর পাড়ায় দেখ্যে আল্যম ছ গাছির চু'ল বাঁধা, চু'ল বাঁধা উল্টায়েঁ দেখ মামশ্বশুরের নাম লেখা। মাথায় কাগজকাটা, দিনে রাইতে উ'ঠছে ল তদের কথা।। গাঁকে আল্য গাঁকে আল্য আমড়া বকুল কাল্লা ফুল, গাইঠের পয়সা খুল মাম্-শ্বশুর, আমি বাছ্যে লিব কাল্লা ফুল।। খুকড়াখুঁপির দকানে ভীষণ কেরাসিন রে, আল' জ্বাল্যে দকান চালায় ভাশুর বোয়াসিন রে।। চুল্হাশালে বসিয়া মাছ খাল্যম ঠাসিয়া, ভাশুর হয়ে, আমার গালে দিল ধাসিয়া।। ছুটুমুটু আখড়া চার্য কুণে ভাশুরা, লাজ লাগে, মকে ছলকি নাচিতে গ।। যেমনি গ সাপের ফেণী তেমনি গ মাথার বেণী, মাথায় আছে ষোল শ ঘুঁগুর, মাথা বাঁধায় না মানে ভাশুর।। আঁধার ঘরে ছঁচ গুলোছি ভাশুর বল্যে জানি নাই, অ ভাশুর তর পায়ে পড়ি পাড়াতে গোল কর্য নাই; ছি ছি লাজে মরি, আমরা হলে লিথি ল গলায় দড়ি।।

'ঠাকুর ঝি' বা স্ত্রীর জ্যেষ্ঠাগ্রজার সঙ্গে 'বহিন-জামাই' বা ভগ্নি-জামাতার অবৈধ সংসর্গকে ঝাড়খণ্ডে নিষিদ্ধ এবং কলঙ্কজনক পাপাচার বলে গণ্য করা হয়। এই সম্পর্কটি ঝাড়খণ্ডে মোটেই রঙ্গরসিকতার সম্পর্ক নয়, বরং পরিহারের সম্পর্ক। বোন-জামাই-এর গৃহে রাত্রিযাপনও অনেক সময় লজ্জা এবং কলঙ্কের কারণ হয়ে থাকে।

১৫১-১৫২ ঝাড়গাঁর হাট যাতে কেউ নাই মোর সঙ্গে সাথে রা'ত ছিলি

বহিন-জামাই ঘরে, পানের খিব লা'গল চাদরে ।। ইদ দে'খতে যাঁয়েছিলি বড কষ্ট পাঁয়েছিলি বা'ত ছিলি বহিন-জামাই ঘরে, তাই ত লকে লিলজ বলে ।।

ঝাডখণ্ডে কয়েকটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক যৌন-সনন্দ লক্ষ্য করা যায়। প্রধানতঃ দেবরের সঙ্গে ভ্রাতৃজায়ার এবং তার ভগ্নীর, শ্যালিকার সঙ্গে ভগ্নিপতির এবং তার ভ্রাতার, বৈবাহিক-বৈবাহিকার, পিতামহ-মাতামহর সঙ্গে পৌত্রী-দৌহিত্রীর সংসর্গ সামাজিক অনুশাসন স্বীকৃত। বলাবাহুল্য, এই ধরনের সংসর্গ নিঃসন্দেহে অসামাজিক প্রেমের পর্যায়েই পড়ে, কিন্তু এই সম্পর্কগুলো নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের পর্যায়ে পড়ে না। অসামাজিক প্রেমমাত্রই নিন্দনীয়, কলঙ্কজনক হয়ে থাকে কিন্তু অগম্যাগমন পাপাচার বলতে যে-ধরনের সংসর্গকে বোঝায় উল্লিখিত সম্পর্কগুলো তেমন দোষণীয় নয়। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে পরকীয়া চর্চা যেমন সম্ভব তেমনি বিবাহবন্ধনও সম্ভব। বিশেষভাবে দেবরভাজ সম্পর্কটি ঝাডখণ্ডে প্রায়শঃই গোপন প্রেমপুষ্ট হযে থাকে। দেবর এবং বিধবা ভাজের মধ্যে সাঁগা বা দ্বিতীয় বিবাহ ঝাডখণ্ডে এখনো প্রচলিত আছে। নিচের গানগুলোতে সনন্দপুষ্ট সম্পর্কগুলোর গোপন সংসর্গের আভাস আছে।

যৌন সনন্দ

১৫৩-১৬২ বাডি নামব শল জমি ভাণ্ডব বাঁধা দিব আমি পুরুষকে ত দিব জিহল ঘরে, দেওরকে ত বা'খব মহল ঘরে।। মনে করি শ্বশুরঘর যাব, গাঁইঠে লিব মুরু চিডা দেওরকে দিব। আমি দেওরের মন জগাব, কলের পুরুষকে বনবাস দিব।। ছট দেওর সনাব চাঁদ এখন ত বে তুঁই যগ্যবান, পান সাজেঁ দিব তকে যতনে, পিবিতি ভাই বা'খবে গোপনে, পাডাপডশী যেমন কেউ না জানে।। যাতেছিলি দ'খনা সড়পে, উল্টা পেঁচের মাথা বাঁধা ল দে'খল দেওরে, অ দেওর বলা না তদের দাদাকে, পা'কলে ডালিম দিব তুমাকে।। ঘরে কুলুপ দিয়েঁ ধনি ঘরের চালে দিল আগুনি দেওর সঁগে পালাল্য নামালে, পুরুষকে ত পড়াল্য আগুনে।। বড দাদার ছট শালী আসেঁয়্যছে আমাদের বাডি লাগুক টাকা কিন্তে দিব গহনা, আর তকে যাতে দিব না।। তকে পান দিলটা কে বটে, ভাই-এর শালা সাঁগাত-এই বটে।। মাগি যাচি আ'নলম বাবা পইলা দুয়েক ধান গ, কু'টতে গেলম

পণ্ডিত ঘরের ঢেঁকি। কন দিগের লে আল্য বাবা মাঝলি বহুর ভাই গ, লিলেক বাবা থা"মচা তিনেক চা"ল ॥ ঝিক ফুল কানে গুঁজলি, বেহাইকে রাসি মদে ভুলালি ॥ ক'লকাতার পানসুপারী বদ্ধমানের জাঁতি, কি পান খাওয়ালি লাতি, আমার ঘুম ধরে না সারা রাতি ॥

নর-নারীর দৈনন্দিন জীবনে রূপচর্চার একটি অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। বিশেষভাবে যুবক-যুবতীর জীবনচর্যায় রূপচর্চার প্রসঙ্গ বাদ দেবার কথা কল্পনাও করা যায় না। ঝাড়খণ্ডের তরুণতরুণীরাও দৈনন্দিন রূপ-চর্চা না করে পারে না। তরুণ-তরুণীর রূপচর্চার প্রসাধন-দ্রব্য অবশ্যই আলাদা হয়ে থাকে। যুবকদেব সাধারণতঃ তেল ছাড়া অন্য কোন অঙ্গরাগ ব্যবহার করতে দেখা যায় না; যুবতীরা তেলের সঙ্গে হলুদও ব্যবহাব করে থাকে। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুল-নক্সার 'খদা' বা উল্কি সাধারণতঃ নারীসমাজেই সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়। চোখে কাজল এবং দাঁতে 'নিশি' (=মিশি) নরনাবী উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবহাব করলেও নারীসমাজে এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। কেশচর্চায় নারীই বৈচিত্র্যের অধিকারিনী; টেরি কাটা, বাবরী চুল রাখা ইত্যাদিই পুরুষের একমাত্র কেশচর্চা। নাবীর বাড়তি প্রসাধন সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ এবং পায়ে আলতা। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলোতে যুবকযুবতীর রূপচর্চার বিভিন্ন বিষয়বস্তু স্থান লাভ করেছে।

রূপচর্চা

১৬৩-১৭৪ রুথা হল'দ মাখবি যদি নামবি লদীর কিনারে, জড়া শিমলে, বুঢ়া যৌবনে তর কেউ যদি ভুলে ॥ কপাল মাঝে উল্‌খি আমার সে কি ধুলে ধুয়া যায়, শাম কলঙ্কেব ডালি আমার র'হল মাথায় ॥ অ ঝিঁগা ফুল অ ঝিঁগা ফুল কন্ ঘাটে জল ডুবাব, চইখের কাজল ঝিকিমিকি পায়ের আলতা ধুয়াব ॥ আয়না কিনতে বায়না দিলম তবু আয়না পাল্যাম না, দাঁতে নিশি চইখে কাজল মুখ দেখিতে পাল্যাম না ॥ দাঁতে নিশি চইখে কাজল আগ দাঁতে তার ছাঁচি পান, মার্য না নয়নবাণ, প্রেমের লদী বইছে কূল উজান ॥ বাডি নাময় ধানেব গাছি ভালছিস কি নহর যাছি, খাবি দাবি টেরি কাটবি ভাবিস না শুকাই যাবি ॥ তকে ভালি নাই রে রূপ দেখোঁ, ভালছি টাঁচর চু'ল দেখোঁ ॥ সাত ল বামহনের বিটি মাথা বাঁধতে বইসেছে, কালা খুঁটি মেয়ের খাতি

টিকলি সিঁদুর সাজ্যেছে ॥ অ মালিনী অ মালিনী তর হাতে চিরুনি, ভাল কর‍্যে বাঁধবে মাথা যেমন থাকে রুনঝুনি ॥ শুদা চু'লে মাথা বাঁধ্যে ভিতরে লিলি লীল দড়ি, ধারে কাঁটা মাঝে কাঁটা পাড়ার লককে ঝুরালি ॥ ডহরে লহরে যাব আহড়ে মন মজাব, ঝঁপা-বাঁধা খঁপাতে তর চাঁপাকলি পরহাব ॥ ফুলাম তেলের শিঁশি-ভরা চু'ল হল্য বাসি, মাথা বাঁধ্যে দে গ মাসি মেজুরা ঝুঁটি ॥

নরনারীর রূপচর্যায় ফুল এবং ফুলের মালারও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। পুরুষ সাধারণতঃ কানে ফুল গোঁজে, নারী খোঁপায় ফুল গোঁজে। ফুলের মালা প্রধানতঃ নারীরা ব্যবহার করে থাকে। ধাতুনির্মিত অলংকারের অভাব ফুলের মালা পরে মেটাবার চেষ্টা করে ঝাড়খণ্ডী নারী। নিচের গান-গুলোতে ফুলের মালার বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে।

১৭৫-১৭৭ টুসুর টিকলি মালা, গাঁথ্যে গাঁথ্যে হল্য গ বিকাল বেলা ॥ কিয়া রজনী ফুলে, হার গাঁথ্যেছি দিব গ টুসুর গলে ॥ জাঁত ফুলের মালা, টুসুর গা করে আলাঝালা ॥

নরনারীর পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। তরুণ-তরুণী পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাজসজ্জায় পোষাক-পরিচ্ছদে কোন রকম ত্রুটি রাখে না। পুরুষের ধুতি আর নারীর শাড়ি—কতো না তাদের বৈচিত্র্য ; রঙের বাহার, পাড়ের নক্সা, সুতোর রকমারি সবকিছু প্রকাশ পেয়েছে অজস্র লোকসংগীতের মধ্য দিয়ে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

১৭৮-১৮৬ বাবুর মাথায় টুপি, বাবুর গায়ে চিকপাড়্যা ফুলাম ধুতি ॥ লদী ধারে লীল বুন্যেছি লীলে শুঁটি ধরে না, ঘরে আছে ছুট দেওর লীল ধুতি বই পরে না ॥ ডাঙুয়া লকের অলমা ধুতি জুতা বিনু সাজে না, ভাল কর‍্যে চলবি ডাঙুয়া লকে যেমন ছুঁবে না ॥ আমার বঁধু পান খায় ছাতিয়া শুকায়ে যায়, বঁধু হে, গায়ে লিহ শীতলী গামছা ॥ লাল গামছা দীঘল কঁচা রাস্তা চল্যে যায়, সনার পদক দুটি দ'লছে গলায় ॥ অরে অরে ঠুরকা শালা কিরে কপাট খুল দেখি, তর দকানে পাটের শাড়ি টুসু বিদায় কর দেখি ॥ হাটে বাটে সস্তা দরে উঠ্যেছে লাইলন শাড়ি, কিনে দে মা লাইলনের শাড়ি, না'হলে যাব না শ্বশুর-

বাড়ি॥ রিমিঝিমি রিমিঝিমি পানী বরষে, ছাতা ধর ধর হে দেওরা, ধান চাকা রাঙা শাড়ি জলে ভিজি গেল্॥

নারীর প্রধান ভূষণ হল অলংকার। গহনাপত্রের প্রতি লোভ নারীর চিরকালের; গহনায়-অলংকারে নিজের শরীরকে সজ্জিত করতে না পারলে নারী তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। ঝাড়খণ্ডের নারীও এর ব্যতিক্রম নয়। ঝাড়খণ্ডের নরনারীর আর্থিক দশা

অলংকার

সাধারণতঃ বিপর্যস্ত হলেও গহনা তাদেরও একান্ত দরকারি জিনিস। সোনার গহনা তাদের ভাগ্যে না জুটলেও রুপো পেতলের গহনা তাদের গায়ে শোভা পেত (বর্তমানে অবশ্য রুপো এবং পেতলের গহনা উঠে যাচ্ছে, পরিবর্তে সোনার গহনা তার স্থান দখল করছে)। ঝাড়খণ্ডী নারীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কতো না নামের কতো না ধরনের কতো বিচিত্র গহনা যে শোভা পেত (এখনো বহু অঞ্চলে এই সব ঐতিহ্যবাহী অলংকারের চলন আছে), তার ইয়ত্তা নেই: খোঁপায় কঁটি, বেলকঁটি, পানকাঁটা, তারা কাঁটা, গলায় গজমোতি, চাঁপাকলি, চাঁদমালা, হাসলি, ডুমরা, মাদলি, মহর, পদক; কানে কানপাশা, কানবালি, কানফুল, কাপ, গাঁঠ্যা, ঝিরঝিরি, ঝুমকা, তিলমাকড়ি, পাখরা, নাকে নাকফুল, কাল্লাফুল, ঝারাফুল, সুরসা, লোথ, নাকছাবি, বেসর, লোলক, মাকড়ি, গুলাপ; বাহুতে বাজু, ঝঁপা, ঝম্পাঝারি, তাবিজ, তক্তি; হাতে চুর, চুড়, বালা (দুধবালা, তাড়বালা, আগবালা), চুড়ি, শাঁখা, পলা, পয়চা, আঙুলে আংঠি, শিরিমুদি; কোমরে বিছাহার, চন্দ্রহার, বেট, গোট, বাঁক; পায়ে খাড়ুয়া, মল, নেপুর, তড়া, পঁইরী, পাঁযজন, পাঁযজর, পাযলিযা, পায়ের আঙুলে ঝুঁট্যা, আঁগট্ ইত্যাদি। লোকগীতিতে ঐতিহ্যবাহী এইসব গহনা-অলংকারের ভূরি ভূরি উল্লেখ মেলে।

১৮৭২০৭ চাঁদমালা তর চাদরে গাথা, মালা গাঁথ রে শিঁকায় তুলা॥ তেঁতল পাত মাকড়ি কাগজে ভরা, ছট লক কিনতে গেলে দর করে চড়া॥ মেদিনপুরে দেখে আলি হালায় হালায় দুধবালা, তর কপালে নাইখ ছানা ল কারে দিবি দুধবালা॥ হাতির উপর বাম চাপ্যেছে গলায় তিনটি মাদলি, ধূরের থাক্যে চিনতে নারি চাদরে মালুম করি॥ থাঁকড়িশলের মাকড়ি বনাই দে, আমি প'রব নাই পেলাঁই দে॥ তুঁই বাধিস না মনের আশা, পরেঁ্যই লে ন পিতল কানপাশা॥ তর বাঁক পিঁধে পেছা ভারি,

চ'লতে লারিস লে ঠেলাগাড়ি॥ তুঁই বা'হ্‌র্যা ল সাঁগা দিব, সিলিক শাড়ি পায়ে মল দিব॥ যেমন জুসনা রাইতে ফিং ফুটে, টাকার বালা রিং রিঁগাঁই উঠে॥ বুঢ়া কই দিলি কানে সনা, বুঢ়ার মনে নাই বিবচনা॥ উড়কি ধানের মুড়কি কলজ্ঞি ধানের খই, চুড়ি দিলিস রে বুঢ়া খাড়ু দিলিস কই॥ চাকুল্যার হাট যাতে চলনে চিন্‌হেছি তকে নাখে লোত্‌-হাতে বাজু ঝুলালি, অকালে সক'ল গুচালি॥ জুস্‌না বাতিয়া হুদকে উঠে ছাতিয়া, ছুমুক ছুমুক, বাজে পায়ের পায়লিয়া॥ কানের ঝুমকা ধনি চরে নিয়েঁ যায়, ভেলে ধনিব ঘুম গে, খঁপাটি চরে নিয়েঁ যায়॥ তব সঁগে নাই যাব যমুনার জলকে, জলকে যাবার বেলা ল তব নাকফুলটা ঝল্‌কে॥ শাঁখা দিলি শাড়ি দিলি নাই সা'জল, উপর কানের ফিরফিরিটি বড় সা'জল॥ হাতে ত চুরবালা কমরে ত গট, রিষাঁই মরে, অ তের উপ্‌র্যা সতীন ল॥ কাঁদ না কাঁদ না বহু গাঁয়ে বসে হাট, কিন্যে দিব অ গ বহু গজমতির হার॥ পেছাপাঢ্যা লীল শাড়ি বাঁধল ডেটি করি লোলক দলনে কি বাজু দলনে, কতই গরব নারীর বেশভূষণে॥ পুরুল্যার হাট যাতে চলনে চিন্‌হেছি তকে নাখে লুলুক কানে পাশা দ'লছে, তথে ল সবাই ভা'লছে॥ বাড়ি নামর মহুল গাছ মহুল কুঢ়াঁয় লিল্‌হ, দাদা, তরে বহুব পাঁ'জ, ঝুঁটিয়ার পাঁ'জ বসে খাঁ'জে খাঁ'জ॥

অতঃপর ঝাড়খণ্ডের খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। আমরা বার বার বলেছি, ঝাড়খণ্ড অরণ্যপাহাড়-ঘেরা অঞ্চল বলে এখানে রুক্ষ মাটির বুকে তেমন ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। তাই এখানকার মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বিপর্যস্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।

খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয়

এমন অর্থনৈতিক দুর্দশা খুব কম অঞ্চলেই দেখা যাবে: শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনগ্রসর অঞ্চল এই ঝাড়খণ্ড। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, খনিজসম্পদ কলকারখানার দিক দিয়ে এই অঞ্চলটি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধানতম রত্নভাণ্ডার বললে অত্যুক্তি করা হয় না। ঝাড়খণ্ডে বহিরাগত উচ্চবর্ণের লোকেরা প্রতিদিন ধনসম্পদে স্ফীত হয়ে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় নগরগুলোকে ভরে তুলছেন, অন্যদিকে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের জমিজেরাত তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, পাতার কুটিরগুলো

ক্রমশঃই ধুলোর সাথে মিশে যাচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের আদিম অধিবাসীদের জীবন এবং সংস্কৃতি আরো কতোকাল টিঁকে থাকতে পারবে, তা যথেষ্ট সংশয়-জনক। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিষ্পেষণে রুদ্ধকণ্ঠ মানুষগুলো বলির পশুর মতো অন্তিম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে যেন। স্বভাবতঃই স্বাধীনতাপ্রিয় বিদ্রোহী বীর অরণ্যসন্তানেরা মারণ-উচাটনের মন্ত্রে নির্বাক, নির্জীব, পরকরুণাজীবী হয়ে পড়েছে। এরা না পারছে পুরনো ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করতে, কিংবা ঐতিহ্যের অবশিষ্ট ছিঁটেফোঁটা পরম বিশ্বাসে অবলম্বন করতে, না পারছে নতুন যুগের আলোকে নিজেদের উজ্জ্বল শাণিত করে তুলতে। তাই এদের আর্থিক জীবন সর্বাংশে নির্ভর করে আছে আদিম জীবনের ফলমূল আহরণ, পশুপালন আর কৃষিরীতির ওপর। সঙ্গত কারণেই এদের খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় বলতে বুনো ফলমূল, জীবজন্তুর মাংস আর কৃষিজাত বিভিন্ন ধরনের খাবার এবং মদ-হাঁড়িয়াকেই বোঝায়। আমরা এর আগে ফলের আলোচনা প্রসঙ্গে বুনো ফলের কথা বলেছি ; জীবজন্তুর কথাও বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। কৃষিজাত খাদ্য বলতে সাধারণতঃ ভাতকেই বোঝায় ; চালের ভাত বাদ দিলেও ঝাড়খণ্ডের মানুষেরা খেড়ীগুঁ দলীর ভাত, কদ ভাতও খেয়ে থাকে। এ ছাড়া মহুলসেদ্ধ, মহুলভাজা, চালভাজার সঙ্গে মহুলভাজা ঢেঁকিতে কুটে তৈরি 'মহুল লাঠা'-ও এদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। লতাপাতার শাক, কানা শাক, শুষণি, সজনে, কচু শাক আদিও এদের খাদ্যতালিকার অপরিহার্য বস্তু। ঝিঙে, সীম, লাউ, করলা, কুঁদরী আদি তরিতরকারিও এদের উদরপূরণে সাহায্য করে। এ ছাড়া আছে মুড়ি, চিঁড়ে, ছাতু। ভুট্টা ঝাড়খণ্ডীদের গম এবং ধানের অভাব মেটায় ; ভুট্টা পুড়িয়ে, সেদ্ধ করে, ভেজে এবং ঢেঁকিতে কুটে 'লেট' রেঁধে খেয়ে অনেক পরিবার জীবননির্বাহ করে। এ ছাড়া আছে মাছ এবং বন্য ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর মাংস। ঝাড়খণ্ডে তাড়ির ব্যবহার কম কিন্তু মদ এবং হাঁড়িয়া পানীয় হিসাবে সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। আমরা কয়েকটি নির্বাচিত গান উদ্ধৃত করে এখানকার খাদ্য ও পানীয়ের অভ্যাসের একটা আভাস দিতে চেষ্টা করছি মাত্র।

২০৮-২৩০ যার হাতে কেঁদ পাকা সে ত বটে ছাল্যার কাকা, ছাল্যা কাঁদে ধাদকীর বনে, কাকা খুজে অরুণ বনে ॥ মাদা'ল পাকার বীচ কাল দেখিতে সুন্দর ভাল, মাদা'ল পাকা, ননদ খাঁয়ে লে ল ললিতা ॥ ভাদর মাসে আল্য জামাই খাতে দিব কি, তাল

পাকা গাদর জগ্‌হা'র আর গাওয়া ঘি।। দাদাকে খাতে দিব দহি-দুধ-ভাত গ, সঁয়াকে খাতে দিব খেড়ী গুন্দলীর ভাত।। ধলভুঁই-এর ধল রাজা খাঁয়ে গেল মহুল সিজা, বঁধু হে. গামছাটি দিয়েঁ গেছে বাঁধা॥ আইল ঝাড়গাঁর রাজা খাঁয়ে গেল মহুল ভাজা, আ'জ রাজা বিপদে পড়েঁছে, গায়ের চাদর বন্ধক দিয়েঁ গেছে।। অ দিদি ডুবালি গে ধনি, কানা শাগে ঘটি দুয়েক পানী।। মা-বিটি রাঁধনী শুষণি শাগ তুলনী, বাদাড় গড়ায়, ঝিঁগা ল'ড়কোেছে সজনি।। হুকড়বা'দের ধকড় শাগ নাচনীবা'দের কচু শাগ, কাকী শাস, তদের বেটায় খুজে বাসি ভাত।। চিংড়ি মাছে বুঢ়া ঝিঁগায় মে'শল না, শ্বশুর গা'ল দিহ না, আর এমন ক'রব না।। আদাড়ে বাদাড়ে ঝিঁগা ঝাঁকের মধ্যে সীম, সীম দাদা বড় মিঠা আরই খুজে নীম।। শাগ ভাজায় রশুন ফড়ন তরহা জান নাই, কাল্লা কুঁদরীর ভাজা অই ত তরকারির মজা তরহা জান নাই।। ভাদর মাসে গাদর জন্‌হা'র আশিন মাসে খই গ, কাত্তিকে জন্‌হা'র লেট তায় চেঁকা দই।। জন্‌হা'র ফুটে ফাটফুট মার বিটি কুঁঢ়া কুট, ভাদর মাসে, খরখস্থা জামাই আল্য লিতে।। লাড়ু পিঠা গটা পিঠা চাটু পিঠা ঝাঁজরা, কামার ঘরে বা'জছে জড়া নাগরা।। মেজুরা রে কাটিকুটি করলম গ ঝল, শ্বশুর ভাশুর খাঁয়ে গেল দেওর মাগে ঝল।। সবাই গেল উঁদুর খাতে শাম মোদের গেল না, উঁদুর পিঠা বড় মিঠা শামকে দিয়া হল্য না।। গগলী কুঢ়াতে গেল নন্দ বান্যার ঝি, মাথায় আছে গগলী ঠেকা উপরে উড়ে চিল।। গেঁঢ়া ছাড়া'স না সক'ল, সকাল হলে কা'টব ছাগল।। এক বাটি চা"ল দিব দু ঘটি পানী, চা'র পয়সার বাখর কিন্যে হাঁড়িয়। ধর গ তুমি, সুরধনি গুণমণি, চিরকদিনের মাতাল আমি গ জান তুমি।। চা"ল দিলে চা"ল লিব পয়সা দিলে মদ খাব, ঘর যাঁয়ে খুকড়া মরাব, রে জীবন ধন, হাঁড্যা খাতেই বড় মন।। ভাটিশাল যা'হ না জাওয়া হাঁড়ি ছুঁ'হ না, যাচিলে ফুলের মালা লিহ না, চেঁকা মদে দাম দিহ না।। মদ আছে বতুলে ছলাভাজা গ আঁচালে, ভাটিশালে, বঁধু দেখা হবেক সকালে।।

এবারে পেশা ও বৃত্তি সম্পর্কিত আলোচনা। কৃষিই ঝাড়খণ্ডের সর্বপ্রধান, বলতে গেলে একমাত্র পেশা। কৃষির ওপর নির্ভর করে আছে ঝাড়খণ্ডের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন। কৃষির সাফল্য-অসাফল্য তাই ঝাড়খণ্ডীদের কাছে জীবনমরণ সমস্যা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। রোদ্দুরে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে এবং বৃষ্টিতে সিক্ত হয়ে তাদের হলচালনা করতে হয়। উগাল, সামাল, তেউড়, চাষ—চাররার জমি চষে চারা পুঁতলে তবেই ভালো ফসল পাওয়া যেতে পারে। ফসলের জন্য বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন, অনাবৃষ্টিতে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। বৃষ্টির জল পেলে তবেই জমি কাদা করে ধান্যরোপণ করা সম্ভব। তাই বৃষ্টি হলে চাষার মুখ হাসিতে ভরে যায়, আবার খরা হলে মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। শুধু চাষ করলেই ভালো ফসল হয় না, আগাছা তুলে ফেলার ব্যবস্থা করতে হয়, সকাল বিকাল ঘুরে ফিরে জমির ফসলের দেখাশোনা করতে হয়। কোথায় জলের প্রয়োজন, কোন জমি থেকে জল বের করে দেওয়া দরকার—চাষীকে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। জমির আল নষ্ট হয়ে গেলে তা বেঁধে না দিলে জমির সব জল বেরিয়ে যেতে পারে। এর ওপর ধানের শত্রু আছে গরুবাছুর, বুনো হাতি, পাখিপাখালি—সেদিকেও নজর রাখতে হয়। চাষের জন্য সব সময়ই মুনিস-কামিনের সাহায্য দরকার, এদের খুশি রেখে কাজ করিয়ে নিতে হয়; অনেক সময়ই বড় বড় চাষীরা কামিন-মুনিসদের কম পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেয় বলে তারা ক্ষুব্ধ হয়। ধান পেকে গেলে যতোক্ষণ না খামারে তোলা যাচ্ছে ততোক্ষণ স্বস্তি নেই, পাখিপাখালি গরুবাছুর তো আছেই, তার ওপর আছে চোরের ভয়। কৃষিকার্য-সংশ্লিষ্ট আনন্দ-বেদনার রৌদ্র-ছায়ার খেলা নিচের গানগুলোতে সুন্দরভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

পেশা ও বৃত্তি

২৩১-২৫২ আমার বঁধু হাল করে বাড়ি নামর খেতে, গরা গায়ে খরা লাগে বড় দয়া লাগে। মুড়ের ঘাম টুঁড়ে পড়ে দেখ্যে নয়ন ঝুরে, অ ননদী ল, আমি যাব নিজে বাস্তাম দিতে।। উগাল সামাল তেউড় চাষ জমিনে যেমন না হয় ঘাঁস, ঘাঁস হলে আবাদ হবেক কেমনে, দুইটি বলদ চালাও সমানে।। শালকাঠের হালটি কুসুম কাঠের বঁটা, বাঁকা বঁটা লাগাঁই কর্যে ক'রব হেটা টাটা, হাল্যা, চলবি চলবি রে, আমি আলগা মুঠে হাল ধর্যেছি।। সুরু সুরু

ধান বু'নলম টিয়ায় খুঁটে খায়, রাজার বিটি দুলালী বাড়ি বাটে যায় ।। রহিনে বুনলম ধান গাছি হল্য মানুষ পরমাণ, আষাড শবাবণ মাসে না গেল কাঢান, মামা কে জান, কিরূপে বাঁচিবে পবাণ ॥ • আষাঢে বুনল ধান শবাবণে গাছি রে, গাছি দেখ্যে চাষী ভাই-এব উলসিত মন রে ॥ উপর বিলে হাল দাদার নাম বিলে কামিন রে, কন্ বিলে রুইব দাদা কামিন কাজল ধান রে ॥ দে ন দিদি ছিঁড়া ঘংটা, বাডি নামম লাগাঁই দিব ভূতমুড়ি ধানটা ॥ ই ববিষে দেখি খেতী চাষীর আনন্দ অতি বরিষার না হইল টান গ, টাঁইডে-টিকবে হইল ধান। কিছু খেতে শুকে জল ঘাঁস হল্য প্রবল কেবা কবে দহরা নিকান গ। যার আছে বেডানাডী মনে মনে মুডে দাঢি সময়েতে হইল কাঢান গ ॥ বারেবাবে কবি মানা ডাঁগা জমি লিহ না, খাঁদেব কদা'ল খাঁদে বহিল, ডাঁগা খেতে জল নাই গেল ।। বাইদে ত কাটিফুটি বহালে উঠিল ছাতি এমন ধরণ দেখি নাই ভাই গিঁয়ানে, জল ক'বল অজ্ঞ বিহানে ।। বাইদে ত জল নাই বহালে সাঁতার রে, কাল মেঘে জল নাই কব্যেছে আঁধার বে ।। আইডে বস্তে ঝুরত নয়ান, কিসে বাঁচে পরাণ, মাহাজনকে কি দিব জবান। যাউ ছিল গুঁডিভাঁডি তাউ লিল লথ্যা শুঁডি মাহাজনকে কি দিব জবান ॥ হাতে লিব চুটিটি কাঁধে লিব কদা'লটি সকসক্যা খাঁয়ে লিব বাসিটি, লহকে ধবিব আ'ড দুটি ।। হিডটা ত ধ'বলে বেশ জলটা ত না হয় শেঁষ, শেঁষ হলে আবাদ হবেক কেমনে, দুটি বলদ চালাও সমানে ।। পাহাড় কচাব চাষ না কবিহ আশ রে, হাডাব হুড়ুর, হাতি আ'সছে সারা রা'ত ।। সুরুসুরু কানালি গডা ধানের চাষ, খালভরা ঘরে ঘুমায চরে কাটে ধান ।। ভোর সকালের বেলি কামিন ডাকিতে গেলি, কাঁকডাটি কামডাল্য হাতে, মনে হল্য পাখাল ভাতে ।। পইলা খুকডা ডাকে মোর সঁইয়ায় হাঁক মারে, নাই যাব সঁইয়া কাজ কবিতে, কাঁসাই নদী ভবা ডাক দিছে ।। গেল বছর আকালে পইলা ধান খাটালে তরা নিজে ডিলি মবাই বসালে, ভকারাকে শঁষে মরালে ।। সুরুসুরু কানালি ধানলাগা করালি, ঝিলপি মিঠাই দিব বল্যে জন্হা'র পড়ায় ভুলালি ।। আষাড় মাসে রথের

মেলা তরাই টানালে তলা, তিন পাই ধান দিব বল্যৌ দিলে নাই,
তদের ঘর ভাই আর যাব নাই ॥

কৃষিবৃত্তি ছাড়াও অন্যবৃত্তির লোকেদের কথাও লোকসংগীতে স্থানলাভ করেছে। তবে কৃষকের আনন্দ-বেদনার কথা যেভাবে এবং যতো বেশি পরিসরে প্রকাশ লাভ করেছে এদের কথা তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। ঝাড়খণ্ডের আদিম সমাজে যেমন বনচারী খাড়িয়া-লোধাদের স্থান আছে, তেমনি কামার-কুমোর তাঁতী-মুচি হাড়ি ডোম-ভুঁইয়া (ছুতার) ঠেঁটরী (পিতলকার) ধরা (নদী পারাপাবকাবী মাঝি) আদি ভিন্নবৃত্তির সম্প্রদায়ের লোকেরাও মিলেমিশে একটি সুষম সংহত সমাজ রচনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কবেছে।

২৫৩ ২৬৬ সকালে উঠিযা খাড্যা ভাবনা কবিছে, কাঁথে ঠেকা হাতে থনতা চলে বনে বনে ॥ কুল্‌হিমুডায় কামাবঘব আঁগাব গুডায় ছলাছল ঝিঁগা বিচিব মতন দাঁত গাবাব, সুরু কাপড় কুঁচি ছাডিব ॥ আইল কামাব ছঁড়া লহাকে করিল গুঁডা গরম লহা জুডে থনে থনে, মোর মন ভাই তর ঠিনে ॥ কুল্‌হিমুডায় তাঁতি ঘব কাপড বুনে ছরছব মাব তাঁত্যান বল্যো দিবি তাঁতিকে, আঁচলে কদম ফুল দিতে ॥ আমাব বঁধু সদাগব কাপড বুনে সরসব, সদাগর, কই দিলি বিলাতি চাদর ॥ চিটামাটির খোলটি হনুমানের তালাটি, ভালাই মুচি বে, অ তুঁই সংসাব নাচালি রে ॥ বাঁশ কা'টতে গেল ডম বাঁশবনের ঝাড়ে, বাঁশ আগায় বরহ'ল ছিল বিঁধল ডমের মুখে। অ বাঁশ কাটবি কখন, টঁকা বুনবি কখন, বেলা গেল গ মাথা বাঁধবি কখন ॥ অ ল ছুতারের ঝি আঁচালে বাঁধ্যেছ কি, আঁচালে বাঁধ্যেছি সুরু চিডা, পান খাতে যাবে আমার পাড়' ॥ বড লড ঘর দেখ্যে কামিলা সামাল্য ঘরে, ঘরে লক নাই, আমবা গহনা গঢাথি হে ॥ আমাব বঁধু শাম সিং পিতল পিটে সারাদিন, দকান খুলিয়ে ঝুম'র বলে, হেল্যিয়ে কদমতলে ॥ আইল কারিকব বনাল্য মন্দির ঘর কারিকরের ঘর কুথায় ছিল গঁ, কেমনে মন্দির বনাইল ॥ পাহাডের কাদাজল নদী-এ নামহিল রে, ধবা ভায়ার মরণ হল্য নউকা ডুবিল রে ॥ ধরা পাডায় ধবধবানি ব'ষ্টম পাডায় নীল ধুতি, তাঁতি পাড়ায় দেখ্যে আল্যম তাঁত গাচায় ঠেং দুটি। চল যাব তাঁতি দরশন,

কাপড় দিব গ মনের মতন॥ শাঁকারীরা শাঁকা কাটে ধারে ধারে শালকলি, সেই শাঁকাতে লেখা আছে রাধা শাম কলঙ্কিনী॥

ঝাড়খণ্ডের অর্থনৈতিক জীবন অত্যন্ত করুণ, বেদনাময়—একথা আমরা বারবার উল্লেখ করেছি। সূর্যোদয় হতে না হতে ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নায় মাতৃহৃদয় নিরুপায় যন্ত্রণায় সজল হয়ে ওঠে। সকাল সকাল লোকজন চারপাশে বেরিয়ে পড়ে দু'মুঠো অন্ন সংগ্রহের জন্য, কখনো কাজ মেলে কখনো মেলে না। কখনো কখনো ভাতও জোটে না, তখন বুনো ফলমূলের ওপর ভরসা করতে হয়। ক্ষুধার জ্বালায় কখনো গৃহিনী লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁড়ির ভাত খেয়ে শেষ করে ফেলে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা নারীকে বিপথে নামতে প্রলুব্ধ করে। গায়ে তাদের কাপড় জোটে না, ছেঁড়া কানি টানাটানি করতে গিয়ে আরো বেশি ছিঁড়ে যায়; গহনার কথা তো ভাবাই যায় না। অথচ অন্নের যেমন দরকার, তেমনি দরকার গায়ের কাপড়। কেননা, 'অন্নর জ্বালা গ পরভু বহুত জ্বালা গ, বস্তুর বিনে বড় মানে হীন'। তাই নিরুপায় নারীকে দেহের বিনিময়ে অন্ন বস্ত্র এবং এবং ছোটখাটো গহনার সংস্থান করতে হয়। এমন সুপ্রকট দারিদ্র্য যেমন অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, তেমনি দারিদ্র্যের জন্য নারীত্বের এমন অবমাননা অন্যত্র বিরল বলে মনে হয়: 'সামান্য পয়সার জন্য পেটের অন্নের জন্য নারীমাংসে হেন মহোৎসব, বুঝি বা তা একমাত্র ঝাড়খণ্ডে সম্ভব।' তাছাড়া আছে সাহুকার-বানিয়া-মহাজনের অকথ্য অমানুষিক শোষণ। বহু পরিবারই বাগাল. ভাতুয়া, মুনিস, কামিন খেটে কিংবা কটাভানারি করে অন্নসংগ্রহের চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের সহস্র প্রয়াস শেষ তক কপোত-বৃত্তিতেই নিঃশেষিত হয়—অন্নের জন্য হাহাকার কোনদিন থামে না।

অর্থনৈতিক জীবন

২৬৭-২৭৭ ঘরে খাতে কিছু নাই চল যাব বাঁওলা কুড়িতে, ছাল্যা ছুটা ভকে কাঁদিছে॥ ঝা'টপা'টের বেলা হল্য বাস্যাম নাই ঘরে, আমার বঁধুয় খাতে খুজে সকাল পহরে, আমার গা কাঁ'পছে ডরে॥ বেলা উঠে ঝিকিমিকি বাজার দিগে যাব ন কি, কাম পালে কাম-অ করিব, পয়সা পালে মদটুকু খাব॥ হাঁটু গাড়ি বসবি আটুপাটু চাটুটাকে ধরবি, টুকু বাঁটি টুকু খ্যাবি টুকু বাসি রাখবি, সকাল হলেই ছাল্যা কাঁদা মনে রাখবি॥ শাগ রাঁধতে বল্যেছিলিন কচু রাঁধ্যেছে, সআদে সআদে বুঢ়ি খাঁয়ে

রাখ্যেছে ॥ দশ হাত ছিঁড়া ভুনি মা-বিটি টানাটানি, বেজারে-বেজারে ঘুম ভা'ঙল, শেষ রা'তে কমরদুখা ধ'রল ॥ দুলালি গ দুলালি ধান দুটি উল্‌হালি, ঢেঁকিশালের পাট্‌রা কুঁঢ়া সক'ল লিয়েঁ পালালি ॥ নামপাড়া গে'ছলেঁ টুসু কার বা কত ধন আছে, কি ব'লব ধনের কথা ভাঁচা কুটো্য দিন যাছে ॥ সন্না-খাডার খুঁচি বঁধু কাঁটাবেড়ের ঘর, ঘংটা নিতে বনে না শাম ছিঁড্যেছে কাপড ॥ যাব না যাব না আমি গঁয়ঠা কুঢ়াতে, হতভাগা শালার বেটা পয়সা লাচাছে ॥ কেইসে বাঁচে প্রাণ, সাঁঝে খাল্যে বিহানে হয় টান। পরের ঘরের পর খাটালি সকাল হল্যে যায় বাগালি, টাঁকে মুড়ে ঠুঁকাঁই হলে পিঠে পড়ে ঘাম। বরাভুঁই-এর কুটুম আল্য খাওয়াদাওয়া সির'াই গেল, না খাওয়ালেও হব অপমান। যাউ ছিল গুঁড়াগুঁড়ি তাউ লিল লখ্যা গুঁড়ি মাহাজনকে কি দিব জবান ॥

কিন্তু ঝাড়খণ্ডীদের জীবনে দারিদ্র্যই থাক আর দিনযাপনেব গ্লানিই থাক, আনন্দরস এদের জীবন থেকে কোনদিনই লুপ্ত হয়ে যায় নি। উদরে ক্ষুধাগ্নির জ্বালা থাকলেও জ্যোৎস্নারাত্রি এদের পাগল করে তোলে। আখডায় আখড়ায় মাদল বাজে, নৃত্যচঞ্চল পায়ে পায়ল নূপুব ছমছম করে বাজে ; বাজনা আর নাচ ক্ষুধা ভোলায় দুঃখ ভোলায়—সারা সত্তা জুড়ে তখন উথালপাথাল বিহ্বলতা। নরনারী নৃত্য-গীতের মধ্যে পরস্পরকে গভীরভাবে পায়, উদরপূরণের চিন্তা আর দৈনন্দিন ব্যর্থতা তখন নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই দিনের বেলাকার রুক্ষ কুশ্রী ক্ষুধার্ত ঝাডখণ্ডেব রূপ যেন রাত্রিবেলা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে পরিবর্তিত হয় ; রাতের ঝাডখণ্ড নৃত্যে-গীতে বাজনায়-কোলাহলে প্রেমের আলাপে-প্রলাপে এক স্বপ্নলোকে পরিণত হয়।

নৃত্যগীতবাদ্য

২৭৮-২৯২ উপব কুল্‌হি মাদ'ল বাজে নাম কুল্‌হি লাচ লাগে, নিদ নাই মোহব আঁখিতে, চল যাবে লেগি রাখিতে। কালিয়া রে কালিয়া লাল পাগডিয়া, ছলে কলে মাদ'ল বাজায় বরুহাভুঁইয়া মাদল্যা ॥ ঝা'ল বাজে ঝম্পা বাজে বাজে করতাল, আশি কশে মাদ'ল বাজে রে রাজার দুয়ার ॥ নাচিতে জানি নাই টান্যে আন্যেছে, অ থালভরা রে, না'চব ত ছাল্যা ধর্যে দে ॥ নাচ

দে'খতে যাঁইছিলি কি ব'লব নাচের কথা, কেউ ডাঁঢ়াই কেউ বস্থে আছে গ সজনি ।। নাচনীরা থারাথা'র মা'দল্যারা গটা চা'র নাচনীরা গেল কন্ পথে, লাগ লিব গুণাদার ঘাটে ।। পুরুল্যা বাজারে ঘুরি মাদ'ল বাজা শিক্ষা করি, মাদ'ল বাজাঁই করি বাবুগিরি, অ গ ধনি থাক ধনি আমাকে মনে করি ।। ভাদর মাসে আদল বাদল দাদার কাঁধে বাজে মাদ'ল, তালে-তালে, দাদা ঠুঁকত মাদলিয়া ।। যাঁইছিলি ঘটিডুবা নাচ লাগে উখাড়ুবা, নাচনীকে জল মাগ্যে খাওয়াব, তবু আমরা নাচ লাগাব ।। বুঢ়া নাচে থাপাকথুপুক ডাঁঢ়াই নাচে ছুঁড়া রে, বঁধুয়ার নাচা আমার দে'খবার বড় মজা রে ।। বুঢ়াবুঢ়ি হাট যায় চা'র পয়সার মুড়ি খায়, শিয়ালভাঁগায়, বুঢ়া লাগাঁই দিল ঝুমরী ।। কুল্হি কুল্হি যাতে ছিলি নাচ শুন্যে ঘুর্যে আলি, তদেব পাড়ায় দিনেই কিসের নাচ, অঁচালে বাঁধ্যেছি মাগুর মাছ ।। আখড়া ত সাঁই সাঁই মা'দল্যা ত ঘরে নাই, মা'দল্যাকে মাড় মাগ্যে খাওয়াব, তবু আমরা নাচ লাগাব ।। তদের পাড়ায় নাচ লাগে, আমদের পাড়ায় নাই লাগে, তরা মেশাবে ন নাই ল, কে জানে ।। পাকা বাঁশেব ঠেকাডালা পিঠ বাঁশের কুলা রে, ভকে-শঁযে গীত গা'হলে লকে বলে ফুলা ।।

উৎসব

এ ছাড়া আছে বার মাসে তের পবব। ঝাড়খণ্ডেব জাওয়া-করম, ভাদু-ছাতা ইঁদ-বিঁধা-জিতিয়া বাঁধনা-টুসু-ভগ্‌তা (চড়ক) প্রায় সারা বছর ধরেই জন-জীবনকে উৎসবমুখর করে রাখে। করম-বাঁধনা-টুসু পরবের, বিশেষভাবে টুসু পরবের, জাতীয় পর্যায়ে প্রাণ-চাঞ্চল্য এবং উৎসবের ব্যাপকতা যিনি লক্ষ্য করেন নি, তাঁকে ঝাড়খণ্ডের মানুষের ওপর 'পরব-তৌহার'-এর যে কি প্রভাব তা বোঝানো যাবে না। উৎসবপ্রিয় ঝাড়খণ্ডীরা যে তাদের গানেও উৎসবের কথা ভোলে না, তার নজির নিম্নোক্ত গানগুলো।

২৯৩-৩০১ অ দিদি চিলকির গড়ে, হাতির উপরে রাজা ঘুরে ; যখন উঠে ইঁদটি তখন ভাঙে নিদটি, চিলকির গড়ে॥ আইল বাঁদনা পরব থুকড়া কাটিব রে, জড়া ঠেং পড়া পিঠা র'হল বাদাড়ে॥ ইঁদ দে'খতে যাঁয়েছিলি বড় কষ্ট পাঁয়েছিলি, বইরার শলে, ঠেং টা

ঢুকিল মুঢ়ার তলে ॥ কাল্যা বুঢ়ার বিটি তাকে সাজে ঝুরা নিশি, অই নিশি কাকে সাজে, নীরকে, চল নীর রাস দেখিতে ॥ চৈৎ পরবের ছাতুকুঁঢ়া চালেই শুকাল্য, কা'ল যে বঁধু মারে্যছিল আইজ-অ দুখাল্য ॥ বড় বহুর দাঁতে নিশি দুখুবাবুর বড খুশি. বিঁধা টাঁইডে কিন্যে দিব গহনা, আর তকে ছাড্যে দিব না ॥ বারিপাদার রথে যাতে কেউ নাই মোর সঁগে সাথে, আ'জ কে রে মহনী দিল মতে, দেখা হবেক বারিপাদার রথে ॥ আইল পোষ পরব কি কর্যে কি করি, ঘরে নাই বাবুর বাপ ভাবিয়েঁই মরি ॥

আনন্দবেদনাময় জীবনের ওপর মধ্যে-মধ্যে বৈরাগ্যের ছায়া পড়ে। তখন অন্য আর এক পৃথিবীর কথা চকিতে মনের মধ্যে উদিত হয়। তখন এই পৃথিবীর আনন্দবেদনা, দৈনন্দিন প্রাণধারণের গ্লানি, প্রেম ভালোবাসা, প্রিয় পরিজন সব কিছু মিথ্যা মনে হয়। দিনগুলো রাতগুলো অকারণে অপব্যয়িত হয়েছে ভেবে মনের কোণে ক্ষোভ জমে, বিষয়-আসক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। ঝাড়খণ্ডের মানুষজনের ভাবনাতেও এসব চিন্তা ধরা পড়ে। ঝাড়খণ্ডের গানেও তাই বিষয়-বৈরাগ্য স্বাভাবিকভাবেই স্থান লাভ করেছে। তবে এই সব গানের বিষয়বস্তুতে যে বৈষ্ণব প্রভাব পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ-পর্বের উপসংহারে এমনি ধরনের কিছু বৈরাগ্যভাবনাশ্রয়ী গান উদ্ধৃত করা হল।

বৈরাগ্যভাবনা

৩০২-৩১০ কেনে মর চিরদুঃখে রে সামান্যের সুখে, ক্ষণমাত্র সাজ রাজা অলীক মজার জনম সাজা রে, হলি রে তুঁই যমের ভেজা গেলি অই ঝঁকে ॥ ঘরে সামাল্য চর নাই মানে অবসর, মন রে, দেখ যেন থাকিবে সতর; চর আছে ছয় জনা সিঁদ কাট্যে লিবেক সনা, নয়ন প্রহরী দিয়েঁ চরকে রাখ ভুলাইয়েঁ ॥ সেখানে কি বল্যে আলি কন্ বিষয়ে ভুল্যে রহ্লি রাধাকৃষ্ণ হরিনাম তুঁই মুখে না বলিলি, পাগল মন রে, মিছা মায়া মোহে ভুলিলি ॥ মানুষ জনম ভাই ঝিঁগাফুলের জালি, দিন গেল চলি, অ তুঁই বেকামে ঘুমালি ॥ কি ভাব্যে আলে মন কি কাজ করিলে, সরবরে ডুব্যে ধন উকুডুবু খালে ॥ আ'সতেউ একা যাতেউ একা কেবল মাত্র পথের দেখা শূন্য পথে যাতে হবেক একা, আর কি এমন হবে দেখা ॥

চতুর্থ পর্ব

রূপ ও রীতি

রূপকথা, ব্রতকথা, প্রবাদ, ধাঁধা আদির গঠনভঙ্গি মোটামুটিভাবে আলোচনা করেছি। এই পর্বে লোকসাহিত্যের ছন্দোবদ্ধ উপকরণগুলোর, প্রধানতঃ সংগীত ও ছড়ার, রূপ ও রীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হবে।

লোকসাহিত্য এবং লোকসংগীতের সংজ্ঞা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে এবং ভাষায় দিয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে কয়েকজন পণ্ডিতের সংজ্ঞা লোকসাহিত্য এবং সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছি। এইসব সংজ্ঞা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁরা প্রধানতঃ লোকসাহিত্য বা সংগীতের অন্তরঙ্গ উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁদের সংজ্ঞা রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য, সব বিষয়ের সত্য অন্তরঙ্গ উপাদানের মধ্যেই নিহিত থাকে। শুধুমাত্র এই কারণেই বহিরঙ্গ রূপ ও রীতিকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়াটাও মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করলে কারো অন্তর্নিহিত সত্তার সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতি, চাল-চলন আদি বহিরঙ্গ উপাদান থেকেই ব্যক্তিবিশেষের সনাক্ত-করণ সম্ভব। লোকসংগীতেরও কিছু বিশিষ্ট রূপ ও রীতি আছে, যা দেখে তাকে লোকগীতি হিসাবে সনাক্ত করা যায়। স্বভাবতঃই লোকসংগীতের সংজ্ঞাও এইসব বাহ্যিক উপাদানকে ভিত্তি করে রচনা করা যায়। লোক-সংগীতমাত্রই যেহেতু গেয়, তাই বাহ্যরূপ বলতে শুধু পাঠরূপ বোঝায় না, তার সঙ্গে সুরের রূপটিও বোঝায়। লোকগীতির গঠনে শব্দের টানা-পোড়েনকে সুর যেমন ভরাট করে, তেমনি বাড়তি শব্দকেও দ্রুতলয়ের মাধ্যমে একটি সুসম রূপ দান করে থাকে। সংগীত সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও যাঁদের আছে তাঁরা জানেন যে, লোকগীতির সুর মানেই তা লৌকিক সুর, গায়নরীতির দিক দিয়ে যা লোকগীতিকে অন্যান্য শ্রেণীর গান থেকে একটি পৃথক সত্তার অধিকারী করেছে। লোকগীতির ভাষাও প্রধানতঃ লৌকিক ভাষা হয়ে থাকে, শিষ্ট ভাষায় রচিত লোকগীতির মধ্যে

লোক-চারিত্র বা-ধর্ম মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় না। লোকগীতির কবিগণ সাধারণতঃ লৌকিক স্তর থেকেই এসে থাকে। তারা নিজেদের মৌখিক লোকভাষায় গান রচনা করে থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে, শিষ্ট ভাষায় রচিত হলে তা কি লোকগীতি হবে না? তাহলে ঝুমুর, টুয়া বা বাউল গান কি লোকগীতি নয়? আমরা তা বলি না। গানটি শিষ্ট ভাষায় রচিত হলেও তার সুরটি যদি লৌকিক সুর হয় এবং লোকগীতির রূপ ও রীতির অনুসারী হয় তবে তা অবশ্যই লোকগীতি হবে এবং এই কারণেই ঝুমুর বা টুয়া গান বা আধুনিক কালে স্বল্পশিক্ষিত কবির রচিত টুসু গীত লোকগীতি। কিন্তু যেহেতু এগুলো শিষ্ট ভাষায় রচিত হয়, তাই এগুলো লোকভাষায় রচিত গানের মতো জনমানসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়। শিষ্ট ভাষায় রচিত লোকগীতি যখনই লোকপ্রিয় হয়েছে তখনই তা জনতার মুখে মুখে আবৃত্তির পথে লোকভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। তখন সেগুলো ব্যক্তি-কবির রচিত মূল গান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপৌরুষেয় লোকায়ত গানে পরিণত হয়। ঝুমুরের বহু জনপ্রিয় কলি বা স্তবক এইভাবেই করম নাচের গানে পরিণত হয়েছে। ভণিতাযুক্ত ঝুমুর, টুয়া, টুসু গীত ইত্যাদি আঞ্চলিক পল্লীকবিদের সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসের ফল বললে ভুল বলা হয় না। লোকভাষায় রচিত গানে লোকভাবনার সহজ স্বচ্ছন্দ নিরাবরণ এবং নিরাভরণ ভঙ্গি কিংবা বাস্তবতা, প্রত্যক্ষতা, ঋজুতা যতো উজ্জ্বল রেখায় প্রকাশলাভ করে, পল্লীকবি-রচিত ভণিতাযুক্ত গানে লোকসংগীতের এই সব বৈশিষ্ট্য তেমনভাবে প্রকাশলাভ করে না। তাই লোকসংগীতের রূপ ও রীতির উপকরণ হিসাবে লোকভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রূপ ও রীতির দিক দিয়ে লোকসংগীতের সংজ্ঞা দেবার প্রয়াস পেলে এইভাবে বলা যেতে পারে: যে সংগীতে লৌকিক সুর এবং প্রধানতঃ লোকভাষার ব্যবহার করা হয়, যার গঠনরীতিতে ধুয়া বা রং এবং পুনরাবৃত্তির অপরিহার্য ভূমিকা থাকে, অর্থহীন পদ, পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশের সাহায্যে যার পঙক্তির পাদপূরণ করা হয়; যার বাক্যগঠনে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে; সর্বত্র না হলেও বহু ক্ষেত্রে উক্তি-প্রত্যুক্তি বা প্রশ্নোত্তরের ব্যবহার যে-গানে করা হয়; যা লোকমানসের উপযোগী সাদৃশ্য-কল্পনা, সাঙ্কেতিকতা, উপমা-অলংকারের বিশিষ্ট প্রয়োগে উজ্জ্বল এবং প্রায় সর্বত্রই শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে, খুব কম ক্ষেত্রে ধ্বনিপ্রধান বা তানপ্রধান ছন্দে রচিত হয়, তাকেই লোকসংগীত বলা যেতে পারে।

অতঃপর এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো লোকগীতির উদাহরণসহ বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। লোকগীতিতে ব্যবহৃত সুর এবং তার সংগীত-মূল্য সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এখানে কম বলে আমরা সে-সম্পর্কে আলোচনা করব না। আমরা শুধুমাত্র সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে রূপ ও রীতি সম্পর্কিত উপকরণগুলো নিয়েই বিশ্লেষণ করে দেখব। সেদিক দিয়ে প্রথম বিচার্য বিষয় হল, লোকসংগীতের ভাষা। আমরা আগেই বলেছি যে, লোকসংগীতের ভাষা সাধারণতঃ মৌখিক লোকভাষা হয়ে থাকে। আলোচ্য অঞ্চলের লোকসংগীত ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় রচিত। কেউ কেউ মনে করেন, ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত বাঙ্‌লা উপভাষা সমতল বাংলা থেকে আগত লোকজনের কথ্যভাষার সাক্ষাৎ প্রভাবের ফলে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ তাঁদের কথা মেনে নিতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, মুষ্টিমেয় লোকের মুখের ভাষা এক বিপুল জনতার মুখের ভাষাকে লুপ্ত করে দিয়ে তাদের সম্পূর্ণভাবে ভাষান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে, যা অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমরা অন্যত্র বলেছি যে, আলোচ্য অঞ্চলের লোকসাহিত্যের প্রধানতম শরিক হল কুর্মি-মাহাত সম্প্রদায়। এদের নিজস্ব উপভাষার নাম কুর্মালি, এমন কি যেখানে এরা ঝাড়খণ্ডী উপভাষা ব্যবহার করে থাকে (বলাবাহুল্য, এই উপভাষাভাষী কুর্মির সংখ্যা এই সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি বললে অত্যুক্তি করা হয় না), সেখানেও এদের নাসিক্যধ্বনি-প্রধান ঝাড়খণ্ডী উপভাষাকে 'মাহ্‌ত ভাষা' বলে চিহ্নিত করতে শোনা যায়। কুর্মালি উপভাষার সরাসরি যোগসূত্র এখনো জাওয়া গীত, বিয়ের গান, আহীরা গান আদি আচারমূলক রক্ষণশীল লোকগীতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। পাঁচপরগণায় যেমন কুর্মালি উপভাষাই মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে, তেমনি ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতেও কুর্মি-মাহাতদের কথ্যভাষারই প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে পল্লীকবি শিষ্ট বাঙলায় গান রচনা করেছে, লোকপ্রিয়তার জন্য তাও বিবর্তিত হয়ে ঝাড়খণ্ডী লোকভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। লোকভাষাই যে লোকসংগীতের আসল রূপের চাবিকাঠি তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকভাষাই লোকসংগীতকে তার নিজস্ব রূপ এবং চরিত্র দান করে থাকে। নিম্নোদ্ধৃত গানগুলোতে লোকভাষার প্রয়োগ এগুলোকে আঞ্চলিক লোকগীতি হিসাবে একটি বিশিষ্ট রূপ এবং চরিত্র দান করেছে।

লোকভাষা

১-৫ নদীয়া কে ধারে ধারে কে কাড়া চরায় গ, কাহার স্তিরিয়া ভাঁস্তে যায়।

ডাঁস্তে ডাঁস্তে আস বাছা আস কাঁখি ধার গ, জঁটে ধর্যো উঠাইব ঘাট ।। ভাই-এ যে দিল গ পরভু ঝুমুঝুমু রে ছামড়া, খুড়া যে দিলেন পরভু টহবর রে বাজনা। জেঠা যে দিলেন পরভু কহবর রে রাতিয়া, বাবা যে দিলেন পরভু জড়িজড়া রে পায়রা।। দে ন গ আগুনটুকু র'স ন হে খনিকটুকু, সেঁগেল সাকাম যতনে বা'র করি, তামুক বিনে র'হতে না পারি ।। বরুহাভুঁই-এ দেখ্যোঁ আলি পালই থাড়ার ঘর গ, চালের উপরে কাঁটা টাকুড়া সমান ।। দিদি হায় গ, সতীন বাদী ডুবালি আমায়। শন্‌লা শাগে ঢালা মাডে রাঁধ ছটকী চাঁড়েমাড়ে, না'হলে বড়্‌কারা যাবেন রাগাঁই ।।

ধুয়া বা রং লোকগীতির রূপ ও রীতির একটি বিশিষ্ট উপকরণ। গানের অন্য পঙক্তিগুলো একবার মাত্র আবৃত্তি করা হলেও ধুয়া বা রং বারে বারে আবৃত্তি করা হয়। নৃত্যসম্পর্কিত কিছু কিছু গানে নৃত্যকারী বা কারিণীরা শুধুমাত্র ধুয়াটিই গেয়ে থাকে। অবশ্য ঝাড়খণ্ডের সব শ্রেণীর গানে ধুয়া বা রং-এর ব্যবহার হয় না। জাওয়া গীত, বিয়ের গান আদিতে রং-এর ব্যবহার হয় না। আহীরা গানেরও সঠিক অর্থে ধুয়া বা রং নেই ; তবে এ গানে পঙ্‌ক্তিযুগলের প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষাংশটুকু দ্বিতীয়বার ঘুরিয়ে গাইতে শোনা যায়। ধুয়া বা রং-এর ব্যবহার করম নাচের গান, ভাদু গান, টুসু গীত, ঝুমুর ও ঢুয়া গানে অপরিহার্য। টুসু গীতের বহু রং মূল গান থেকে বিচ্ছিন্ন করেও গাওয়া হয়।

ধুয়া বা রং

৬-৯ ছাল্যা ছাল্যা কর তরা ছাল্যার বেদন কি জান, পরের ছাল্যা কলে লিলে মায়ের মন কেমন করে। **বল বাছাধন চাঁদ কুথায় পাব, গাছের ফল লহে তুল্যে দিব ॥** বড় বাঁধের আগালে মাছ ধর্যোছি সকালে, **বঁধুর তরে, অ মাছ রাখ্যে'ছ ভাই আঁচালে ॥** মাছ পডাটি রাখ্যোছিলি ঝনকার উপরে, কতখনে খাঁয়ে গেল ছচরা বিরালে। **আমার গা কাঁ'পছে ডরে, মোর সঁয়া খাতে খুজে সকাল পুহালে॥** আষাঢ় মাসে হলা দেখা খঁচলে তর আম পাকা গ, যাব বল্যো কই গেলি অ তুঁই দিলি না ঠিকানা। **এবার গেল গ জানা, রাং পিতলে মজলি ধনি চিনলি না সনা।** মুয়াগড়ের সুরু চিড়া বাঁধের ঘাটে থালি কিরা গ, *বল্যোছিলি কনকালে তুমায় ছা'ড়ব না।* **টিয়া ভাব্যে হয় গ জরা মনিহারা** ফণির পারা গ, চিটা গুড়ে মন মিশিলে চিনির পানুহায় মিশে না ॥

পুনরাবৃত্তি লোকসংগীতের একটি অত্যন্ত সুপরিচিত রীতি; প্রধানতম বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম বলা যেতে পারে। একই গানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের পুনরাবৃত্তির ব্যবহার লক্ষ্যগোচর হয়। কখনো গানের এক একটি পঙ্‌ক্তির, কখনো পঙ্‌ক্তির অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তি করা হয়।

পুনরাবৃত্তি

১০-১৪ পাথবার হাটে দেখে আলি আনায় মিঠাই তিন থালা, **আনায় মিঠাই তিন থালা**। অই মিঠাই কি খাবার বঠে ল গপিনীদেব মন-ভুলা, **অই মিঠাই কি খাবার বঠে ল গপিনীদের মন-ভুলা**॥ জুরগুণ্ডাব বনে **জুরগুণ্ডার বনে** অ রে বালা রানী হারা হল্য, সাত সিপাই নিয়ে অ রে বালা বানী খুজে॥ লাউপাত্‌টি কাল বলি **লাউ পাতটি কাল রে**, আমাব দাদার দুটা বউ ধান কু'টতে ভাল রে॥ ঝিপিরঝিপিব জল ববষে তেঁত'ল তলে, **হায় হায় তেঁত'ল তলে**, কানের ঝুমকা ধনি চরে নিয়ে যায়, ভেলে ধনির ঘুম গে, থঁপাটি চবে নিয়ে যায়॥ বাঁশ পাল্‌হা বলি বে **বাঁশ পাল্‌হা পাল্‌হা**, বাড়ি বাটে বা'হব'াই দেথ মালিফুলের হালা॥

পুনবাবৃত্তির মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য কবা যায়। কখনো কখনো একই শ্রেণীর ভাবানুষঙ্গের বা বস্তুর পুনবাবৃত্তি কবা হয়, এই ধরনের পুনরাবৃত্তিকে সমভাবার্থক পুনবাবৃত্তি বলা যেতে পারে।

১৫-১৬ আঁচিবে পাঁচিরে ঘর তাই সামাল্য চর, ধনদবিব সক'ল আছে, আমার ধন চুবি যাছে, আমদের ধনি চুরি যাছে। **আঁচিরে পাঁচিরে ঘর তাই সামাল্য চর**, ঘটিবাটি সক'ল আছে, **আমার ধনি চুরি যাছে, আমদের ধনি চুরি যাছে**॥ শ্বশুরকে খাতে দিব দহিদুধভাত গ, আর দিব ছলাকলাই ডা'ল। শাউড়ীকে খাতে দিব **দহিদুধভাত** গ, আর দিব **ছলাকলাই ডা'ল**। ভাশুরকে খাতে দিব **দহিদুধভাত** গ, আর দিব **ছলাকলাই ডা'ল**। জেঠানীকে খাতে দিব দহিদুধভাত গ, আর দিব ছলাকলাই ডাল। দেওরকে খাতে দিব দহিদুধভাত গ, আর দিব ছলাকলাই ডা'ল। ননদকে খাতে দিব চুল্‌হার গরম পাঁশ গ, আর দিব কুকুর লেল্‌হাই॥

কখনো কখনো পুনরাবৃত্তির সময় বিপবীত ভাবানুষঙ্গ বা বিষয় উল্লেখিত হয়। এই ধরনের পুনরাবৃত্তিকে বিপবীতার্থক পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে।

১৭-১৮ **উঁচু ডুঁগুরি কা খড় কাটলি গ নিচু ডুঁগুরিকেরি বাঁশ।** সেহ বাঁশে ছাহলি আশি কশ মাড়ওয়া, সারিসুগায় সাজে বরিয়াত। **উঁচু ডুঁগুরি কা খড় কাটাল নিচু ডুঁগুরিকেরি বাঁশ, সেহ বাঁশে ছাহলি আশি কশ মাড়ওয়া,** তবু নাই গ সাজে বরিয়াত। কচা বাড়ির ভিতরে গুলাংফুলের গাছ, ডাল ভাঙো ফুল তুলে বিদেশী ভমরা। সে ফুলের হাব গাঁথো দিল রানীর গলে, ফুলের মালা গলে দিয়ে দিল গিরুহজ্বালা। **নাই লিব ফুলের মালা নাই লিব গিরুহজ্বালা, গিরুহজ্বালা বড় জ্বালা নয়নে বহে ধারা।**

কখনো কখনো সংখ্যার প্রয়োগেব সাহায্যে পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়ে থাকে, যে রীতিকে সংখ্যাবাচক পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে।

১৯-২৩ **এক মা'র সইলম দু মা'র সইলম তিন মা'র** আর সইব না, সাথী থাক ছট দেওব তব ভাই-এব ঘব ক'বব না। **এক সড়পে দু সড়পে তিন সড়পে** লক চলে, আমার বঁধু একলা চলে বিন বাসাতে গা দলে॥ **এক শ টাকা দু শ টাকা তিন শ টাকার** আগবালা, আগ-বালাটি ভাঙো গেলে থা'কবে শুধু হাত লাড়া॥ **এক কশ** গেলে বাজা **দুই কশ** গেলে হে, **তিন কশে** উড়িল মেজুর। **এক চালান চালালম দুই চালান চালালম তিন চালানে** পড়িল মেজুব॥ বিজুবনে পাকিল পিয়াল, **এক খাঁড়্যা মারিব দুই খাঁড়্যা মারিব তিন খাঁড়্যায়** ভুঁই-এ ছলাছল, পিয়াল কে খায়॥

অর্থহীন পদ, পদগুচ্ছ বাক্যাংশ সহযোগে পাদপূরণ

লোকগীতিব বচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, অনেক সময় অর্থহীন পদ, পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশ দিয়ে পঙ্‌ক্তির পাদপূরণ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় দু'পঙ্‌ক্তির গানের একটি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে অন্য পঙ্‌ক্তিব অর্থেব কোন সামঞ্জস্য থাকে না। কখনো কখনো একটি পুরো পঙ্‌ক্তিই অর্থহীন পদসমষ্টি দিয়ে রচিত হয়ে থাকে। গানে অর্থহীন শব্দ বা পদ কিংবা পদসমষ্টি বা বাক্যাংশের প্রয়োগ থাকলেও অর্থপ্রকাশেব ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা দেখা দেয় না। কারণ লোককবি কখনো ছন্দ রক্ষার জন্য কখনো পরিবেশ রচনার জন্য গানের মধ্যে অর্থহীন পদগুচ্ছের ব্যবহার করলেও তার আসল বক্তব্য একটি পঙ্‌ক্তির মধ্য দিয়েই স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। যেখানে গানের আয়তন দু'পঙ্‌ক্তির সেখানে সাধারণতঃ প্রথম পঙ্‌ক্তিটিই অর্থহীন পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশের

সাহায্যে রচিত হয়ে থাকে। কখনো বা অর্থযুক্ত পদসমষ্টি দিয়ে রচিত দু'টি পঙক্তির মধ্যে অর্থের সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও সংগতি যথেষ্ট দুরান্বয়ী হয়ে পড়ে; তবে সব সময়ই গানের আসল বক্তব্য দ্বিতীয় পঙক্তিতেই বিধৃত থাকে।

২৪-৩০ **অ তর বাড়ি নামর ককশিয়া,** জ্ব'লছে আগুন জল দিয়ে নিম্হা॥ **এলাচলবং পানের খিলি জাঁতিকাটা সুপারী**, চিরক্কালের ভালবাসা আ'জ কেনে মুখ ঘুবালি॥ **অড় ল টড় ল বলি টড় ল পাহাড়ে গ, খিপাল ধপল বাঁশ গড়ে গ।** বাঁশ গড়ে বাঁশ নাই, লিঘাভাঁগা সাজে নাই, পাথবাঘাটিব ফবফন্দি গেল নাই॥ **একটা মাত্র পুঁঠি মাছ মাথায় গুঁজ্যে রা'খব,** শ্বশুবঘরেব কথা গিলা হিয়ায় গাঁথ্যে বা'খব॥ **কার ঘরে ডিঁগা ডিঁগা কার ঘরে ভাল মুরগা, সরপ সরপ,** বাহিব কব আন ত দেখিব, থাড়িকুচা সিকি সের লিব॥ **ধা তিন তিন বার নেতান তিন তের, তুমি নিয়েঁগ সখি হবে আঠার, কি বার সতর॥ বাসি ভাত চেকা চেকা মাছ রে ভাই ভেকা, কি তিনিং ডেগের ডেগা॥**

লোকগীতির প্রকাশভঙ্গিব মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্যগোচর হয়। লোকগীতির সচেতন শ্রোতা, পাঠক বা গবেষকেব দৃষ্টিতে এব বাক্যগঠনেব বিশেষত্বগুলো সহজেই ধরা পড়ে। কখনো দেখা যায়, সমাসবদ্ধ পদের একাংশের অনুল্লেখের ঝোঁক ('আয় রে ময়রা ধর বে

বাক্যগঠনে বিশেষত্ব

ঝাঁজরা দে রে লুচির সব করো, আম্‌দেব টুসু **শ্বশুর যাবে** দে বে লুচিব সব কব্যে। ময়রা সেঁক বে রুটি, আম্‌দের টুসু **শ্বশুর যায়** গুটি গুটি॥') আবার কখনো-বা ষষ্ঠীতৎপুরুষের সমাসবদ্ধতার চেয়ে অলুক রূপেব ব্যবহারের দিকে সবিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় ('তরোয়াল যে ঝিকিমিকি রকতেবি ছুট গ, উপরে উড়িল **রাজার হাঁস**'; নাগপুরে রে বেপারী বলদ ডাললি ভাই, চটকে বিকাল্য **মতির হার**')। সমপবিমিত শব্দযুগ্মে অনুপ্রাসসৃষ্টির ঝোঁক লোকগীতির অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। দু'টি শব্দের অনুপ্রাসের মধ্যে সমতা এতো বেশি পরিমাণে থাকে যে একটি অক্ষর তুলে নিলে বা বদলে নিলে দু'টো পৃথক শব্দ একই শব্দে পরিণত হতে পারে।

৩১-৩৮ আমড়া **আঁঠি** দাঁতন **কাঠি** ঘটি-মাজা পাত্‌খানি, আমরা মায়ের কুলকামিনী আদালতের কি জানি॥ **আলতা** পাতে **চালতা**

পাতে বিনদ পাতে মেল্যেছে, টুসু নকি রাজার বিটি সই পাতাতে আস্যেছে ॥ অহে **কাকা** দে হে **টাকা** কিনব হে ঝুরানিশি, বস্তে বস্তে দাঁত গাবাব হাঁসলে যেমন পাই সিকি ॥ **আদা** বনের **সাদা** কাপড় কষতা ছালে গাবাব, অই কাপড়টি পর্যে আস্তে পাড়ার লককে ঝুরাব ॥ **আয়না** চাই না **পায়না** চাই না চাই হে বঁধু তুমারে, বিদেশ গেলে চাকরী পালে বাঁ'খবে মনে আমারে ।। **ভাদর** মাসের **গাদর** জন্‌হা'র চকলি খাতে ভাল ল, ইঁদ দে'খতে যাবার বেলা ব'লব মনেব কথা ল ।। **আসন** তলে **বাসনকুসন** তরুতলে ঝারি, যার ঘরে সুন্দবী নাবী তার ঘরে যায় চুরি ।॥ **ডুবকা** বনে **ঝুমকা** হারালি, ছুট ননদ ল, গটা বন ঘুবি ঘুবি কষা কেঁদ খাওয়ালি ॥

লোকগীতির বাক্যগঠনে শব্দদ্বিত্ব বা দ্বিরুক্তিব প্রয়োগও প্রচুব পরিমাণে দেখা যায়। এই সব শব্দযুগ্ম কখনো একই শব্দের সমাহারে গড়ে ওঠে, কখনো প্রায় সমধ্বন্যাত্মক দু'টি শব্দের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে গড়ে ওঠে। সব সময়ই যে শব্দযুগলের উভয় পদই সার্থক হয়ে থাকে, তা নয়, বহু ক্ষেত্রে একটি পদ নিতান্তই নিরর্থক হয়ে থাকে, কখনো কখনো ধ্বন্যাত্মক নিরর্থক শব্দযুগলের সার্থক প্রয়োগের ফলে তাব মধ্যে অর্থেব ব্যঞ্জনাও ফুটিয়ে তোলা হয়।

৩৯-৪৪ **বাজারে বাজারে** যাব কন্ বাজাবে পান পাব, যন্ বাজারে পান পাব ল সে বাজারে লুট লিব ।। **সড়পে সড়পে** যাব কন্ সড়পে ডাঁড়াব, যাব দে'খব বাঁকা সীঁতা তাব সঁগে ফুল পাতাব ।। শালুক নাড়ার ঘর তুল্যেছি **হেঁকেল পেঁকেল** কবে গ, কা'ল আস্যেছি পরের বিটি পাছে জাঁকাঁই মরে ।। ঘরেব শভা **আঁচির পাঁচির** লহার বাসঘর, বাসঘবে চাভি দিয়েঁ গেছে বাপের ঘর ॥ **ঝাঁগাল ঝুঁগুল** ভাতুয়াটি **খিচাং খাচাং** চলে, গলা ঘরে সারা দিন ফির-ফিরায়েঁ চলে ॥ **আদল বাদল** ক'রল এক চিড়াক বোদ দিল, ঝিঁগা ফুল, ঝিঁগা ফুল শুকিল রে ।।

লোকগীতির বাগভঙ্গিতে ধ্বনিসমতাও সবিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। স্বভাবতঃই অনুপ্রাসবহুল গান, পঙক্তি বা বাক্যাংশের প্রয়োগ যত্রতত্র সর্বত্রই লক্ষ্যগোচর হয়। ধ্বনিসামঞ্জস্যেব প্রতি লোকমানসের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে; তাই প্রয়োজনে তো বটেই, অপ্রয়োজনেও সমধ্বনির শব্দ-

প্রয়োগের জন্য লোকগীতির রচয়িতারা যেন একটু বেশিই প্রলুব্ধ হয়ে থাকে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে ধ্বনিসমতাই কবিতা বা গানের সৌন্দর্যকে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। লোকগীতিতে এর বহুল প্রয়োগ লোকগীতিকে শুধু সৌন্দর্যমণ্ডিতই করে না, সহজ স্বাভাবিক সাংগীতিক ধ্বনিসৃষ্টিতেও সাহায্য করে। অবশ্য এই অনুপ্রাসসৃষ্টি বা ধ্বনিসমতা কোন অলংকারশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্যের ফল নয়; কণ্ঠে সংগীত যেমন আপনা থেকে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, সম্ভবতঃ লোককবিদের মুখেও তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই সুষম ধ্বনি বা অনুপ্রাস বণিত হয়ে ওঠে।

8৫-৫১ একশ টাকার গাছ কা'টলম ঠেক চালাবার হুড়বড়ি, ইঁট পড়াবার তরস্তরি কবকটায় পিটন দিলি ।। চা'ব চালা চণ্ডীমেলা বাসফুলের বিছনা, ঝিঁঝির কাটো জল সামালা ভিজ্‌ল টুসুব বিছনা ।। অ মা অ মা ফুল করিব ফুলকে আমার কি দিব, আমার ফুলের চু'ল বাড়ে না ফুলকে ফুলাম তেল দিব ।। বই লিলম শেলেট লিলম চ'ললম আমরা ইস্কুলে, সুরু হাতে সুরু শাঁকা সুরু মুখে ঘাম ঝরে। আমবা করি মানা, রোদ মুহানায় যা'সনা ইস্কুল মেলা ।। কুল্‌হি কুল্‌হি যাতেছিলি ধুলা দিল, ধুলা লহে গ কুলে কালি দিল ।। যখন ছিলি গাডার গুড়ুর তখন মারি তিতির গুঁড়ুর, এবার দাদা হয়েঁছি ডাগর, কাঁশির কাঁড়ে বিঁধব ঘাগর ।। লাল ঘড়ার লাল ছাতা মঙ্গল-মারীর ছুঁড়ীর খাতা, ছুঁড়ীর খাতায় না মানে সবুব ল, মাথা বাঁধায় বা'জছে ঘুঁগুর ।।

লোকগীতির গঠনরীতিতে প্রশ্নোত্তর বা উক্তি-প্রত্যুক্তিরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সব গানে এর প্রয়োগ না থাকলেও আচারধর্মী জাওয়া গীত আহীরা গান এবং বিয়ের গানে উক্তি-প্রত্যুক্তির ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্যগোচর হয়। এ ছাড়া সাথী গানে, করম নাচের গানেও এর ব্যবহার অপ্রতুল নয়। লোকগীতির রূপ ও রীতির ক্ষেত্রে এটি যে একটি অপরিহার্য উপকরণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্নোত্তর, উক্তি-প্রত্যুক্তি

৫২-৫৫ 'কন্ পরবে দাদা আনবে লেগবে রে, কন্ পরবে দাদা করবে বিদায়?' 'করম পরবে বহিন আনব লেগব রে, জিতিয়া পরবে বহিন করব বিদায়'। কিয়া খাওয়াবে দাদা কিয়া পিঁধাইবে রে, কিয়া দিয়েঁ গ

দাদা করবে বিদায় ?' 'ভাত খাওয়াব বহিন লুঁগা পিঁধাইব রে, ডম ঘরের ডালা দিয়েঁ করব বিদায়' ।। 'মহমহ সাবন বালা শিঁশিভরা তেল, বালা চল্যে যাও ন যমুনা সিনাতে। সিনান কর্যে আলে বালা নাহান কর্যে আলে, বালা পবের ঝিকে ভুলায়েঁ আনিলে' 'ভুলায়েঁ নাই আনি মা গ ডাকিয়েঁ নাই আনি গ, মা গ রূপ দেখ্যে গডায়েঁ আসিল।' 'গড়াঁই আলে ভাল ক'বলে দুয়াবে ডাঁঢ়ালে, ধনি দশ কুটুমের মান সম্মান রাখিবে, তবে ধনি হবে শিরোমণি ॥' 'কন কা পাত ভালা উলটি পালটি রে কন পাত বডই গম্ভীর, কন কা পাত ভালা প্রতি সেবাই লাগে কন পাত ঝাঁকে বে তবা'ল ?' 'জ'ড যে পাত ভালা উলটি পালটি রে বড্ পাত বডই রে গম্ভীর, তুলসী কা পাত ভালা প্রতি সেবাই লাগে বে আ"থ পাতে ঝাঁকে রে তরা'ল ॥' 'তুমি যে যাবে বাবু পুরুলিয়া দেশ, বাবু, ঘরে খরচ দিয়েঁ যাও।' 'পুডায যে আছে ভাউজী সুরু গেঁতই চা"ল, ভাউজী, হাঁড়ি-এ আছে বিরহিব ডা'ল। বাক্সায় যে আছে ভাউজী শায়া শেমিজ শাডি, ভাউজী, সুটকেসে আছে ফুলাম তেল ॥'

কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে সাদৃশ্যের বিচাবে সেগুলোকে একটি গানের মধ্যে মালার মতো গ্রথিত করবার ঝোঁক লোকগীতিতে দেখা যায়। বিভিন্ন বস্তু বা ভাবেব মধে সমতা, তুল্যতা বা সাদৃশ্য খুঁজে বের করে অজস্র গান এবং প্রবাদেব মধ্যে সেগুলোকে বিধৃত করা হয়েছে। লোকসাহিত্যের রূপ ও রীতিব উপকরণ হিসাবে সাদৃশ্যেব ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক বস্তু বা ভাবেব মধ্যে যে মুহূর্তে এই সাদৃশ্যের যোগসূত্রটি স্থাপন করা হয়, তখনই তা লোকমানসে আবিষ্কাবের একটি দুর্লভ রসাস্বাদ বহন করে নিয়ে আসে। সব সাদৃশ্য কল্পনাই যে সোনায় সোহাগাব মতো হয়, তা নয়, তবে কোথাও একেবারে কষ্টকল্পিত দূরান্বয়ী সাদৃশ্যের প্রয়োগ করা হয় না। অন্য ভাষাসংস্কৃতির লোকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব সাদৃশ্যের ব্যবহার বেশ কৌতুককর মনে হতে পারে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ঝাডখণ্ডী লোককবিরা নিতান্ত সরল মানসবৃত্তির অধিকারী হলেও সাদৃশ্যের যোগসূত্র রচনায় যথেষ্ট বুদ্ধিপ্রৌঢ়তাব পরিচয় দিয়েছে।

সাদৃশ্য

৫৬-৬৩ অযধ্যাতে রাম রাজা লঙ্কাতে রাবণ, গকুলে গবিন্দ রাজা সাজ্যেছে

কেমন ॥ গঠের মধ্যে গাই ভাল ধবলী শামলী, গড়ের মধ্যে রাজা ভাল শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥ ঘবের বাদী ননদী বাহিরের বাদী পর, যমুনা ঘাটের বাদী শাম নটবর ॥ বাসিভাতে নুন মিঠা পানের মিঠা চূণ, শিশুকালে পিরিত মিঠা যৌবন যতদিন ॥ পিঠার মজা দুধ চিনি পানের মজা চূণ, পিরিতি ক'ববার মজা যৌবন যতদিন ॥ মুড়ির মজা কাঁচালঙ্কা মুচির মজা তরকারি, নইতন পিবিতিব মজা চ'খ ঠারাঠারি ॥ শাম আমার আটাপাটা শাম আমাব মাথাব কাঁটা শামকে মাথায় গুঁজ্যে রা'খব, চাভিথাডি আঁচলে দলাব ॥ বঁধু আমার পিয় সখা বঁধু আমার মাথার ফিতা, গ সজনি, বঁধু আমার আয়না চিরুনি ॥

লোকগীতিব আর একটি বিশিষ্ট রীতি হল সাঙ্কেতিকতা। সাঙ্কেতিকতা রহস্যেব গভীরতা সৃষ্টিতে যেমন সহায়তা করে, তেমনি রসোপলব্ধিকে আরো বেশি ঘন ও নিবিড় কবে তোলে। যখনই কোন বিষয় বা ভাব সরাসরি প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে কোন বাধা বা দ্বিধা বা শালীনতার প্রশ্ন দেখা দেয়, তখনই তা ইশারা-ইঙ্গিত বা সঙ্কেতের কিংবা রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করবার ঝোঁক দেখা দেয়। আবার অনেক সময় বস্তু বা ভাবের প্রতীক হিসাবে অন্য কোন বস্তুর উল্লেখ করে দু'টি বস্তুর মধ্যে গভীর সামঞ্জস্যের উপলব্ধির দ্যোতনা ফুটিয়ে তোলা হয়। কখনো কখনো এই প্রতীকের ব্যবহার এতোই সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে তা আমাদেব চেতনার মধ্যে এক রহস্যময় উপলব্ধিব অধরা ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলে। ব্যঞ্জনা যখন বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে চেতনার মধ্যে এক রসমধুব অনুরণন সৃষ্টি করে, তখনই সাঙ্কেতিকতা সার্থক হয়ে ওঠে। লোকগীতিতে ব্যবহৃত রূপক এবং প্রতীক একান্তভাবে লোকমানসের উপযোগী; সূক্ষ্মতার পরিবর্তে স্থূল-বস্তুর প্রাধান্য থাকলেও সূক্ষ্মরসের ব্যঞ্জনা একেবারে অনুপস্থিত থাকে না। জনৈক বিশিষ্ট লোকশ্রুতিবিদ্ পণ্ডিত মনে করেন, রূপকের ব্যবহার একটি উচ্চতর শিল্পবোধ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, সহজ এবং সরল জীবনের মধ্য থেকে এর প্রেরণা নাকি আসতে পারে না, কারণ নিরক্ষর সমাজে অনুভূতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তিই স্বাভাবিক; অপ্রত্যক্ষ রূপায়ণ একান্ত স্বাভাবিক হয় না। বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর এই মত সত্য হতে পারে কিন্তু ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর মত একেবারেই গ্রহণযোগ্য

সাঙ্কেতিকতা

নয়। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। সাধারণতঃ প্রেমসম্পর্কিত, বিশেষভাবে দৈহিক প্রেমসম্পর্কিত, গানেই সাঙ্কেতিকতার ভূরিপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

৬৪-৭৬ আম গাছে আম বকুল দেখ্যে গেল ভমর বিদেশে, আম পাক্যে আম পড়্যে গেল তবু ভমর আল্য না॥ ইতুটুকু মরিচ গাছে কতই জল ঢা'লব, মাব ন দিদি তাহেই বাল ধুবেই সাঁগা ক'রব॥ কুল্হি কুল্হি যা'হনা ছাঁইরা পাঁয়ে বস্য না, ছাঁইরা পাঁয়ে পিরিত মনে কব্য না, ই জীবনে আর হবে না॥ ফুল গাছটি লাগাঁই ছিলি ধূলামাটি দিয়েঁ, সে ফুল ফুটিয়েঁ গেল সংসার জুড়িয়েঁ॥ ছানার মা খাল্য ঝিঁগা ছানা হল্য তিরিং রিঁগা ছানার মাকে পিঁড্হায় শুতে মানা, নেজকাটা লাকড়াটি করে আনাগনা॥ শালুক ফুলটি ভাল ছিল পরের কথায় চলেঁ গেল, দেশে দেশে করে অপমান, আ'জ ফুলকে ধরেঁ আন, আ'জ ফুলের বধিব পরাণ॥ চৈত বৈশাখ মাসে কাঁচা বাঁশে ভমর বসে, ভাব্যে দেখ এ ভব সংসারে, আর কি রহিবে বাপ ঘরে॥ কাঁচা কদমের কলি ধনি বসের শিঙ্গারে, ভাব কর হে বঁধু মধু জম্যেছে ভাণ্ডারে॥ কঁচি কদমের কলি ফুল ফু'টতে নাইখ দেবি, অ তুমার পায়ে ধরি, যা'হ নাই শাম আস্থ ঘুরি॥ ছারপকা বড় বকা দিনের বেলা ঘুমায় একা রা'ত হলে খুনুস খুজ্যে পায়, দাদা হে, সারা রা'ত ঘুমাতে দেয় নাই॥ আমার বঁধুর বাড়ি-এ বারমাস্যা বে'ল, সেহ বে'ল খাঁয়ে বঁধু বুকে মারে শে'ল॥ ই ঘর খুজি সে ঘর খুজি পাই না থকীকে, কাদের ঘরে যাঁয়ে কর্য়ে হাঁড়্যা পাকাছে॥ তর কাপড়ের পা'ড় ভাল ল, তার কাপড়ে জড়া পান খিলি॥

রসসৃষ্টির জন্য ছন্দোবদ্ধ সাহিত্য-উপকরণের পক্ষে উপমা-অলংকারের প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য, লোকগীতির ক্ষেত্রে উপমা-অলংকার ঠিক ততোখানি অপরিহার্য না হলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কাব্যসাহিত্যে উপমা-অলংকারের যেমন সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, লোকগীতিতে তেমন উজ্জ্বল শাণিত উপমা-অলংকারের প্রয়োগ বড়ো একটা দেখা যায় না। তবে লোককবিরা যেসব উপমা-অলংকার ব্যবহার করে তা কথনোই উদ্ভট নয়, বরং প্রায় সময়ই সেগুলো অত্যন্ত

উপমা-অলংকার

সহজ সবল, মৌলিক এবং হৃদয়সংবেদী। পবিদৃশ্যমান পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে আহৃত সাদামাটা উপমাব মধ্যেও লোকজীবনেব বিচিত্র অভিজ্ঞতার দর্শনলাভ ঘটে। উপমা অলংকাব রসসৃষ্টিতে সাহায্য কবে মাত্র, উপমা-অলংকাব বস নয়; তাই বসসৃষ্টিব জন্য এগুলো অপরিহার্য এ কথা বলা চলে না। আমরা ইতিপূর্বে অনুপ্রাসের প্রয়োগ সবিস্তাবে দেখিযেছি। এখানে কয়েকটি উপমা অলংকারেব প্রয়োগ দেখানো হল।

৭৭-৯০ উপব কাল ভিতর কাল সর্বাঙ্গ কালয় ভবা, টাটকা ফুলেব মধু খায়ে কয়লাব মতন চেহাবা॥ কি ব'লব কপেব বর্ণিমা অমাবস্যাব বাত্রিসমা, কবা যায় না কল্পনা নাই তুলনা এমন, বলি অ ধন কাল জাম পাকাব মতন, মচকে কমব ভাবি লচকে যৌবন। কাল মেঘেব মতন চুল খঁপাব উপব কাঁশি ফুল, কানে দুলে সনাব দুল পায়ে নূপুব ঝমঝম॥ তুমি কঁচি আমেব মুকুল আমি কোকিল বেযাকুল, মুকুলের বসে আকুল তোমাব ধেয়ানে, কেবল ভালাভালি করে না মিটে পিযাসা নৌতন যৌবনে॥ ফুলাম শাড়িব নীল আঁচলে বুনপুকিব আল' জ্বলে, সে আলব তেজে ধনি আমার নয়ন ঝলসিল, কপালে সিঁদুবের টিপ আমাব মনে জ্বালে প্রদীপ, কাজল কাল চ'খে তুমার বিজলি চমকিল॥ আম পাকাব মতন বং দেখিলে জুড়ায় জীবন, জাম পাকাব মত কাল চুলে শ্রাবণের ঘটা, অ তব সীঁতার সিঁদুব চমকে গ যেমন বিজলিব ছটা। কাজল কাল আল' করা নয়নে জ্বলিছে তাবা, যৌবন সবোবব মাঝে ফুল ফুটেছে দুটা॥ এই ত বছর ষোল যৌবন আমাব ঝলমল, চঞ্চল কব না ভাই ভমরা, পিরিতি কাঁঠা'লের লাঠা ছাড়িলে না ছাড়ে লেঠা লাগে অসঠা আঁখিঠারা॥ যেমন পুন্নিমা চাঁদেব আল, কিন্তু কাল বাধিকা ভাল॥ পস্তু কাঁদে গোল আলুব তবে, আমাব মন কাঁদে শ্বশুর ঘরে॥ ভাই ভাল ত ভাউজে গা'ল দিছে, যেমন শুকনা কাঠে জ্বা'ল দিছে॥ তরা যতই সাজা, তদের টুসুর চ'খ দুটা পিয়াজ ভাজা॥ যেমন গবম খলায় খই ফুটে, তেমনি শ্যামের গা জ্বল্যে উঠে॥ যেমন ডিংলা ভিতর ফরা, তদেব মিছাই হে ভাব করা॥ শিশিবে ত চিড়া ভিজে না, তর ঢং দেখ্যে মন মজে না॥ টুসুর গানে এম্‌নি ভাব আছে, যেমন ভরা নদী ঢেউ দিছে॥

সবশেষে ছন্দ-প্রসঙ্গ। একেবারে আদিকালে ছন্দের দোলা বা স্পন্দন সম্পর্কে আদিম মানুষের খুব একটা সুস্পষ্ট ধারণা না-থাকাটাই স্বাভাবিক।

ছন্দ

তখন ভাঙা-ভাঙা ছন্দে অথবা নিছক গদ্যরীতিতে লোকগীতি রচিত হয়ে-থাকা অস্বাভাবিক নয়, ছন্দের অভাব তারা সুরের সাহায্যে সম্ভবতঃ পূরণ করত; কখনো বিলম্বিত, কখনো দ্রুত লয়ের সুরের সাহায্যে পদসমূহ বা বাক্যাংশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হত। তখন সবাসবি মুখের ভাষাকেই গানের ভাষায় রূপান্তরিত করা হত বলে মনে হয়। লোকগীতিতে কথাবস্তু নিতান্ত অবহেলার না হলেও সুরেব ভূমিকা নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতম ছিল। পববর্তীকালে কল্পনাশক্তির বিকাশের ফলে এবং কাব্যভাবনা ও সৌন্দযভাবনা দানা বেঁধে উঠলে লোকগীতির মধ্যে কথাবস্তুর প্রাধান্যও স্বীকৃত হতে থাকে। তখন শব্দনির্বাচনে, শব্দেব ব্যঞ্জনা-আবিষ্কারে লোককবিদের যত্নবান হতে হয়েছিল, সন্দেহ নেই। অই সময়ই লোকগীতিতে ছন্দ অপবিহায বলে বিবেচিত হতে থাকে। একেবারে আদিকালের লোকগীতির নিদর্শন বর্তমানে দুর্লভ হলেও বিরল নয়। এই ধরনের দু,একটি গান উদ্ধৃত কবা হল; সবাসবি মুখেব ভাষার ব্যবহার এবং ভাঙাভাঙা ছন্দ সহজেই আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে।

৯১-৯২ চলিতে বুলিতে ধনি ঢল্যে পড়ে, | চলিতে বুলিতে ধনি ঘুমাই পড়ে, | উঠ ধনি বর আল্য গ। কেনে মা গ কাঁচা ঘুমে উঠালি, | মোর জঁথের বর লহে গ।। বালা আল্য গেলিয়েঁ | বালার মা গ ধুলায় ধুসুরে। বালার লাগি বাহিব কর, | বালার মা গ আতর গলাপ তেল, | বালার মা গ মহমহ তেল।।

ক্রমশঃ ছন্দ যখন লোককবিব অধিগত হল, তখন শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দই সে সর্বপ্রথম আয়ত্ত করতে পেরেছিল বলে মনে হয়। দুই-তৃতীয়াংশের মতো লোকগীতি শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে রচিত হয়েছে। পর্ব, চরণ বা পঙ্‌ক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর গানে বিভিন্ন ধরনের স্তবক ব্যবহার করা হয়েছে, একই শ্রেণীর গানের মধ্যেও স্তবক-সজ্জায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই সব গানে প্রায় সর্বত্রই শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের ব্যবহাব আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। জাওয়াগীত, টুসুগীত, ছড়া ইত্যাদি শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দেই রচিত হয়েছে। করম নাচের গান, ছো নাচের গান ইত্যাদিতে প্রধানতঃ শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের ব্যবহার

করা হয়ে থাকলেও তানপ্রধান ছন্দও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পর্ববিশ্লেষণ করে সবিস্তারে আলোচনা করার অবকাশ এখানে অত্যন্ত কম। তাই আমরা বিভিন্ন ছন্দে রচিত গানের উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হব। গানগুলো লক্ষ্য করে দেখলেই বোঝা যাবে প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতেই চার মাত্রার চারটি করে পর্ব আছে, কোন কোন গানের শেষ পর্বটি অপূর্ণ।

৯৩ যন বনে | যন বনে | পিঁপড়া না | চলে গ
সেহ বনে | ভাই চলি | যায়।
ফির ফির | ফির ভাই | লিহ ঝারি | পানী রে
থাঁয়ে লিহ | দহি দুধ | ভাত ।। (জাওয়া গীত)

৯৪ আর্‌শি চুড়ি | ফার্‌সি চুড়ি | প'রবার বড় | মন ছিল,
কালিমাটি | ইস্টিশেনে | বস্যে সারা | রা'ত গেল ।।

৯৫ আঁচিরে ধান | পাঁচিরে ধান | ধান খাল্য | হাঁসে,
হাঁসের বাগাল | হাঁস ঘুবায় নাই | কিয়া কেত্‌কীর | বাসে ।।(টুসু গীত)

৯৬ সাঁজের বেলা | কুল্‌হি বুলা | ঘামে সর | বর।
এমন বল্যে | কে জানে ভাই | সামনে শ্বশুর | ঘর ।। (ছো নাচের গান)

৯৭ খড়গ্‌পুরে | বা'জল বাঁশি | মেদিন্‌পুরে | শুন্যেছি,
আর বাজ্য না | শামের বাঁশি | ধুলায় লুট্যে | কাঁদ্যেছি ।।
(নাচনী ঝুমুরের রং)

৯৮ টেংরা হাটের | মিঠাই খালা | ধর ব'লতে | পর্যেছি,
ছাড়ালে কি | ছাড়া যায় গ | শিশুকালের | পিরিতি ।।

৯৯ আমার বঁধুয | কাঠ কাটে | গটা বনের | সলগন,
আস্য বঁধু | খাতে দিব | চুল্‌হার আগুন | সলগন ।। (করম নাচের গান)

১০০ ধুর দেশের | শশুরাল বালা | পায়ে লাগে | ধুলা,
ধুর দেশের | শশুরাল বালা | গায়ে লাগে | খরা।
শ্বশুরকে যে | মা'গবে বালা | পায়ে জঁখা | জুতা।
শ্বশুরকে যে | মা'গবে বালা | হাতে জঁখা | ছাতা ।। (বিয়ের গান)

১০১ মাথা বাঁধ্যে | ফুল পর্যেছি | তদের গেল | কি,
তদের পাড়া | যাই না বল্যে | রিষাঁই মর | কি ।। (ছড়া)

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের পাশাপাশি ধীরে ধীরে তানপ্রধান ছন্দ জেগে উঠেছে। প্রথমে পয়ারের ভঙ্গিটি ফুটে ওঠে; পাকাপোক্ত নিয়মে চৌদ্দ

অক্ষরের বাঁধনে পয়ার বাঁধা পড়বার আগে কখনো কম কখনো বেশি অক্ষরে রচিত হয়েছে। কোন কোন স্থলে তানপ্রধান ছন্দে রচিত পয়ারের অংশবিশেষে শ্বাসাঘাতের সুস্পষ্ট আভাস মেলে।

১০২ আঁগনী ঝাট্যাতে ভালা বাঢ়নী খিয়াল্য
শাশুড়ী ননদী দিল গা'ল,
না শাসু গা'ল দিহ না শাসু মা'র্য গ
নেহর গেলে আ'নব বাঢ়নী ॥ (জাওয়া গীত)

১০৩ এক তাঁতি হরবর তিন তাঁতি জড,
বুনিতে টানিতে তাঁতি ঘামে সরবর ॥ (বিয়ের গান)

১০৪ একটা ফুলের জন্য হলি অপমান,
দুয়ারে লাগাঁই দিব ফুলেরি বাগান ॥

১০৫ কুল্‌হি কুল্‌হি বুলে নটবর,
বহুত আনন্দে বেহাঘর ॥ (করম নাচের গান)

পয়ারের ছয়, আট, দশ অক্ষরের পর্ববিভাগ সম্পর্কে সচেতন হবার পরই সম্ভবতঃ লোককবিরা ত্রিপদীর ব্যবহার করতে শুরু করে। বলাবাহুল্য, তানপ্রধান ছন্দ হলেও ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে যে ত্রিপদীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা পয়ারের মতোই স্থানে স্থানে শ্বাসাঘাতের স্বাক্ষর বহন করে। গায়নরীতির প্রতি আনুগত্যের ফলে সম্-এর প্রয়োজনে পঙ্‌ক্তির মধ্যস্থলে বিরতির জন্য যতিপাত করা হয়ে থাকে প্রায় গানেই। সাধারণতঃ ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে দীর্ঘ ত্রিপদীরই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, লঘু ত্রিপদীর প্রয়োগ লোকায়ত গানে বিরলদর্শন বললেও ভুল বলা হয় না। তবে আহীরা গানে একটি বিচিত্র ত্রিপদীর ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যার প্রথম দু'টি পদ ছয় অক্ষরের কিন্তু শেষ পদটি দশ অক্ষরের ; ফলে এটিকে লঘু, ললিত বা দীর্ঘ কোন ধরনের ত্রিপদী হিসাবেই সনাক্ত করা যায় না, এটিকে মিশ্র ত্রিপদী বলা যেতে পারে।

১০৬ ধলভুঁই-এর ধব ছাতা | বরাহভুঁই-এর ছঁড়ী খাতা
ভেলের ভেল্, মাথা বাঁধিতেই দিন গেল্ ॥

১০৭ যমুনার জল কাল | সে জলে সিনাতে ভাল
মাজিতে ঘঁষিতে বেলা গেল,
কদমতলায় কে আছে ভাই বল ॥

১০৮ ছুটুমুটু ডিহালি | কেনে ল তুঁই বিহালি
জুনার লেট খাঁয়ে তুঁই | কেনে এত শুখালি ॥ (করম নাচের গান)

১০৯ কাকে সাজে ভালা | ঠেঁগা বল ছাতা | কাকেউ ত সাজে জামাজড়া,
কাকেউ ত সাজে | হল'দলুঁগা ঠেঁটি | আব সাজে টিকলি সিঁদুর।
বাগালকে সাজে | ঠেঁগা বল ছাতা | গলাকে ত সাজে জামাজড়া,
গুলিনকে ত সাজে | হল'দলুঁগা ঠেঁটি | আর সাজে টিকলি সিঁদুর ॥
(আহীবা গান)

পঞ্চম পর্ব

বিষয়বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন

লোকসাহিত্যের মধ্যে নাগরিক সাহিত্য বা শিল্পসাহিত্যের মতো সাহিত্য-গুণ প্রত্যাশা করা সংগত নয়। শিল্পসাহিত্য সচেতন সৃষ্টির ফসল; সাহিত্যিকের সম্মুখে শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন আদর্শ এবং তত্ত্ব তর্জনী উদ্যত করে দাঁড়িয়ে থাকে, সাহিত্যিক তাই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত মূল্যমান এবং রীতিরেওয়াজকে সর্বান্তঃকরণে পালন না করে পারেন না। নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করতে হলে তাঁকে সচেতন ভাবে যুক্তিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবসাম্য স্থির রেখে তত্ত্বের রূপরেখা অঙ্কন করতে হয়। শিল্পসাহিত্যের মৌল বৈশিষ্ট্যই হল এর মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত সচেতন সাহিত্যিকের স্বরূপের পরিপূর্ণ প্রতিফলন। সচেতনতাই শিল্পসাহিত্যের সার্থক সৃষ্টির প্রধানতম গুণ হলেও লোকসাহিত্যের পক্ষে এই সচেতনতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। লোকসাহিত্য কখনই সচেতনভাবে সৃষ্ট হয় না। লোকসাহিত্যের সম্মুখে কোন নন্দনতত্ত্বের আদর্শ থাকে না, কোন অলংকারশাস্ত্রের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ থাকে না। লোকসাহিত্য লোকমানসের নিরাবরণ এবং নিরাভরণ রূপের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। কোন তত্ত্ব বা শাস্ত্রের প্রতি জবাবদিহি করবার দায়দায়িত্ব থাকে না বলে লোকসাহিত্য সহজতম ভাষায় মানবসমাজের খাঁটি চারিত্রধর্মকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। জীবনের সব রকম আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনার কথা অকৃত্রিম ভাষায় লোকসাহিত্যে প্রকাশ লাভের সুযোগ পায়। সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ হল জীবনধর্মিতা। সাহিত্য জীবনরসের কারবার করে। জীবনরস শুধু যে শিল্পসাহিত্যেই লভ্য তা নয়, লোকসাহিত্যেও তার প্রাচুর্য অপরিসীম; বলা যেতে পারে, লোকসাহিত্যে শুধুমাত্র জীবনের কথাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। লোকসাহিত্যে কল্পনাপ্রবণতা বা সৌন্দর্যবিলাসিতা বিরলদর্শন বললেও চলে। অন্ততঃ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে এ সবের দর্শন কচিৎ কদাচিৎ মেলে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রসাধন ছাড়াও যেমন নয়নতৃপ্তিকর এবং রম্য হয়ে থাকে, ঝাড়খণ্ডের

শিল্পসাহিত্য ও লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যেও তেমনি এক ধরনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখা যায় যা উগ্র প্রসাধনে অভ্যস্তদের হৃদয়গ্রাহী না হলেও সৌন্দর্যের স্বাভাবিকতায় বিশ্বাসী-দের আনন্দদানে সমর্থ হয়। তবে উত্তাল, টগবগে, উষ্ণ প্রাণময়তায় ভরা জীবন ঝাড়খণ্ডের যে-কোন গানের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর গানের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জীবনধর্মিতার বিশিষ্ট দিক-গুলো দেখাবার চেষ্টা করেছি। লোকসাহিত্যের মধ্যে বাস্তবতা, প্রত্যক্ষতা, ঋজুতা ইত্যাদি গুণগুলো যতোখানি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ লাভ করে, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। আমরা ইতিপূর্বে ভূরি ভূরি উদাহরণের সাহায্যে এগুলোও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি।

শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের আরো একটি দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। শিল্পসাহিত্য লিখিত সাহিত্য, সুতরাং তার পরিবর্তিত হবার কোন অবকাশ থাকে না; ফলে যুগের পরিবর্তন এবং ভাষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসাহিত্য প্রাচীনত্ব লাভ করতে বাধ্য। কিন্তু যেহেতু লোকসাহিত্য অলিখিত সাহিত্য, তাই এর পরিবর্তিত হবার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর অংশবিশেষ পরিবর্তিত হয়ে যুগোপযোগী রূপ লাভ করে, ভাষা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে যুগোপযোগী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে চলে। লোকসাহিত্য তাই চিরপুরাতন হয়েও চিরনূতন। অন্যদিকে শিল্পসাহিত্যের ভাববস্তু চিরনূতন হলেও তা কালক্রমে পুরাতন হয়ে পড়ে। শিল্পসাহিত্যে যেমন জীবনের সামগ্রিকতা প্রতিফলিত হয়ে থাকে, লোক সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। পারিপার্শ্বিক জগৎ এবং জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না, তা সে শিল্পসাহিত্য হোক কিংবা লোকসাহিত্য, সর্বত্রই জগৎ এবং জীবন অনুপ্রবেশ করে থাকে। জগৎ এবং জীবন লোক-অভিজ্ঞতায় বিচিত্র রূপে ধরা পড়ে। প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায়ের কথা, তাদের ধর্ম, সমাজ ও জীবনের কথা, তাদের প্রভাব ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসাহিত্যের মধ্যে ধরা পড়ে, ফলে লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পায়। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে অন্যান্য উচ্চতর সম্প্রদায়ের লোকের ধর্ম সমাজ ও জীবনের কথা এবং তাদের প্রভাব কি ভাবে পড়েছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব লোকসাহিত্য এবং জীবনে সমান-ভাবে পড়েছে। সংস্কৃতি-সমন্বয় সর্বাংশে সাধিত না হলেও ভাসা-ভাসা প্রভাব থেকে ঝাড়খণ্ডের লোকজীবন এবং সাহিত্য মুক্ত থাকতে পারেনি।

কতো বিচিত্র বিষয়বস্তু যে ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার সীমা-পরিসীমা নেই। আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপকরণের ওপর আলোকপাত করেছি। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বিষয়বৈচিত্র্যই ঝাড়খণ্ডের লোক-সাহিত্যের রসবৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। শিল্পসাহিত্যের মূল্যমানের নিরীখে এতদঞ্চলের লোকসাহিত্যে কবিত্বের ঘাটতি আছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ঘাটতি জীবনপাত্রের উছলে-পড়া রসে যে পূরণ হয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। যে জীবনধর্মিতা সাহিত্যের প্রধানতম গুণ, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে তা ভূরি পরিমাণেই পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তু

আমরা এখানে ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের বিচিত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে যে-কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখব, সেগুলো হল : রঙ্গব্যঙ্গ, বিস্ময় ও হাস্যরস, সামাজিক ঘটনায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ, আধুনিক সমাজসভ্যতা (যন্ত্র সভ্যতা), সাময়িক ঘটনাপ্রবাহ, ইতিহাসচেতনা, রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এবং রামায়ণ-প্রসঙ্গ।

যে কোন ধরনের বিকৃতিই হাস্যের উৎপত্তির কারণ হতে পারে। সাধারণ আকৃতি প্রকৃতি আমাদের হাস্যোদ্রেক করে না, কিন্তু আকৃতির মধ্যে যৎসামান্য বিকৃতি দেখলেই আমরা হাস্যোদ্বেল হয়ে উঠি। শুধু আকৃতিগত বিকৃতিই নয়, আচারব্যবহারে, লোকচরিত্রে, স্বভাবগুণে যে কোন রকম বিকৃতি ঘটলেও তা প্রচুর পরিমাণে হাস্যরসের জোগান দেয়। গভীর জীবনদৃষ্টি, বস্তুদৃষ্টি, লোকচরিত্র সম্পর্কে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ইত্যাদি গুণ থাকলে তবেই হাস্যরসদৃষ্টি লাভ করা যায়। লোককবিদের মধ্যে এই রসদৃষ্টির যে অভাব ছিল না, তা ভূরি ভূরি লোকগীতি থেকে সপ্রমাণ হয়। রঙ্গব্যঙ্গ কৌতুক বিস্ময়কর ঘটনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে হাস্যরস উজ্জ্বল রৌদ্রধারার মতো আমাদের স্নাত করে তোলে। কখনো- বা শৃঙ্গাররসের সঙ্গে হাস্যরস মিলেমিশে এক অভাবিত-পূর্ব অনাস্বাদিত রস-অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। ব্যঙ্গের সাহায্যেও যে নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি সম্ভব ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যে তারও নিদর্শন মেলে। তাছাড়া অনেক সময় রূপকের সাহায্যেও রঙ্গরসের সৃষ্টি করা হয়। জীবজন্তু পশুপাখি সম্পর্কিত বহু গানে তাদের চারিত্রধর্মের বিকৃতি দেখানো হয়; সাধারণতঃ এই সব গানে দেখা যায় যে, পশুপাখিরা মানুষের মতোই আচরণ করছে, যা তাদের

রঙ্গব্যঙ্গ, বিস্ময় ও হাস্যরস

চারিত্রধর্মের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়, ফলে রঙ্গরসের সংমিশ্রণে হাস্যরসের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে; এই সব গানে বিস্ময় বহু ক্ষেত্রে fantasy-র দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। রঙ্গব্যঙ্গ-কৌতুক-বিস্ময়-fantasy-সম্পৃক্ত হাস্যরসোজ্জ্বল কয়েকটি গান নিচে উদ্ধৃত করা হল।

১-১৫ গপালপুরে দেখ্যে আল্যম বড তলে সুরকির ঘানি, এমন সাহেব কল কর‍্যেছে আমলারা টানে ঘানি ॥ চাঁশ মাছির গাজনা লাল গামছার বিছনা, দিব বল্যে দিলি না আমার কি দিন গেল না ॥ পুঁঠি মাছ গীত গায় শোল মাছ সেরেঞ বাজায়, মামা কাঁদে গ, মামী-এ ভিমু বাঁধি খায় ॥ শিয়াল করে হুয়া হুয়া কুকুর বলে কন শালা, এসা দেদা দে'দব শিয়াল উগাল গাচ এ''লতলা ॥ ডাঁড়কা মাছ ডভা ঝিঁটে শিয়ালে গাহে গান, লবংলতা হে, শিয়ালের লেজ কেনে বাঁকা ॥ ডাঁড়কা মাছে ডাঁড়ি ধরে পুঁঠি মাছে গীত গাহে শোল মাছে খঞ্জরী বাজায়, রে ভাবতভাই, উড়াকলে মুল্লুক বেড়ায় ॥ বঘারধী হাল করে শিয়ালে বুনে ধান, বুঢা ভালুক মুড়া ঝাড়ে আশি কুড়ি ধান ॥ শিয়ালে হাল বাহে পেচায় বুনে ধান, বনের হনু মুড়া ঝাড়ে পেঁচিয়া কিষাণ ॥ রাতায় রাতায় উঁদুর যায় উঁদুরে কি বিরাল খায়, মাঝি ভাই, ভাঙা নউকা অগম দরিয়ায়, ভাঙা নউকায় কি হয়ে পাইরায় ॥ বিলের দিগে যাহ না বেঁগে মারে লাথি, উলটি কাচাড খাঁয়ে ভাঁঙল কলসী ॥ কাঠপকায় গবরপকায় করে একাদশী, কাবুরা বিড়ালে বলে সব পরব বাসি ॥ মেদিনপুরে দেখ্যে আল্যম দালানে ধান পাক্যেছে, এমনি চাষা চাষ কর‍্যেছে শিয়ালে ধান মাডাছে ॥ মেদিনপুরে দেখ্যে আল্যম সেঁঘের শাতে কাছারি, সাপ দেখ্যে বেঙ পালাই গেল পড়্যে র'হল কাছারি ॥ মেদিনপুরে দেখ্যোঁ আল্যম কাওয়াতে গাহনা করে, বাঁদরে খঞ্জরি বাজায় ধুঁতুর পেচায় নাচ করে ॥ মেদিনপুরে দেখ্যে আল্যম কঠার উপর বাঘবসা, সে বাঘেতে মানুষ খায় না দেখন বাঘের তামাসা ॥

স্বাভাবিক জীবন বা ঘটনা কখনই ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। ব্যঙ্গবিদ্রূপের ক্ষেত্রেও বিকৃতিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই বিকৃতি দেখলেই কবিমানস ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ঝলসে ওঠে। সমাজের বিভিন্ন লোকচরিত্রে,

সামাজিক ঘটনায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ

তাদের আচারব্যবহারে সামান্যতম বিকৃতি ঘটলেও তাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের শিকার হতে হয়। অসাধু উপায়ে অর্জিত সম্পদে ভুঁইফোঁড় বড়োলোক, দুষ্কৃতির পরিণাম, কৃষিনির্ভর জীবনে চাকুরিবৃত্তি সমস্তই ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপকরণ হয়ে থাকে। তাছাড়া সমাজজীবনের, পারিবারিক জীবনের নানান ঘটনাও ব্যঙ্গ-লক্ষ্য হয়। নারীসমাজের আচারআচরণ, চালচলন, তাদের ব্যভিচার ইত্যাদির ওপর বিদ্রূপের শাণিত চাবুক বারংবার বর্ষিত হয়ে থাকে।

১৬-২২ এতদিন যে দেখি গকুল খড়ের ঘর ছিল বে, এবার কেনে গকুল টালি উবড়াঁই দিলি রে। যখন টালি উবড়ালি কাঁটাবনীর বন পালি কাঁটাবনীর হাজরী খাতায় চালালি। নবসিংগড়ে টাকা পেরমেঁট পালি বে, যখন টাকা পালি টালি উবডালি রে॥ শালই লাগা গাঁইঠে কড়ি ঘামে ভিজিল শাড়ি, শালই-লাগা সাদ না মিটিল, হাড়িরামের চাকরি চলি গেল॥ বঁধু যদি মোব হথ্য চাষী বিলে ঝাড়ে দেখা পাথি, চা'কর্‌য়া কুকুরেব মতন যায় হে, ছ মাসে ন মাসে দেখা পাই॥ ধলভুঁই-এর বাঁগা মাটি কার পালায় বহু বিটি কার পালায় বেহালা পুরুষ, দিদি যা'হ না ধলভুঁই কঠিন মুলুক, কুলুপ লাগাই পড়াল্য পুরুষ॥ শিলদা সাতভুঁই-এ ঘব ধলভুঁইকে কিসের ডর সিপাইকে ত করো্‌ছি পাগল, দাবগা ত নয়নের কাজল॥ আম ফলে থঁপা থঁপা তেঁত'ল ফলে বাঁকা, পুরুব দেশে যাঁয়ে দেখ রাঁড়ীর হাতে শাঁকা॥ শাউড়াঁকে ধর্‌য়ো দাড়ে কিলাঁই দিল টিকি হাড়ে দাঁত দুটা পড়িয়ে রহিল, ভাবিতে গুণিতে দিন গেল॥

আধুনিক সভ্যতাকে যন্ত্রসভ্যতা নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। যন্ত্র-সভ্যতা শুধু নাগরিক জীবনকেই প্রভাবিত করে নি, পল্লীর লোকজীবনও কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে। অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ডের জনজীবনের অসাড় স্থবিরতাকেও যন্ত্রসভ্যতা নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে।

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা

ঝাড়খণ্ডের বুক চিরে রেলপথ, রাজপথ বহু পর্বেই স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তখন তা নিতান্তই বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। যন্ত্রসভ্যতা এখানের জনজীবনে সর্বাধিক প্রভাব ফেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। এখানে-ওখানে বিমানঘাঁটি তৈরি করা হয়েছিল তখন, আকাশে পাখির মতো ডানা মেলে দিয়ে অজস্র উড়োজাহাজ ঘোর কর্কশ শব্দে ওড়াউড়ি করে জনজীবনকে সদাসর্বদা সচকিত করে রেখেছিল। উড়োজাহাজ মোটর গাড়ি তখন অরণ্য-

ভূমির প্রত্যন্তবাসীর কাছেও আর অপরিচিত থাকে নি। উড়োজাহাজে ওড়বার সৌভাগ্য ঝাড়খণ্ডীদের না হলেও কুলিকামিনের কাজ নিয়ে তারা মোটর গাড়িতে চড়ার দুর্লভ আনন্দ তখনই লাভ করতে পেরেছিল। প্রত্যক্ষ সংসারের এই সব যন্ত্রযান সম্পর্কে তাই লোককবিরা উদাসীন থাকতে পারে নি। অজস্র গানে এই সমস্ত যন্ত্রযানের কথা বিবৃত হয়েছে; পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে লোকসাহিত্যও যে নির্বিকার থাকে না এগুলো থেকেই তা সপ্রমাণ হয়। ধানের কল, উড়োজাহাজ, রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, বিজলী বাতি, কলকারখানা সব কিছুই স্বাভাবিকভাবেই লোকসাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৩-৩২ চাকুল্যাতে দেখ্যো আল্যম চুঁয়ার জলে কল চলে, ইস্টিমাতে ধান ঢাল্যেছে চা'ল পড়ে মিশিন তলে। একবার ইস্টিম হলে, পা'ছড়াতে হয় না গ কলের চা'লে॥ উ'ড়ল উড়াকল, ভাল্যো ব'হল দেশের লক সকল॥ আল্যা গাড়ি ঢুমঢুমায়েঁ অ গাড়ি তর ঘর কুথা, টিপ্‌নি কলটা টিপেঁ দিব সজা রাস্তা ক'লকাতা॥ আইল মালগাড়ি গেল রে ভাই তাড়াতাড়ি, পাঁইটমেন দিল হাত লাড়ি, পবন বেগে ছুটাল্য ডাকগাড়ি॥ আগুই আগুই রেলগাড়ি তার পেছুই ঠেলাগাড়ি তার পেছুই জড়া পাসিঞ্জর, মকে লাগে ডর, ক'লকাতা কঠিন শহর॥ কালিমাটি আনাগনা মুসাবনীর কারখানা মুসাবনীর বিজলী বাতি, বিনা তেলে জ্ব'লছে গ সারারাতি॥ মুসাবনীর কা'রখানা পাথর বা'হরায় সনার পারা, গবরমেঁটের ভাল হইল, তারে তারে আল জ্বালাল্য॥ কন মাগীদের বিটি মাগো লিল শাঁখা ছুটি, অড়ন পিঁধন টসর শাড়ি, টাঁ'ড়কে উঠিল রেলগাড়ি॥ ভালুকবিঁধায় কাম হল্য ছানামায়া সক'ল গেল বুঢ়ী ঠেঢী সক'ল লিল শাড়ি, মটরে চঢ়িল হাত লাড়ি॥ বারে বারে বারুণ করি ঘাটি খা'টতে যা'হনা, ঘাটি-খাটা বড় কষ্ট গায়ের বরন ফিরে না॥

লোকমানস অত্যন্ত ঘটনা-গ্রাহী হয়ে থাকে। জনজীবনে যে ঘটনাই স্পন্দন তোলে তাই মানসরসে জারিত হয়ে লোকসাহিত্যের উপকরণে পরিণত হয়। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যেও সাময়িক ঘটনাপ্রবাহের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। প্রাকস্বাধীনতা যুগের সংরক্ষিত অরণ্যগুলো স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সরকারী নিয়ন্ত্রণে কেটে

সাময়িক ঘটনাপ্রবাহ

কেটে ধ্বংস করে নতুনভাবে অরণ্যসৃষ্টির জন্য প্লান্টেশানের পরিকল্পনা কি-ভাবে ব্যর্থ হল, চারপাশে কাঁটাতাবের বেড়া দিয়ে গরুবাছুর মানুষজনের অরণ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল; দু'দু'বার ভারত-প্যাকিস্তান যুদ্ধের সময় কলাইকুণ্ডা বিমানঘাঁটির থমথমে সন্ত্রস্ত অবস্থা জনমানসে কি ধরনের প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ইত্যাদি সাময়িক ঘটনা নিয়োদ্ধৃত গানগুলোতে বিধৃত হয়েছে।

৩৩-৩৫ যখন ধলভুঁই রিজাফ ছিল থুকডাখুঁপী ভালই ছিল, এবার ধলভুঁই-এ পেলেনটেশান হল্য, ধারে ধারে থাম খুঁটা দিল, ধন্য বেঞ্জার তর মুরাদ ছিল ॥ খড়প্‌পুরের পচ্ছিমে ঘাটি কলাইকুণ্ডা, বম ফে'লল দুপহরে পাকিস্থানেব গুণ্ডা। ঘাটির কাজ বন্দ হল্য ভয়ে লক দেশ ছাড়িল, কলাইকুণ্ডাকে বুঝিবা উড়ায় ॥ ভারত আর পাকিস্থানে যুদ্ধ হয়েঁছিল, দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ দু'নম্বরে গেল। সাড়ে দশটার সময় ফায়ার করেঁছিল, পালাতে পালাতে একজনা আম গাছটায় পড়িল। অ কি মজা হল্য, বম গিলা ফুটিতে লাগিল ॥

লোকসাহিত্যেব গানে-গল্পে ইতিহাসেব ছিঁটেফোঁটা বিধৃত হয়ে আছে। বহু প্রসঙ্গ এতোই ধূসর বিবর্ণ হয়ে গেছে যে, আর তাদের সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন রাজা-জমিদারদের প্রসঙ্গ প্রচুর পরিমাণে লোকগীতিব মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও কোন রাজার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি, ব্যতিক্রম শুধুমাত্র 'লীলমণি' এবং 'রাজা নরসিংবর'। বৃটিশদের পদপাতের পূর্বে ঝাড়-খণ্ডের জনজীবনে সম্পদে, আচারব্যবহারে রাজার স্থান এতোই উঁচুতে ছিল যে প্রজারা বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাই ঝাড়খণ্ডের রাজাদের প্রসঙ্গ লোকগীতিতে বারবার এসেছে; এগুলোর মধ্যে ইতিহাসচেতনা অবশ্যই আছে, কিন্তু ইতিহাস রচনার কোন সচেতন প্রয়াস বা বাসনা এগুলোর মধ্যে খুঁজতে যাওয়া নিতান্তই বাতুলতা মাত্র। লোককবি কখনোই কোন গান সচেতনভাবে রচনা করে না। ইতিহাসচেতনার ছাপ আরো অনেক প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়: মুসলমান আমলে স্বাধীন ঝাড়খণ্ডে মুসলমানদের হামলার কথা, ছেলেধবাদের বিভীষিকার কথা, বর্গী হাঙ্গামার কথা, নীলচাষের কথা এবং নীলকরদের কাছে বাধ্যতামূলক কাজের কথা, খাজনার জন্য ইংরাজদের চাপ এবং অত্যাচারের কথা, রাজাদের রাজত্ব বিকিয়ে

ইতিহাস-চেতনা

যাওয়ার কথা—অস্পষ্টভাবে হলেও এখনো লোকগীতিতে খুঁজে পাওয়া যায়।

৭৬-৪৬ ডুঁগুবি কাধারে ধাবে কে বে ঝাঁটি কাটে, আমি বঠি শতপতি রাজাব বেটা বাছ্যো বাছ্যো কাটি ॥ বাবমু চব পাহাড়ে কিসেব ধুলা উড়ে রে, বাজার বেটা ভুববাজ খড়মে চলিছে ॥ মলভুঁই-এর মল বাজা খাঁয় গেল জনহা'ব ,ভাজা, আ'জ বাজ বিপদে পড়েছে, গায়েব গামছা বন্ধক দিয়ে গছে ॥ যখন বাজা ছট ছিল পাহড়ে গহড়ে বাট ছিল, এবাব বাজা বড হন্যা দলদলি সডপ দিল ॥ কইমশাল কলাবনী যেথান থাকে ত শদ শুনি পাকাব উপব জড় নলেব কল, রাজা নবসিংবব, ঝাড়গ গ্রামে কবে ঝলমল ॥ বাইদে বহালে মাছ রুপা পানায় লিতেছে নাচ, আখড়ায় সামাল্য বুঢ়া মুসলমান নিশি দাড়ি বুকেব সমান ॥ আম ফলে ধকা ধকা কমবে বাঁধল টকা, ননদ ল, বাজাবে সামাল্য ছানাধবা ॥ উপব কুলহি হুডহুডানি নাম কুলহি ঢড়া, কি কব্যে পাইবাব দাদা ভুই ঠেং যে খড়া। অ ননদী দেখ, দেখ ল বর্গী কত ধুবে, বর্গী আ'ল্য লক পালাল্য বর্গী কত ধুবে॥ এতটুকু সাহেব ছাটি নীল কুঠিব নাবে, হাটু গাড়্যা বন্ধুক চালায় বগড ভাঙ্গ্যে পড়ে ॥ নীল কাট্যে নীল বইতে গেলম শালমাবির কুঠিতে, এমন নীলেব বঝা ভাবি ঘাড়ে দবজ লাগ্যেছে ॥ গাকে আল্য বেলি সাহেব পাজনাব বড হুডবডি, অই ন শুন্যে গাঁয়ের মডল বাড়ি বাটে গডবড়ি ॥

শ্রীচৈতন্যদেব একদা এই ঝাড়খণ্ডেব 'ভিল্লপ্রায়' আদিম অধিবাসীদেরও তাঁব প্রেমমন্ত্রে সঞ্জীবিত কবেছিলেন। বস্তুতঃ অন্যান্য আর্যধর্ম—হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন—কে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীবা ঘৃণাব দৃষ্টিতে দেখে বজন কবে থাকলেও বৈষ্ণবধর্মের জাতিহীনতা শ্রেণীহীনতা তাদেব কিছুটা আকৃষ্ট কবেছিল। বিশেষভাবে আদিবাসী বাজা-জমিদাব সামন্তবা যথেষ্ট পবিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের মাধ্যমেই আপামব জনসাধাবণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মেব প্রতি আপাত আনুগত্য দেখা দেয় এবং হরিনাম সংকীর্তন মাহাত-ভূমিজ আদি সম্প্রদায়েব মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়। হরিনাম এবং পদাবলী কীতন ঝাড়খণ্ডে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং কীর্তনে ঝাড়খণ্ডী ধারা গড়ে ওঠে। তবে এর ফলে

বৈষ্ণবধর্ম ও ঝাড়খণ্ড

যে স্থানীয় অধিবাসীরা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব বনে গিয়েছিল এমন কথা ভাবা একান্তই ভ্রান্ত। ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারা তাদের ঐতিহ্যানুসারী রীতিরেওয়াজকে কোনদিনই বর্জন করে নি, আবার হরিনাম সংকীর্তনেও তাদের অনীহা দেখা যায় নি। ভাবা যেতে পারে যে এর ফলে এখানে সংস্কৃতি-সমন্বয় সাধিত হয়েছে। কিন্তু সে কথাও সত্য নয়। সমন্বয় তখনই সম্ভব যখন কোন সম্প্রদায় নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বহিরাগত সংস্কৃতিকেও আত্মস্থ করে নেয়। বৈষ্ণবধর্মকে ঝাড়খণ্ডের অধিবাসীরা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে আত্মস্থ করে নেয় নি, শুধুমাত্র 'ব'স্টম'(<বৈষ্ণব) নামে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তারাও যে সব সময় বৈষ্ণবোচিত জীবন কাটায় না তা 'ব'স্টম টম চম, হাঁড়ির ভিতর পইতা রাখ্যে থুকুড়া খাবার মন' শ্লেষাত্মক প্রবাদবাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

রাধাকৃষ্ণ ও লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকা

বৈষ্ণবধর্ম জনমানসের গভীরে প্রভাব ফেলতে অসমর্থ হলেও রাধাকৃষ্ণ ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে ঝাড়খণ্ডীদের পরম আত্মীয়ের মতো একটি প্রীতিমধুর স্থান করে নিতে পেরেছে। পরম আত্মীয়ই বলা ভালো, কারণ ঝাড়খণ্ডের লৌকিক প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কটা হরিহর-আত্মার মতোই। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে যে রাধাকৃষ্ণের দর্শন মেলে পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের বহিরঙ্গ রূপটা পদাবলীর অক্ষম অনুকরণে রচিত ঝুমুরে হয়তো-বা কিছুটা পাওয়া যাবে, কিন্তু অন্তরঙ্গ রূপের দিক দিয়ে ঝুমুরের রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের আকাশপাতাল ব্যবধান। আন্তর ধর্মের দিক দিয়ে লোকায়ত গানের রাধাকৃষ্ণের মতোই ঝুমুরের রাধাকৃষ্ণও ঝাড়খণ্ডের নির্বিশেষ লৌকিক প্রেমিকপ্রেমিকার বিশেষ রূপ ছাড়া কিছু নয়। লোকায়ত গানের রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। লৌকিক জৈব প্রেম উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানতম ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতি এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের মতো নিরক্ত ভাবমূর্তি মাত্র নয়। লৌকিক জগতের প্রেমিকপ্রেমিকাযুগলের মতোই এরা সরক্ত, চঞ্চল, কামনা-বাসনা দৈহিক ক্ষুধায় অস্থির। দেহকে উপবাসী রেখে শুধু প্রেমের ভাবমূর্তিকে আশ্রয় করে এরা মানসিক শান্তি পায় না। কেউ কেউ মনে করেন, ঝাড়খণ্ডের আদি-বাসীদের মুক্ত প্রেমই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উৎস, হাতে বাঁশি, গলায়

বনফুলের মালা, পরনে হলুদ-ছোপানো কাপড়, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ—ঝাড়খণ্ডের রাখাল বালকের এই সাজ পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণের রূপ কল্পনায় যে প্রেরণা জোগায় নি, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না; গোপিনীবিহারের মতো রাখাল বালকের ঝাড়খণ্ডী কিশোরীদের সঙ্গে মুক্ত প্রেমবিহার আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতেও রাখালের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তার বংশীধ্বনি গৃহকোণে আবদ্ধা যুবতী নারী এবং কুলবধূদের উন্মন করে তোলে, মিলনের জন্য তারা আকুল হয়ে ওঠে; গৃহকর্মে বাঁধা থাকায় তারা অরণ্যপথে বেরিয়ে পড়তে না পাবার ক্ষোভে দীর্ঘশ্বাসে ঘরের বাতাসকে ভারি করে, রাধার মতোই প্রেমের অশ্রুকে ধোঁয়ার জ্বালার জল বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তাই রাধাকৃষ্ণ বৈষ্ণবধর্মের প্রসার এবং পদাবলীর জনপ্রিয়তার পথ বেয়ে লোকায়ত গানে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, এমন কথা ভেবে নিতে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিধা দেখা দেয়।

এমন-কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণই এখানকার লোকগীতিতে স্থান করে নিয়েছে, তা'ও জোর করে বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাব ও ভাষার সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির ভাব ও ভাষার যথেষ্ট মিল রয়েছে, তা'ও লক্ষ্য করে দেখা দরকার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ওপর ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির প্রভাব পড়েছে নাকি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনই এখানকার লোকগীতির ওপর প্রভাব ফেলেছে তা রীতিমতো বিতর্কিত ব্যাপার হতে বাধ্য। যদি ধরে নেওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির ওপর প্রভাব ফেলেছে, তাহলে এটাও ধরে নিতে হবে যে এই অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল; এই সম্ভাবনাটি অনেকাংশে গ্রহণ-যোগ্য এই কারণে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একমাত্র পুঁথিটি ঝাড়খণ্ডের পূর্ব প্রত্যন্তে পাওয়া গেছে এবং গ্রন্থটির ভাষায় ঝাড়খণ্ডী উপভাষার যথেষ্ট ছাপ থেকে গেছে। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড (যাকে কেউ কেউ পারখণ্ড-ও বলেছেন) এবং বংশীখণ্ডের বংশীচুরি প্রসঙ্গগুলো অন্যত্র দুর্লভ হলেও ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে পাওয়া যায়। ভারখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের প্রসঙ্গ মেয়েদের নিজস্ব গীত জাওয়া গীতে দেখতে পাওয়া যায়। অন্দরমহলে এমনিতেই বাইরের প্রভাব পড়ে কম; তার ওপর যে ঝাড়খণ্ড উচ্চধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করেছে যুগ যুগ ধরে, সেই ঝাড়খণ্ডের নারীসমাজ যেখানে আজো নিজেদের বৈষ্ণববাদ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে—তাদের গানে

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও লোকসংগীত

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পড়েছে এমন কথা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। এখানে ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড এবং বংশীখণ্ডের প্রসঙ্গ-সংবলিত কয়েকটি গান উদ্ধৃত করা হল।

৪৭-৫৩ কিয়াকাঠের বাঁহুকখানি চিহড় লতের শিকা, কিষ্টর কাঁধে ভর দিয়েঁ চল্যেছেন রাধিকা। আগুয় আগুয় যাবেন কিষ্ট পিছনে রাধিকা, লক শুধালে ব'লবেন কিষ্ট রাধিকার বেগার। মথুরাকে যাবেন কিষ্ট হইবে উদ্ধার, লক শুধালে ব'লবেন কিষ্ট রাধিকার বেগার॥ আমপাত চিরিচিরি নউকা বনাব, সেহ নউকায় নদী পাইবার। সোব লককে পার ক'রব লিব আনা আনা, রাধিকাকে পার ক'রতে লিব কানের সনা॥ আসেঁছি রাস্তা ভুল্যে বস্যে আছি নদীর কূলে ঝাপ দিলে ডুবিয়েঁ মরিব, কমনে নদীয়া পার হব। যে করিবে নদী পার তাকে দিব গলার হার ॥ ই কূল উ কূল নদী বহিছে পাতালভেদি ঝাঁপ দিলে ডুবিয়ে মরিব, কেমনে নদীয়া পার হব॥ ডিংগিয়া ডিংগিয়া ঘাটে কে রে ডিংগিয়া বঠে কিযা নাম কাহারে শুধাব, কেমনে নদীয়া পার হব। যে ক'রবেক নদী পার তাকে দিব গলার হার আধা প্রাণ তাহারে সঁপিব॥ ইস্তে হাস্তে বাজায় বাঁশি নিঠুর কালিয়া, জলে পার করায়ে দে আমি যাব মথুরা॥ একড়া কদম তলে কৃষ্ণ ঘুমাল্য কলে না জানি শাম ঘুমেরি ঘরে, বাঁশিটা যে নিয়েঁ গেল চরে॥ কঁচি কদমের তলে কিষণ ঘুমাল্য কলে হাতের বাঁশরি লিল চরে, নাই জানি শাই ঘুমের ঘরে॥

তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পংক্তির সঙ্গে সরাসরি যোগ আছে এমন লোকগীতির সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। পরোক্ষ নির্দেশের ওপর নির্ভর করলে ঝাড়খণ্ডের প্রকীর্ণ লোকগীতিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আত্মিক যোগাযোগ যে খুবই নিবিড় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আসলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা একান্তভাবে লৌকিক প্রেমের বিচিত্র রসসম্ভার ছাড়া কিছু নয়। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে একই ধরনের লৌকিক প্রেমের জয়গান সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব এখানকার লোকগীতির ওপর পড়েছে নাকি এইসব প্রকীর্ণ লোকগীতিই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাঠামো রচনায় সাহায্য করেছে, সে বিতর্কের মধ্যে প্রবেশের কোন প্রয়োজন দেখি না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একমাত্র পুঁথি মাত্র ষাট বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে,

যার অস্তিত্বের কথা এখনো বহু তথাকথিত শিক্ষিত লোকই জানেন না। সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ লাভের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল্য জনসাধারণের নাগালের মধ্যে কোনদিনই থাকে নি। অন্য কথায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মোটেই বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় গ্রন্থ হয়ে উঠতে পারে নি। এমনি অবস্থায় ঝাড়-খণ্ডের লোকমানসকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গান পরিব্যাপ্ত করবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছে এমন কথাও ভাবা চলে না। আর যদি বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব ঝাড়খণ্ডের লোকগীতির ওপর সত্যিসত্যিই পড়েছে, তাহলে ধরে নিতে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কৃত হবার বহু আগে থেকেই, বলতে গেলে মধ্যযুগ থেকে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝাড়খণ্ডে অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ ছিল; সে ক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয় গ্রন্থটি ঝাড়খণ্ডেই রচিত এবং ঝাড়খণ্ডের প্রেম-ভাবনাই তার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। অন্যভাবেও ভাবা যেতে পারে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে পল্লীসাহিত্য বা লোকসাহিত্যের পর্যায়েও ফেলা যেতে পারে। লৌকিক কথা কাহিনী, প্রবাদ এবং গান লৌকিক কাব্যরচনায় প্রেরণা যেমন জুগিয়েছে, তেমনি কাঠামো রচনাতেও সাহায্য করেছে। ঝাড়খণ্ডের প্রেমভাবনা, লোকচরিত্র এবং প্রেমগীতি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনায় অনুপ্রেরণা জোগায় নি কিংবা তার কাঠামো রচনায় সাহায্য করেনি, তা'ও কি জোর করে বলা যায়? ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি লোকগীতি উদ্ধৃত করা হল, বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পঙ্‌ক্তির সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

৫৪-৫৯ তবল দেখো উ'ঠলম গাছে গাছতলেতে লক আছে, তবা দুজন সাথী থাক ডাল ভাঙো পড়ি যাছে। বনঝন ঝড় বাসাতে, যে-ডাল ধরি সেই ডালেই ভাঙি পড়ে॥ বাউ নাই বাসাত নাই ডাল কেনে লড়ে, অভাগা কদমের ডাল যাছে ভাঙ্যে পড়ে॥ আগ ডালের কুইলী ম'ধ ডালে বাঁসা, ভা'ঙলে বিরিখের ডাল জীবনের নাই আশা॥ আকাশেতে চাঁদ নাই কি করিবে তারা, যার ঘরে পুরুষ নাই জীয়ন্তে সে মরা॥ কদমতল রয়াঁই গেল বঁধু নাই আলা, কানের ফুল কানেই শুকাল্য, শ্যাম নাগর বড় দাগা দিল॥ আষাড় শরাবণ মাসে কাঁচা বাঁশে ভমর বসে, আমার বঁধু র'হল বিদেশে, কাল মেঘ গ'ড়ড়ে আকাশে॥

উল্লেখিত গানগুলোর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলোর তুলনা করলেই মিলটা বোঝা যাবে।

যে ডালে করে মো ভর সে ডাল ভাঙ্গিঞঁ। পড়ে নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে ।। নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী । জিএ সে যাহার পাসত পুরুষ নাহি ।। ফুটিল কদম ফুল ভরে নোঁআইল ডাল । এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ।। জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ । সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ।। আসাঢ় মাসে নবমেঘ গরজএ । মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ।। (রাধাবিরহ খণ্ড)

আমরা অন্যত্র লৌকিক প্রেমের ক্ষেত্রেও যে পূর্বরাগ-অনুরাগ বিরহ-মিলন ইত্যাদি পর্যায়ক্রম আছে, তা বিস্তর উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছি। এবারে আমরা রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত কিছু নির্বাচিত গান উৎকলিত করে দেখাবার চেষ্টা করব যে, এ গানের রাধাকৃষ্ণ মোটেই পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ নয় কিংবা যে-প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা গানগুলোর মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে তা উজ্জ্বলনীলমণি অথবা বৈষ্ণব রসতত্ত্ব-নির্দেশিত প্রেমলীলা নয়, বরং একান্তভাবে লৌকিক প্রেম। সেদিক দিয়ে দেখে গভীরভাবে বিচার করলে এগানগুলোও যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত তাতেও সন্দেহ থাকে না। কোন কোন গানে পদাবলীর ছায়া থাকা একেবারে অসম্ভব এমন কথা বলি না। 'দাঁড়ায়ে নন্দের আগে গপাল কাঁদে অনুরাগে' গানটি যে বলরাম দাসের বাৎসল্যরসাশ্রিত বিখ্যাত পদটির সরাসরি ব্যবহার তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৬০ **বাল্যলীলা** : দাঁড়ায়ে নন্দের আগে গপাল কাঁদে অনুরাগে, হে গ বুক বহিয়েঁ পড়ে লর। না রহিব তর ঘরে অপযশ দেহ মোরে, হে গ মা ইঁইয়ে বলে ননীচর। বলাই খাঁয়েছে ননী মিছাই চোর বলে রানী, হে গ মা ইঁইয়ে বলে ননীচর।

৬১-৬৬ **গোষ্ঠলীলা** : নদীর কিনারে ডুবলা করে লহ লহ, হে গ কাহা কৃষ্ণয় বাছুরী চরায় ॥ অ রে কানহাই ভাই যতনে চরাবি গাই কতি ধুরে পাব গয়ালিনী, আস্তে দিব রসিকা রঙ্গিনী ॥ উঠ বাছা রাম রাম উঠ বাছা বলরাম উঠ বাছা বেলা বিহানে, যশদা কাঁদিছে বনে বনে ॥ নদী কা ধারে কৃষ্ণ গধন চরায়, বাঁশি রা' রাধা বল্যে বা'জছে সদাই ॥ এক কণা খেজাড়ি নাই যার বাগালি, মাই গ মাই, চরহা ধেনু না'রব ঘুরাতে ॥ ভাঙা কাঁকই পানের ধন শিঙ্গারে মজোছে মন মা গ মা, চূড়াটি বাঁধিয়ে দে মোর মাথে। ডকে অন্তর জ্বলে আঁখি ছলছল করে চরহা ধেনু না'রব ঘুরাতে ॥

৬৭ ৬৮ **দানলীলা :** আমরা গোয়ালা জাতি দধি বিকি নিতি নিতি দধি ছলে মথুরাতে যাব, দধি ছলে কৃষ্ণ দেখা হবে॥ প্রভাতে উঠিয়া রাই সাজাল্য'পসরা, মনে উলসিত বড় যাইবে মথুরা। সাজিল সাজিল গ, দধির পসরা মাথে সাজিল গ॥

৬৯-৭০ **যমুনা-প্রসঙ্গ :** যাইতে যমুনার জলে কত ছলে কথা বলে, কলসী না ডুবাতে দেয় জলে, উ বড় লম্পট্যা বটে॥ যাইতে যমুনার জলে শ্রীরাধা সখিরে বলে, কদমতলে কালিয়া দাঁড়ায়, একা কেইসে যাব যমুনায়॥

৭১-৭৮ **অনুরাগ :** উঠ গ ধুতি দেখিয়েঁ আসি যমুনা বহিছে নিরাধার, বামে হেলাইয়েঁ চরণ দলায়েঁ আছেন কি ন আছেন প্রাণনাথ॥ চাঁদ করে ঝিকিমিকি সুরুজ করে আলা, কন্ বনে বাঁশুরি বাজায় আমার কালা॥ দেখ সখি ছুডাছল বাইরে ঘুরাল্য জল ঐ জলেতে চিন্তামণি হেলে, যেন সেই কদমের তলে গ মন গেছে ভুল্যে॥ বাঁশি বাজে বেরি বেরি আর ঘরেতে রইতে নারি, বাঁশিটাকে, আমি কাট্যে লিব জনমকে॥ যত সখি জড় হয়েঁ জল আনিতে গেলে, কালার সঁগে দেখা হল্য সেই কদমতলে, বাঁশিটি রাধানাম বলে। কেউ হাঁসে কেউ কাঁদে কেউ নাম্‌হেঁছে জলে, শ্যামের মাথায় মেজুর পাখা দলে॥ যমুনা কী তীরে পানী আনিবারে, কদমতলে, রূপ দেখি গে মেয়া ভ্রমরা গুঞ্জরে, কদমতলে॥ কালিয়া বাঁশির সুরে যায়েছিলি সরবরে, কালিয়া বাঁশির সুরে আমার মন ত মানে না, ভাব করে ভাব রাখলি না রে॥ বাঁশি কি মন্তর জানে, বাঁশের বাঁশি কিবা জানে গ সখি বিঁধিছে হিয়ায়, দিবানিশি গ আমার জাগিছে হিয়ায়॥

৭৯-৮২ **বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গ :** নন্দের বেটা বড় ঠেঁটা লাগাল্য বিষম লেঠা বসন নিয়েঁ উ'ঠল কদমে, কইসে রাখব ভরমে॥ যত সখি ঝিলিমিলি যমুনা সিনাতে গেলি, গায়ের বসন লিল চুরি করি, সখিরা সব জলের ভিতর লাজে মরি॥ ভারি গাছোয়াল হয়েঁছে রে তরই গপাল, সখীদের লুঁগা লুট্যে ফরক্যে উঠে অই কদমের ডাল॥

৮৩-৮৫ **কুটিলা-প্রসঙ্গ :** থাম তর ভা'ঙব ঢিটলি, দাদা আলে কহিঁ দিব সকলি॥ দাদা কি ব'লব তরে, শ্রীরাধিকার গুণের কথা পাবে

ব্রজপুরে। সকাল বেলা জলকে গেলে ঘর ঘুরে রাই সন্ধ্যা হলে কদমতলায় ডাঁটাই থাকে কালা দে'খবার তবে, কালার সাড়া পালে পরে কে বাথে দাদা রাইকে ধবে কদমতলায়·· ··॥ যমুনার জল যাতে তলে তাতা বালি বে, ললিতা, গা'ল দিছে ননদ বিবালি॥

৮৬-৯০ **বংশী-প্রসঙ্গ :** অকাতে বন চালা কানা কদমতলায় করে থানা, মাবাং বুরু বাঁশবি বাজায, কি দিলে মিলিবে শাম রায়।। আহলে বিনদ রাজ মুখেতে না কব লাজ, শাম নাগব বলিযে ডাকিব, দে হে তুমাব বাঁশিটি বলাব।। আউল বাউল বেণী অভিমানে বসে ধনি, বাঁশেব বাঁশি কি জানে বেদন গ, বাজুক বাঁশ জুড়াক জীবন।। আমাব বচন বাখ নটবব বেশ ধব নারীবেশ খুল অঙ্গ হতে, হাবিলে হার লিব জিতিলে মুবলী দিব তবে ত মুবলী দিব হাতে।। শুকনা বাঁশেব বাঁশি বাজিছে বিশাল, ঘবে না ঠহবে মন কি হল্য জঞ্জাল॥ শুকনা কাঠেব বাঁশি বাজে ঝঞ্ঝকাব. ঘবে না ত বহে প্রাণ কি হল্য

৯১ ৯৭ **অভিসার :** কুথায যাছ গ হল'দববন ধুতি কমবে গুঁজল বাঁশি, বাঁদ ঘাটে পথ'ব ঘাটে না বাজাও বাঁশি, কলসী কাঁখে আসি, কলসী বাখ্যে হাসি।। কালাচাঁদ যখন বাজায বাঁশি কঁচি কদমের তলে, তখন আমি বন্ধনে বস্যেছি। বাঁধাবাঁটা ছাড়্যো দিযে যাও যবুনাতে, সখি কাজ নাই পিবিতে॥ চল সখি জলকে সেই কদমতলকে, দেখবি যদি ধনি নীলকমলকে॥ চল ধনি জলকে জড়া কদমতলকে, শামেব বাঁশি না বাজিলে না ঘুবিব ঘবকে।। শামে বাজালে বাঁশি তখন আমবা জলকে আসি, বাঁশি বাজাতে বারুণ কর, বাঁশি বাজালে হবে সর॥ বনেতে বাজিল বাঁশি মনেতে লাগিল খুশি, আঁচল চিড়া মাথায ঘটি পানী, বঁধুয়ার গুণ আমি জানি॥ কাল জলে গেলে বাধে হহযে সুবেশ, কেনে ভিজা গায়ের বসন কেনে ভিজা কেশ। যবুনাব ঢেউ দেখ্যে আমবা ভয়ে মবি, ভিজল গায়ের বসন ভা'ঙল কলসী॥

৯৮-১০৬ **বিপ্রলব্ধা-খণ্ডিতা :** কাল কাল বল না কাল জলে নাম না, কাল জলে হে'ল মাব না।। কাল বসন না পরিব কাল মুখ না হেরিব কাল জলে কেমনে পার হব।। তবে কেনে বেশ কর প্যাবি আজি না;

আসিবেন হরি, যাঁয়েছিলম গ আমরা বুলিতে নগরে, দেখ্যে আল্যম চন্দ্রাবলীব ঘরে। শুঁয়েছিল গ তারা পালঙ্ক উপবে, দুজনাতে গ তারা নানা খেলা করে॥ ভোব সকালবেলা ঘুমাই উঠে বাজবালা, আঁখি দুটি ঢুলুঢুলু মুখে নাই তাব কথা, ঘুব্যে যাতে বল গ ললিতা॥ শুন হে কপট বঁধু বাসি ফুলে নাই হে মধু কার কুঞ্জে কব্যে আলে খেলা, বাসি হল্য ফুলমালা॥ শাম র'হল আ'ঙনায় বসিয়েঁ, উঠ্যে যাতে বল তদেব শামকে আসিয়েঁ॥ সাজে ফুটিল ফুল সকালে মলিন, কার কুঞ্জে ছিলে বঁধু হল্য এত দিন॥ কাল কাল বল না কাল চুড়ি পব্‌হ না কাল চুড়ি ছেঁচিযে ভাঙিব, কাল রূপ আব না হেরিব॥ ভোব সকালেব বেলা আইল চিকণ কালা, আঁখি ছলছল মুঁহে নাই কথা, ঘুবাই যাতে বল গ ললিতা।

১০৭-১২৯ **বিরহঃ** আয রে সুবন ব'লব কথ হৃদয় মনেব কথা রে, আমার কেনে না আইল রসিকা বঁধিযা। যখন শামেরে মনে পড়ে আমার ইছুবি বিছুবি উঠে হিয়া॥ উড়ু উড়ু কবে মন কত সইব জ্বালাতন, কাঁদে প্রাণ নিরলে বসিয়েঁ, গেল কালা কুলে কালি দিযেঁ॥ গলে বনফুল মালা দেখিতে চিকণ কালা বামে চূড়া হেলাইয়েঁ আছে, দেখা হলে ব'লবে আসিতে॥ কাইকেব বিদেশী তবা মথুরাতে যাবে পাবা, শাম নাগব গেছে মথুবাতে, দেখা হলে ব'লবে আসিতে॥ চলিতে চবণ বাঁকা বাঁকা চূড়া বামে হেলিছে, দেখা পালে ব'লবে আসিতে, মহন মুরলী তাব হাতে॥ ছিলে রাখাল হলে রাজা বিষয় বড ভারি, মথুরায় রাজা হলে কুবুজা সুন্দরী। অ তাই বলি গ, যাবে কি না যাবে বংশীধারী॥ ছিলে ছিলে বঁধু ছিলে আমাব পরদেশে যাঁয়ে হলে কাহাব, আষাডেতে বরিষা শরাবণে নদিয়া, নাই আল্য আমাব শাম শুক বঁধুযা, কই আল্য আমাব শাম শুক বঁধুয়া॥ যমুনাকে জলকে গেলে কিসেব কাঁদনা পায় গ, কাঁদিস না গ ভাবিস না তব শাম আনিতে যাই॥ যমুনাব জল আ'নতে গেলে পিছলে পড়ে পা, মনে পড়ে, আমার নিঠুর বঁধুয়াব কথা, মনে পড়ে॥ লকে বলে কাল কাল কালই আমার ছিল ভাল, কাল বঁধু কন পথে গেল, জীবন যৌবন কাঁদাইল॥ যেমনি গ পুন্নিমাব চাঁদ তেমনি ছিল আমাব শাম, শাম আমার কুথায় চল্যে গেল, আল ঘর আঁধাব

হয়েঁ গেল ।। মুড়কাটা নাং-এর বেটা কপালে মাণিকের ফঁটা মোরে ছাড্যে মধুপুরে গেল, জীবনে যৌবনেই দাগা দিল ।। শাম বিনে গ আমার বিঁধিছে হিয়ায়, শামকে আমার আন্যে দে তরা যা গ মথুরায় ।। কাঁদিব কাঁদিব সখি বিরলেতেঁ বসিয়া, শেষে প্রাণ তেয়াগিব শামের নাম ধরিয়া ।। আম পাতের শিরে শিরে কাজলেরই লেখা, কন্ পথে গেলে শাম নাই হল্য দেখা ॥ একে ত অবলা নারী প্রাণে ধৈর্য ধ'রতে নারি প্রাণ দহে মদনের শরে, সখি রে, কেমনে রহিব শূন্য ঘরে ।। গত হল্য কতদিন এই কি আসিবার চিন, কা'ল বল্যে নাগর আমার গেছে, বঁধুয়াকে বাঘুয়ায় ধরেছে ।। পথে ঘাটে দেখা হলে কালাচাঁদে দিবে বলো যদি কবু আসে কদমতলে, শামকে সাজাবই বনফুলে ।।

১২৫-১২৮ **মিলন :** কালিয়া কালিয়া বলি কালার লাগ্যে ঝুর্যে মরি, আল্য কালা র'হল বা'ত ঘরে, পিরিতির দাগ লা'গল চাদরে ।। লীলপাতা তরুলতা হিয়ার মাঝে, আ'জ লৌতন খেলা খে'লব হে শাম কালিয়ার সাথে ।। হরষিতে বিনদিনী আধা আধা কহেন বাণী, কত না সুখ মুখ দরশনে, প্রথমে মিলন হয় নয়নে নয়নে ।। আমি হে কুসুমকলি তুমি হে ত বনমালী, তুমার প্রাণসূতায় আমার মন-সুতায় মালা গাঁ'থব গাঁ'থব, দুজনে মিলে র'হব ।।

ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে রামায়ণ-প্রসঙ্গ যথেষ্ট পরিমাণেই লক্ষ্যগোচর হয়। সাধারণতঃ করমনাচের গান, টুসু গীত, ছো নাচের গান এবং বিয়ের গীতেই রামায়ণের উপকরণ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রামায়ণের উপকরণের জন মানসে ব্যাপক প্রভাবের একটি কারণ হতে পারে—কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিপুল জনপ্রিয়তা। ঝাড়খণ্ডে রামায়ণ পুঁথির চল বিপুল পরিমাণে ছিল বলে মনে হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আপামর জনসাধারণের হৃদয়হরণ করেছিল। এখনো ঝাড়-খণ্ডের গ্রামাঞ্চলে গ্রীষ্মের দুপুর বেলা এবং সন্ধ্যাবেলা রামায়ণ পাঠের আসর বসতে দেখা যায়। সে তুলনায় কাশিদাসী মহাভারত ঝাড়খণ্ডে তেমনটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি, মনে হয়। কারণ লোকায়ত গানে মহাভারত-প্রসঙ্গ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। ঝুমুর-কবিরা ঝুমুরে মহাভারতের কিছু কিছু উপাখ্যান পালাবদ্ধ করেছে মাত্র। বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাবের ফলে রামায়ণের জনপ্রিয়তা—এমন কথা বলা যায় না। তাহলে

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

বৈষ্ণবদের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মহাভারত জনপ্রিয় হল না কেন ? আসলে রামায়ণের কাহিনীর আবেদন মহাভারতের কাহিনীর চেয়ে তীব্রতর, কাহিনীতেও খুব বেশি জটিলতা নেই। সীতা যেন ঝাড়খণ্ডী জনতার সমস্ত সহানুভূতি, মমতা তার প্রতি আকর্ষণ করেছিল। লোকগীতের রামায়ণ-প্রসঙ্গ কথাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখলেও দেখা যাবে মানবিক আবেদনে-ভরা নাটকীয় মুহূর্তগুলোই গীতবিদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকগীতির মধ্যে নিবদ্ধ রামায়ণী কথাগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রামায়ণের কাহিনীটি যথাসম্ভব গড়ে তুলে দেখানো হল।

১২৯-১৬৫ বার বচ্ছর অনাবিষ্টি জনক রাজার দেশে। দিনে-দিনে মনে-মনে জনক রাজা ভাবিতে লাগিল। তখনি মুনি-দেবস্তা বর যে দিলেন। যদি রাজা লাঙল চর বৃষ্টি যে হইবে। মনে কন চিন্তা বর না বৃষ্টি যে হইবে। লাঙল চষিবে রাজা বৃষ্টি যে বরষিবে। শুন শুন শুন মুনি বলি গ তুমারে। আমরা হচ্ছি রাজবংশ লাঙল না চষি। শুন শুন শুন রাজা বলি এক কথা। কভু যদি না চষ লাঙল আ'জ চষিতে হবে। তখনি জনক রাজা লাঙল ধরিল। এক বেটা ঘুরাল্য দুই বেটা ঘুরাল্য। তিন বেটায় উঠি গেল সীতার সিন্দুক। তখন জনক রাজা সিন্দুক খুলিল। সিন্দুক খুলিয়া দেখে আচ্ছা সীতা কন্যা। একমনে জনক রাজা কলেতে লইল। একমনে বলে জনক কার কন্যা বটে। তখনি মুনি-দেবস্তা আর বর দিলেন, কার কন্যা নহে জনক তুমারি অদিষ্টে ছিল। এই সীতা কন্যা তখনি জনক রাজা কলেতে লইল। কলেতে লইয়া রাজা গেলেন নিজ স্থানে। তখনই মহলের লক করে ছিছিক্কারি। শুন শুন শুন রানী কবি এই বাণী। চণ্ডালের নাই চুয়াড়ের নাই আমার অদিষ্টে ছিল এই সীতা কন্যা॥ তখনি মহলে রানী পালঙ্ক বিছনা করিল। লকলস্কর বাজবাজনা করেঁ্য মহলে লেগিল। দিনে দিনে সীতা কন্যা বাড়িতে লাগিল, তখনি জনক রাজার চিন্তা যে হইল। কি হল্য কি হল্য রানী আমার কপালে, উপযুক্ত কন্য আমার রহিল মহলে। তখন মুনি-দেবস্তা আর বর দিলেন। কেনে রাজা ভাবিছ কন চিন্তা কর, ধেনুক ভাঙা পণে ইয়ার হবেক বিভা দান। সেই শুন্যে রাবণ রাজা আইল

ধাইয়া, চল মামা সঙ্গে চল পাব কন্যা দান। আশি হাতের বাঁশ ভা'গনা বিশ হাতের কাঁড়, সে ধেনুক না ভাঙ্গিলে না পাবে গ দান। তখনি রাবণ বলে শুন মামা বলি, কৈলাস ভাঙেছি মামা ধেনুক ভাঙিব। আস্তে আস্তে রাবণ রাজা যাইয়েঁ ডাঁঢ়াল্য। চা'র ধারে লকলস্কর মধ্যেতে ধেনুক, যত শক্তি লাগায় রাবণ লাড়িতে না পারে। আড নয়নে সীতা কন্যা চাহিয়েঁ দেখিল, ই বর মোর যগ্য না হইতে পারে। তখন বাবণ রাজা বলিতে লাগিল, কন্ কন্যা দানে দিছ দিহ ন আমাবে, যাত্রাকালে ধেনুক ভাঙ্যে যাব নিজ ঘবে। তখনি জনক রাজা বলিতে লাগিল, শুন শুন রাবণ বাজা বলি গ তুমারে। মুনির বর-দিয়া ধেনুক-ভাঙা পণ, মুনির বাখ্য রাজা না কব লঙ্ঘন। তখনি রাবণ রাজা গেল নিজ ঘরে। তখনি জনক রাজা ভাবিতে লাগিল, কি হল্য কি হল্য বিধি আমার কপালে, উপযুক্ত কন্যা আমার রহিল মহলে। তখনি মুনি-দেবস্তা আর বর দিলেন, কেনে রাজা ভাবিছ কেনে চিন্তা কর, সীতার যগ্য বব যে এখন নাই আসে। তখনি জনক রাজা ছাড়িলেন চিঠি, সে চিঠি পড়িয়েঁ গেল দশরথের হাতে। তখন দশবথ রাজা ধাইয়েঁ আইল, রামকে কলে নিয়েঁ ধাইয়েঁ আইল। আসিয়েঁ ডাঁঢ়াল্য দশরথ ধেনুকেব কাছে। চা'রধারে লকলস্কর মধ্যেতে ধেনুক। তখনি দশরথ বাজা বলিতে লাগিল, দিহ ন আন সম্বন্ধী তর কন্যা মোরে দিহ দানে। তখনি সীতা কন্যা আড় নয়নে চাহে, ই ত বর মোর যগ্য হইতে বা পারে। তখনি রাম ডাঢ়াল্য ধেনুকের কাছে, বাঁ হাতের এক আঙ্গুল লাগাল্য ধেনুকে। এক অঙ্গুলিতে ধেনুক করে খান খান, দশরথের পুত্র রাম পালেন কন্যা দান। কন্যা দান দিলে রাজা দেও মোরে বিদায়, যাহা দিতে হয় দেও দেও কন্যা বিদাই। তখনি জনক রাজা সাজিতে লাগিল, লকলস্কর হাতি-ঘড়া সাজন সাজিল। মহলের ভিতর রানী করিছেন রদন, এই যে যাইছ সীতা কবে যে ফিরিবে। এক মুষ্টি কাঁকাল সীতাব সনার বরন দেহ, চরণের অঙ্গুলি সীতার হিঙ্গুল বরন। কেমনে ভুলিব সীতা তুমার বদন, কত যে তপিষ্টে সীতা পাঁয়েছি তুমাকে। রাজার মহল সীতা শূন্য কর্যে

যাবে, রামকে পাঁয়েছ সীতা আর কি রহিবে। রাম হল্য মোর গুণের নাগর রাম হল্য মোর স্বামী, রাম হল্য মোর নিজের পরভু আধা অঙ্গের ভারি। আর কি রহিতে পারি মা বাপের মহলে, যা দিতে হয় দিহ মা গ বিদাই দিহ আমারে। যাত্রা কর্যো বিদাই দেঅ মা যাই গ নিজের ঘরে॥ (বিয়ের গীত)

অ রামের মা অ রামের মা রামের বিভা দিলি নাই, রামের বিভা জনকপুরে জনক রাজার বিটিকে॥ জনক রাজায় পণ করিল হাতে লে রে গণ্ডীর বাণ। এ গণ্ডীব বাণ যে ভাঙিবেক তাকেই দিব সীতা দান॥ রাম ন কি রে রাজা হবি আ'জ নকি তর অধিবাস, চৌকাঠেতে লেখা আছে চ'দ্দ বছর বনবাস॥ কি সত্য করিলে রাজা কৈকেয়ীর সনে, রাজ্য ছাড়ি রাম লক্ষ্মণ চলিলেন বনে॥ রাম লক্ষ্মণ বনে যায় সত্যের পালন, দুয়ারে ডাঁড়ায়ে দেখে কপাটে লিখন॥ রাম যাবেন বনে রে লক্ষ্মণ যাবেন বনে. জনকনন্দিনী সীতা সেহ যাবেন বনে, কত দুঃখমনে॥ শুন মাতা ঠাকুরানী রামে কহিছে বাণী আমার লাগি না কাঁদ মা অকারণ, আমি মা ত চলিলাম বন, সাথে যাবে ভাই ত লক্ষ্মণ, অ মা না করিহ রদন॥ ভরতকে রাজ্য দিয়ে রাম গেলেন বনে, কাঁদেন রাজা দশরথ রঘুনাথ বিনে॥ হাতিশালে হাতি কাঁদে ঘড়ায় না খায় পানী, অযধ্যা ভিতরে কাঁদে কশল্যা জননী। অ আমার রাম কুথায় গেলি রে, অযধ্যা নগর শূন্য হল্য॥ হাটে কাঁদে হাটুল্যা বাটে কাঁদে বাটুল্যা, মহল ভিতরে কাঁদে বড়রানী কশল্যা॥ আগুয় আগুয় রামচন্দ্র পিছনে লক্ষ্মণ, মধ্যিখানেসীতারানী করিছে রদন॥ আর কি প্রাণে ধৈর্য ধরা যায়, সে ত রামসীতা বনেতে যায়॥ অ রামের মা অ রামের মা রামের কিবা দুখদশা, বস্তর বিনে গাছের বাকল তেল বিনে মাথায় জটা॥ সগগে শিম'ল ফুল ছিল যোল যোজন বাস গেল, সীতার সাক্ষী মিছা হল্য ভমরে ত্যজ্য দিল। সীতার শাঁপ লাগিল, সুগন্ধ ফুল নিগন্ধ হয়ে গেল। নাককান কাটা স্বর্পনখা রাবণকে যাঁই দিল দেখা, গ [illegible] হায় হায়, শুন ভাই দশানন লঙ্কেশ্বর দশানন, সুন্দর রমণী এক গহন কানন॥ পঞ্চবটী বনে রাম বাঁধে কুঁড্যা খানি, কাল দষে আল্য এক সনার

হরিণী। লক্ষ্মণ ধর‍্যে দেও ভাই, সনার হরিণী আমায় ধর‍্যে দেও ভাই॥ হংসগমনে চলে কপালে মাণিক জ্বলে, রঘুবর, হরিণ ধরিয়েঁ দেও মোরে॥ পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেলেন বনবাসে, কাননে হেরিল সীতা রাবণ রাক্ষসে, হায় কপালের দষে॥ অশোকবনের পাতের কুণ্ডল ভিক্ষা দেও মা জননী, আমি ভিক্ষা দিব নাই হে ঘরে নাই রাম রঘুমণি॥ ভিক্ষা দাও জননী, ভিক্ষা দিলে চল‍্যে যাব এখনি॥ আইল রাবণ রাজা যগী ভেঁশ নিয়েঁরে, দুয়ারে বসিয়েঁ রাবণ ভিক মাগিছে। ভিক নাহি লেই রাবণ দুয়ার না ছাড়ে রে, হাতে হাতে রাবণ ভিক মাগিছে। হাতে হাতে ভিক দিতে টানিয়েঁ চাপাল‍্য রথে, রাবণ লঙ্কাব মুখে ছুটাইল রথ। হবিল রাবণ সীতাবে হরিল রাবণ, শূন্য ঘরে পাঁয়ে সীতা হরিল রাবণ॥ হাতে হাতে ভিক দিতে টান‍্যে উঠাল‍্য রথে, রথ উড়িল বিনা শূনে, কাঁদেন সীতা রঘুনাথ বিনে॥ অশোকবনে পাতেব কুণ্ডল সীতায় পাশা খেল‍্যেছে, যগী ভেঁশে রাবণ আস‍্যে সীতায় চুবি কর‍্যেছে॥ কুঠি শূন্য হেরি, অ ভাই লক্ষ্মণ কুথায় কন্যা সুন্দরী॥ সীতার অন্বেষণে, লঙ্কাপুরী গেল হনু দক্ষিণে॥ ডালে ডালে হনু চলে বাঁদরের কি গা জ্বলে, লেজে কর‍্যে অগ্নি তুল‍্যে লঙ্কাকে ডাহান করে॥ সীতা চুরি করিস বাবণ রাখবি রে যতন করেঁ, দেখবি দেখবি সনার লঙ্কা দিব রে ডহন করেঁ॥ রাবণ দে'খব তরে, সনার লঙ্কা রাখবি রে কেমন কর‍্যে॥ এতটুকু হনু গিলা নদা নদা পেট, অ বাছা হনু রে, সাগর ডেঙ্গিতে মাথা হেঁট॥ পব নারী, বাবণ নাই তব ভয় বে। আন‍্যেছ রামের সীতা কি করিবে ইন্দ্রজিতা, রাবণ, লঙ্কাগড় করে টলমল॥ শুন অহে প্রাণনাথ তুমারে বুঝাব কত, পরনারী কেনে কর চুরি, ফিরায়েঁ দাও রামেব সুন্দরী॥ সিংহাসনে বসে বাম ধারেতে লক্ষ্মণ, মধ্যেতে জানকী সীতা সাজ‍্যেছে কেমন॥ রাম ছাড়‍্যেছেন যজ্ঞের ঘড়া তপবনেতে, লবকুশে বাঁধ‍্যে রাখে দুধিলতাতে॥ রাম ছাড়‍্যেছে যজ্ঞেব ঘড়া তপবনের সে ধারে। লবকুশে ধর‍্যেছে ঘড়া সীতা বলে দাও ছাড়‍্যে॥ অ বাম ধেনুকধারী, বনের মাঝে কেমনে ধৈর্য ধবি॥ অরুণবনে তরুণ লতা গ তার তলে সীতার বনবাস, সীতা যে কাঁদে মা লব নাহি পুঁছে গ সামটি না বাঁধে নবীন কেশ॥

গ্রন্থপঞ্জী

বৃহৎ সংহিতা—বরাহমিহির
মার্কণ্ডেয় পুরাণ
ভবিষ্যপুরাণ
ধর্মমঙ্গল—রামকান্ত রায়
রূপরামের ধর্মমঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত
শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বড়ু চণ্ডীদাস
লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন
ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্যভাষা—ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা
বিচিত্র প্রবন্ধ—ডঃ সুকুমার সেন
বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলার লোকসাহিত্য (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
লোকসংগীতরত্নাকর (৩য় খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
সীমান্ত বাঙলার লোকযান—ডঃ সুধীরকুমার করণ
ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান—ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা
ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি—শ্রীরাধাগোবিন্দ মাহাত
পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য—শ্রীসুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
পূজাপার্বণ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
ব্রত ও আচার—প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী
খুকুমণির ছড়া—যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত
বাংলাদেশের ছড়া—ভবতারণ দত্ত সম্পাদিত
আদিবাসীর রূপকথা—শচীশ মুখোপাধ্যায়

রবিবারের স্বাধীনতা—কলকাতা,
চতুষ্কোণ—কলকাতা
মধ্যাহ্ন—কলকাতা,
পুরুলিয়া (টুসু সংখ্যা)—পুরুলিয়া,
ছত্রাক—পুরুলিয়া
টুসু স্মারক—চাকুলিয়া

Delhi Sultanate (Vol. VI)
History and Culture of the Indian People—Cambridge History of India
History of Bengal and Bihar through Ages—Dr. Qanungo
Chhotanagpur Raj—P. B. Chakraborty
Manbhum District Gazetteer—(1911)
Mundas and their Country—S. C. Roy
Aboriginals of Central India—B. C. Majumdar

Aborigines—so-called and their future—Prof. G. S. Ghurye
Descriptive Ethnology of Bengal—E. T. Dalton
The Bhumij Revolt—Dr. J. C. Jha
Religion of the Semites—Dr. Cook
Primitive Religion—Sir E. B. Tylor
The Golden Bough—James Frazer
Ancient Art and Ritual—J. E. Harrison
The Origin of the Family the Private Property and the State—F. Engels
Encylopaedia Britanica—14th Edition 1932
The Outlines of Mythology—Lewis Spence
The Companion Guide to World Literature—Mentor Book
The Sacred Wood—T. S. Eliot
Folklore of Santal Parganas—C. H. Bompas
The Folktale—Stith Thompson
Indian Fairy Tales—Maive Stokes 1880
Romantic Tales from the Punjab—Charles Swynnerton
Oriental Proverbs—Ed. Dr. Mahadev Prasad Saha
Oral Literature in Africa—Ruth Finnegan
Memorandum to S. R. C—Kurmi Panch of Chhotanagpur 1956

महाभारत, द्वितीय खंड—गोरखपुर
प्राङ्मौर्य बिहार—डा॰ देवसहाय त्रिवेदी
मुघल सम्राट हुमायूँ—डा हरिशंकर श्रीवास्तव
नागपुरी भाषा और साहित्य—डा॰ श्रवण कुमार गोस्वामी
छोटानागपुर-सांताल परगणा कुर्मि-महासभा स्मारिका

নির্বাচিত শব্দসূচী

অকাই : বমি।
আঁচাল : আঁচল ; কোঁচড।
অদা : আর্দ্র, ভেজা।
অধন<ওদন : ভাতেব জল।
অকুন : বন।
অলমা : অবলম্বিত।
অসঠা : অসহ্য।
অহীবা : গোয়ালা।
আউদান : বিনাশ ; খতম।
আওযা : আতপ।
আঁকতুয়ার : ফটক , সদব দবজা।
আগনী : আঙিনা।
আগাল : বাঁধেব ওপবদিকেব সংকীর্ণ
অংশ।
আগসাব : অগ্রসব।
আগুড : আগল, কবাট।
আগামদিগাম : অগ্রপশ্চাৎ।
আঘা : ক্ষুন্নিবৃত্তি হওযা।
আটুপাটু : তাডাতাডি।
আঁটা : সংকুলান হওযা।
আড্‌তি : ভোজে যারা পবিবেষণ
করে।
আঢা : আদেশ কবা।
আদ্দাশী : প্রার্থী, আবেদনকাবী
আনলা : আলুনি।
আফাই : বিপদ, সংকট।
আবাল কাল : ছেলেবেলা।
আমঠা : পক্কাশয।
আমানি : বাসি মাড।
আজা : অর্জন কবা।
আলতি : কচ।
আল' চাল, ধান : আতপ চাল, ধান
আলাপালি : পালা কবে।
আলাঝালা : ঝলোমলো।
আশব : আশ্রয।
আহড : আডাল।
ইচলা, ইচলি : চিংড়ি মাছ।
উইমেকা : উই-এব বাসা।
উকুবুঁকু : হাবুডুবু।
উখাড়ুবা . তুলকালাম, উদ্দাম।
ঢাকন-পিঁধন : আববণ- বিধান।
উনহান : উনোন।
উফাল : লাফ।
উলটবাজি : ডিগবাজি।
উলখী, উলুখী : উল্কি।
উশাস : খসখসে, হালকা মাটি।
এড়ি : গোডালি।
কদ : শস্যবিশেষ।
কড়ার : প্রতিশ্রুতি।
কচা : সংকীর্ণ জমি।

কববরি : দাগাবাজি ; ফুলবিশেষ।
কজ্জি : কলজে।
কপ্‌তী : ঘুঘু।
কল্‌গা : পালক।
কশলা : কষ্ট।
কষ্‌তা : বেগুনী।
কটোরা : বাটি, পাত্র।
কাঁকই : চিরুনি।
কাড : তীর।
কাব্‌রা : বহুবর্ণ।
কাললা : কবলা।
কাল্‌হা : ঠাণ্ডা।
কাড়া : পুরুষ মোষ।
কাঠাড : গোয়ালের বেড়
কাকাড়চাং : কড়কড়ে শুকনো
কাচাড : আছাড়।
কানা : ফুটো, অন্ধ।
কাথি : নদীপুকুরের কিনারা।
কামিলা, কামলা : স্বর্ণকার।
কামিন : নারীশ্রমিক।
কাঞ্চিকুঁয়র : নাবালক শিশু।
কুণ্ডল : কুটির।
কুঁদরী : তেলাকুচা।
কুইলা : কালো।
কুড্যা, কুটী : আলসে।
কুট্যা : মাংসের টুকরো।
কুড়া : খনন করা।
কুইলী, কুইলিনী (স্ত্রীং) : কোকিল।
কুল্‌হি : গাঁয়ের পথ।
কুচি : কাঁচা।

কুথি : ডালবিশেষ।
কেড়রু : মোষ বাচ্চা।
কেঁদু : কেন্দু, বুনো ফল।
খঁচল : কোঁচড়।
খঁচ : মহুয়ার রস্ত।
খতচড়া : গোবরগাদা।
খঁদ : শস্য।
খখর : জাং, ফোঁপরা।
খজ : খেঁজ
খঁচা : খোঁচ, ঠেলা।
খরখস্যা : কর্কশ, রক্ষাবতী।
খঁজা : জোড়া দেওয়া।
খঁসা : খোঁপা।
খর : বোল।
খার : [illegible]
খাম্‌চা : খুটো।
খাটরা : অপরিচ্ছন্ন দিও, বিছানাহীন
খাঁক : কক্ষদেশ।
খাজাড়ি, খেজাড়ি : মুড়ি।
খাটালি : খাটুনি মজুরগিরি।
খাডা : পর্যাপ্ত, দল।
খালা : দোনা, ঠোঙা।
খাঁড়া : বড় কাঠের টিল।
খাড়া : খাঁচা।
খিজা : কাঁদা।
খির : গাছের আঠালো রস।
খিয়া : ক্ষয় পাওয়া।
খুকৃডী : ব্যাঙের ছাতা।
খুঁদা : মুখে ঘুঁষি মারা।
খুরা : খাটের পায়া।

খুন্নস : অজুহাত ; সুযোগ।
খেঁচবা : খোঁচা দেওয়া।
খেড : ঘাসবিশেষ।
খেঁটন : পেটভাত, খাওয়া-দাওয়া।
খেঁচড়া : বদরাগী।
খেটা : খরগোশ।
খেডী : সঙ্গী, সহ-খেলোয়াড়।
খেঁডী গুঁদলী : শস্যবিশেষ।
গতর : শরীর, শক্তি।
গডবড়ি : পলায়ন।
গঁড়রানি : লাথি।
গচই : লেঠা মাছ।
গমশা : বার্ষা পূর্ণিমা।
গজধর : অথর।
গভরি : পেটের অপরিপক্ক ভুক্তদ্রব।
গজ : কৌণিক।
গজ : খিল।
গলা : গৃহস্বামী।
গগান : উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করা।
গাঁচর : সজনে গাছের পোকা।
গাদর : ডাঁশা, আধপাকা।
গাইদ : গাদা, প্রচুর।
গাডা : পোঁতা।
গাচা : গর্ত।
গাড্যা : ছোট পুকুর, ডোবা।
গাঁদাবগুঁতুর : নিম্নকণ্ঠে কথাবার্তা।
গিজড়া : দাঁত বের করে হাসা।
গিলান : চাদরবিশেষ।
গুঁদলু : শস্যবিশেষ।
গুডরু : বেঁটে।
গুজ্রুক : ছোট, সরু।
গুলাঁচ, গুলাঁত : কাঠগোলাপ।
গুবা : ছোট পুকুর ; ডোবা।
গুডা : পিটানো, বাজানো।
গুলিন : গৃহস্বামিনী।
গুটী : মাদী গরু।
গেডা : বেঁটে।
গেঁচা : গেঁডা, শামুক।
গোড : গোয়াল।
ঘড : ঘড়া।
ঘং : বৃষ্টিনিবারক মাথার আবরণী।
ঘংটা : ঘোমটা।
ঘাঘর : পাখিবিশেষ।
ঘুসুর : শূকর।
চখা : শানানো, ধারাল।
চপা : খোসা।
চুঁঘ্বা : চুমুকে চুমুকে খাওয়া।
চাওড়া : সাড়াশব্দ।
চাকাচাঁদা : গোলকধাঁধা, হতভম্ব
চাঁচর : কুঞ্চিত।
চাড : অভিমান।
চাঁডমাড : তাড়াতাড়ি।
চাটু : তাতা ; তাওয়া।
চাবকি : ঘুন্সি, কোমরদড়ি।
চিহড : বুনোলতা।
চিমটি : পিঁপড়ে।
চিটা : আঠালো।
চিপা : পিষ্ট করা।
চুঁয়া : কুয়ো।
চুঁচা : নেংটি ইঁদুর।

চুটি : হাতে-পাকানো বিড়ি।
চুহা : চোষা।
চেঁকা : টক।
চেঁদড় : ভীতু ; কাণ্ডজ্ঞানহীন।
ছঁচ : গোবর জল।
ছচ্‌রা : লোভী।
ছঁড : অনাথ শিশু।
ছাতু : ব্যাঙের ছাতা।
ছাহা, ছাঁইরা, ছাঁহিরা : ছায়া।
ছাপর : খাপরা ; নিচু।
ছাকড : বাচ্চা ছেলে।
ছিঁটা : ছেঁড়া।
ছিনার : অশালীন ; বেশ্যা।।
জঁয়া : কালো বিষ পিঁপড়ে।
জল্‌হা : তাঁতি।
জব্‌রা : আবর্জনা।
জঁখ্‌ : মাপ।
জলঘাট : পায়খানা।
জভি : আগাছাভরা জলা জমি।
জাড : শীত।
জাঁকা : চাপা দেওয়া।
জাহিরা : আদব ; দাপট।
জিরপা : খোঁড়া, অথর্ব।
জিয়া : জীবন্ত ; বাঁচা।
জিগির : উৎপাত ; কামনা।
জুঁঠা : এঁটো।
জুমডা, জুমঢ়া : জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড।
জুরগুণ্ডা : চোরকাঁটা।
ঝঁট (ঝঁটমট) : তাড়াতাড়ি।
ঝবরা : ঝুঁকে পড়া।
ঝড়া : ঝরা।
ঝরিঝম্পা : গহনাবিশেষ।
ডহর : রাস্তা।
ডঁগা : ছোট নৌকো।
ডঁডা : কালো পিঁপড়ে।
ডাঙুয়া, ডাঁগুয়া : অবিবাহিত।
ডাং, ডাঁগ : লাঠি, দণ্ড।
ডাঁড়ি : হাতল ; দণ্ড।
ডাংরা (সাঁ) : গরু।
ডাহিন : ডাইনী।
ডিঁগা : গাদা।
ডিংলা : কুমড়া।
ডুঁড়কা : জলে পুড়ে যাওয়া।
ডুব্‌কা : অনতি উচ্চ ঝোপের বন।
ডুমকা : গোলগাল, ফোলা।
ঢেগাঢেগি : লাফালাফি।
ঢডর : গর্ত, কোটর।
ঢরকা : চোখ জলে ভরে ওঠা।
ঢর্‌রা : ফোঁপরা ; কোটরগত।
ঢড়া : নিচু, গর্ত।
ঢাডা : লাঠি দিয়ে আঘাত করা।
ঢাঁগা : দীর্ঘদেহী, লম্বা।
ঢিটলি : ধৃষ্টতা, দুষ্টামি।
ঢেঁড : বদমাস।
ঢেলকা : ঢেলা, ঢিল।
ঢেকা : ভাতের জমাট পিণ্ড।
তা” বড়া : উপুড়।
তাতা : গরম।
তিরি, তিরিয়া : স্ত্রী।
তিরিংরিঁগা : লম্বা ; বদরাগী।

তুঁড় : মুখ।
থপ্‌না : থোঁকা।
থড়বা : পিছলানো।
থলা : গুচ্ছ।
থান : দেবস্থান।
থানা : দেখা, আস্তানা।
থুংনা, থুতুনা, মুখ।
দলক : দোলা (ক্রি°)।
দলদলি : নরম কাদা।
দরজ : ব্যথা।
দাস্‌না : ঠোঙা।
দুখা : ব্যথা করা।
দুব্‌রাজ : যুবরাজ।
দৌড়া : বড়ো ডালাবিশেষ।
ধব : শাদা।
ধকড়, ধক্‌ড়া : পুরনো কাপড়।
ধস্‌কা : ধ্বসে যাওয়া।
ধকা, ধঁপা : গুচ্ছ, স্তবক।
ধজা : চূড়া, শীর্ষ।
ধরা : মেয়ে ; নৌজীবী।
ধুনা : মাটি খোঁড়া ; গরুকে গুতো মারা।
ধুমকুম : গাঁট্টা ; মারপিট।
ধুতি : দুতী, কাপড়।
নিচা : নিরেট, নিশ্ছিদ্র।
নিদা : ঘুমানো।
নিশা : নেশা।
নিশি : মিশি।
নেটী : পাছা, নিতম্ব।
নেগুড় : লেজ।
নেহগা : নিকৃষ্ট শাকবিশেষ।
পইলা : শস্য মাপবার পাত্র।
পরগল : প্রজ্জ্বলিত।
পরশা : পরিবেষণ করা।
পলম : বিলম্ব।
পয়্‌না : লাঠি।
পং, পংড়া : চারা, অঙ্কুর।
পলা : বিনামূল্যে, ফোকটে।
পাগাল : বাসি ভাত।
পাঘা : গরুবাছুর বাঁধবার দড়ি।
পাঁজ : পায়ের ছাপ
পাজা : শান দেওয়া।
পারা : মতো।
পালই : খেজুর পাতা।
পানহা : রস।
পালহা : পাতা।
পায়্‌না : চিরুনি।
পাতা (সাঁ) : মেলা।
পাঁতা : পঙ্‌ক্তি।
পাঁদাড়, পিঁদাড় : বাসগৃহের পেছন দিক।
পিঁধা : পরিধান করা।
পুতনী : পতঙ্গ।
পুটক : ছোট।
পুয়াতী : অন্তঃসত্ত্বা।
পেড়ি : বাঁশের তৈরি পেটিকা।
পোঁদ : মিথ্যা কথা ; স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।
পেংঘা : পঙ্ক।
ফফশ : ফুসফুস।
ফরফন্দি : চালবাজি।

ফরা : ফোঁপরা।
ফাবড : ঢিল।
ফিঁচা : পাছা।
ফুচি : ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ।
ফুলছড়ি : ফুলঝুরি।
ফুলা : ফুলবাবু ; ফুল ধরা।
ফুড়্‌রা : দম্ভ করা।
বহাল : আমন ধানের ক্ষেত।
বনি : শালিখ।
বতর : সময়, সুযোগ।
বঁটা : লাঙলের হাতল।
বাউড়ানি : বিলাপ।
বারুন : বেড়ার লম্বা বাঁশ।
বাখ'ল : কোঠাবাড়ি।
বাঢনী : ঝাঁটা।
বাঁগুক : বাঁক, ভার।
বাথান : গোষ্ঠ।
বাটুলা : পথিক।
বিঁঝা : বীজ।
বিগুন : বীজ, বীচ।
বিষপিতা : তিক্তবিরক্ত।
বিহান : ভোর বেলা।
বুচা : কোণাভাঙা ; ভোঁতা।
বুতল : ক্ষমতা।
বুদা : অতুচ্চ ঝোপ।
বুড়িয়া : কুড়ুল।
বেড়া : জলাজমি।
বেসাতি : তরকারি।
ভজকট : কাজের ভিড় ; ব্যস্ততা।
ভং : ফুটো।
ভালা : দেখা, তাকানো।
ভালা—ভদ্র : সম্বোধনসূচক শব্দ
ভাবরী : কুঞ্চিত চুল।
ভাঁওসর : দেখাশোনা, পরিচর্যা।
ভুলুক : ছিদ্রপথ।
ভুনি : মোটাশাড়ি।
ভেকা : মাছের টিকরো।
ভেঠর : প্রেত।
ভেজা : লম্বা বস্তু।
মহড়া : চেহারা, আদল।
মলকা : আনন্দে ছুটোছুটি করা।
মাউকা : কৈ হুড়োহুড়ি করা।
মাগনা : বিনি পয়সায়।
মাদার : আস্কারা।
মারাং বুরু (সাঁ) : বড় দেবতা ; কৃষ্ণ।
মুস্যিয়ান : মুখপাজি।
মুড়া : শেষ সীমা।
মুঢা : গাছের গুঁড়ি ; ভোঁতা।
মুরুল : মৃণাল ; পদ্ম।
মুজি : বীচ।
মেচড়ি : পুঁই-এর ফুলদণ্ড।
মেহরারু : স্ত্রী।
বঁদ : বেড়া।
রকা : টাটকা, তাজা।
রাডারাম্পা : বিশালাকার।
রাহেড : অড়হর।
রাজট : কথাবার্তা, আলাপ।
রাসি মদ : নিজলা মদ।
রিজ, রিঝ : আনন্দ, খুশি।

বিষ : ঈর্ষান্বিত হওয়া।
রিচ্ : কুঞ্চিত, ঢেউ খেলানো।
বাংক : ঋতুকাল।
কাঁবা : বেড়া দেওয়া।
কষ : কষ্ট হওয়া।
কচা : কচি হওয়া।
রখা : রুক্ষ, শুকনো।
লছং : ছলনা, ছল।
লালকা : প্রলুব্ধ হওয়া।
লানবন : [illegible]।
লঙক : ঝুলে থাকা।
লাহা : [illegible]।
লিপা : ধুবা।
লিযই : ঝগড়া।
লুকালুকি : লুকোচুরি।
লুচক : আতঙ্কে ছিটকে যাওয়া।
লুগা : কাপড়।
লুখি : মাছিবিশেষ।
লাগা : নিয়ে যাওয়া।
লে : থেকে।
লেডপী : খোঁড়া (স্ত্রী°)।
লেদা : ঝুঁকানো, কুঁজো।
লেসা : মাখা ; প্রলেপ দেওয়া।
লেঠা : জট ; বিপদ।
শষ, শউষ : তৃষ্ণা।

শিশুকাল : যৌবন।
সগা : আগুন জ্বলা।
সঁয়া : স্বামী ; প্রিয়তম।
সংগতি : সঙ্গীসাথী।
সতব : সাবধান, হুঁশিয়ার।
সন : কৃপণ।
সাকাম (সাঁ) : পাতা।
সামা : ঢোকা।
সাপা : পীড়ন করা।
সিব : শেষ হওয়া।
সুচা : ছুঁচলো।
সুং : নির্ভীক, ভয়ডরহীন।
সেঙেল (সাঁ) : আগুন।
সেরেঞ (সা) : গীত।
হড় : দড়।
হবরব : বাস্তুসম্বন্ধ ; বাস্তুক।
হাঁসা : শাদা, ফরসা।
হালি : কচি ফল, ভ্রূণ।
হাড়ুলা : হাড়ুরে।
হিড : আল।
হিলা : নড়া, দোলা।
হুলক : উঁকি মারা।
হুনকা : [illegible] ভরে জলে ওঠা।
হেঁক : ঢেউ।
হেঁসুরা : পরিশ্রমজনিত শ্বাস ফেলা।

শুদ্ধিপত্র

আছে	পৃষ্ঠা/পঙক্তি	হবে
ইয়ত্বা	১|১৭	ইয়ত্তা
এজেন্সীভুক্ত	১৭|১	এজেন্সীভুক্ত
সম্প্রদায়	২১|১৯	সম্প্রদায়
শাকয়ান	২২|পা টী.	লোকায়ন
[illegible]	৫৫	[illegible]
[illegible]	২৫|২৫	[illegible]
পংক্তি	২৮|২০	পাংক্তি
[illegible]	৩০|১৫	কুলকেতুর
পুরোপরি	৩৪|৫	পুরোপুরি
প্রসংগে	৪০|৯	প্রসঙ্গে
শুডার	৪১|৯	কডার
[illegible]	৪১|২০	[illegible]
অধ্যায়ণের	৪৫|২৩ ২৭	অধ্যায়নের
[illegible]	৫৮|১৭	[illegible]
পরসার	৬৫|১	পরস্পর
গোপিণী	৭১|১৫	গোপিনী
সদাচরণে	৭০|২০	সদাচরণ
[illegible]	৯৮|৮	পরিস্ফুট
[illegible]	১০৪|২	সাজা
নয়	১১২|১৬	হয়
[illegible]	১১৯|১৮	[illegible]
[illegible]	১২০|১	[illegible]
[illegible]	১২৩|৪	শ্বাস ... প্রধান
[illegible]	১৩২|২৭	[illegible]
[illegible]	১৩০|২৫	প্রতিবেশিনী
বাস্তুর	১৪৫|১	[illegible]
অগ্নুৎসবে	১৪৫|৩	[illegible]
ঘাটি	১৪৫|১০	বাটি
পবরের	১৪৬|৬	[illegible]
Cuntries	১৪৭|১৫	Countries
[illegible]	১৪২|৫	[illegible]
ifid	১৪৯|পা.টী	ibid
বলে	১৫০|১৭	[illegible]
সেই	১৫৮|২৮	[illegible]
শাশুড়ী	১৬৫|১৪	[illegible]
শ্বশুরালয়ে	১৬৬|৯	শ্বশুরালয়

আছে	পৃষ্ঠা পঙক্তি	হবে
[illegible]	১৮|২	ইন্দ্র
[illegible]	১৮২|১১	[illegible]
রোহিত...কপাল	১৭৮|২৬	কপাল...রোহিত
বাস্থাবানুগ	১৮১|৫	বাস্তবানুগ
[illegible]	১৮১|১৫	[illegible] অসুবিধাও
[illegible]	১৮১|১০	উচ্চবর্ণের
পাইন ...	১৮০|২০	পাইনা দিলি
[illegible]	১৯১|১১	[illegible]
[illegible]	২১০|১৬	সঙ্গে
সঙ্গে	২১০|১৭	[illegible]
[illegible]	২১৮|১৮	[illegible]
[illegible]	২২১|পা টী	ধর্মমঙ্গল
[illegible]	২২৫|৪	[illegible]
[illegible]	২২৮|[illegible]	[illegible]
[illegible]	২৩০|১৯	করেছে
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]|১০	করেছেন
গায়ন রীতি	২৩৯|২১	গায়নরীতি
[illegible]	[illegible]|১	[illegible]
সুরও	২৪৮|১৮	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	২৫৬|১০	[illegible]
[illegible]	[illegible]|পা টী	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]|১০	[illegible]
[illegible]	[illegible]|১০	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	৮৫|৬	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	৮৬|২৭	[illegible]
[illegible]	৩৯|৬	ম-এ
[illegible]	২৯০|৬	অন যন্ত্র
বলে	২৯৭|২০	বলে
[illegible]	[illegible]|২৩	[illegible]

আছে	পৃষ্ঠা/পঙক্তি	হবে
কু'খবল	২৯৯।১	কুখি
তাড়াতাড়ি	২৯৮।১৭	তাড়িতাডি
ডাগুড (৩)	৩০০।৬	ঝাঁ গুড (৩)
পো	৩০০।১৭	পা
প্রাশ্নোত্তরমূলক	৩০২।৭	পশ্নে ত্তরমূলক
প্রাগুপ্ত	৩০৪।পা টি	প্রাগুক্ত
aphorigm	৩০৫।১১	aphorism
এব	৩০৬।১০	নব
অ'নাখ না	৩০৭।১০	আনাথানা
ঘব	৩০৭।১১	দাঁড়
বাটে	৩১২।২১	চাটে
এমন	৩১২।২৪	এখন
শ'লেব	৩১৭।৭	শ'লেব
আইডে	৩১৯।১৪	অাইডে ,
শোভন	৩১৯।১৮	লৌতন
যাব	৩২১।২৪	যায
কাট্টবায	৩২৫।২	কাঠুযায
।	৩২৮।১১	,
রূপকথাব	৩৪৬।২৮	রূপকথায
কবাবব	৩৫২।২	কববার
দেওযা	৩৫২।১৬	দেখা
ম'নুষেবা	৩৫৫।৪	মুনিসবা
সুমুদ্দব	৩৫৮।৩০	সমুদ্দুব
সংগৃী ত	৩৬৪।২৫	সংগৃহীত
destriy	৩৬৯।৯	destroy
ifficacy	৩৬৯।১০	efficacy
এবং	৩৭২।২৫	এবং
পৃবিবী তে	৩৭৪।৭	পৃথিবী ত
পৃথিবীই	৩৭৫।৪	পৃথিবী
কামাবেশ্বব	৩৭৭।১০	কান যেশ্বব
গমণেব	৩৭৮।২৫	গমনেব
ধাবো	৩৯১।২০	ঠাবো
লাম্পট্যা	৩৯১।২৭	লম্পট্যা
স মান্য	৪০০।১৫	স হায্য
সাহায্য	৪০০।২০	সামান্য
গ্রকৃতি	৪২৫।শীর্ষক	প্রকৃতি
জগ্‌হাব	৪২৫।১	জনহা'ব
চালতা	৪৩৯।১০	চালতা